

দু রিটান অর শালক

হামস

আর্থার বেনান ডয়েল



সূচিপত্র

কার্পেটের কারচুপি	2
কালাপাহাড়ের কাণ্ড নয়	60
কুটিল বুড়োর কুচক্র.....	101
খেলোয়াড়ের খেলায় অরুচি.....	146
গোরুর খুরের রহস্য.....	191
তিন গেলাসের রহস্য.....	260
তিমি শিকারির বুক হারপুন.....	309
নাচিয়েদের নষ্টামি	353
প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রফেসর	394
প্রশ্নপত্রের পলায়ন.....	438
ভাংচি দেওয়ার ভয়ংকর কাহিনি.....	479
মোর্যানের মারাত্মক হাতিয়ার.....	509
সুন্দরীর শতক জ্বালা!.....	548

বাপিটের বগরচুপি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেকেন্ড স্টেন]

কোন বছর তা বলব না। এমনকী সেযুগটারও কোনো নামকরণ করব না। শরৎকালে এক মঙ্গলবারের সকালে বেকার স্ট্রিটে আমাদের দীনহীন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ইউরোপবিখ্যাত দুজন পুরুষ। একজন তপঃকৃশ চেহারা, উন্নত নাক, ইগল পাখির মতো চোখ এবং সব মিলিয়ে ক্ষমতাবান পুরুষের মতো প্রভুত্বময় মূর্তি। দু-দু-বার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যিনি, ইনি সেই স্বনামধন্য লর্ড বেলিনগারআর একজনের বর্ণ মলিন, মুখের গঠন নিখুঁত, সুষ্ঠু, সুন্দর, পরিপাটি চেহারা। টেনেটুনে তাকে মধ্যবয়সিও বলা যায় না। দেহ এবং মনের স্বভাব-দত্ত সর্ববিধ গুণসম্পন্ন এই পুরুষটিই রাইট অনারেবল ট্রেলাওনি হোপ—যিনি ইউরোপ সংক্রান্ত দপ্তরের সেক্রেটারি এবং দেশের উদীয়মান রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁর স্থান সবার আগে। কাগজপত্র ছড়ানো সেটির ওপর পাশাপাশি বসলেন দুজনে। ওঁদের শ্রান্ত গুঁকনো আর উদবেগে-আঁকা মুখ দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, রীতিমতো জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে দুজনকে সশরীরে আসতে হয়েছে আমাদের আস্তানায়। নীল-নীল শির-বার করা পাতলা হাতে ছাতার হাতির দাঁতের বাঁটটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীমশায়। আর বিষাদ-মাখা তপঃকৃশ কঠোর মুখে ক্রমান্বয়ে তাকাচ্ছিলেন আমার আর হোমসের পানে। নার্ভাস হয়ে নিজের গোঁফ ধরে টানাটানি করছিলেন ইউরোপীয়ান সেক্রেটারি আর চঞ্চল আঙুলে নাড়াচাড়া করছিলেন ঘড়ির চেনের সিলমোহরগুলো।

মি. হোমস, আজ সকালে আটটার সময় চুরিটা আবিষ্কার করার সঙ্গেসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীমশায়কে খবর দিই আমি। তারই প্রস্তাবমতো দুজনে এসেছি আপনার কাছে।

পুলিশকে জানিয়েছেন?

না, মশায়। চট করে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনভাবে বললেন যেন তার কথাই চূড়ান্ত, তারপর আর কিছু বলার নেই। কথা বলার এই দুটি বিশেষ ভঙ্গিমার জন্যে সুনাম আছে তাঁর। আমরা জানাইনি এবং জানানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। পুলিশকে জানানো মানেই, দু-দিন বাদে জনসাধারণকে জানানো। ঠিক এই জিনিসটাই আমরা এড়িয়ে যেতে চাই।

কিন্তু কেন, স্যার?

কেননা যে-দলিল সম্পর্কে আমরা এসেছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনই বিরাট তার গুরুত্ব যে, একবার যদি প্রকাশ পায়, তাহলে অতি সহজে চরমতম মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে পড়বে সারা ইউরোপে এবং আরও জটিল হয়ে উঠবে তার বর্তমান পরিস্থিতি। আমি আবার বলছি, এ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা খুবই বেশি। বেশি কী, এ-ব্যাপারের ওপর শাস্তি অথবা যুদ্ধ নির্ভর করছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। রীতিমতো গোপনতার সাথে এ-দলিল উদ্ধারের চেষ্টা না-করলে, কোনোদিনই তা উদ্ধার করা যাবে না। কেননা এ-

জিনিস যারা নিয়েছে, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়া।

বুঝলাম। মি. ট্রেলোওনি হোপ, কীরকম পরিস্থিতির মধ্যে ও-দলিলটি অদৃশ্য হয়েছে, তা যদি হুবহু বলেন তো বাস্তবিকই উপকার হয় আমার।

অল্প কয়েকটি কথা দিয়েই তা বলা যায়, মি. হোমস। চিঠিটা—দলিলটা আসলে এক বিদেশি রাজার একটা চিঠি পেয়েছিলাম ছ-দিন আগে। চিঠিটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনোদিনই আমার আয়রন সেফে তা রেখে যাওয়া নিরাপদ মনে করিনি। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে সঙ্গে করে এনেছি হোয়াইট হল টেরেসে আমার বাড়িতে। চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ বয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ডেসপ্যাঁচ বাক্স আছে আমার শোবার ঘরে। এই ডেসপ্যাঁচবাক্সেই চাবি দিয়ে রেখে দিতাম চিঠিটাকে। গতরাতে এই বাক্সেই ছিল চিঠিটা। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ডিনারের পোশাক পরার সময়ে বাক্সটা খুলেছিলাম, চিঠিটাকেও ভেতরে দেখেছিলাম। আজ সকালে দেখি তা উধাও হয়েছে। আমার ড্রেসিং টেবিল আয়নার পাশেই সারারাত ছিল ডেসপ্যাঁচবাক্সটা। আমার ঘুম পাতলা, আমার স্ত্রীর-ও তাই। আমরা দুজনেই শপথ করে বলতে রাজি আছি, সারারাত ঘরের মধ্যে তৃতীয় কোনো প্রাণী ঢোকেনি। তা সত্ত্বেও আবার আমি বলছি, চিঠিটা উধাও হয়েছে বাক্সের ভেতর থেকে।

ডিনার খেয়েছিলেন কখন?

সাড়ে সাতটায় ।

শুতে গিয়েছিলেন কখন?

থিয়েটারে গেছিলেন আমার স্ত্রী । তার অপেক্ষায় বসে ছিলাম কিছুক্ষণ । সাড়ে এগারোটায়
আমরা শুতে গেছিলাম ।

তাহলে পুরো চার ঘণ্টা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল ডেসপ্যাঁচ-বাক্সটা?

সকালে বাড়ির পরিচারিকা, আর সারাদিনে আমার খিদমতগার অথবা আমার স্ত্রীর
পরিচারিকা ছাড়া আর কাউকে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না । এরা
প্রত্যেকেই খুব বিশ্বাসী এবং বেশ কিছুদিন ধরে রয়েছে আমাদের কাছে । তা ছাড়া,
ওদের মধ্যে কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে, দপ্তরের সাধারণ কাগজপত্র ছাড়া আরও
বেশি মূল্যবান দলিল থাকতে পারে আমার ডেসপ্যাঁচবাক্সে ।

চিঠিটার অস্তিত্ব কে কে জেনেছিল?

বাড়ির মধ্যে কেউ নয় ।

আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জেনেছেন?

না মশায় । আজ সকালে কাগজটা খোয়া যাওয়ার আগে পর্যন্ত স্ত্রীকে কিছুই বলিনি আমি ।

ঘাড় হেলিয়ে সাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী ।

বললেন, জনসাধারণের কাজে তোমার কর্তব্যবোধ যে কতখানি প্রখর, অনেকদিন ধরেই আমি তা জানি, হোপ । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন যতই নিবিড় আর মধুর হোক না কেন, সব কিছুর ওপরে স্থান দেওয়া উচিত এ-জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্যসম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা ।

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন ইউরোপীয় সেক্রেটারি ।

বললেন, আমার ন্যায় পাওনাটুকুই শুধু আমায় দেবেন, স্যার । মি. হোমস, আজ সকালের আগে এ-ব্যাপার সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি আমার স্ত্রীর কাছে ।

উনি অনুমান করতে পেরেছিলেন কি?

না, মি. হোমস । উনি তো পারেনইনি, আর কারো পক্ষেও সম্ভব ছিল না অনুমান করার ।

এর আগে আপনার কোনো দলিল খোয়া গেছিল?

না মশায় ।

এ-চিঠির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কে কে খবর রাখেন সারা ইংলন্ডে?

ক্যাবিনেটের প্রত্যেক মেম্বাররা জানেন। গতকালই এ-খবর দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। ক্যাবিনেট-মিটিংয়ে যাঁরা যোগদান করেন, তাদের প্রত্যেকেই গুহ্যতত্ত্ব গোপন রাখার আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার করতে হয়। এ-অঙ্গীকারের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রধানমন্ত্রীমশায়ের দেওয়া গুরুগম্ভীর হুঁশিয়ারিতে। হায় রে! তখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি নিজেই খুইয়ে বসব এ-জিনিস! প্রবল নিরাশায় দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। দু-হাতে চুল ধরে টানতে লাগলেন উনি। মুহূর্তের জন্য এক ঝলকে দেখে নিলাম আমরা আসল মানুষটিকে—উদগ্র আবেগ, আতীত আর আতীত্ব অনুভূতি দিয়ে ঘেরা একটি স্বাভাবিক মানুষকে। পরের মুহূর্তেই ফিরে এল তার আভিজাত্য-আঁকা মুখোশ আর ধীরগম্ভীর স্বর। ক্যাবিনেটের মেম্বাররা ছাড়া এ-সম্বন্ধে জানেন দপ্তরের দুজন, কি খুব সম্ভব তিনজন অফিসার। ইংলন্ডে আর কেউই জানে না, মি. হোমস। এ-বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি।

কিন্তু সাগরের ওপারে?

আমার বিশ্বাস, এ-চিঠি যিনি লিখেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউই এটা দেখেননি। আমার দৃঢ় ধারণা, মিনিস্টারদের মানে, অফিসের কাউকেই এ-কাজের ভার তিনি দেননি।

অল্পক্ষণের জন্য কথাগুলো মনে মনে তোলপাড় করে নিল হোমস।

তারপর বললে, এবার, স্যার, আরও বিশদভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। এ-দলিলটি কীসের এবং এর অন্তর্ধানে পরিণামই-বা এত গুরুতর হবে কেন, তা আমার জানা দরকার।

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন দুই রাজনীতিবিদ। তারপর, ঝকড়া ভুরু কুঁচকে কুটি করলেন প্রধানমন্ত্রী।

মি. হোমস, লেফাফাটা লম্বা আর পাতলা। ম্যাডমেডে নীল রং, গুঁড়িমারা একটা সিংহের ছাপ আছে লাল গালার সিলমোহরের ওপর। ঠিকানাটা লেখা হয়েছে গোটা গোটা, বলিষ্ঠ অক্ষরে—

হোমস বাধা দিয়ে বললে, এসব খুঁটিনাটি যতই চিত্তাকর্ষক আর প্রয়োজনীয় হোক না কেন, সব কিছুরই একদম গোড়ায় পৌঁছোতে চায় আমার তদন্তধারা। চিঠিটা কীসের?

সেটা একটা রাষ্ট্রিক গুহ্যতত্ত্ব এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ! এ-প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিতে পারব না এবং এ-তথ্যের প্রয়োজন আছে বলেও মনে হচ্ছে না আমার। যেসব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় আপনার এত সুনাম, তার সাহায্যে আমার বর্ণনামতো লেফাফা এবং তার মধ্যকার কাগজপত্র যদি উদ্ধার করে আনতে পারেন, তাহলেই জানবেন, আপনার স্বদেশের একটা যথার্থ উপকার আপনি করলেন। আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয়, একটি পুরস্কারও অর্জন করবেন আপনি।

মুদু হেসে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোমস ।

বললে, এদেশের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত পুরুষদের মধ্যে আপনারা দুজনেও আছেন। আর, দীনহীন হলেও বহুজনেই দেখা করতে আসে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি, এ-ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব না। এ-সাক্ষাৎকার আর টেনে নিয়ে গেলেও শুধু সময় নষ্টই সার হবে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী। কোটরে বসা দুই চোখে দপ করে জ্বলে উঠল চকিত ভয়ংকর দীপ্তি। এ-চোখের সামনে কতবার কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে গোটা ক্যাবিনেটটা। এসব আমি বরদাস্ত করি না বলেই, প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন তাঁর ক্রোধ। আবার বসে পড়লেন সেটির ওপর। মিনিটখানেক কি তারও বেশি হবে চুপচাপ বসে রইলাম সবাই। তারপর দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ, আপনার শর্তই মেনে নেওয়া উচিত, মি. হোমস। নিঃসন্দেহে খাঁটি কথাই বলেছেন আপনি। আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আওতায় আপনাকে

-আনা পর্যন্ত আপনার পক্ষে তৎপর হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয়।

আমি আপনার সাথে একমত, স্যার, বললেন কনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

আপনার এবং আপনার সহকর্মী, ড. ওয়াটসনের সততার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সবই আমি বলব। আপনাদের স্বদেশপ্রেমের ওপর আস্থা রাখছি আমি। এ-ব্যাপার একবার প্রকাশ পেলে যে চরমতম দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে এদেশের শিরে, তার চেয়ে বেশি আর কিছু আমি কল্পনাতেও আনতে পারছি না।

নিশ্চিত মনে আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন আপনি।

চিঠিটা এসেছে একজন বিদেশি রাজার কাছ থেকে। সম্প্রতি এদেশের উপনিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি পরিস্থিতিতে বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন উনি। চিঠিটা লেখা হয়েছে। তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবে তার নিজের দায়িত্বে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এ-ব্যাপার সম্পর্কে তার মিনিস্টাররাও কিছু জানেন না। চিঠিটা কিন্তু লেখা হয়েছে এমন ভঙ্গিমায়, বিশেষ করে এর কয়েকটি কথা এমনই আক্রমণাত্মক যে এ-চিঠি একবার কাগজে ছাপা হয়ে গেলেই অত্যন্ত বিপজ্জনক মনোভাবের সৃষ্টি হবে এদেশে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই আমার। ফলাফলটা এমনই গেজে উঠবে যে, কোনোরকম দ্বিধা না-করেই বলছি, এ-চিঠি প্রকাশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে আমাদের দেশ।

একটুকরো কাগজে একটা নাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলে হোমস।

এজ্যাক্টলি? ইনিই বটে। এবং এইটাই সেই চিঠি যার পরিণাম হয়তো কোটি কোটি মুদ্রার ব্যয় আর লক্ষ লক্ষ জীবনের হানি। এই চিঠিটাই হারিয়েছি।

চিঠি যিনি পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জানিয়েছেন?

হ্যাঁ, জানিয়েছি। গোপন হরফে লেখা একটি সংকেত-টেলিগ্রাম চলে গেছে তার কাছে।

উনি হয়তো চান চিঠিটা ছাপা হোক।

না মশায়, না। কাজটা যে মাথা গরম হয়ে গিয়ে ঝাঁকের মাথায় অত্যন্ত অবিবেচকের মতো করে ফেলেছেন, তা যে এর মধ্যেই উনি বুঝতে পেরেছেন, তা বিশ্বাস করার মতো জোরালো কারণ আমাদের আছে। এ-চিঠি প্রকাশ পেলে আমরা যে-চোট পাব, তার চাইতেও প্রচণ্ড আঘাত গিয়ে পড়বে ওঁর নিজের দেশের ওপর।

তাই যদি হয়, তাহলে বলুন তো এ-চিঠি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাক, এ-রকম আগ্রহ কার থাকতে পারে? এ-জিনিস লোপাট করা বা ছাপানোর অভিসন্ধিই যদি কারো মনে জেগে থাকে, তবে তার মূল কারণটাই-বা কী?

মি. হোমস, তাহলেই তো আমাকে বেজায় উঁচুদরের আন্তর্জাতিক কূটনীতির এজিয়ারে এনে ফেললেন। ইউরোপীয় পরিস্থিতি যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন, তাহলেই কিন্তু মোটিভ অনুমান করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না আপনাকে। সারা ইউরোপটা এখন একটা সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে দুই জাতির একটা জোট আছে— সামরিক শক্তির মোটামুটি সমতা রক্ষা করছে এরাই। পাল্লা ধরে বসে রয়েছে থেট

ব্রিটেনে। এই দুই রাষ্ট্রের একটির সঙ্গে যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় গ্রেট ব্রিটেন, তাহলেই জোটের অপর রাষ্ট্রটির পরম প্রাধান্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তারা যুদ্ধে যোগদান করলেই-বা কী, না-করলেই-বা কী। বুঝেছেন তো?

জলের মতো। তাহলে এই রাজ্যের শত্রুরাই চাইছে চিঠিটা সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিতে—যাতে করে তাদের দেশ আর আমাদের দেশের মধ্যে ফাটল ধরে। এই তো?

ইউরোপের যেকোনো বড়ো চ্যামেলারিতে অর্থাৎ এমবাসি-সংলগ্ন অফিসে পাঠিয়ে দিলেই হল। এই মুহূর্তে চিঠিটা খুব সম্ভব এইরকম কোনো চ্যামেলারির দিকে ধেয়ে চলেছে তিরবেগে—মানে যতটা বেগে স্টিমের জাহাজ তাকে নিয়ে যেতে পারে।

মি. ট্রেলাওনি হোপের মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। সজোরে গুণ্ডিয়ে উঠলেন উনি। আলতো করে সাস্থনার ছলে তার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন প্রধানমন্ত্রী।

মাই ডিয়ার, এ তোমার নিছক দুর্ভাগ্য। এজন্যে কেউই অপরাধী করতে পারে না তোমাকে। এমন কোনো সাবধানতা বাকি ছিল না যা তুমি অবহেলা করেছ। মি. হোমস, সব তথ্যই তো পেলেন। এবার বলুন তো, আমাদের করণীয় কী?

বিষমভাবে মাথা নাড়তে লাগল হোমস।

বলল, স্যার, আপনি তাহলে মনে করেন, এ-চিঠির পুনরুত্থান না হলে যুদ্ধ হবেই?

আমার মনে হয়, সে-সম্ভাবনা খুবই বেশি।

তাহলে, স্যার, যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হোন।

কথাটা খুবই শক্ত, মি. হোমস।

ঘটনাগুলো ভেবে দেখুন, স্যার। চিঠিটা যে রাত সাড়ে এগারোটার পর নেওয়া হয়নি তা সহজেই অনুমেয় এই কারণে যে, এইমাত্র শুনলাম মি. হোপ আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই সেই সময় থেকে চুরি ধরা পড়ার সময় পর্যন্ত ঘরের মধ্যেই ছিলেন। তাহলে এ-জিনিস উধাও হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা থেকে এগারোটার মধ্যে, খুব সম্ভব সাড়ে সাতটার পরেই কোনো সময়ে। এ-কথা বললাম এই কারণে যে, চিঠিটা যে-ই নিক না কেন, সে নিশ্চয় জানত ডেসপ্যাঁচ বাক্সেই আছে দলিলটা। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তগত করে ফেলাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আচ্ছা স্যার, এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল যদি ওই সময়ে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলুন তো এখন তা কোথায় থাকতে পারে? চিঠিটা কাছে রেখে দেওয়ার কোনো কারণ নেই কারোরই। এ-জিনিস যারা চায়, তাদের কাছেই চটপট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দলিলটা। এখন বলুন তো এদের পিছু নেওয়ার বা পিছু নিয়ে তাদের পেরিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ কি আমাদের আছে? না, নেই। চিঠি চলে গেছে আমাদের নাগালের বাইরে।

সেটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

মি. হোমস যা বললেন, তা খুবই যৌক্তিক। বেশ বুঝতেই পারছি, বাস্তবিকই এ-ব্যাপার আমাদের হাতের বাইরে।

নিছক তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, দলিলটা সরিয়েছে পরিচারিকা অথবা খিদমতগার—

দুজনেরই বয়স হয়েছে এবং বহুভাবে যাচাই হয়ে গেছে তাদের সততা।

আপনার মুখেই শুনলাম, আপনার ঘরটা তিনতলায়। বাইরে থেকে সে-ঘরে ঢোকার কোনো পথ নেই এবং ভেতর থেকেও অলক্ষিতভাবে কারোর পক্ষে উঠে আসা সম্ভব নয়। তাহলে, নিশ্চয়ই বাড়ির কেউ নিয়েছে চিঠিটা। চোর মহাপ্রভু চিঠিটা নিয়ে যাবে কার কাছে? আন্তর্জাতিক গুপ্তচর আর সিক্রেট এজেন্টদের একজনের কাছে। এদের সংখ্যা বেশি নয় এবং তাদের প্রত্যেকের নামের সাথে পরিচয় আছে আমার। এ-পেশার মাথা বলতে আছে তিনজন। আমার তদন্ত শুরু হবে এদেরকে দিয়েই। প্রত্যেকের ঘাঁটিতে গিয়ে আমায় দেখতে হবে তারা হাজির আছে কি না। একজন যদি নিপাত্তা হয়—বিশেষ করে কাল রাত থেকে যদি সে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলেই দলিলটা যে কোনদিকে গেছে, সে-সম্বন্ধে কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।

ইউরোপীয় সেক্রেটারি শুধোলেন, কিন্তু সে নিপাতাই-বা হবে কেন? চিঠিটা নিয়ে লন্ডনের কোনো এমবাসিতে পৌঁছে দিলেই কাজ শেষ হয় তার। অবশ্য এমনটা হতেও পারে, নাও হতে পারে।

আমার তা মনে হয় না। এ ধরনের এজেন্টরা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং এমবাসির সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ মোলায়েম হয় না।

ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানানেন প্রধানমন্ত্রী।

আমার তাই বিশ্বাস, আপনি ঠিক বলেছেন, মি. হোমস। এ-রকম একটা মূল্যবান দলিল সে নিজের হাতেই পৌঁছে দেবে হেড কোয়ার্টারে। আপনার কাজের গতি-পদ্ধতি খুব চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে আমার। হোপ, ইতিমধ্যে এই একটা দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা সাজে না। সারাদিনে নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আপনাকে খবর দেব। আর আপনিও আপনার তদন্তের ফলাফল জানাবেন নিশ্চয়।

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে গম্ভীরমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই রাজনীতিবিদ।

এহেন যশস্বী সাক্ষাৎকারীরা বিদায় হলে পর, নীরবে পাইপটা ধরিয়ে নিলে হোমস। তারপর অতলস্পর্শী চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। সকালের কাগজটা

খুলে একটা চাঞ্চল্যকর খুনের সংবাদে ডুবে গিয়েছিলাম আমি। খুনটা হয়েছে গতরাতে লন্ডন শহরেই। ঠিক এমনি সময়ে বিস্ময়চকিত দারুণ চিৎকার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আমার বন্ধুটি। তারপর পাইপটা নামিয়ে রাখল ম্যান্টেলপিসের ওপর।

বললে, ঠিক, এ-রহস্যের মুখে পৌঁছানোর এর চাইতে আর ভালো পথ নেই। পরিস্থিতি বেপরোয়া হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এমনকী কখনো যদি জানতে পারি এদের মধ্যে কোন মূর্তিমান এ-জিনিসটাকে চক্ষুদান করেছেন, তাহলেও এমনও হতে পারে যে এখনও চিঠিটা বেহাত হয়নি। একটা কথা কি জানো, এ ধরনের লোকদের কাছে অর্থই হচ্ছে পরমার্থ আর ব্রিটিশ কোষাগার তো আমার পেছনেই রইল। এ-চিঠি যদি বাজারে পৌঁছায়, কিনে নিতে পিছপা হবে না আমি—তাতে যদি ইনকাম ট্যাক্সে আর একটি পেনি বৃদ্ধি পায়, পরোয়া করি না। যতদূর মনে হয় আমার, লোকটা হয়তো মওকা বুঝে দাঁও মারবার আশায় এখনও চিঠিটা রেখে দিয়েছে নিজের জিম্মায়। ওদিকে কপাল ঠুকে দেখার আগে দেখে নিতে চায় এদিক থেকে কীরকম দরটা আসে। এ ধরনের বিরাট খেলা খেলতে পারে শুধু তিনজন। ওবারস্টাইন, লা রোথিয়েরা, আর এডুয়ারডো লুকাস। এদের প্রত্যেকের সাথে দেখা করব আমি।

আমি সকালের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম।

গোডোলফিন স্ট্রিটের এডুয়ারডো লুকাস তো?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

কেন হবে না?

গতরাতে সে খুন হয়েছে তার বাড়িতে।

বিগত বহু অ্যাডভেঞ্চারে আমাকে বহুভাবে তাক লাগিয়েছে আমার বন্ধুটি। কাজেই, যখন উপলব্ধি করলাম এক্ষেত্রে তাকেও আমি বিলকুল তাজ্জব বানিয়ে দিতে পেরেছি, তখন বাস্তবিকই পরম সন্তোষ লাভ করলাম আমি। বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ও, তারপর কাগজটা ছিনিয়ে নিলে আমার হাত থেকে! হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকে যে প্যারাগ্রাফটা তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম, তা নীচে দিলাম :

ওয়েস্টমিনিস্টারের হত্যা

গতরাতে ১৬ নং গোড়োলফিন স্ট্রিটে একটি রহস্যজনক অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। হাউস অফ পার্লামেন্টের সুবিশাল টাওয়ারগুলির ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে নদী এবং মাঠের মধ্যবর্তী স্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সারি সারি কতকগুলি সেকেলে নির্জন বাড়ি আছে। ১৬নম্বর বাড়িটি ইহাদেরই অন্যতম। ক্ষুদ্র কিন্তু রুচিসুন্দর এই আয়তনটিতে মি. এডুয়ারডো লুকাস কয়েক বছর ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন মহলে তিনি

দুই কারণে সমধিক পরিচিত। প্রথমত তাঁহার মনোহর ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়ত এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শৌখিন গায়ক হিসাবেও তাহার বিলক্ষণ সুনাম আছে। মি. লুকাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্য বর্ষীয়সী মিসেস প্রিন্সল এবং খিদমতগার মিঠুনকে লইয়াই তাহার সংসার। মিসেস প্রিন্সল সকাল সকাল ঘুমাইতে যায় এবং তাহার শয়নকক্ষ বাড়ির সর্বোচ্চ তলায়। হ্যামারস্মিথে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিবার জন্যে সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির বাহিরে গিয়াছিল খিদমতগার। এই সময়ে কী ঘটিয়াছে, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু রাত সওয়া বারোটো নাগাদ পুলিশ কনস্টেবল ব্যারেট গোডেলফিন স্ট্রিট দিয়া যাইতে লক্ষ করে যে ১৬ নম্বর বাড়ির দরজাটি দু-হাত করিয়া খোলা। টোকা মারিয়াও সে কোনো উত্তর পায় না। সামনের ঘরে আলোর আভাস পাইয়া সে প্যাসেজ বরাবর আগাইয়া যায় এবং আবার টোকা মারে, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ আসে না। তখন সে দরজা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ঘরে সমস্ত কিছু লম্বভল হইয়া পড়িয়া ছিল। যাবতীয় আসবাবপত্র টানিয়া একধারে জড়ো করা হইয়াছিল এবং একটি চেয়ারের একটি পায়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছিলেন বাড়ির হতভাগ্য ভাড়াটিয়া। তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল এবং প্রাণবায়ু নিশ্চয় সঙ্গেসঙ্গেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। যে ছুরিকা দিয়া অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা একটি বেঁকানো ভারতীয় ভোজালি। নির্জিত শত্রুর দেশ হইতে সংগৃহীত প্রাচ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি টাঙানো ছিল একটি দেওয়ালে। ভোজালিটি এইস্থান হইতে টানিয়া নামানো হয়। হত্যার মোটিভ চুরি বলিয়া মনে হইতেছে না। কেননা ঘরের মূল্যবান সামগ্রীসমূহের একটিও সরানোর প্রচেষ্টা করা হয় নাই। মি. এডুয়ারডো লুকাস এত সুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁহার এই নিষ্ঠুর এবং রহস্যবৃত্ত পরিণতি তাঁহার সুদূরপ্রসারী বন্ধুমহলে সগভীর সহানুভূতি এবং বেদনাময় আত্মহের সঞ্চার করিবে।

ওয়াটসন, এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয় শূনি? দীর্ঘ বিরতির পর শুধোল হোমস ।

একটি আশ্চর্য কাকতালীয় ।

কাকতালীয়! এ-নাটকে যে তিনজন সম্ভাব্য অভিনেতার নাম বলেছি, এ-লোকটা তাদেরই একজন । যে সময়ে এ-নাটক অভিনীত হয়েছে বলে আমরা জানি, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছে সে । কাকতালীয় না-হওয়ার সম্ভাবনাই দেখছি বিস্তর । কোনো সংখ্যা দিয়েও এসবের প্রকাশ চলে না । না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ দুটো ঘটনার মধ্যেই যোগসূত্র আছে—আছেই । এবং সে-যোগসূত্র কী তা আমাদেরই বার করতে হবে ।

কিন্তু এখন তো সরকারি পুলিশ সবই জেনে ফেলেছে?

মোটাই নয় । গোডোলফিন স্ট্রিটে যেটুকুই দেখেছে, ওরা শুধুই সেইটুকু জানে । হোয়াইট হল টেরেস সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না বা জানবে না । আমরাই শুধু দুটি ঘটনাই জানি এবং আমরাই পারি এই দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করতে । তবে একটা জ্বরদস্ত পয়েন্ট আছে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেই শুধু এই পয়েন্টের জোরেই আমার সন্দেহ এসে পড়ত লুকাসের ওপর । ওয়েস্টমিনিস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিট থেকে হোয়াইট হল টেরেস মাত্র কয়েক মিনিটের পথ । আর যে ক-জন সিক্রেট এজেন্টের নাম

করলাম, ওরা থাকে ওয়েস্ট এন্ডের এক প্রান্তে। কাজেই ইউরোপীয়ান সেক্রেটারির গেরস্থালির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বা সেখান থেকে কোনো বার্তা গ্রহণ করা অন্যান্যের চেয়ে লুকাসের পক্ষেই সহজতর। জিনিসটা খুবই সামান্য কিন্তু যেখানে সমস্ত ঘটনাকে চেপেচুপে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মেয়াদে আনা হচ্ছে, সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও থাকতে পারে। আরে! আরে! আবার কী এল?

রেকাবিতে এক ভদ্রমহিলার কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস হাডসন। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভুরু তুলল হোমস। তারপর, কার্ডটা তুলে দিলে আমার হাতে।

বললে, লেডি হিলডা ট্রেলাওনি হোপকে দয়া করে ওপরে আসতে বলল।

এক মুহূর্ত পরেই আমাদের দীন হীন ঘরে প্রবেশ করলেন লন্ডনের সবচেয়ে লাভণ্যময়ী রমণী। সকাল বেলাই এই সামান্য প্রকোষ্ঠ একবার ধন্য হয়েছিল দুই রাজনীতিবিদের আগমনে এবং তা আর একবার সম্মানিত হল লেডি হোপের আবির্ভাবে। ডিউক অফ বেলমিনস্টারের কনিষ্ঠতম কন্যার রূপের খ্যাতি আমি প্রায় শুনতাম। কিন্তু বর্ণনা শুনে বা রঙিন ফটোগ্রাফ দেখে অনেক কল্পনা করেও তার এহেন সুগঠিত চারু করোটির অপরূপ বর্ণসমারোহ আর নিখুঁত মনোহর, নয়ন-সুন্দর কান্তির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরতের সেই সকালে তার সৌন্দর্যই কিন্তু সবার আগে আমাদের মনে গভীর ছাপ এঁকে দেয়নি। গাল দুটি কমণীয় বটে, কিন্তু আবেগের ছোঁয়া লেগে তা ফ্যাকাশে। চোখ দুটি প্রদীপ্ত বটে, কিন্তু সে-দীপ্তি জ্বরের উত্তাপজনিত। অনুভূতি-সচেতন মুখটি দৃঢ়সম্বন্ধ এবং চাপা অধরাষ্ঠে আত্মসংযমের প্রয়াস। মুহূর্তের মধ্যে খোলা দরজার

ফ্রেমে আমাদের রূপসি সৌন্দর্য দর্শনপ্রার্থী যখন এসে দাঁড়ালেন চিত্রাৰ্পিতের মতো, তখন সৌন্দর্য নয়—আতঙ্কই সবার আগে থির থির করে কেঁপে উঠল তার দুই চোখে।

আমার স্বামী কি এখানে ছিলেন মি. হোমস?

হ্যাঁ, ম্যাডাম, এখানে ছিলেন তিনি।

মি. হোমস, আপনাকে মিনতি করছি, আমি যে এখানে এসেছি, তা তাঁকে বলবেন না। ভাবলেশহীন নিষ্পৃহ মুখে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল হোমস। তারপর হাতের সংকেতে লেডিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

বললে, ইয়োর লেডিশিপ, আমাকে বড়ো সংকটে ফেললেন। আমার অনুরোধ, আগে বসুন, তারপর বলুন কী অভিপ্রায়। কিন্তু আগেই জানিয়ে রাখছি, কোনোরকম শর্তবিহীন প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

দ্রুত পদক্ষেপে আড়াআড়িভাবে ঘর পেরিয়ে জানলার দিকে পিঠ করে বসে পড়লেন লেডি হোপ। রানির মতোই হাবভাব-চেহারা তাঁর—তন্ত্রী, দীর্ঘাঙ্গী, অভিজাত এবং রেখায় রেখায় বরবর্ণিনী।

মি. হোমস, কথা বলতে বলতে সাদা দস্তানাপরা হাতের মুঠি বন্ধ করতে এবং খুলতে লাগলেন ঘন ঘন, অকপটে আপনাকে সব খুলে বলব আমি। বলব এই আশায় যে

হয়তো সব শোনার পর আপনিও প্রাণখোলা হবেন আমার কাছে। শুধু একটি বিষয় ছাড়া আমি এবং আমার স্বামী পরস্পরের কাছে কোনো প্রসঙ্গই গোপন করি না। সমস্ত ব্যাপারে আমার ওপর তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা আছে—শুধু একটি ছাড়া। এবং তা রাজনীতি। এ-ব্যাপারে যেন গালামোহর করা তাঁর ঠোঁট। কিছুই বলেন না আমাকে। কিন্তু আমি জানি, গতরাতে অত্যন্ত শোচনীয় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে আমাদের বাড়িতে। আমি জানি, একটা কাগজ অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টা রাজনীতি সম্পর্কিত, সুতরাং আমার স্বামী পুরোপুরিভাবে আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারছেন না। অথচ এ-ঘটনার সব কিছু বিস্তারিতভাবে আমাকে জানতেই হবে। এবং জানাটা একান্তই দরকার—একান্তই দরকার, আবার বলছি আমি। এই রাজনীতিবিদরা ছাড়া আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সত্য ঘটনাটা জানেন। সেইজন্যেই আমার অনুরোধ, আমার মিনতি মি. হোমস, দয়া করে বলুন, ঠিকঠিক বলুন কী হয়েছে এবং এর পরিণাম কী। সমস্ত খুলে বলুন, মি. হোমস। মক্কেলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নির্বাক হয়ে থাকবেন না। কেননা, তাঁর স্বার্থ রক্ষা পাবে যদি আমাকে আপনারা সব কথা বলেন এবং আমার ওপর আস্থা রাখেন। যে-কাগজটা চুরি গেছে সেটা কী?

ম্যাডাম, যা জিজ্ঞাসা করছেন, তা সত্যিই অসম্ভব।

গুণ্ডিয়ে উঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন লেডি।

জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করুন, ম্যাডাম। আপনার স্বামী যদি এ-ব্যাপারে আপনাকে অন্ধকারে রাখাই সংগত মনে করে থাকেন, তখন, সদ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যেসব

তথ্যগুলি আমি জেনেছি এবং যা উনি আপনার কাছে গোপন রেখেছেন, তা কি আপনাকে আমার বলা উচিত? এ-কথা জিজ্ঞেস করাটাও অন্যায়। আপনার উচিত তাঁকেই জিজ্ঞেস করা, আর কাউকে নয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে। শেষ উপায় হিসেবে আপনার কাছে আমি এসেছি। মি. হোমস, নিশ্চিত কিছু না বলেও একটি পয়েন্ট সম্পর্কে আপনি যদি আমায় আলোকিত করেন তো বড়ো উপকার হয়।

পয়েন্টটা কী, ম্যাডাম?

এ-ঘটনার ফলে আমার স্বামীর রাজনৈতিক কর্মজীবন কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

ম্যাডাম, এ-ব্যাপারে একটা সুরাহা না হলে ফলাফল খুবই খারাপ হতে পারে।

আ! এমনভাবে চকিতে নিশ্বাস টানলেন লেডি যেন আরও দৃঢ়মূল হল তার সন্দেহের রাশি। আর একটা প্রশ্ন, মি. হোমস! এ-বিপর্যয়ের প্রথম শক পেয়েই আমার স্বামী তার চোখ-মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা থেকে আমি বুঝেছিলাম, এ-দলিল খোঁয়া যাওয়ার ফলে ভয়ানক রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে জনগণের মধ্যে।

উনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয় তা উড়িয়ে দিতে পারি না।

প্রতিক্রিয়াগুলো কী প্রকৃতির বলুন তো?

উঁহু, ম্যাডাম, আবার আপনি এমন কথা জিজ্ঞেস করছেন যার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে আপনার সময় নষ্ট করব না। আরও একটু খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাইলেন, সেজন্যে আপনাকে আমি দোষ দিই না, মি. হোমস। আপনিও যে আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা নিশ্চয় পোষণ করবেন না-সে-বিশ্বাস আমার রইল। আমার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি চাই তার উদবেগ উত্তেজনার কিছুটা অংশ নিজের মনে নিতে। আর একবার অনুরোধ জানিয়ে যাই, আমি যে এখানে এসেছিলাম, তা দয়া করে ওঁকে বলবেন না। দরজার কাছ থেকে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন উনি। শেষবারের মতো দেখলাম তাঁর সুন্দর কিন্তু উদ্ভান্ত মুখ, চমকিত চোখ আর চাপা অধরোষ্ঠ। তারপরই অদৃশ্য হলেন উনি।

স্কাটের বিলীয়মান খস খস শব্দের পরিসমাপ্তি ঘটল দরজা বন্ধ করার শব্দে। হাসিমুখে হোমস তখন বললে, ওহে, ওয়াটসন, মেয়েদের বিভাগটা তো তোমার। সুন্দরী মহিলাটি কী খেলায় মেতেছেন বলো তো? ওঁর আসল অভিপ্রায়টা কী?

ভদ্রমহিলার বক্তব্যই তো জলের মতো পরিষ্কার এবং ওঁর উদবেগও খুবই স্বাভাবিক।

হুম। ওঁর চেহারাটা একবার ভেবে দেখ, ওয়াটসন। আরও ভাবো ওঁর হাবভাব, অবরুদ্ধ উত্তেজনা, অশান্ত প্রকৃতি এবং নাছোড়বান্দার মতো প্রশ্ন করার ধরন। মনে রেখো, উনি যে-সম্প্রদায়ের মানুষ, সেখানে কেউ লঘু কারণে আবেগ প্রকাশ করে না।

বাস্তবিকই, বেজায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা।

আরও মনে রেখো, কীরকম অদ্ভুত ঐকান্তিকতার সঙ্গে উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর স্বামীর সম্যক স্বার্থরক্ষার জন্যেই সব জানা উচিত। ও-কথা বলার অর্থ? আরও একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে, ওয়াটসন। আলোর দিকে পেছন ফিরে কেমন কৌশলে বসে পড়লেন, তা তো দেখলে। আমরা যে তার মুখের ভাব দেখে মন বুঝে ফেলি, তা উনি চান না।

হ্যাঁ, ঘরের একটা চেয়ারই বেছে নিয়েছিলেন উনি।

জানোই তো, মেয়েদের মোটিভ সবই অবোধ্য। মার্গারেটের সেই স্ত্রীলোকটার কথা তোমার মনে থাকতে পারে। তাকেও ঠিক এই কারণে সন্দেহ করেছিলাম আমি। নাকের ওপর কোনো পাউডার ছিল না। আর এই সন্দেহই কিনা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল নির্ভুল সমাধান। এ-রকম চোরাবালির ওপর কী করে তোমার সিদ্ধান্তের প্রাসাদ তৈরি করবে বল তো? ওদের অতি তুচ্ছ কার্যকলাপ নিয়েই মোটা মোটা গ্রন্থখণ্ড রচনা করা যায় অথবা ওদের অতি অসাধারণ আচরণের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে পাওয়া যায় হয়তো একটা চুলের কাটা বা চুল কেঁচকানোর প্রসাধনসামগ্রী। গুড মর্নিং, ওয়াটসন।

বেরোচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ। যাব গোডোলফিন স্ট্রিটে। পুলিশ অফিসের দোস্তুদের সঙ্গে সকালটা কাটাওইখানেই। আমাদের সমস্যার সমাধান আছে এডুয়ারডো লুকাসের মৃত্যুরহস্যের সাথে— যদিও স্বীকার করছি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে-বিষয়ে কিছুই আন্দাজ করে উঠতে পারছি না আমি। ইঙ্গিত, ইশারা কিছুই আমি পাইনি এ-সম্পর্কে। ঘটনা ঘটার আগেই থিয়োরি তৈরি করাটা বিরাট ভুল। ভায়া ওয়াটসন, একটু সামলে থেকো। নতুন কেউ দেখা করতে এলে কথা বোলো আমার হয়ে। যদি সম্ভব হয় তো লাঞ্চার আগেই দেখা হবে তোমার সাথে।

সেদিন, তার পরের দিন এবং তারও পরের দিন বিশেষ একটা মুডে রইল হোমস। ওর বন্ধুবান্ধবেরা এ সময়ে ওকে বলে স্বপ্নভাষী, আর সবাই বলে বিষণ্ণ। এ ক-দিন ও ঝড়ের মতো এল, ঝড়ের মতো গেল, ধূমপান করলে অবিরাম, মাঝে মাঝে বেহালা নামিয়ে টুকটাক দু-একটা গান বাজাল, কখনো-বা ডুবে রইল দিবাস্বপ্নে, স্যান্ডউইচ গিললে যখন-তখন অসময়ে, এবং আমার ছাড়া ছাড়া প্রশ্নগুলোর উত্তর যা দিলে তা না-দেওয়ারই শামিল। বেশ বুঝলাম, তদন্ত সম্পর্কে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না ও। নিজের অবস্থাও তেমন ভালো নয়। কেসটা সম্বন্ধে কিছুই বলত না ও তদন্তের খুঁটিনাটি এবং নিহত ব্যক্তির খিদমতগার জন মিঠুনও গ্রেপ্তার এবং পরে খালাস পাওয়ার খবর জানলাম আমি কাগজ পড়ে। করোনারের জুরিরা জানালে যে খুনটা নিশ্চয় উদ্দেশ্যমূলক এবং সুপরিকল্পিত হত্যা। কিন্তু খুনি অথবা খুনিরা আগের মতোই রইল অজ্ঞাত। মোটিভ কী,

সে-রকম আচও কেউ দিতে পারলে না। বহু মূল্যবান সামগ্রীতে ঘর বোঝাই থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিসও সরেনি। নিহত ব্যক্তির কাগজপত্রও কেউ নাড়াচাড়া করেনি। কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, ভদ্রলোক ছিলেন একধারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর উৎসাহী এবং উৎসুক ছাত্র, অবিশ্রান্ত গল্পবাজ, অসাধারণ ভাষাবিদ, এবং ক্লাস্তিহীন পত্রলেখক। অনেকগুলো দেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তার ড্রয়ারবোঝাই দলিলপত্র থেকে চাঞ্চল্যকর কোনো তথ্যই আবিষ্কার করা গেল না। স্ত্রীলোকেদের সাথে আলাপের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বাহ্যবিচাররহিত। ব্যক্তিনির্বিশেষে সবার সঙ্গে মিশতেন, কিন্তু ওপরে ওপরে, মাখামাখি ছিল না কারোর সাথেই। এ-রকম মেয়েদের মধ্যে তার পরিচিতের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু বান্ধবী ছিল মাত্র কয়েকজন, আর এমন একজনও ছিল না যাকে তিনি ভালোবাসতেন। স্বভাবচরিত্র পরিমিত এবং নিয়মিত। তার আচরণে কেউ রুষ্ট হতেন না। আগাগোড়া একটা বিরাট রহস্য তাঁর মৃত্যু এবং এ-রহস্য সম্ভবত শেষ পর্যন্ত অনুঘাটিতই থেকে যাবে।

সীমাহীন নিষ্ক্রিয়তার অনুকল্প হিসাবে মরিয়া হয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল খিদমতগার জন মিঠুনকে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাই টেনে নিয়ে যাওয়া গেল না। সেই রাতেই হ্যামারস্মিথে বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিল সে। কোনো ফাঁক নেই তার অ্যালিবিতে। একটা পয়েন্ট অবশ্য সত্যি। যে সময়ে বাড়িমুখো রওনা হয়েছিল সে, খুনটা ধরা পড়ার আগেই ওয়েস্টমিনস্টারে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু দেরি হওয়ার যে কারণ সে দর্শালে তা খুবই সম্ভব। সেরাতে খানিকটা পথ হেঁটে এসেছিল সে এবং তা আশ্চর্য নয় এই কারণে যে বড়ো সুন্দর ছিল সেই বিশেষ রাতটি। কাজেই, বারোটোর সময়ে

বাড়িতে পৌঁছায় সে। পৌঁছেই ওই অপ্রত্যাশিত শোচনীয় কাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভালো। মৃত ব্যক্তির কয়েকটি জিনিস বিশেষ করে ক্ষুর রাখবার একটা ছোট কেস খিদমতগারের বাক্সে পাওয়া গেছিল। কিন্তু জন মিঠুন জানলেন যে জিনিসগুলো তার মনিবের দেওয়া বকশিশ। মিসেস প্রিঙ্গলও তা সমর্থন করলে। বছর তিনেক হল লুকাসের কাজে বহাল আছে মিঠুন। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষণীয়। ইউরোপ সফরের সময়ে লুকাস মিঠুনকে সঙ্গে নিতেন না। মাঝে মাঝে মাস তিনেকের জন্যে প্যারিসে থাকতেন উনি। সে সময়ে মিঠুন থাকত গোছোলফিন স্ট্রিটের বাড়ির তত্ত্বাবধানে। খুনের রাতে মিসেস প্রিঙ্গলও কিছু শুনতে পায়নি। তার মনিবের সাথে কেউ যদি দেখা করতে এসে থাকে তো তিনি নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

কাজে কাজেই তিনটে দিন কেটে গেল, কিন্তু রহস্য-তিমিরের একটা অংশেরও সমাধান করা গেল না। অন্তত কাগজে আমি তাই পড়লাম! হোমস এর থেকে বেশি খবর যদিও রাখত, তা আর কাউকে জানায়নি। ওর মুখেই শুনেছিলাম, এ-কैसे লেসট্রেড তাকে দলে টেনেছে। সে যে প্রত্যেকটা নতুন পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রয়েছে, তা জানতাম। চতুর্থ দিন প্যারিস থেকে একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোনোর পর মনে হল এ বিরাট প্রশ্নের সব কিছুই সমাধান হয়ে গেল।

প্যারিসের পুলিশ সদ্য একটা আবিষ্কার করিয়াছে (লিখেছে ডেলি টেলিগ্রাফ)। ফলে, যে অবগুষ্ঠন মি. এডুয়ারডো লুকাসের শোচনীয় অদৃষ্টকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা উখিত হইল। গত সোমবার রাতে ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রিটে আক্রান্ত হইয়া

মি. এডুয়ারডো লুকাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমাদের পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিতে পারে যে, নিহত ভদ্রলোককে ছুরিকাহত অবস্থায় তাঁহার ঘরেই পাওয়া গিয়াছিল। কয়েকটি কারণে তাঁহার খিদমতগারকে সন্দেহ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু একটি অ্যালিবির জন্য সে-কেস ভাঙিয়া যায়। ম্যাডামজেল হেনরি ফোরনেয়ি নামে পরিচিত এক ভদ্রমহিলা রু অস্টারলিতে একটি ছোট ভিলা লইয়া বাস করিতেন। গতকাল তাহার চাকরবাকরেরা কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় যে তিনি নাকি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, বাস্তবিকই তিনি বিপজ্জনক এবং স্থায়ী প্রকৃতির একটা বাতিকে আক্রান্ত। তদন্তের ফলে পুলিশ আবিষ্কার করিয়াছে যে, লন্ডন পরিভ্রমণ সমাপনান্তে গত মঙ্গলবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন ম্যাডামজেল এবং প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, ওয়েস্টমিনস্টারের অপরাধের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ আছে। ফটোগ্রাফ মিলাইয়া দেখবার পর সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মসিয়ে হেনরি ফোরনেয়ি এবং এডুয়ারডো লুকাস এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি এবং নিহত ব্যক্তি কোনো কারণে লন্ডন এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন। ম্যাডামজেল ফোরনেয়ি বর্ণসংকর। ওয়েস্ট ইন্ডিতে তাহার জন্ম এবং তাহার ধমনীতে ইউরোপীয় ও নিগ্রো উভয় রক্তই প্রবাহিত। অল্পতেই নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া ওঠা তাহার স্বভাব এবং অতীতে ঈর্ষার প্রকোপে কয়েকবার তাহার চিত্তবিকার ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। অনুমান, উত্তেজনা বা ঈর্ষাবশতই তিনি এ ভয়ানক খুনটা করিয়া ফেলিয়াছেন যাহার ফলে লন্ডনে এই প্রকার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সোমবার রাতে তাহার গতিবিধির কোনো হদিশ এখনও পাওয়া যায় না বটে, তবে পুলিশের সন্দেহ, তাহার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যায় এমন একজন স্ত্রীলোক মঙ্গলবার সকালে শেরিং ক্রস স্টেশনে তাহার উদ্ভান্ত চেহারা এবং মারমুখো অঙ্গভঙ্গির জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতএব খুনটা স্বভাবতই উন্মত্ত

থাকাকালীনই হইয়াছে অথবা খুনের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় এই অসুখী মহিলার চেতনা লোপ পায় এবং তিনি পাগল হইয়া যান। বর্তমানে অতীতের কোনো সুসংবদ্ধ বর্ণনা দিতে তিনি অপারগ এবং চিকিৎসকেরাও তাহার চেতনার পুনরুদ্ধারের কোনো আশা রাখিতেছেন না। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, একজন স্ত্রীলোককে তিনি ম্যাডামজেল ফোরনেয়িও হইতে পারেন, সোমবার রাতে কয়েক ঘণ্টার জন্যে গোডোলফিন স্ট্রিটের একটি বাড়িকে লক্ষ করিতে দেখা গিয়াছে।

এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, হোমস? খবরটা আমিই জোরে জোরে পড়ে শোনালাম ওকে। শুনতে শুনতে প্রাতরাশ খাওয়া শেষ করল বন্ধুবর।

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে বলল ও, বুঝতে পারছি নিদারুণ ভোগান্তি চলেছে তোমার কৌতূহলের টুটি টিপে বসে থাকার জন্যে। কিন্তু গত তিন দিনে যদি তোমায় কিছু না-বলে থাকি তো বুঝতে হবে বলার মতো কিছুই ছিল না। এমনকী এখনও প্যারিস থেকে আসা এই রিপোর্টও আমায় বিশেষ সাহায্য করতে পারছে না।

লোকটার মৃত্যুই যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে এই রিপোর্টেই তো চূড়ান্ত, তাই নয় কি?

ভদ্রলোকের মৃত্যুটা তো একটা নিছক ঘটনা—আমাদের আসল কাজের তুলনায় তুচ্ছ একটা উপসংহার। আমাদের মুখ্যকর্তব্য হল দলিলটার হদিশ খুঁজে বার করা আর একটা ইউরোপীয় বিপর্যয়কে নিরোধ করা। গত তিনদিনে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঘটেছে,

এবং তা হচ্ছে কিছুই ঘটেনি। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি আমি এবং ইউরোপের কোথাও কোনোরকম অশান্তির সূচনা দেখা যায়নি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখন, এ-চিঠিটা যদি দেশছাড়া হত না, কখনোই তা হয়নি, হতে পারে না কিন্তু যদি দেশছাড়া না-ই হয়ে থাকে, তবে এখন তা কোথায়? কার কাছে? কেনই-বা একে চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নটাই তো হাতুড়ির মতো দমাদম পড়ছে আমার মগজে। চিঠিটা যে-রাতে অদৃশ্য হল, ঠিক সেই রাতেই লুকাসও ওপারের পথে যাত্রা করলেন-একি বাস্তবিকই নিছক কাকতলীয়? চিঠিটা কি আদৌ পৌঁছেছিল ওঁর কাছে? তাই যদি হয় তো তার কাগজপত্রের মাঝে মাঝে চিঠির সন্ধান মিলছে না কেন? ওঁর বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রী কি যাওয়ার সময়ে চিঠিটাও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? তাই যদি, তাহলে তা কি তার প্যারিসের বাড়িতে আছে? ফরাসি পুলিশের সন্দেহ জাগ্রত না-করে কীভাবে আমি এখন এর সন্ধান করি বল তো? মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ-কেসটা এমনই যে এখানে আইন আমাদের কাছে যতখানি বিপজ্জনক, ঠিক ততখানি বিপজ্জনক ক্রিমিনালরা। প্রত্যেকটি লোকের হাত রয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, তা সত্ত্বেও স্বার্থের ঝুঁকি কিন্তু অতি বিপুল। এ-রহস্যের সাফল্যময়। পরিসমাপ্তিতে যদি পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমার গৌরবময় কর্মজীবনের মুকুটমণি হয়ে থাকবে এ-ঘটনা। এই তো দেখছি রণাঙ্গন থেকে এসে পৌঁছেছে আমার সর্বশেষ রিপোর্ট! নোটটা হাতে পেয়েই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে ও। হুররে! লেসট্রেড কৌতূহলোদ্দীপক কিছুর খোঁজ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে! ওয়াটসন, টুপিটা মাথায় দিয়ে নাও। চলো, বেড়াতে বেড়াতে ওয়েস্টমিনস্টারের দিকে যাই দুজনে।

অকুস্থলে সেই আমার প্রথম আগমন। যে-শতাব্দীতে এ-বাড়ির জন্ম-ভবন তারই মতো আকৃতি। উঁচু মলিন, আর সংকীর্ণ খুপরিতে বহুধা বিভক্ত আয়তন। ফিটফাট, কেতাদুরস্ত আর নিরেট। সামনের জানলা থেকে লেসট্রেডের বুলডগ-আকৃতিকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। বিশালবপু একজন কনস্টেবল দরজাটা খুলে ধরতেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন লেসট্রেড। যে-ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, খুনটা হয়েছে সেখানেই। তখন কিন্তু কার্পেটের ওপর একটা কুৎসিত এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়া দাগ ছাড়া খুনের আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না ঘরের মধ্যে। কার্পেটটা ছোটো আর চৌকোনা, পুরু কাপড়ে আবৃত এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা। চারপাশে ঘিরে ছিল চওড়া কিন্তু ভারি সুন্দর সেকলে কায়দায় খুব চকচক পালিশ করা চৌকো ব্লকের কাঠের মেঝে। আগুনের চুল্লির ওপরে বুলছিল বিজিত শত্রুদের অতি চমৎকার অস্ত্রের সারি। এই অস্ত্রেরই একটাকে কাজে লাগানো হয়েছে সেই শোচনীয় রাতে। জানলার সামনে একটা বহুমূল্য জমকালো লেখবার টেবিল। ঘরের প্রতিটি তুচ্ছ বস্তু, ছবি, মেঝের আবরণ, দরজা জানলার পর্দা-সব কিছুর মধ্যে একটা সুখাবহ বিলাসপ্রবণ রুচির নিদর্শন।

প্যারিসের খবরটা দেখেছেন, শুধোলেন লেসট্রেড।

মাথা নেড়ে সায় দিল হোমস।

মনে হচ্ছে, আমাদের ফরাসি বন্ধুরা এবার আসল জায়গায় হাত দিতে পেরেছে। ওরা যা বলেছে, নিঃসন্দেহে ঘটেছেও তাই। দরজায় টোকা দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। আমার

অনুমান, আচমকা এসে চমকে দিয়েছিলেন লুকাসকে। কেননা, জলনিরোধক নিচ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে জীবনধারণ করতেন উনি। দরজা খুলে ভদ্রমহিলাকে ভেতরে আনলেন লুকাস-বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না। কীভাবে লুকাসের ডেরা খুঁজে বার করেছেন, তা বললেন ভদ্রমহিলা। ভৎসনা করলেন। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়লেন অচিরে। তারপরই ছোটোখাটো ওই ভোজালির ঘায়ে যবনিকা পড়ল লুকাসের জীবনে। এত কাণ্ড কিন্তু এক মুহূর্তে হয়নি। কেননা, জানেন তো চেয়ারগুলো গিয়ে জড়ো হয়েছিল দূরে ওইখানে। আর, একটা চেয়ার বাগিয়ে ধরেছিলেন এমনভাবে যেন ওই দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন উনি। প্রমাণাদি সবই পেলাম এবং তা এমনই জলের মতো পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে আমরা যেন নিজের চোখেই দেখছি সে-দৃশ্য।

ভুরু তুললে হোমস।

আর তবুও কিনা আমায় ডেকে পাঠালে তুমি?

আ, হ্যাঁ, সেটা আর একটা বিষয়। নিছক একটা নগণ্য ব্যাপার, কিন্তু এই সবেতেই তো আপনার আগ্রহ জেগে ওঠে। অদ্ভুত। নেহাতই খামখেয়াল। মূল ঘটনার সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে কোনো সংযোগ নেই-থাকতে পারে না অন্তত ওপর দেখে যা মনে হচ্ছে।

জিনিসটা কী শুনি?

আপনারা জানেন তো এ ধরনের অপরাধের পর যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা বেজায় সতর্ক হয়ে থাকি। দিনরাত একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মোতায়েন ছিল এখানে। আজ সকালে মি. লুকাসকে কবর দেওয়ার পর খতম হল তদন্ত পর্ব—এই ঘর সম্পর্কিত তদন্ত। তারপর আমরা ভাবলাম একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যাক জিনিসপত্র। এই কার্পেটটা দেখছেন তো, মেঝের সঙ্গে এটা আঁটা নেই—শুধু পেতে রাখা হয়েছে। কার্পেটটা তোলার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। তুলতে গিয়ে দেখলাম—

হ্যাঁ? তুলতে গিয়ে দেখলেন—

উদবেগে টানটান হয়ে ওঠে হোমসের মুখ।

যা দেখলাম তা আপনি এক-শো বছরেও অনুমান করে উঠতে পারবেন না। কার্পেটের ওপর এই দাগটা দেখছেন তো? বেশ খানিকটা রক্ত ভেতরেও নিশ্চয় শুষে নিয়েছে—নেয়নি কি?

নিঃসন্দেহে নিয়েছে।

বেশ, বেশ, শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সাদা কাঠের ওপর এই দাগটার সঙ্গে মিলে যাওয়ার মতো অনুরূপ দাগটি কিন্তু নেই।

দাগ নেই। কিন্তু তা থাকতেই হবে—

ঠিক । আপনিও তাই বলছেন । কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে দাগটা নেই ।

কার্পেটের কোণটা তুলে নিয়ে উলটে ফেলে লেসট্রেড দেখাল, বাস্তবিকই সে যা বললে তা সত্যি ।

কিন্তু গালিচার তলার দিকে দাগটা যতখানি, ওপরে ততখানি! কাঠের ওপর নিশ্চয় পড়েছে রক্তের চিহ্ন ।

সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে হতবুদ্ধি বানিয়ে দেওয়ার উল্লাসে মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে উঠল লেসট্রেড ।

এবার আপনাকে দেখাচ্ছি এর ব্যাখ্যা । দ্বিতীয় দাগ একটা আছে, কিন্তু তা প্রথমটার সঙ্গে মিলছে না । নিজেই দেখুন । বলতে বলতে কার্পেটের আর একটা অংশ উলটে ফেললে ও । আর সত্যি সত্যিই দেখলাম বেশ খানিকটা টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়েছে পুরানো কায়দায় মেঝের । চৌকোণে সাদা জমির ওপর । কী মনে হয় আপনার মি. হোমস?

আরে, এ তো ভারি সোজা । দুটো দাগই ওপর ওপর ছিল, কিন্তু কার্পেটটা ঘুরিয়ে দেওয়া

হয়েছে পরে । চৌকোনা কার্পেট, মোটেই বেগ পেতে হয়নি ।

মি. হোমস, কার্পেটটা যে ঘোরানো হয়েছে, এ-কথা বলার জন্য আপনাকে সরকারি পুলিশের প্রয়োজন নেই। পরীক্ষার দেখা যাচ্ছে কার্পেটটা এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই মিলে যাচ্ছে দাগ দুটো। একটার ওপরেই এসে পড়ছে আর একটা। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, কার্পেটটা ঘুরিয়েছে কে এবং কেনই-বা ঘুরিয়েছে?

হোমসের শক্ত মুখ দেখে বুঝলাম অবরুদ্ধ উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ও।

বললে, লেসট্রেড, প্যাসেজের ওই কনসেটবলটি কি সর্বক্ষণ এখানে পাহারা দিয়েছিল?

নিশ্চয়।

আমার উপদেশ নাও। খুব সাবধানে পরীক্ষা করো ওকে। আমাদের সামনে কোনো না। আমরা বরং এখানে অপেক্ষা করছি। পেছনকার ঘরে নিয়ে যাও ওকে। একলা থাকলে অনায়াসেই ওর কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারবে তুমি। ওকে জিজ্ঞেস করো, কোন সাহসে বাইরের লোককে ভেতরে ঢুকিয়ে একলা রেখে গেছিল সে এ ঘরের মধ্যে। এ-কাজ করেছিল কি না, তা জিজ্ঞেস করো না। ধরে নাও সে করেছে। ওকে বলো, এখানে যে কেউ ছিল তা তুমি জান। চাপ দাও। বলো, আগাগোড়া সব স্বীকার করলেই এ-যাত্রা ক্ষমা পেতে পারে সে। যা বললাম, অবিকল তাই করো।

সর্বনাশ! ও যদি এ-খবর জানে তো ওর পেট থেকে এখুনি আমি তা টেনেইঁচড়ে বার করে নিচ্ছি। চিৎকার করে উঠে হলের ভেতরে ছিটকে এগিয়ে যায় লেসট্রেড। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওর গমগমে কণ্ঠের তর্জনগর্জন শোনা যায় পেছনের ঘরে!

এবার, ওয়াটসন, এবার! চিৎকার করে ওঠে হোমস-বিকারগ্রস্ত ব্যাকুলতা রণরণিয়ে ওঠে ওর স্বরে। নিরুদ্যম, নির্বিকার আচরণের ছদ্ম মুখোশ পরা মানুষটির সমস্ত দানবিক শক্তি তেজ যেন নিমেষে ফেটে পড়ে উৎপিঞ্জর-উৎসাহ প্রকম্পিত সাময়িক কিন্তু উদ্যম উদ্দীপনের মধ্যে। একটানে মেঝে থেকে কার্পেটটা তুলে ফেলে পলকের মধ্যে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে চৌকোনা কাঠের ব্লকের প্রতিটা জোড় আঁকড়ে আঁকড়ে পরখ করতে লাগল ও। একটা ব্লকের কিনারায় নখ বসে গেল হোমসের এবং সঙ্গেসঙ্গে তা ঘুরে গেল পাশের দিকে। বাক্সের ডালার মতো পেছনের কবজায় ঘুরে গেল কাঠের ব্লকটা। নীচে বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট অন্ধকারময় গহ্বর। ক্ষিপ্তের মতো সাগ্রহে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে হোমস। পরক্ষণেই রাগে হতাশায় দাঁত-মুখ খিচিয়ে এক তিক্ত গর্জন ছেড়ে হাত টেনে নিল সে। গহ্বর শূন্য।

তাড়াতাড়ি, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি! যেমন ছিল তেমনি রেখে দাও! কাঠের ডালা ফিরে এল যথাস্থানে। কার্পেটটা সোজা করে রাখা হয়েছে, এমনি সময়ে প্যাসেজে লেসট্রেডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে এসে দেখলে অসলভাবে ম্যান্টলপিসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হোমস। যেন চিন্তায় ইস্তফা দিয়ে মূর্তিমান সহিষ্ণুতার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদম্য হাইগুলো চাপবার চেষ্টা করছে সে।

আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত, মি. হোমস। বেশ দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে তিত্তিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন আপনি। যাক, সব স্বীকার করেছে ও। এদিকে এসো, ম্যাকফারসন। তোমার এই অত্যন্ত অক্ষমাই আচরণের ইতিবৃত্ত শুনিতে যাও এই ভদ্রলোকদের।

সুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিশাল বপু কনস্টেবলটি। চোখ-মুখ বেজায় লাল হয়ে উঠেছিল তার। হাবভাব দেখে বেশ অনুতপ্ত মনে হল তাকে।

কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার ছিল না, স্যার, সত্যিই ছিল না। যুবতী মেয়েটি গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন এ-দরজায় বাড়ি ভুল করেছিলেন-উনি তাই বললেন কথাবার্তা কইলাম কিছুক্ষণ। সারাদিন এখানে ডিউটিতে মোতায়ন থাকলে বড়ো একলা একলা লাগে।

বেশ, তারপর কী হল শুনি?

খুনটা কোথায় হয়েছে, তা তিনি দেখতে চাইলেন। বললেন, কাগজে নাকি এ-সম্বন্ধে খবর পড়েছেন। দেখলে খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলে মনে হয় তাঁকে, অল্প বয়স, কথাবার্তাও চমৎকার বলেন। তাই, স্যার, ভাবলাম ওঁকে একবারটি উঁকি মারতে দিলে এমন কী আর ক্ষতি হবে। কার্পেটের ওপর ওই চিহ্নটা দেখেই ধপ করে উনি পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। এমনভাবে পড়ে রইলেন যে দেখে মনে হল বুঝি-বা মারাই গেলেন। পেছনে দৌড়ে গিয়ে খানিকটা জল নিয়ে এলাম, কিন্তু জ্ঞান ফেরাতে পারলাম

না। তখন দৌড়ে গেলাম আইভি প্ল্যান্ট-এ কিছু ব্র্যান্ডি আনতে। ফিরে এসে দেখি মেয়েটি আর নেই। নিশ্চয় জ্ঞান ফিরে পেয়ে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে আর মুখ দেখাতে সাহস করেননি।

কার্পেটটা নড়ল কেমন করে?

স্যার, ফিরে এসে কার্পেটটাকে বাস্তবিকই একটু কুঁচকে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু শুনলেন তো, মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন কার্পেটের ওপর। পালিশ করা মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটাকে মেঝের সঙ্গে আটকে রাখারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। আমিই পরে তা সিঁধে করে দিই।

ভারিষ্কি চালে লেসট্রেড বললে, কনস্টেবল ম্যাকফারসন, আজকে এই শিক্ষাই পেলে যে, আমার চোখে ধুলো দিতে তুমি পারবে না। ভেবেছিলে তোমার কর্তব্যের গাফিলতি কোনোদিনই ধরা পড়বে না। কিন্তু কার্পেটটার দিকে এক লহমা তাকিয়েই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে এ-ঘরে একজনকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। তোমার কপাল ভালো যে কিছুই খোয়া যায়নি। তা হলে এতক্ষণে কোয়ার্টার স্ট্রিটে চালান হয়ে যেতে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি দুঃখিত, মি. হোমস। ভেবেছিলাম, দ্বিতীয় দাগের সঙ্গে প্রথম দাগের না মিল হওয়ার পয়েন্ট শুনলে নিশ্চয়ই আগ্রহ বোধ করবেন আপনি।

আরে পয়েন্টটা তো দারুণ ইন্টারেস্টিং বটেই। কনসেটবল, এই ভদ্রমহিলাটি কি এ-ঘরে শুধু একবারই এসেছিলেন?

হ্যাঁ স্যার, মাত্র একবার।

কে তিনি?

নাম জানি না, স্যার। টাইপরাইটিং সংক্রান্ত একটা বিজ্ঞাপন পড়ে খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলেন। এসে পড়েন ভুল ঠিকানায়। ভারি মিষ্টি, আর ভদ্র মেয়ে স্যার।

ছিপছিপে লম্বা? সুন্দরী?

হ্যাঁ, স্যার। মিষ্টি চেহারার অল্পবয়সি যুবতী। সুন্দরী বলতে পারেন। কেউ কেউ হয়তো বলবে বেজায় সুন্দরী। ও, অফিসার, একবারটি আমায় উঁকি মারতে দিন, বললেন মেয়েটি। এমন মিষ্টিভাবে জেদাজেদি করতে লাগলেন যে আমি ভাবলাম দরজা দিয়ে একবার ওঁকে মাথা গলাতে দিলে কোনো ক্ষতিই হবে না।

কীরকম পোশাক পরেছিলেন তিনি?

সাদাসিঁদে, স্যার, পা পর্যন্ত লম্বা একটা আলখাল্লা।

কোন সময়ে?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল তখন। ব্র্যান্ডি নিয়ে ফিরে আসার পর দেখলাম ওরা ল্যাম্পগুলো জ্বালাচ্ছে।

বেশ বেশ, বললে হোমস। এসো ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় অন্যত্র এর চাইতেও দরকারি কাজ আমাদের আছে।

লেসট্রেডকে সামনের ঘরে রেখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। অনুতপ্ত কনস্টেবলটি এসে দরজা খুলে দিলে। সিঁড়ির ধাপের ওপর বোঁ করে ঘুরে গেল হোমস। হাতের মধ্যে কী-একটা জিনিস নিয়ে তুলে ধরলে ম্যাকফারসনের সামনে। নিবিষ্ট চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কনস্টেবল ম্যাকফারসন।

তারপরই চোঁচিয়ে উঠল, জয় ভগবান, স্যার। বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার মুখে। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখল হোমস। হাতের জিনিসটা রেখে দিল বুক পকেটে! তারপর যখন রাস্তায় নেমে এলাম, শুরু হল তার অউহাস্য। বললে, চমৎকার! বন্ধু ওয়াটসন, শেষ দৃশ্যের ড্রপসিন এবার উঠেছে। শুনে তুমি আশ্বস্ত হবে যে যুদ্ধ আর হবে না, রাইট অনারেবল ট্রেলাওনি হোপের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও মসীলিপ্ত হবে না, অবিবেচক নৃপতি মহোদয়কে তার অবিবেচনার কোনো শাস্তি পেতে হবে না, প্রধানমন্ত্রীমহাশয়কে ইউরোপীয় জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, এবং আমরা যদি সামান্য বুদ্ধি খরচ

করে সমস্ত ব্যাপারটাকে সুকৌশলে পরিচালনা করতে পারি, তাহলে কারোরই আর একটা পেনিও লোকসান হবে না-নতুবা জানই তো কী বিশ্রী দুর্ঘটনা সৃষ্টি হতে পারে।

সমস্যার সমাধান করেছ তাহলে! চেষ্টায়ে উঠি আমি।

একেবারে নয় ওয়াটসন। এখনও কতকগুলো পয়েন্ট রয়েছে যা আগের মতোই তিমিরাবৃত। কিন্তু এত বেশি জেনে ফেলেছি, যে, এখন যদি বাকিটুকু না জানতে পারি তো দোষ হবে আমাদের নিজেদেরই। এখন আমরা সিধে যাব হোয়াইট হল টেরেসে। এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতির সৃষ্টি হবে সেখানেই।

ইউরোপীয়ান সেক্রেটারির বাসভবনে পৌঁছে হোমস যাঁর খোঁজ করল তিনি লেডি হিলডা ট্রেলাওনি হোপ। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মর্নিংরুমে।

মি. হোমস। ঘৃণা মেশানো রোষে অরুণ হয়ে ওঠে লেডির মুখ, এ কিন্তু আপনার অত্যন্ত অন্যায় এবং অনুদার আচরণ। আমাদের অভিপ্রায় আপনার সামনেই প্রকাশ করতে এসেছি আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার গোপনে রাখবেন শুধু এই কারণে যে আমার স্বামী যেন মনে না-করেন যে আমি তার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। আর তবুও কিনা এখানে এসে আপনি আমায় সবার সন্দেহভাজন করে তুলেছেন এবং দেখাচ্ছেন যে, আপনার আমার মধ্যে আছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক।

ম্যাডাম দুর্ভাগ্যক্রমে এ ছাড়া আর কোনো সম্ভাব্য বিকল্প পথ আমার ছিল না। নিদারুণ গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটা পুনরুদ্ধারের কাজে বহাল করা হয়েছে আমাকে। সুতরাং ম্যাডাম, বলতে বাধ্য হলাম, দয়া করে দলিলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন লেডি-নিমেষের মধ্যে উধাও হল তার সুন্দর মুখের সমস্ত রং। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার দুই চোখ-এমনভাবে টলমল করে উঠলেন যে আমি ভাবলাম এবার বুঝি জ্ঞান হারাবেন তিনি। তারপরেই প্রবল প্রচেষ্টায় আঘাতের বিপর্যয় থেকে নিজেকে সামলে নিলেন। আতীত্ব বিস্ময় আর ঘৃণা মেশানো ক্রোধ মুখের প্রতিটি রেখা বিতাড়িত করলে আর সব ভাবকে।

আপনি-আপনি আমায় অপমান করলেন, মি. হোমস!

ধীরে, ধীরে, ম্যাডাম, এসবে কোনো লাভ হবে না। চিঠিটা বার করে দিন।

ঘণ্টার দিকে ছিটকে গেলেন লেডি।

বাটলার এসে আপনাদের বাইরের পথ দেখিয়ে দেবে।

ঘণ্টা বাজাবেন না, লেডি হিলড়া। যদি বাজান তো একটা কেলেক্সারি এড়ানোর জন্যে আমার যাবতীয় আন্তরিক প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। চিঠিটা দিয়ে দিন-তাহলেই সব কিছু দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আমার হাতে হাত মিলিয়ে চলুন, সব বন্দোবস্ত আমি করে

দেব। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে গেলেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে দ্বিধা করব না আমি।

অপরূপ উদ্ধত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন লেডি হিলডা। রানির মতোই দর্পিত চেহারা তার। নিম্পলক দুই চোখ দিয়ে হোমসকে গঁথে ফেলে যেন ওর অন্তরাত্মাসুদ্ধ পড়ে নিলেন উনি। ঘণ্টার দড়িতে হাত রেখেছিলেন বটে, দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজানো থেকে নিবৃত্ত করে নিলেন নিজেকে।

বললেন, আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন আপনি। এখানে আসা, অরপর কুটি করে একজন স্ত্রীলোককে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করাটা খুব পুরুষোচিত কাজ নয়, মি. হোমস। আপনি কিছু জানেন বলছেন। কী জানেন আপনি?

দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, ম্যাডাম। পড়ে গেলে নিজেই চোট পাবেন। আপনি না-বসা পর্যন্ত আমি কথা বলব না! ধন্যবাদ।

আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, মি. হোমস।

এক মিনিটই যথেষ্ট, লেডি হিলডা। আমি জানি আপনি এডুয়ারডো লুকাসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, দলিলটা তাকে দিয়েছিলেন, অতি দক্ষতার সঙ্গে গতরাতে সেই ঘরেই আবার গেছিলেন এবং সুকৌশলে চিঠিটাকে বার করে এনেছেন কার্পেটের তলায় লুকোনো জায়গা থেকে।

ছাই ছাই মুখে বিস্ফারিত চোখে হোমসের পানে তাকিয়ে ছিলেন লেডি হিলডা ।

কথা বলার আগে বার দুয়েক ঢোক গিললেন ।

তারপর চৈঁচিয়ে উঠলেন, আপনি উন্মাদ, মি. হোমস-আপনি উন্মাদ!

পকেট থেকে ছোট্ট এক টুকরো কার্ডবোর্ড বার করল হোমস । জিনিসটা ফটোগ্রাফ থেকে কেটে নেওয়া একটি স্ত্রীলোকের মুখের ছবি ।

বললে, ভেবেছিলাম কাজে লাগতে পারে, তাই সবসময়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলাম এই ছবিটি । পুলিশম্যান ছবি দেখে চিনতে পেরেছে ।

যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল লেডি হিলডার মাথা এলিয়ে পড়ল চেয়ারের পেছনে ।

স্বীকার করুন, লেডি হিলডা । চিঠিটা আপনার কাছেই আছে । ব্যাপারটাকে এখনও সামলে নেওয়া যায় । আপনাকে ঝামেলায় জড়ানোর কোনো অভিপ্রায় নেই । হারানো চিঠিটা আপনার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিলেই শেষ হয় আমার কর্তব্য । আমার উপদেশ নিন-সরলভাবে সব খুলে বলুন আমাকে । এ ছাড়া রেহাই পাওয়ার আর কোনো পথ আপনার নেই ।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

প্রশংসনীয় তার সাহস । এত কাণ্ডের পরেও হার মানবার পাত্রী নন ।

আবার আপনাকে বলছি, মি. হোমস, উদ্ভট কতকগুলো কল্পনার জাল বুনে চলেছেন আপনি!

আপনার জন্যে আমি দুঃখিত, লেডি হিলডা । আমার যথাসাধ্য করলাম আপনার জন্যে । সবই দেখছি বৃথা ।

ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ও । ঘরে ঢুকল বাটলার ।

মি. ট্রেলাওনি হোপ বাড়িতে আছেন?

পৌনে একটার সময় উনি বাড়িতে পৌঁছোবেন, স্যার ।

ঘড়ির দিকে তাকাল হোমস ।

বললে, আরও মিনিট পনেরো । বেশ, আমি অপেক্ষা করব ।

বাটলার বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে-না-করতেই লেডি হিলডা জানু পেতে বসে পড়লেন হোমসের পায়ের কাছে । দুই হাত সামনে প্রসারিত করে সুন্দর মুখটি তুলে ধরলেন ওপর পানে । দরদর অশ্রুধারে সিঁক্ত সে-মুখ ।

মি. হোমস, আমাকে এযাত্রা ছেড়ে দিন! আমাকে বাঁচান! অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতির উদ্যমতার যেন সাময়িক চিত্তবিকার ঘটে ওঁর।

ঈশ্বরের দোহাই ওঁর কাছে এ-কথা বলবেন না! ওঁকে যে আমি বড়ো ভালোবাসি। ওঁর জীবনে এইটুকু ছায়াও আমি ফেলতে চাই না। আমি তো জানি, সে-আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওঁর মহান অন্তর।

লেডি হিলডাকে ধরে তুলল হোমস। বললে, ধন্যবাদ, ম্যাডাম। আপনি যে এই শেষ মুহূর্তেও আপনার বিচারবুদ্ধি ফিরে পেয়েছেন, এজন্যে ধন্যবাদ! আর একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যায় না। চিঠিটা কোথায়?

তিরবেগে একটা লেখবার টেবিলের কাছে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ডেস্কটা খুলে ফেললেন লেডি হিলডা। ভেতর থেকে বার করে আনলেন নীল রঙের একটা দীর্ঘ লেফাফা।

এই সেই চিঠি, মি. হোমস। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ভেতরে কী আছে, তা আমি কোনোদিনই খুলে দেখিনি!

কী করে ফেরত দিই খামটা? বিড় বিড় করতে থাকে হোমস। তাড়াতাড়ি, যা হয় একটা উপায় ভেবে বার করতেই হবে আমাদের! ডেসপ্যাঁচ-বাক্সটা কোথায়?

এখনও ওঁর শোবার ঘরে ।

ওঃ, কী সৌভাগ্য! তাড়াতাড়ি, ম্যাডাম, বাক্সটা নিয়ে আসুন এখানে ।

মুহূর্ত পরেই লালরঙের একটা চ্যাটালো বাক্স হাতে ফিরে এলেন লেডি হিলডা ।

এর আগে কী করে খুলেছিলেন বাক্সটা? নকল চাবি আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে । খুলুন ।

বুকের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা চাবি বের করলেন লেডি হিলডা । ওপরদিকে ছিটকে গিয়ে খুলে গেল বাক্সের তালা! কাগজপত্রে ঠাসা ভেতরটা । নীল লেফাফাটা একদম ভেতরে ঠেসে দিলে হোমস । অন্যান্য দলিলের পাতার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখে দিলে বাক্সের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় । বন্ধ হয়ে গেল বাক্স, চাবি ঘুরল এবং ফিরে গেল তা শোবার ঘরে ।

হোমস বললে, এইবার আমরা তৈরি । এখনও দশ মিনিট হাতে আছে । আপনাকে আড়াল করতে গিয়ে অনেক দূরে গড়িয়েছি, লেডি হিলডা । তার প্রতিদানে আপনি শুধু এই সময়টুকুর মধ্যে বলুন, অকপটে বলুন, এই অসাধারণ ব্যাপারের আসল অর্থটা কী?

মি. হোমস, সবই বলব আপনাকে, চিৎকার করে বললেন লেডি । ওঃ, মি. হোমস, ওঁকে এক মুহূর্তের জন্যও দুঃখ দেওয়ার আগে যেন আমার ডান হাতটা আমি কেটে ফেলি ।

সারা লন্ডনে আপনি এমন একজন মেয়েকে খুঁজে পাবেন না যে তার স্বামীকে আমার মতো এতখানি ভালোবাসে। তার, তবু আমি যা করছি-যা করতে আমি বাধ্য হয়েছি তা যদি শুনতে পান তো জীবনে আর আমায় ক্ষমা করে উঠতে পারবেন না উনি। ওঁর মানসসম্মান এতই সুমহান, সুউচ্চ যে কোনোরকম পদস্থলন ভুলত্রুটিকে উনি বিস্মৃত হতে পারেন না বা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন না। আমাকে সাহায্য করুন মি. হোমস। আমার সুখই তার সুখ। অথচ একী মহাসংকটের মাঝে এসে পড়ল আমাদের দুজনের জীবন।

তাড়াতাড়ি, ম্যাডাম, সময় কমে আসছে!

মি. হোমস, সব কিছুর মূলে আছে আমার লেখা একটি চিঠি, আগে অবিবেচকের মতো, মহামুখের মতো লেখা একটা চিঠি, আবেগবিহীন, প্রেমাঙ্কিত এক বালিকার লেখা একটা চিঠি। কারো ক্ষতিও করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জানি, উনি এ-চিঠিতে গুরু অপরাধ বলেই গণ্য করতেন। এ-চিঠি উনি পড়লে আমার ওপর ওঁর অটুট আস্থা চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যেত। এ-চিঠি লেখার পর অনেক বছর কেটে গেছে। ভেবেছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে গেছে সবাই। আর, তারপরেই এই লুকাস লোকটার কাছে শুনলাম যে চিঠিটা তার হাতে এসে পৌঁছেছে এবং শিগগিরই আমার স্বামীর সামনে সে তা হাজির করবে। আমি অনুনয় করে দয়া ভিক্ষা করলাম ওর। সে বলল, চিঠিটা সে আমায় ফিরিয়ে দিতে পারে একটি শর্তে। আমার স্বামীর ডেসপ্যাঁচ-বাক্স থেকে বিশেষ একটা দলিল এনে দিতে হবে তার হাতে। অফিসে ওর কয়েকজন গুপ্তচর আছে। তারাই এসে ওকে দলিলটার অস্তিত্ব জানিয়েছিল। আমাকে

আশ্বাস দিলে যে এর ফলে আমার স্বামীর কোনো ক্ষতিই হবে না। আমার স্থানে নিজেকে কল্পনা করুন, মি. হোমস। এ-অবস্থায় কী করা উচিত আমার?

স্বামীকে বিশ্বাস করে অকপটে সব খুলে বলা।

আমি তা পারিনি, মি. হোমস, আমি তা পারিনি! একদিকে নিশ্চিত ধ্বংস। অপরদিকে, স্বামীর কাগজপত্র অপহরণ করা ভয়ংকর কাজ মনে করলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে এর ফলাফল আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। তার চেয়ে বরং স্নেহ, ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর পরিণাম কী, তা জলের মতো স্বচ্ছ মনে হয়েছিল আমার কাছে। আমি তাই করলাম, মি. হোমস। চাবিটার একটা ছাপ নিলাম আমি। এই লুকাস লোকটা একটা নকল চাবি আনিয়ে দিলে আমায়। ডেসপ্যাঁচ-বাক্স খুলে কাগজটা নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলাম গোডোলফিন স্ট্রিটে।

সেখানে কী ঘটল, ম্যাডাম?

পূর্ব ব্যবস্থামতো দরজায় টোকা দিলাম আমি। দরজা খুলে দিলে লুকাস। এর পিছু পিছু এসে পৌঁছোলাম তার ঘরে। হল ঘরের দরজা দু-হাট করে রেখে এলাম এই কারণে যে লোকটার সঙ্গে একলা থাকতে ভয় ভয় করছিল আমার। ভেতরে ঢোকানোর সময়ে মনে আছে একজন স্ত্রীলোককে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমাদের কাজ শেষ হল অচিরে। আমার চিঠিটা ও টেবিলের ওপর রেখেছিল। আমি দলিলটা তুলে দিলাম ওর হাতে। চিঠিটা আমাকে দিয়ে দিল ও। ঠিক এই মুহূর্তে, দরজার কাছে কীসের শব্দ

শুনলাম। প্যাসেজে সিঁড়ির ধাপ ছিল। লুকাস চট করে কার্পেটটা তুলে ফেলে একটা চোরা গর্তের মধ্যে দলিলটা ঠেলে গুঁজে দিয়ে আবার কার্পেটটা পেতে দিল সমান করে।

এরপরে যা ঘটল তা যেন এক টুকরো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। পলকের মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখলাম একটা মলিন, উন্মত্ত মুখ। কানে শুনলাম ফরাসি ভাষায় একজন স্ত্রীলোকের চিলের মতো তারস্বরে চিৎকার, প্রতীক্ষা আমার বিফলে যায়নি। শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি তোমায় ওই মেয়েটার সাথে! শুরু হল বর্বরের মতো দারুণ ধস্তাধস্তি। লুকাসের হাতে দেখলাম একটা চেয়ার। আর, স্ত্রীলোকটার হাতে ঝলসে উঠল একটা ছোরা। তিরবেগে আমি বেরিয়ে পড়লাম এই দৃশ্য ছেড়ে এক দৌড়ে এসে পড়লাম বাইরে, রাস্তায় পড়েও দৌড় থামলাম না। খণ্ডযুদ্ধের বীভৎস ফলাফল জানতে পারলাম পরের দিন সকালে কাগজ পড়ে। চিঠিটা ফিরে পেয়ে সেরাতটা কিন্তু বড়ো সুখে কাটলাম আমি। তখন অবশ্য বুঝিনি ভবিষ্যতের গর্ভে লুকোনো এর বিষময় পরিণতি।

পরের দিন সকালে বুঝলাম এক উৎপাত নিরোধ করতে গিয়ে আর এক উৎপাতের সৃষ্টি করেছি আমি। দলিল খোঁয়া যাওয়ায় আমার স্বামীর আতীব্র মানসিক যাতনা তিরের মতো গিয়ে আমার বুকে বিঁধল। তখনই আর কালবিলম্ব না-করে ভাবলাম তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলি আমার কীর্তি। কিন্তু অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। কেননা তা করা মানেই তো অতীতের অন্যায় স্বীকার করা। সেইদিনই সকালে আপনার কাছে গেলাম এই উৎকট অপরাধের পুরো গুরুত্বটা জানতে। যে-মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম আমার কাজের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, সেই মুহূর্ত থেকে শুধু একটি চিন্তাই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল আমার মনের কোণে এবং সে-চিন্তা হল যেমন করেই হোক আমার স্বামীর দলিলটাকে

ফিরিয়ে আনা। এমনও হতে পারে যে, লুকাস দলিলটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, এখনও তা সেইখানেই আছে। ভয়ংকর ওই স্ত্রীলোকটা ঘরে ঢোকার আগেই কাগজটা ও লুকিয়ে ফেলেছিল এবং সে না এসে পড়লে আমি বোধ হয় জানতেই পারতাম না তার গোপন স্থানের হদিশ। কী করে যাওয়া যায় তার ঘরে? দু-দিন চোখে চোখে রাখলাম জায়গাটাকে। কিন্তু একবারও দরজাটাকে খোলা অবস্থায় দেখলাম না। গতরাতে শেষ চেষ্টা করলাম। কী করেছিলাম এবং কীভাবে আমি কার্যোদ্ধার করি তা তো আপনি আগেই জেনেছেন। কাগজটা নিয়ে এলাম বাড়িতে। অপরাধ স্বীকার না-করে স্বামীর কাছে এ-দলিল ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো পথ না-পেয়ে ভাবলাম নষ্ট করে ফেলব কাগজটাকে। হেভেনস ওঁর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি সিঁড়ির ওপর।

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন উত্তেজিত ইউরোপীয় সেক্রেটারি।

খবর আছে, মি. হোমস, কোনো খবর আছে? চেষ্টা করে ওঠেন উনি।

কিছু আশা আছে।

আ, জয় ভগবান! প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তার মুখ। প্রধানমন্ত্রীর শায় আমার সাথে লাঞ্ছনা খাবেন। আপনার আশার অংশ কি তিনিও নিতে পারেন? ইস্পাতকঠিন নার্ভ থাকা সত্ত্বেও আমি জানি এই ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে ঘুম উড়ে গেছে ওঁর চোখের পাতা থেকে। জেকবস, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে ওপরে আসতে বলবে কি? হিলডা ডিয়ার, এটা

একটা রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাইনিং রুমে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবেখন।

প্রধানমন্ত্রীর অচঞ্চল হাবভাবে সংঘমের প্রকাশ দেখলাম। কিন্তু তবুও তার চোখের দীপ্তি আর অস্থিসার হাতের মৃদু কম্পন থেকে বুঝলাম তরুণ সহকর্মীর উত্তেজনার কবল থেকে তিনিও নিস্তার পাননি।

শুনলাম রিপোর্ট দেওয়ার মতো খবর এনেছেন, মি. হোমস?

বন্ধুবরও উত্তর দিলে, এখনও কিন্তু তা পুরোপুরিই নাবাচক। যেখানে যেখানে এ-দলিলের হদিশ পাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতে খবর নিয়েছি আমি। কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা যে নেই, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু তা তো যথেষ্ট নয়, মি. হোমস। এ-রকম একটা আগ্নেয়গিরির ওপর আমরা তো চিরকাল বসে থাকতে পারি না। নিশ্চিত কিছু আমাদের পেতেই হবে।

আশা আছে, তা পাব। সেই কারণেই এখানে আমি এসেছি। এ-ব্যাপার নিয়ে আমি যতই ভাবছি, ততই একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে যাচ্ছে আমার মনে! বিশ্বাসটা এই চিঠিটা কস্মিনকালেও এ-বাড়ির বাইরে যায়নি।

মি. হোমস!

যদি যেত, তাহলে তা এতক্ষণে জনসাধারণের সামনেই উপস্থাপিত হত!

কিন্তু এ-বাড়ির মধ্যেই রেখে দেওয়ার জন্যে কেই-বা সরাতে যাবে বলুন? আর, কেনই-বা নেবে সে?

আমি বিশ্বাস করি না যে চিঠিটা কেউ নিয়েছে।

তাহলে ডেসপ্যাঁচবাক্স থেকে চিঠিটা উদ্ধাও হল কেমন করে শুনি?

আমি বিশ্বাস করি না যে চিঠিটা আদৌ ডেসপ্যাঁচ-বাক্সের বাইরে গেছে।

মি, হোমস, বড়ো অসময়ে এসব রঙ্গ-পরিহাস শুরু করেছেন। আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চিঠিটা বাক্স থেকে উদ্ধাও হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালের পর থেকে বাক্সটা আর পরীক্ষা করেছিলেন?

না। তার আর দরকার ছিল না।

আমার অনুমান, আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে চিঠিটা।

অসম্ভব । আমি বলছি, অসম্ভব ।

কিন্তু আমি তো পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না, বিশ্বাসও করে উঠতে পারছি না ।
এ-রকম ব্যাপার ঘটতে তো এর আগেও আমি দেখেছি । ধরে নিচ্ছি, নিশ্চয় আরও
কাগজপত্র ছিল বাক্সের মধ্যে । সেইসবের মধ্যেই মিশে থাকতে পারে দলিলটা ।

দলিলটা ছিল সবার ওপরে ।

কেউ হয়তো নেড়েছিল বাক্সটাকে । তাতেই স্থানভ্রষ্ট হয়েছে ।

না, না । আমি সব কিছু বার করে দেখেছিলাম ।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, হোপ, অনায়াসেই তো সমাধান করা যায় এ-সমস্যার ।
ডেসপ্যাঁচবাক্সটা এখানে আনাও দিকি ।

ঘণ্টা বাজালেন সেক্রেটারি ।

জেকবস, আমার ডেসপ্যাঁচবাক্সটা নামিয়ে আনে । সময়ের হাস্যকর অপচয় ছাড়া আর
কোনো লাভই হবে না । এই করলেই যদি সন্তুষ্ট হন তো, তবে তাই হোক । ধন্যবাদ,
জেকবস, এখানে রাখো । চাবিটা সবসময়ে আমার ঘড়ির চেনে লাগানো থাকে । এই
দেখুন এই কাগজগুলো । লর্ড মেররোর চিঠি, স্যার চার্লস হার্ডির রিপোর্ট, বেলগ্রেড থেকে

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

সংক্ষিপ্ত বিবরণী, রাশিয়ান-জার্মান ফসলকর সংক্রান্ত টীকাটিপ্পনী, মাদ্রিদ-এর চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ার্সের চিরকুট গুড হেভেনস! এটা কী? লর্ড বেলিনগার! লর্ড বেলিনগার!

ওঁর হাত থেকে নীল লেফাফাটা ছিনিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী।

হ্যাঁ, এইটাই-চিঠিটাও আছে। হোপ, আমার অভিনন্দন নাও!

ধন্যবাদ! ওঃ, একী গুরুভার পাথর নেমে গেল আমার বুক থেকে। কিন্তু এ যে অকল্পনীয় অসম্ভব। মি. হোমস, আপনি ভেলকি জানেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক। কী করে জানলেন আপনি যে চিঠি এখানেই রয়েছে?

কেননা, আমি জানতাম এ-চিঠি আর কোথাও নেই।

আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। স্কিপ্তের মতো দরজার কাছে ছুটে গেলেন সেক্রেটারি। আমার স্ত্রী কোথায়? ওকে বলে আসি, সব ঠিক হয়ে গেছে। হিলডা। হিলডা। সিঁড়ির ওপর থেকে ভেসে এল ওঁর কণ্ঠস্বর।

চকচকে চোখে মিট মিট করে হোমসের পানে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী।

বললেন, এবার বলুন তো, মশায়। এ ব্যাপারে চোখের দেখার চেয়ে অদেখা জিনিসই আছে বেশি। চিঠিটা কী করে ফিরে এল বাক্সের মধ্যে?

আশ্চর্য ওই দুটি চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে থেকে মুচকি হেসে সরে গেল হোমস । আমাদেরও তো কিছু কিছু কূটনৈতিক মন্ত্রণা আছে । বলে, টুপিটা তুলে নিয়ে ও এগিয়ে গেল দরজার দিকে ।

টীকা

কার্পেটের কারচুপি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেকেন্ড স্টেন স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় এবং কলিয়ার্স উইকলির ২৮ জানুয়ারি ১৯০৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় । গল্পটির পাণ্ডুলিপি হ্যাভারফোর্ড কলেজের সংগ্রহে রক্ষিত আছে ।

লর্ড বেলিংগার : হোমস এবং ওয়াটসনের জীবদ্দশায় মাত্র তিনজন মানুষ দু-বার করে বা তার বেশি ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন । তারা হলেন বেঞ্জামিন ডিসরেইলি (১৮৬৮ এবং ১৮৭৪-১৮৮০), উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন (১৮৬৮-১৮৭৪, ১৮৮০-১৮৮৫, ১৮৮৬ এবং ১৮৯২-১৮৯৪) এবং রবার্ট সলসবেরি (১৮৮৫-১৮৮৬, ১৮৮৬-১৮৯২ এবং ১৮৯৫-১৯০২) । ওয়াটসন বর্ণিত তপকৃশ চেহারা, উন্নত নাক, ইগল পাখির মতো চোখ প্রভৃতি বিবরণ থেকে বেশির ভাগ গবেষক লর্ড বেলিংগারকে মনে করেন রবার্ট সলসবেরির প্রতিরূপ ।

ইনিই বটে : হোমস-গবেষকদের মতে ইনি হলেন কাইজার দ্বিতীয় উইললেম (১৮৫৯-১৯১৮) জার্মানির সম্রাট এবং ১৮৮৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রুশিয়ার রাজা পরিচিত ছিলেন দ্বিতীয় উইলিয়াম নামেও ।

মূল কারণটাই-বা কী : এই চিঠি নিয়ে কে যে কী করতে পারেন, তা শার্লক হোমস বুঝতে না-পেরে এহেন প্রশ্ন করবেন-এ-কথা ভাবাই যায় না ।

ওবারস্টাইন, লা রোথিয়েরা : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস গল্পে এই দুটি চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় । তার মধ্যে প্রথমজনের ভূমিকা গল্পে বেশ উল্লেখযোগ্য ।

ওরা থাকে ওয়েস্ট এস্টের এক প্রান্তে : ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস গল্পে ওবারস্টাইনের বাড়ি কেনসিংটনে এবং লা রোথিয়েরার বাসস্থান নটিংহিলে বলে জানা যায় ।

স্থায়ী প্রকৃতির একটা বাতিকে আক্রান্ত : বাতিকটা যে স্থায়ী প্রকৃতির তা কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বেশ তাড়াতাড়ি জেনে ফেলেছেন ।

অফিসে ওর কয়েকজন গুপ্তচর আছে : তাদের সন্ধান করার ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? মনে হয় ঘটনার সামঞ্জস্য রাখতে প্লটে জোড়াতালি লাগানোর জন্য হঠাৎ করে এই গুপ্তচরদের সৃষ্টি করলেন লেখক ।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । ঔপাখ্যায় বোণান ড়েল । শার্লক হোমস

ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো পথ না-পেয়ে : ডেসপ্যাঁচ বক্সের নকল চাবি ছিল হিলডার কাছে। বাক্সটাও শোবার ঘরে রাখা ছিল। বিস্তর সময় পেয়েও তিনি রেখে দিতে পারলেন না চিঠিটা? এতই বোকা লেডি হিলডা?

বঙ্গলাপাহাড়ের বণ্ড নথ

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়ন্স]

প্রায় সন্ধ্যাতেই আমাদের ঘরে আসতেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড ।

সেদিন সন্ধ্যাতেও খবরের কাগজ আর আবহাওয়া সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার পর চুপচাপ বসে ছিল লেসট্রেড । আনমনা ও চিন্তামগ্ন মুখে সিগার টানছিল অনেকক্ষণ ধরে । তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে হোমস জিজ্ঞাসা করে, জবর খবর আছে মনে হচ্ছে?

লেসট্রেড বলল, ধরেছেন ঠিকই মি. হোমস, বাস্তবিকই বড়ো চিন্তায় পড়েছি। আমার মনে হয়, এটা আমাদের আওতায় না-এসে ডক্টর ওয়াটসনের এজিয়ারেই আসা উচিত ।

অসুখবিসুখ নাকি? শুধোলাম আমি ।

উন্নততাই বলতে পারেন । তাও আশ্চর্য রকমের খেপামো । আপনি কি মনে করেন আজও আমাদের সমাজে প্রথম নেপোলিয়নের ওপর তীব্র ঘৃণা নিয়ে লোকে বেঁচে আছে এবং তার যা প্রতিমূর্তি পাচ্ছে, তাই ভেঙে চুরমার করে ফেলছে?

হেলান দিয়ে বসল হোমস । বলল, এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় নেই ।

যা বলেছেন। আমার মতও তাই। এ নিয়ে আমিও মোটেই মাথা ঘামাতাম না যদি না লোকটা পরের মূর্তি চুরি করে ভাঙা শুরু করত। চুরিচামারি শুরু হতেই পুলিশের টনক নড়েছে, মানে নড়াতে বাধ্য করেছে।

চুরিচামারি? আবার সিধে হয়ে বসে হোমস। বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে তো! তাহলে সব খুলেই বলো লেসট্রেড।

নোটবুক বার করে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিলে লেসট্রেড।

তারপর বলল, প্রথম ঘটনাটা ঘটে আজ থেকে ঠিক চারদিন আগে মর্স হাডসনের দোকানে। দোকানটা কেনিংটন রোডে। মূর্তি আর ছবি ছাড়া অন্য কিছু বিক্রি হয় না সেখানে। সেদিন সামান্যক্ষণের জন্যে সামনের দরজা ছেড়ে ভেতর দিকে গেছিল কাউন্টারের কর্মচারী-হঠাৎ দমাস শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে কি নেপোলিয়নের একটা মূর্তি চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। কাউন্টারের ওপর আরও অনেকগুলো মূর্তির সাথে এ-মূর্তিটাও সাজানো ছিল।

সময় নষ্ট না-করে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেল না। কয়েকজন অবশ্য বললে যে একটা লোককে তিরবেগে দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে যেতে দেখেছে তারা, সে-লোকটাকে যে কী করে চিনে বার করা যাবে, সে-রকম নিশানা তারা দিতে পারল না।

সবাই ভাবলে নিশ্চয় কোনো নচ্ছার লোকের বিটলেমো। এ-রকম বদমাইশি তো হামেশাই হচ্ছে এ-শহরে। কাজেই এই সামান্য বিষয় নিয়ে আর মাথা না-ঘামিয়ে বীটের কনস্টেবলকে জানানো হল খবরটা। তাদের কর্তব্য শেষ হল ওইখানেই। কেননা, মাত্র কয়েক শিলিং দামের সস্তা একটা প্লাস্টারের ছাঁচ ভাঙা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু না। কাজেই, এ নিয়ে আর জোরালো তদন্তের প্রয়োজন কেউ মনে করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা কিন্তু আরও আশ্চর্য রকমের এবং এত সহজে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কাল রাতের ব্যাপার।

কেনিংটন রোডে মর্স হাডসনের দোকানের শ-খানেক গজের মধ্যে ডা. বার্নিকট থাকেন।

ডা. বার্নিকট নেপোলিয়নের দারুণ ভক্ত এবং চব্বিশ ঘণ্টা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়িতেও তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন রাশি রাশি বই, ছবি আর দুস্ত্রাপ্য জিনিস, বলা বাহুল্য সবই সম্রাট নেপোলিয়ন সংক্রান্ত। কিছুদিন আগে মর্স হাডসনের দোকান থেকে তিনি দুটি প্লাস্টারের ছাঁচ কেনেন। একই ছাঁচ থেকে তৈরি দুটি মূর্তিতে শিল্পী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল নেপোলিয়নের বিখ্যাত আবক্ষ রূপটুকু। ভাস্কর একজন ফরাসি। নাম-ডিভাইন।

ডা. বার্নিকট একটি মূর্তিকে রেখেছিলেন তাঁর কেনিংটন রোডের হল ঘরে। আর একটি লোয়ার ব্রিক্সটনের সার্জারিতে ম্যান্টলপিসের ওপর।

আজ সকালে নীচের হল ঘরে নেমে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন ডা. বার্নিকট ।

দেখলেন, অদ্ভুত এক চোর গত রাতে তার অনধিকার প্রবেশের চিহ্ন রেখে গেছে হল ঘরে ।

অদ্ভুত এই কারণে যে রাশি রাশি মূর্তির মধ্যে থেকে চোর শুধু বেছে নিয়েছে নেপোলিয়নের মূর্তিটাই এবং তাও বাগানের দেওয়ালে দারুণ আক্রোশে আছড়ে ভেঙে রেগু রেগু করে রেখে গেছে । সবকটা টুকরোই পাওয়া গেছে দেওয়ালের নীচে ।

হাত রগড়াতে রগড়াতে হোমস শুধু বললে, বেশ অভিনবত্ব আছে দেখছি ।

আমি জানতাম খুশি হবেন আপনি । কিন্তু এখনও শেষ হয়নি আমার কাহিনি । সেদিন দুপুর বারোটায় সার্জারিতে আসার পর চক্ষুস্থির হয়ে গেল ডা. বার্নিকটের ।

দেখলেন, সেখানেও চোর ঢুকেছিল গত রাতে । জানলা খোলা । আর, ঘরময় ছত্রাকার হয়ে পড়ে তার অতিপ্রিয় নেপোলিয়নের অগুনতি ভাঙা টুকরো । এক্ষেত্রে অবশ্য ম্যান্টলপিসের ওপরই আছড়ে গুঁড়ো করা হয়েছে মূর্তিটাকে ।

কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এমন কোনো সূত্র পড়ে নেই যাকে নিয়ে এই পাগলই বলুন, বদমাইশই বলুন, লোকটার কোনো হৃদিশ খুঁজে বের করতে পারি । এখন বলুন, মি. হোমস, কী করা উচিত আমার !

বাস্তবিকই লেসট্রেড, সবকটা ঘটনাই শুধু অদ্ভুত নয়-কিন্তুত। যাই হোক, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। মর্স হাডসনের দোকানে যে-মূর্তিটা গুঁড়ো হয়েছে, আর ডা. বার্নিকটের যে-মূর্তি দুটো চুরমার হয়েছে, সবগুলোই কি একই ছাঁচ থেকে তৈরি?

হ্যাঁ।

তাহলে তো তোমার থিয়োরিটাই নাকচ হয়ে যাচ্ছে। তোমার ধারণা, নেপোলিয়নের ওপর তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে কেউ সমানে মূর্তি ভেঙে চলেছে। এ-ধারণা ভুল এই কারণে যে, এ-শহরে শক্তিমান সম্রাট নেপোলিয়নের শত শত মূর্তির মধ্যে এই আধখোঁপা কালাপাহাড়ের পক্ষে একই ছাঁচে তৈরি তিনটি মূর্তি পর পর ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয়। এরকম ধরনের কাকতালীয় কল্পনাও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

লেসট্রেড বললে, আপনার মতো আমিও ভেবেছিলাম মি. হোমস। কিন্তু ভাববার আর একটা দিকও আছে। লন্ডনের ওই অঞ্চলে আবক্ষ মূর্তি কেনাবেচা করে শুধু একজনই এবং মর্স হাডসন। আর শুধু এই তিনটে মূর্তিই বেশ কয়েক বছর ধরে পড়ে ছিল তার দোকানে। সুতরাং আপনার কথামতো শহরে শত শত মূর্তি থাকলেও শুধু এই তিনটে মূর্তিই ছিল এ-অঞ্চলে। কাজেই কোনো স্থানীয় অতি-উৎসাহীর পক্ষে ওই তিনটে দিয়ে কাজ শুরু করা অসম্ভব নয়। আপনি কি বলেন ডা. ওয়াটসন?

আমি বললাম, Monomania বা বাতিকগ্রস্ত মানুষ যে কত কী করতে পারে, তার কোনো শেষ নেই। এই মানসিক অবস্থাকে আধুনিক ফরাসি মনোবিজ্ঞানীরা Idee fixe নাম দিয়েছেন।

মাথা নাড়তে নাড়তে হোমস বললে, মাই ডিয়ার ওয়াটসন! তা হতে পারে না এই কারণে যে Idee fixe তে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও কোনো বাতিকগ্রস্তের পক্ষেই মূর্তিগুলোর ঠিকানা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

বেশ তাই যদি হয়, তবে তোমার বক্তব্যটা শুনি।

আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমি শুধু দেখছি যে ভদ্রলোকের খাপছাড়া কার্যকলাপের মধ্যেও বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে। যেমন ধর না কেন ডা. বার্নিকটের হল ঘরে। সেখানে সামান্য শব্দ হলেই বাড়ির লোক জেগে উঠতে পারে, কাজেই মূর্তিটাকে না-ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাগানে সেখানে দেওয়ালের ওপর আছাড় মারা সত্ত্বেও কারো ঘুম ভঙেনি। আবার সার্জারিতেও যেখানে এত সাবধান না-হলেও চলবে, সেখানে মূর্তিটাকে তুলে নিয়ে আছাড় মারা হয়েছে যেখানে সেটা ছিল সেই ম্যান্টলপিসের ওপরেই। সেই কারণেই তিনটে মূর্তি ভাঙা গল্প শুনে আমি হাসাহাসি করতে চাই না। এই আশ্চর্য ঘটনাগুলোর পর নতুন কিছু যদি আবার ঘটে আমাকে জানতে ভুলো না লেসট্রেড। আমি তাতে সত্যিই খুব খুশিই হব।

পরের দিন সকালে তখনও আমি শোবার ঘরে সাজগোজ করছি। এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল হোমস। হাতে তার একটা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটা সে-ই পড়ে শোনাল : এখুনি চলে আসুন, ১৩১ পিট স্ট্রিট, কেনসিংটন-লেসট্রেড।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম পিট স্ট্রিটে। লন্ডনের একটি অতিচঞ্চল জীবনধারার ঠিক পাশেই যেন একটি স্থির জলাশয়। ছোট অথচ শান্ত!

১৩১ নম্বর বাড়িটাকে পেলাম একসারি বাড়ির মাঝখানে। সারির প্রতিটি বাড়িই সাদাসিধে গঠনের। সুন্দর না-হলেও সৌম্য। গাড়ির মধ্যে থেকেই দেখলাম, বাড়ির সামনের রেলিংয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ছোটোখাটো একটা উৎসুক জনতা।

লেসট্রেড খুব গম্ভীরমুখে আমাদের এগিয়ে নিতে এল। ওর পিছু পিছু বসবার ঘরে এসে দেখলাম, ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন এক প্রৌঢ়। চুল উশকোখুশকো, পরনে ফ্লানেলের ড্রেসিং গাউন।

আলাপ পরিচয় হল। শুনলাম ইনিই সেন্ট্রাল প্রেস সিভিকিটের* মি. হোরেস হার্কার-এ-বাড়ির মালিক। সাংবাদিক।

লেসট্রেড বলল, আবার নেপোলিয়নের মূর্তি, মি. হোমস! গতরাতে আপনার খুব আগ্রহ দেখেছিলাম এ-ব্যাপারে, তাই ভাবলাম আপনাকে একবার খবর দিই। কেসটা আর তাক্ষিল্য করবার মতো নয়, খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যথা?

খুন। মি. হার্কার এঁদের সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি? কিছুই বাদ দেবেন না।

বিষয় মুখে আমাদের পানে তাকালেন মি. হার্কার। বললেন, রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছি আমি

মাস চারেক আগে নেপোলিয়নের একটা আবক্ষ মূর্তি কিনেছিলাম এই ঘরে রাখব বলে। যত গুণগোল মনে হচ্ছে ওই মূর্তিকে নিয়েই। স্টেশন থেকে দু-পা গেলেই হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকান। মূর্তিটা তাদের দোকান থেকেই কিনেছিলাম।

আমার সাংবাদিকতার বেশির ভাগ কাজই সারতে হয় রাত্রে। লিখতে লিখতে রাত দুটো তিনটে তো হামেশাই বাজে। কাল রাতেও হয়েছে তাই। ওপরতলায় পেছনের দিকে আমার ঘরে একটানা লিখে চলেছি-রাত তখন প্রায় তিনটে।

হঠাৎ মনে হল নীচের তলায় সিঁড়িতে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। কান খাড়া করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ-কিন্তু কিছুই আর শুনতে পেলাম না। শব্দটা যে বাইরের-সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

ঠিক তার মিনিট পাঁচেক পরেই, আচমকা এক ভয়াবহ আত্নাদ ভেসে এল কানে। মি. হোমস, অনেকরকম চিৎকার সারাজীবনে শুনেছি, কিন্তু এ-রকম রক্ত-হিম-করা শব্দ আর শুনিনি। যতদিন বেঁচে থাকব এ-চিৎকার আমি ভুলব না।

মিনিট খানেক কি দুয়েক পাথরের মতো বসে ছিলাম। তারপরেই চুল্লি খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা নিয়ে গেলাম নীচে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম জানলা দু-হাট করে খোলা এবং পর মুহূর্তেই বুঝলাম ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে উধাও হয়েছে নেপোলিয়নের মূর্তিটা। কিন্তু কিছুতেই আমি বুঝে উঠছি না এ-রকম একটা জিনিস চুরি করে কী লাভ! সামান্য একটা প্লাস্টারের ছাঁচ! কতই-বা আর তার দাম।

আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন মি. হোমস, লম্বা একটা লাফ মেরে জানলা থেকে সামনের দরজার ধাপেতে পৌঁছোনো এমন কিছু কঠিন নয়। চোর মহাপ্রভুও নিশ্চয় সেই পথেই উধাও হয়েছেন মনে করে তৎক্ষণাৎ ঘুরে গিয়ে খুলে ফেললাম সামনের দরজা। অন্ধকারের মাঝে পা বাড়িয়েই হোঁচট খেলাম একটা মৃতদেহের ওপর। চৌকাঠের ঠিক সামনেই পড়ে ছিল লাশটা।

দৌড়ে গিয়ে আলো এনে দেখলাম শুধু রক্ত আর রক্ত। রক্তের পুকুরের মধ্যে যেন সাঁতার কাটছে লোকটা। গলাটা ধারালো অস্ত্রের কোপে হাঁ হয়ে রয়েছে। চিত হয়ে পড়ে ছিল দেহটা, হাঁটু দুটো গুটোনো, মুখটা বীভৎসভাবে হাঁ করা। স্বপ্নের মধ্যেও সে-দৃশ্যকে

আমি ভুলতে পারব না। আমার কাছেই পুলিশ হুইসেল ছিল। কিন্তু বাজানোর পরেই বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা, এরপর কী হয়েছে আর মনে নেই। চোখ খুলে দেখলাম হল ঘরে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিশের লোক।

হোমস জিজ্ঞাসা করে, তাহলে খুন হল কে?

জবাব দেয় লেসট্রেড, চেনার কোনো উপায় নেই। মর্গে গেলেই লাশটা দেখতে পাবেন। কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা এক ইঞ্চিও এগোতে পারিনি। লোকটা বেশ লম্বা, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, রীতিমতো শক্তিমান, বয়স তিরিশের ওদিকে নয়। জামাকাপড় সস্তা দামের। অথচ তাকে দেখলে শ্রমিক বলে মনে হয় না। পাশেই থইথই রক্তের মাঝে শিংয়ের হাতলওলা একটা ছুরি পড়ে ছিল। এই ছুরি দিয়েই কাজ সারা হয়েছে কি না অথবা তা মৃত লোকটার কিনা তা আমি জানি না। জামাকাপড়ের কোনো নাম পাইনি। পকেটে একটা আপেল, কিছু সরু দড়ি, এক শিলিং দামের লন্ডনের একটা ম্যাপ আর একটা ফটোগ্রাফ ছাড়া কিছু ছিল না। এই দেখুন সেই ফটোগ্রাফ।

ছবিটা যে একটা ছোটো ক্যামেরা থেকে নেওয়া স্ল্যাপশট, তা দেখলেই বোঝা যায়। লোকটার চেহারা চোখাচোখা, বানরের মতো চনমনে, মোটা মোটা ভুরু আর অনেকটা বেরুনের চোয়ালের মতো মুখের তলার অংশ খানিকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

সতর্ক চোখে ছবিটা দেখে জিজ্ঞেস করে হোমস, মূর্তিটা কী হল?

আপনি আসার ঠিক আগেই খবর পেলাম। ক্যাম্পডেন হাউস রোডে একটা খালি বাড়ির সামনের বাগানে পাওয়া গেছে মূর্তিটাকে। আস্ত অবশ্য নয়, টুকরো টুকরো অবস্থায়। ওইদিকেই যাচ্ছি এখন, আসবেন নাকি?

সে-কথা আর বলতে। তার আগে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। কার্পেট আর জানলা পরীক্ষা করে বলল হোমস, হয় লোকটার বেশ লম্বা লম্বা ঠ্যাং আছে, আর না হয় বেশ করিতকর্মা পুরুষ সে। এতখানি জায়গা টপকে জানলার কিনারায় পৌঁছে জানলা খোঁেলাটা কম বাহাদুরি নয়। ফিরে আসা বরং অনেক সোজা। মি. হার্কার, আমাদের সাথে আসছেন নাকি? গেলে আপনার মূর্তির চরম পরিণতিটা দেখতে পেতেন।

লেখবার টেবিলে শুকনো মুখে বসে ছিলেন মি. হারকার। বললেন, না মশাই, যা হয় একটা কিছু খাড়া করার চেষ্টা করতে হবে এখন। সবকটা ইভনিং পেপারের প্রথম সংস্করণেই যে আদ্যোপান্ত খবরটা বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ভীষণ দেরি করে ফেলেছি। দোরগোড়ায় দারুণ খুন, আর আমি কিনা—।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে শুনলাম ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর জার্নালিস্টের কলম আত্ননাদ করে ছুটে চলেছে।

চূর্ণবিচূর্ণ মূর্তিটাকে পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। মহাপরাক্রমশীল সম্রাটের এমন শোচনীয় পরিণতি দেখলাম এই প্রথম। আততায়ীর অন্তরে তাঁর প্রতি নিদারুণ

ঘণা যে কতটা তা রেণু রেণু অংশগুলো দেখলে খানিকটা বুঝতে পারা যায়। ঘরের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিল শতধা চূর্ণ টুকরোগুলো। হোমস কয়েকটা পরীক্ষা করল। তার নিবিষ্ট চোখ আর হাবভাব দেখে বুঝলাম শেষ পর্যন্ত একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছে সে।

হল? শুধোল লেসট্রেড।

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, তুড়ি মেরে কি আর কুয়াশা কাটানো যায়? এখনও অনেক অনেক পথ মাড়িয়ে যেতে হবে। তবু কি জানো, দু-একটা ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু ইশারা পাচ্ছি। আমাদের উচিত এখন এই নিয়েই কাজ শুরু করা। তুচ্ছ মূর্তি দখল করাই মানুষের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করে আমাদের অজ্ঞাত এই ক্রিমিনাল ভদ্রলোকটি। এই হল গিয়ে প্রথম পয়েন্ট। তারপরে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে মূর্তি চুরমার করাই যদি লোকটার মুখ্য উদ্দেশ্য হত, তাহলে প্রতিবারেই দেখা যাচ্ছে মূর্তিটাকে হাতে পেয়েও সে তক্ষুনি বাড়ির বাইরে গিয়ে ভাঙছে না।

আর এক স্যাঙাতের চোখে পড়ে যাওয়ায় নিশ্চয় ভাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল সে। তা ছাড়া ধস্তাধস্তিও তো কম হয়নি।

তা খুবই সম্ভব। তবুও আর একটা জিনিসের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মূর্তিটা চুরমার করা হয়েছে এইখানেই-এই বাগানের মধ্যে। আচ্ছা, ওই বাড়িটার অবস্থানটা লক্ষ্য করেছ?

চারপাশে দেখে নিল লেসট্রেড ।

বাড়িটা খালি দেখেই সে বুঝেছিল বাগানে মূর্তি আছড়ালে কারো ছুটে আসার সম্ভাবনা নেই ।

ভালো কথা । কিন্তু মূর্তিটা চুরি করে এই বাগানে আসার পথেই তো আর একটা বাগান পড়ছে । তার পক্ষে সেইটাতেই ঢোকা উচিত ছিল । নয় কি? বিশেষ করে চোরাই মাল হাতে কারো সাথে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যখন রয়েছে?

আমি হার মানলাম, বলল লেসট্রেড ।

মাথার ওপর রাস্তার বাতিটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল হোমস । সে যা করতে চেয়েছিল, তা সে এখানে দেখতে পাবে বলেই এসেছিল । ওদিককার বাগানে সে-সম্ভাবনা ছিল না । এই হল কারণ ।

বাইজোভ? ঠিকই তো, লাফিয়ে ওঠে গোয়েন্দা-প্রবর, এখন আমার মনে পড়ছে সব । মি. বার্নিকটের মূর্তিটাও তার লাল আলো থেকে বেশি দূরে ভাঙা হয়নি । মি. হোমস, তা না হয় হল, কিন্তু এ নিয়ে আমরা করব কী?

মনে রাখবে। নোট করে রাখবে। ঘটনাচক্রে কাজে লেগে যেতে পারে। যাই হোক, এখন তুমিই বলো, কীভাবে এগোতে চাও তুমি।

আমার মতো মৃত লোকটাকে শনাক্ত করলেই অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে। আসল কাজ তো এইটাই। খুব কঠিন অবশ্য নয়। লোকটার ঠিকুজি জানা গেলেই আর তার সাক্ষোপাঙ্গদের হৃদিশ পাওয়া গেলেই গতরাতে পিট স্ট্রিটে সে কী করতে গিয়েছিল এবং মি. হোরেস হার্কীরের বাড়িতে কার সাথে দেখা হওয়ামাত্র অক্লা পেয়েছে তাও জানা যাবে। আপনি কী মনে করেন?

নিঃসন্দেহে তাই। তবে কি জানো, আমার কার্যপদ্ধতি ঠিক তোমার মতো হবে না?

কী করতে চান তবে?

তা বললে তুমি আর নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করতে পারবে না। আমি বলি কি আমরা যে যার নিজের নিজের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই। আমি থাকি আমার লাইনে, তুমি থাক তোমার লাইনে। পরে আমরা একসাথে বসে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব।

বেশ, তাই হোক। বলল লেসট্রেড।

পিট স্ট্রিট যদি যাও এখন মি. হোরেস হার্কারের সাথে তোমার দেখা হতে পারে। তাকে বল, আমার মন স্থির হয়ে গেছে। গতরাতে তাঁর বাড়িতে যে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা খুনে পাগল নেপোলিয়ন বিদ্রোহে আচ্ছন্ন হয়ে খুনখারাপি করে গেছে-সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এ-খবরটা জানলে তার অনেকটা সুবিধে হবে।

বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রইল লেসট্রেড।

আপনি কি সত্যি সত্যি তাই বিশ্বাস করেন নাকি?

মুচকি হাসল হোমস।

করি না? বেশ, হয়তো করি না। কিন্তু এ-খবর শুনলে মি. হোরেস হার্কার তো খুশি হবেনই, সেন্ট্রাল প্রেম সিভিকিটের গ্রাহকেরাও হবেন। লেসট্রেড, আজ সন্ধ্যা ছটায় বেকার স্ট্রিটে আমার সাফে তুমি দেখা করলে খুশি হব। ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতের পকেটে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটা রইল আমার কাছে।

হাটতে হাটতে আমি আর শার্লক হোমস চলে এলাম হাই স্ট্রিটে হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকানের সামনে। মূর্তিটা কেনা হয়েছিল এখান থেকেই।

একজন ছোকরা কর্মচারী ছিল দোকানে। হোমসের প্রশ্ন শুনে বললে যে সে নিজেই নতুন এসেছে দোকানে। মি. হার্ডিংও বিকেলের আগে আসেন না, কাজেই কোনো খবর দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। শুনে হোমসের মুখে ফুটে উঠল যুগপৎ হতাশা আর বিরক্তি।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বলল, সব কিছুই যে আমাদের অনুকূল হবে এ-রকম আশা করাই উচিত নয়, কি বল ওয়াটসন? মি. হার্ডিং ফিরে এলে পর বিকেলেই আসতে হবে আমাদের। কীভাবে কাজ শুরু করছি, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছ তুমি। মূর্তিগুলো এসেছে যেখান থেকে আমি পৌঁছোতে চাই সেখানেই। বেচারিদের এ-রকম দূরবস্থার মূলে যদি কোনো অদ্ভুত কারণ থাকে, তা জানা যাবে উৎপত্তি স্থানে পৌঁছোতে পারলে। চলো, কেনিংটন রোডে মি. মর্স হাডসনের কাছে যাওয়া যাক। তাকে দিয়েও সমস্যার জট খানিকটা খুলতে পারে।

একটা গাড়ি নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছবিওয়ার দোকানে পৌঁছে গেলাম। ভদ্রলোকের চেহারা ছোটোখাটো হলেও বেশ মজবুত, লাল মুখ, হাবভাব একটু ঝাঁঝাল।

তড়বড় করে কথা বলে চললেন ভদ্রলোক, হ্যাঁ, হা স্যার, আমারই কাউন্টারে। ট্যাক্স-ফ্যাক্সগুলো কেন দিই তা বুঝি না-বদমাশরা এসে আমার জিনিসপত্র যদি ভেঙে তছনছ করেই গেল, তাহলে এসব দিয়ে লাভ কী আমার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ড, বার্নিকটকে মূর্তি দুটো আমিই বিক্রি করে ছিলাম। কী লজ্জার কথা, ছিঃ ছিঃ। আমি তো বলব, রীতিমতো একটা নিহিলিস্ট প্লট। অ্যানার্কিস্ট ছাড়া আর কেউ এমন করে মূর্তি চুরমার করতে পারে না। আমি তো ওদের রেড রিপাবলিকান বলি। কোথেকে পেয়েছি মূর্তিগুলো? তার সঙ্গে

এ-ব্যাপারের কী সম্বন্ধ বুঝছি না। বেশ আপনি যদি একান্তই জানতে চান তো শুনুন। স্টেপনিয় চার্চ স্ট্রিটে গেলডার অ্যান্ড কোম্পানি থেকে কিনেছিলাম। বিশ বছর ধরে তারা এই ব্যবসা করে আসছে এবং নামও খুব। ক-টা কিনেছিলাম? তিনটে-দুটো আর একটা, মোট তিনটে। দুটো ড. বার্নিকট নিয়েছিলেন, আর একটা তো দিনেদুপুরেই গুঁড়ো হল আমার কাউন্টারে। ফটোগ্রাফটা কার? না, না, আমি চিনি না। হ্যাঁ, একটু একটু চিনি মনে হচ্ছে। আরে, আরে, এ তো দেখছি বেপ্পো। লোকটা ইটালিয়ান। ঠিক কাজ করত। আমার অনেক কাজ করে দিত বেপ্পো। খোদাইয়ের কাজ একটু-আধটু জানত, সোনালি রং ধরাতে পারত-আরও টুকিটাকি কাজ করত অনেকরকম। গত হুগায় শেষবারের মতো এসেছিল লোকটা। তারপর আর কোনো খোঁজখবর পাইনি ওর। না, কোথেকে এসেছে আর কোথায় গেছে-অত খবর আমি রাখি না। ওইখানে থাকার সময় ওর সঙ্গে আমার কোনো খিটিমিটি লাগেনি। ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। মূর্তি চুরমার হওয়ার দিন দুয়েক আগে বেপ্পো শেষবারের মতো এসেছিল।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে হোমস বলল, মন্দ কী, মর্স হাডসনের কাছ থেকে যা যা আশা করেছিলাম, সবই পেয়েছি। কেনিংটন আর কেনসিংটন-দুজায়গাতেই পাচ্ছি বেপ্পোর অস্তিত্ব। দশ মাইল গাড়িতে আসা বৃথা যায়নি দেখছি। ওয়াটসন, এবার যাওয়া যাক স্টেপনিতে গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে। মূর্তিগুলোর উৎপত্তি এইখান থেকেই যখন, তখন ওখান থেকে কিছু-না-কিছু সাহায্য আমরা পাবই।

দ্রুতবেগে আমরা একে একে পেরিয়ে গেলাম বিলাসী লন্ডন, হোটেল লন্ডন, থিয়েটার লন্ডন, সাহিত্যিক লন্ডন, ব্যবসায়ী লন্ডন এবং সব শেষে সমুদ্রতীরের লন্ডন।

যা খুঁজছিলাম, তা পেলাম এখানেই। খোলামেলা একটা জায়গা। এক সময়ে বোধ হয় এখানে ধনী লন্ডন ব্যবসায়ীদের আস্তানা ছিল। কিন্তু আজ গড়ে উঠেছে হরেকরকম মূর্তি তৈরির কারখানা।

বাইরে বিরাট উঠোনটায় অগুনতি পাথরের স্মৃতিফলক। ভেতরের মস্ত বুড়ো ঘরটায় জনা পঞ্চাশেক কারিগর খুটখাট কাজ করে চলেছে। কেউ খোদাই করছে, কেউ-বা ছাঁচে ঢেলে মূর্তি তৈরি করছে।

ম্যানেজার একজন জার্মান ভদ্রলোক। চেহারাটি বিরাট। আমাদের বেশ খাতির করে বসিয়ে হোমসের সব প্রশ্নেরই পরিষ্কার উত্তর দিলেন।

খাতাপত্র ঘেঁটে দেখা গেল, ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের মার্বেল পাথরের আবক্ষ মূর্তি থেকে এ পর্যন্ত কয়েকশো ছাঁচ নেওয়া হয়েছে। বছরখানেক আগে ছ-টা মূর্তি একসাথে তৈরি করা হয়েছিল। তিনটে পাঠানো হয়েছিল মর্স হাডসনকে, বাকি তিনটে কেনসিংটনের হার্ডিং ব্রাদার্সের দোকানে। অন্যান্য ছাঁচের সঙ্গে এই বিশেষ ছ-টির পার্থক্য থাকার কোনো কারণ নেই। কেনই-বা মূর্তিগুলোকে চুরমার করা হচ্ছে তাও তিনি ভেবে পেলেন না। সব কথা শুনে তো ভদ্রলোক হেসেই অস্থির। মূর্তিগুলোর পাইকারি দাম ছ-শিলিং। খুচরো কিনতে গেলে বারো শিলিংয়ের মতো দাম পড়বে। মুখের দু-পাশ থেকে দুটো ছাঁচ নেওয়া হয়, তারপর প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচ বেমালুম জুড়ে দিলেই সম্পূর্ণ হয় মূর্তিটা। আমরা যে-ঘরে বসেছিলাম, মূর্তিগুলো সাধারণত ওইখানেই হয়। করে

ইটালিয়ান কারিগররা। কারিগরদের কাজ শেষ হলেই প্যাসেজের ওপর মূর্তিগুলো রাখা হয় শুকোবার জন্যে। তারপর যায় গুদোমে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না জার্মান ভদ্রলোক।

কিন্তু ফটোগ্রাফটা বার করামাত্র দারুণ পরিবর্তন এল ম্যানেজারের চোখে-মুখে। রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ, নীল নীল চোখের ওপর দড়ির মতো ফুটে উঠল কপালের শিরাগুলো।

রাসকেল কোথাকার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি, বেশ ভালোভাবেই চিনি। এ-প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়েছিল একদিনই। আর তা এই রাসকেলটার জন্যে যেদিন ওর পেছনে পুলিশ এসে হানা দিয়েছিল এখানে। এক বছরের ওপর হল। রাস্তার একজন ইটালিয়ানকে ছুরি মেরে কারখানায় এসে বসেছিল। পিছু পিছু পুলিশও এসে হাজির। বেপ্পো নামেই ওকে জানতাম, পদবি জানি না। এ-রকম লোককে কাজ দেওয়ার ফলে ভোগান্তি কম হয়নি আমার। অবশ্য কারিগর হিসাবে লোকটা ভালোই ছিল প্রথম শ্রেণির কারিগরই বলব।

কী শাস্তি পেয়েছিল বেপ্পো?

কপালজোরে লোকটা বেঁচে গিয়েছিল মশাই। এক বছর শ্রীঘর বাসের ওপর দিয়েই রেহাই পায় বেপ্পো। আমার তো বিশ্বাস এতদিনে খালাস পেয়েছে সে। অবশ্য এখানে

মুখ দেখানোর সাহস আর তার হয়নি। বেপ্পোর এক খুড়তুতো ভাই কাজ করে এখানে। তাকে জিজ্ঞেস করলে ও এখানে আছে কোথায়, তা জানা যেতে পারে।

না, না, চেষ্টা করে ওঠে হোমস, কোনো কথা নয়, তার সঙ্গে বেপ্পো সম্পর্কে কোনো কথা নয়-আমার একান্ত অনুরোধ। ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতখানি, তা হয়তো আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না। কিন্তু আমি যতই দেখছি, শুনছি, ততই বুঝছি কমা তো দূরের কথা, ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে এর গুরুত্ব। ভালো কথা, খাতাপত্র ঘেঁটে মূর্তিগুলোর বিক্রির খবর দেওয়ার সময় তারিখটা গত বছরের তেসরা জুন বললেন শুনলাম। আচ্ছা, বেপ্পো কবে গ্রেপ্তার হয়েছে সে-তারিখটা দিতে পারেন?

ম্যানেজার বললেন, মাইনের খাতা থেকে মোটামুটি বলতে পারব। কয়েকটা পাতা উলটে আবার বলেন, গত মাসের বিশ তারিখে তাকে শেষবারের মতো মাইনে দিয়েছি আমি।

হোমস বললে, ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনার ধৈর্য পরীক্ষা করার আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।

কাকপক্ষীও যেন আমাদের গোপন তদন্তের কথা জানতে না পারে, শেষবারের মতো এই অনুরোধ জানিয়ে আবার রওনা হলাম পশ্চিম দিকে।

দুপুর তখন গড়িয়ে এসেছে। একটা রেস্টোরাঁয় ঢুকে নাকেমুখে গুঁজে কোনোরকমে লাঞ্চ শেষ করলাম দুজন। ঢোকবার পথেই খবরের কাগজে দেখি বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা,

কেনসিংটনে খুনখারাপি। খুনে পাগলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। খানিকটা পড়তেই বুঝলাম, মি. হোরেস হার্কার শেষ পর্যন্ত তার সাংবাদিকের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। ছ-কলম ঠেসে লিখেছেন ভদ্রলোক। চাঞ্চল্যকর হত্যার শাখাপ্রশাখা ছড়ানো বর্ণনা পড়তে পড়তে সত্যি শিহরন জাগে। ভিনিগার, মরিচ, নুন ইত্যাদি রাখার স্ট্যান্ডে কাগজটা ঠেস দিয়ে রেখে দিয়ে খেতে খেতেই আগাগোড়া পড়ে ফেলল হোমস। বার দুয়েক আপন মনে মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে নিল।

তারপর পড়তে পড়তে বললে, ঠিকই আছে ওয়াটসন। শোনো, সবাই শুনে খুশি হবেন যে মি. লেসট্রেড, বিপুল অভিজ্ঞতাবলে পুলিশমহলে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ইনি তাঁদের অন্যতম, আর মি. শার্লক হোমস অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরূপে তিনি সর্বসাধারণের কাছে সুপরিচিত—এঁরা দুজনেই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই শোচনীয় পরিণতির মূলে পূর্ব পরিকল্পিত হত্যার প্রবৃত্তি নেই। নিছক উন্মত্ততা থেকেই নাকি এই বিচিত্র এবং আশ্চর্য ঘটনাবলির উদ্ভব হয়েছে। মানসিক গোলযোগ ছাড়া আর কিছু দিয়ে এই ঘটনার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ওয়াটসন, সংবাদপত্র হচ্ছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্র। নাড়াচাড়া করার কৌশলটুকু শুধু জানলেই হল। তোমার উদরদেব যদি শান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এবার দৌড়ানো যাক কেনসিংটন রোডে। হার্ডিং ব্রাদার্সের ম্যানেজারের বক্তব্য এখনও শোনা হয়নি।

এম্পোরিয়ামটি বিরাট হলেও প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক দেখতে খুবই ছোটোখাটো। বেশ চটপটে, চনমনে, চালাকচতুর। কথাবার্তায় হাবেভাবে অফুরন্ত প্রাণ রস যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ে। মাথাটি কিন্তু বেশ সাফ।

ইয়েস, স্যার, আজকের ইভনিং পেপারে সব পড়লাম। মি. হোরেস হার্কার আমার খদ্দের। মাস কয়েক আগে একটা মূর্তি তাকে বিক্রি করেছিলাম আমি। স্টেপনির গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে ও-রকম তিনটে মূর্তির অর্ডার দিয়েছিলাম। সবকটাই বেচে ফেলেছি। কাদেরকে? সেলস বই ঘেঁটে তা না হয় বলে দিচ্ছি। এই যে পেয়েছি। একটা তো জানেনই মি. হার্কারকে, আর একটা যোশিয়া ব্রাউনকে। মি. ব্রাউনের ঠিকানা, লেবারনাম লজ, লেবারনাম ভেল, চিজউইক। আর একটা মি. স্যান্ডি ফোর্ডকে। ঠিকানা, লোয়ার গ্রোভ রোড। না, না, ফটোগ্রাফ তো দূরের কথা, এ-রকম ধরনের লোককে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। এ-রকম কদাকার লোককে একবার দেখলে কি আর ভোলা যায় স্যার? আপনি কী বলেন? কর্মচারীদের মধ্যে ইটালিয়ান আছে কি না? তা, হ্যাঁ, আছে বই কী। টুকটাক কাজ আর ঝাড়ামোছা করার জন্য কয়েকজন আছে। ইচ্ছে করলে সেলস বুক খুলে তারা দেখতে পারে বই কী। খাতা খুলে দেখলেই-বা ক্ষতি কী? অত আর কে নজর রাখতে যায় বলুন। বাস্তবিকই তাজ্জব কাণ্ডকারখানা বটে! চালিয়ে যান তদন্ত। কোনো জবর খবর পেলে জানাতে ভুলবেন না আশা করি।

মি. হার্ডিংয়ের কথা শুনতে শুনতে কিছু কিছু পয়েন্ট লিখে নিচ্ছিল হোমস। দেখলাম, বেশ খুশি হয়ে উঠেছে ও। ঘটনার স্রোত ভালোর দিকেই চলেছে বলতে হবে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে কোনো মতামত প্রকাশ করলে না সে। শুধু বললে যে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি না-ফিরলে লেসট্রেডকে হয়তো বসে থাকতে হবে।

তাড়াতাড়ি করে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছেও অবশ্য দেখলাম লেসট্রেডকে রীতিমতো অসহিষ্ণুভাবে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে পায়চারি করতে। চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, সারাদিনের কাজ তার একেবারে বৃথা যায়নি।

আমাদের দেখেই থমকে গেল সে, কী খবর, মি. হোমস? বরাত খুলেছে নাকি?

ধীরেসুস্থে বলল হোমস, সারাদিন বড়ো খাটাখাটুনি গেছে। আর, দিনটা একেবারে বাজে যায়নি। খুচরো দোকানদার থেকে শুরু করে পাইকারি হারে মূর্তি তৈরির কারখানা পর্যন্ত সবই ঘুরে এলাম। এখন আমি গোড়া থেকে শুরু করে সবকটা মূর্তিই খুঁজে বের করতে পারি।

মূর্তি! চেষ্টা করে ওঠে লেসট্রেড। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার কাজ করার পদ্ধতি একেবারেই আপনার নিজস্ব এবং আমিও তা নিয়ে আপনাকে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে সারাদিনে আপনার চাইতে খাঁটি কাজ কিছু করতে পেরেছি আমি। মৃত লোকটাকে আমি শনাক্ত করেছি।

বল কী হে!

আর পেয়েছি তার খুন করার আসল কারণ।

চমৎকার।

আমাদের একজন ইনস্পেকটর স্যাক্সন ছিল আবার ইটালিয়ান কোয়ার্টার সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান রাখে। নিহত লোকটার গলায় ক্যাথলিক প্রতীক আর তার গায়ের রং দেখে আমার মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় দক্ষিণ দেশের। দেখামাত্র এক পলকেই ইনস্পেকটর ছিল তাকে চিনে ফেললে। লোকটার নাম পিয়েত্রো ভিনাসসি। জন্ম, নেপলস-এ। লন্ডনের কুখ্যাত গলাকাটাদের অন্যতম সে। মাফিয়ার সাথে জড়িত আছে পিয়েত্রো। মাফিয়া যে গুপ্ত রাজনৈতিক সংঘ তা তো আপনি জানেনই। ডিক্রি জারি করে খুনের পর খুন করে যায় এরা।

এখন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা দেখুন কীরকম পরিষ্কার হয়ে আসছে। খুন করে ফেরার লোকটাও ইটালিয়ান এবং মাফিয়ার সভ্য। যেকোনো রকমেই হোক, নিশ্চয় সংঘের নিয়ম ভঙ্গ করেছিল সে। পিয়েত্রোকে লাগানো হল তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। পকেটে ফটোগ্রাফটা দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত এই কারণে যে ভুল করে অন্য কাউকে না ছুরি মেরে বসে সে। লোকটার পিছু নিয়ে পিয়েত্রো দেখলে তাকে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে। কাজেই বাইরে ওত পেতে রইল সে। বেরোনোমাত্র শুরু হল ঝটাপটি। ফলাফল তো দেখতেই পেয়েছি। নিজেই কাবু হয়ে পড়ায় মরণঘা তাকেই খেতে হয়েছে। শুনতে কীরকম লাগছে, মি. হোমস?

তালি বাজিয়ে উৎসাহ দিয়ে সোল্লাসে বলল হোমস, শাবাশ, লেসট্রেড, শাবাশ কিন্তু তোমার ওই মূর্তি চুরমারের ব্যাখ্যাটা তো ঠিক ধরতে পারলাম না।

মূর্তি আর মূর্তি! মাথা থেকে কিছুতেই মূর্তিগুলোকে তাড়াতে পারছেন না। আরে, আসলে ওগুলো কিছু না। ছিঁচকে চুরি-খুব জোর হয়তো হবে ছ-মাসের জেল। খুনের মামলা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেছি ছিঁচকে চুরি নিয়ে নয়। আবার বলি শুনুন, মি. হোমস, সবকটা সূত্রই আমি জড়ো করে এনেছি আমার মুঠোর ভেতর।

তাহলে তোমার প্রোগ্রাম?

খুব সোজা। হিলকে নিয়ে সোজা যাব ইটালিয়ান কোয়ার্টারে। ফটোগ্রাফের সাথে মিলিয়ে লোকটাকে বার করে খেঁজার করব খুনের অপরাধে। আপনি আসছেন নাকি?

উঁহু, আমার আসা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, আরও সোজা পথে আমরা পৌঁছাতে পারি আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে। সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কেননা, সব কিছুই নির্ভর করছে এমন একটি বিষয়ের ওপর যা তোমার ইচ্ছার বাইরে। কিন্তু গভীর আশা আছে এবং তা এতই গভীর যে, তোমার সঙ্গেই বাজিও ফেলছি আমি। আজ রাতে যদি আমার সঙ্গে আসো লেসট্রেড, খুনিকে তুমি হাতেনাতে ধরতে পারবে বলেই আমি মনে করি।

ইটালিয়ান কোয়ার্টারে?

না। আমার ধারণা, চিজউইকের একটা ঠিকানায় তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজ রাতে যদি আমার সঙ্গে চিজউইক আসসা তুমি, কথা দিচ্ছি কাল তোমার সঙ্গে ইটালিয়ান

কোয়ার্টারে আমি যাবই। ওয়াটসন, ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ করো। একটা জরুরি চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। ঘণ্টা বাজাও। চটপট কাউকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো! এখনি।

বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই কয়েকটি ঘর ছিল আমাদের। হোমস এইখানেই ঢুকে কাগজ ঘাঁটতে বসল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে যখন সে নেমে এল তার দু-চোখে দেখলাম বিজয় উচ্ছ্বাস। মুখে কিন্তু সে নিজের গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কোনো কথাই বললে না। আগাগোড়া ওর তদন্ত পদ্ধতি দেখে এইটুকু বুঝেছিলাম যে হোমসের বিশ্বাস, বাকি দুজনে যাঁরা নেপোলিয়ানের ওই একই ছাঁচের মূর্তি কিনে নিশ্চিত মনে বসে রয়েছেন নিজের বাড়িতে, এবার জড়িয়ে পড়বেন রহস্যজালে। এঁদের মধ্যে একজনের বাড়ি চিজউইকে। বিদঘুটে খুনের আবির্ভাব ঘটবে এবার তারই বাড়িতে।

আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু কৌশলে খবরের কাগজ মারফত একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করার পেছনে হোমস-এর মূল উদ্দেশ্যটুকু অনুমান করে তার চাতুরির তারিফ না-করে পারলাম না। এসব পাগলের কাণ্ডকারখানা ভেবে আমরা যে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি—এই ধারণা নিয়ে নির্ভয়ে আমাদের শিকার বেরিয়ে পড়বে তার নৈশ অভিযানে। কাজেই হোমস যখন আমাকে রিভলভার নিতে বললে, মোটেই অবাক হলাম না। সে নিজেও তার প্রিয় হাতিয়ারও গুলিভরা হান্টিং ক্রপ তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিলে।

ঠিক রাত এগারোটার সময় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হ্যামারস্মিথ ব্রিজের অপর পাশে। গাড়োয়ানকে এখানেই দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম জনবিরল একটা রাস্তায়। নির্জন রাস্তা। কিন্তু দু-পাশের সারি সারি বাড়িগুলো ছবির মতো সুন্দর। প্রত্যেক বাড়ির সামনে খানিকটা খোলা জমি।

রাস্তার বাতির আলোয় একটা বাড়ির সামনে দেখলাম লেখা রয়েছে, লেবারনাম ভিলা। বাড়ির লোকে নিশ্চয় শুয়ে পড়েছিল, কেননা হলের দরজার সামনে একটা ফ্যানলাইট ছাড়া আর কোনো আলো কোথাও দেখলাম না। আলোটোর নিম্নেজ গোলাকার ছটা এসে পড়েছিল বাগানের রাস্তায়। রাস্তা আর লনের মাঝখানে কাঠের বেড়া। ঘন কালো ছায়া পড়েছিল ভেতরের দিকে। এইখানেই গা ঢাকা দিয়ে বসলাম সবাই।

ফিসফিস করে বললে হোমস, আমার তো মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। কপাল ভালো। বৃষ্টি হচ্ছে না এখন। তাহলে তো দুর্ভোগের শেষ থাকত না। দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। আমার তো ধারণা, এত কষ্ট আমাদের বৃথা যাবে না।

হোমসের কথা শুনে ভেবেছিলাম, না-জানি কতক্ষণ এভাবে কষ্টেসৃষ্টে গুঁড়ি মেরে বসে থাকতে হবে। কার্যকালে দেখা গেল কিন্তু এ-ভয় একেবারেই অমূলক। কেননা, আচম্বিতে এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে শেষ হল আমাদের প্রতীক্ষা।

চক্ষের পলকে, আমরা কিছু বোঝবার এবং সাবধান হবার আগেই নিঃশব্দে দু-হাট হয়ে খুলে গেল বাগানের দরজা। খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ একটা মূর্তি বানরের মতো দ্রুত আর ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে তিরবেগে ছুটে গেল বাগানের পথে। হলের দরজার ওপর থেকে যেটুকু আলো পড়ছিল তারই আবছা আভায় দেখলাম সাঁ করে মূর্তিটাকে সরে যেতে। পর মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল বাড়ির অন্ধকার ছায়ায়।

দীর্ঘ বিরতি। নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম আমরা। তারপরেই খুব মৃদু একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ভেসে এল আমাদের কানে।

জানলার পাল্লা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

তারপরেই থেমে গেল শব্দটা। আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। বুঝলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে লোকটা। ঘরের মধ্যে হঠাৎ চোরা লণ্ঠনের ঝলক দেখলাম। ঈঙ্গিত বস্তু নিশ্চয় পাওয়া গেল না সে-ঘরে, তাই আলোর চমক সরে গেল পাশের খড়খড়ির পেছনে, সেখান থেকে পরেরটায়।

ফিসফিস করে বললে লেসট্রেড, খোলা জানলাটার নীচে গিয়ে বসা যাক। নীচে নামলেই কাবু করে ফেলব।

কিন্তু আমরা ওঠবার আগেই আবার বেরিয়ে এল লোকটা। নিস্তেজ আলোটার তলায় আসতেই দেখলাম বগলের ফাঁকে সাদা মতো একটা জিনিস। জুলজুল করে চারপাশে

দেখতে দেখতে সাবধানে এগিয়ে এল সে। জনহীন রাস্তার শব্দহীনতায় যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল। আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে পড়ে বোঝাটা নামালে মাটিতে। পরমুহূর্তেই শুনলাম দমাস শব্দ, আর যেন অসংখ্য টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

নিজের কাজে এমন তন্ময় হয়ে ছিল সে যে পা টিপে টিপে ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল হোমস তার পিঠের ওপর এবং পর মুহূর্তেই আমি আর লেসট্রেড তার কবজি দুটো চেপে ধরে এঁটে দিলাম হাতকড়া।

হেঁচকা টানে ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম তার মুখ। কুৎসিত, পানসে হলদেটে রং। জিঘাংসা ভরা জ্বলন্ত দৃষ্টি আমাদের ওপর মেলে ধরে ছটফট করছিল সে কঠিন বন্ধনের মধ্যে। এক নজরেই চিনতে পারলাম তাকে। ফটোগ্রাফে দেখা মুখের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এ-মুখ।

হোমস কিন্তু এত কষ্টে ধরা লোকটার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সতর্ক চোখে যা পরীক্ষা করছিল, তা একটু আগেই এই কুৎসিত লোকটা বয়ে নিয়ে এসেছে বাড়ির মধ্যে থেকে। এটাও নেপোলিয়নের মূর্তি। সকালে যেমনি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছত্রাকার হয়ে পড়ে ছিল চারিদিকে। তন্ময় হয়ে একটার পর একটা টুকরো আলোর সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল হোমস। কিন্তু প্লাস্টারের কোনো টুকরোটাই বোধ হয় তার মনে ধরল না। পরীক্ষা তার সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় হল ঘরের আলো জ্বলে উঠল, খুলে গেল

দরজা । শার্ট আর ট্রাউজার্স পরনে হাসিখুশি গোলগাল চেহারার বাড়ির মালিক বেরিয়ে এলেন বাইরে ।

মি. যোশিয়া ব্রাউন? শুধোল হোমস ।

ইয়েস স্যার । আপনি তাহলে মি. শার্লক হোমস? আপনার জরুরি চিঠি আমি পেয়েছিলাম, মি. হোমস । যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনটি করেছি । ভেতর থেকে প্রতিটি দরজা তালা এঁটে অপেক্ষা করছিলাম কী হয় তা দেখবার জন্যে ।

লেসট্রেড কিন্তু রাসকেলটিকে নিরাপদ জায়গায় চালান করবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল । কাজেই মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি এসে পৌঁছোননার পর চারজনে মিলে রওনা হলো লন্ডনের দিকে ।

মুখ টিপে সমস্ত পথ গেল লোকটা, একটা কথাও বার করা গেল না তার পেট থেকে । ঝকড়া ঝকড়া চুলের তলা থেকে বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখ মেলে আগাগোড়া তাকিয়ে রইল আমাদের পানে । একবার শুধু আমার হাতটা নাগালের মধ্যে আসতেই খ্যাক করে কামড় বসাতে চেষ্টা করলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো । পুলিশ স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর জানলাম, লোকটার জামাকাপড় তল্লাশি করে কয়েকটা শিলিং আর দু-মুখো ধারালো একটা ছোরা ছাড়া আর অন্য কিছুই পাওয়া যায়নি । ছোরাটার হাতলে রক্তের চিহ্ন দেখা গেছে এবং সে বেশি পুরোনো নয় ।

যাবার সময়ে লেসট্রেড বললে, আর কোনো গোলমাল নেই, মি. হোমস। হিল এদের সম্বন্ধে খবরাখবর কিছু রাখে, কাজেই ওর নামটা তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবেখন। আমার মাফিয়া থিয়োরি যে নির্ভুল, তার প্রমাণ আপনি পাবেন। কিন্তু আপনার কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ মি. হোমস। বেশ কায়দা করে পাকড়াও করলেন বটে হতভাগাটাকে। কী করে যে করলেন, তা অবশ্য এখনও বুঝে উঠলাম না।

হোমস বললে, এত রাতে সেসব আলোচনা আর নাই-বা করলাম। তা ছাড়া, এখনও দু-একটা ছোটো জিনিস বাকি রয়েছে। তুমি তো জানই লেসট্রেড, কতকগুলো কেসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ না-করলে মোটেই আনন্দ পাওয়া যায় না-এ-কেসটি সেই ধরনের। তুমি যদি কাল ছ-টায় আর একবার বেড়াতে বেড়াতে চলে আস আমার ওখানে, তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব যে এখনও পর্যন্ত এ-ব্যাপারটা আগাগোড়া কোনো অর্থই ধরতে পারনি তুমি।

পরের দিন সন্ধ্যায় লেসট্রেডের কাছে শুনলাম বেঞ্জো সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে ফেলেছে সে! লোকটার পুরো নাম অবশ্য জানা যায়নি। বেঞ্জো নামেই পরিচিত সে। ইটালিয়ান কলোনিতে এক ডাকে সবাই চেনে এবং জানে যে, নিরাঞ্জাট জীবন সে কোনোদিনই কাটায়নি। এক সময়ে কুশলী ভাস্কর হিসেবে সুনাম ছিল তার। সৎপথে রোজগারও করেছে বহুদিন। তারপর এল সে পাপের পথে। ফলে দু-দুবার দাঁড়াতে হল কাঠগড়ায়। একবার ছিঁচকে চুরির জন্যে। দ্বিতীয়বারের কারণটা আমরা আগেই শুনেছি-জাতভাইকে ছুরি মারার অপরাধে। ইংরেজি চমৎকার বলতে পারে সে। কিন্তু বেধড়ক মূর্তি ধ্বংস করার কারণটা কিছুতেই বার করা গেল না তার পেট থেকে। কোনোদিক থেকেই এ-

সম্পর্কে শেষ খবর জানা যায়নি এখনও। পুলিশ অবশ্য জেনেছে যে মূর্তিগুলোর সৃষ্টি খুব সম্ভব বেপ্লোর হাতেই। কেননা গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে এই জাতীয় কাজ তাকেই করতে হলো।

অবশেষে শেষ হল লেসট্রেডের বক্তৃতি। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে হোমস। চিক চিক করে উঠল তার চোখের মণি সদর দরজায় ঘণ্টাধ্বনির শব্দ শুনে। এক মিনিট পরেই পায়ের শব্দ শুনলাম সিঁড়িতে। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ়। লাল মুখ। কঁচাপাকা ধোঁয়াটে জুলপি। ডান হাতে পুরানো আমলের কার্পেটের ব্যাগটাকে টেবিলে রেখে শুধোলেন ভদ্রলোক, মি. শার্লক হোমস। এখানে আছেন কি?

মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বললে হোমস, মি. স্যান্ডিফোর্ড? রিডিং থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, আপনার চিঠি আমি এনেছি। লিখছেন, ডিভাইনের তৈরি নেপোলিয়নের একটা মূর্তি আমার দরকার। আপনার কাছে যেটা আছে, তার জন্য দশ পাউন্ড দিতে রাজি আমি। ঠিক আছে তো?

নিঃসন্দেহে।

আপনার চিঠি পেয়ে বাস্তবিকই অবাক হয়ে গেলাম। দেখুন, আমি খুবই গরিব হতে পারি, কিন্তু অসাধু নই। আপনার কাছ থেকে দশ পাউন্ড নেওয়ার আগে তাই আমার মনে হয় আপনার জানা দরকার যে মাত্র পনেরো শিলিং দিয়ে মূর্তিটা কিনেছিলাম আমি।

আপনার মতো সৎ লোকের পক্ষেই এমন সংকোচ মানায়, মি. স্যান্ডিফোর্ড। কিন্তু যখন আমি দশ পাউন্ড দেব বলে কথা দিয়েছি, তখন আর তার নড়চড় হবে না।

আপনার উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন, মি. হোমস। চিঠিতে লেখা মূর্তি আমি সঙ্গে এনেছি। এই দেখুন।

ব্যাগ খোলার পর শেষ পর্যন্ত একটা আস্ত নেপোলিয়নের মূর্তি দেখতে পেলাম চোখের সামনে। এর আগে বার বার দেখেছি রাশি রাশি ভাঙা টুকরো। আভাঙা নমুনা দেখার সৌভাগ্য হল এই প্রথম।

হোমস পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলে। তারপর দশ পাউন্ডের নোট টেবিলে রেখে বললে, মি. স্যান্ডিফোর্ড, কিছু মনে করবেন না। এঁরা সাক্ষী রইলেন, এই কাগজটায় একটা সই দিয়ে দিন। মূর্তির সর্বস্বত্ব যে আমি কিনে নিলাম, এইটুকুই শুধু লেখা আছে কাগজটায়। আমি একটু আটঘাট বেঁধে কাজ করি, মি. স্যান্ডিফোর্ড। সই দিতে বলছি সেই কারণেই। পরে কী ঘটবে-না-ঘটবে তা তো আপনি জানেন না। ধন্যবাদ মি. স্যান্ডিফোর্ড। টাকাটা নিয়ে নিন। আচ্ছা, গুড ইভনিং।

মি. স্যাভিফোর্ড অদৃশ্য হওয়ামাত্র হোমসের কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম।
ড্রয়ারের ভেতর থেকে এক টুকরো সাদা কাপড় বার করে প্রথমে সে বিছিয়ে নিলে
টেবিলের ওপর। তারপর সযত্নে সদ্য পাওয়া নেপোলিয়নের মূর্তিটাকে বসালে কাপড়ের
ঠিক মাঝখানে। সবশেষে হান্টিং ক্রপটা দিয়ে মোক্ষম একটা ঘা মারলে নেপোলিয়নের
ঠিক মাথার ওপর।

চুরমার হয়ে গেল মূর্তিটা। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাপড়টার মধ্যে। হোমস
সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ল এই ধ্বংসাবশেষের ওপর।

পরমুহূর্তেই, জয়ের আনন্দে তীব্র চিৎকার করে একটা টুকরো তুলে ধরল আমাদের
দিকে-পুডিংয়ের মধ্যে কিশমিশের মতো কালো একটা গোলাকার বস্তু আটকে ছিল
তাতে।

সোল্লাসে চেষ্টা করে উঠল সে, আসুন, আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই বর্জিয়ার ১৩
বিখ্যাত কালো মুক্তোর সাথে।

মুহূর্তের জন্য আমি আর লেসট্রেড বসে রইলাম নিশ্চুপ হয়ে। তারপরেই ঠিক রসঘন
নাটকের চরম মুহূর্তের ধাপে ধাপে পৌঁছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ভেঙে পড়লাম ঘন ঘন
হাততালিতে। লাল হয়ে উঠল হোমসের পাগুর গাল। মাথা নীচু করে আমাদের
অভিবাদন জানালে সে।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে শুরু করল হোমস, পৃথিবীতে যত নামকরা মুক্তো। বর্তমান আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল বর্জিয়ার মুক্তো। অনেকদিন আগে ডেকার হোটেলে কোলোন্নার যুবরাজের শোবার ঘরে হারিয়ে গিয়েছিল মুক্তোটা। আমার পরম সৌভাগ্য, সেই হারানো মুক্তোটাই আজ খুঁজে পেলাম স্টেপনির গেলডার অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি ছ-টি নেপোলিয়নের মূর্তির সর্বশেষটির মধ্যে।

লেসট্রেড, তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে কীরকম সাড়া পড়ে গেছিল এই মূল্যবান রত্নটি অদৃশ্য হওয়ার পর। লন্ডন পুলিশ বৃথাই চেষ্টা করেছিল এর হদিশ পাওয়ার। আমার কাছ থেকেও পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনোরকম আলোকপাত করতে পারিনি আমি। যুবরানির একজন ইটালিয়ান পরিচারিকা ছিল। সন্দেহ এসে পড়ল তার ওপর। লন্ডনে একজন ভাই ছিল বটে, কিন্তু ভাইবোনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বার করা সম্ভব হয়নি। পরিচারিকার নাম ছিল লুক্রেতিয়া ভেনাসসি। এই লুক্রেতিয়ার ভাই পিয়েত্রোই যে দু-দিন আগে খুন হয়েছে, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। পুরানো কাগজ ঘেঁটে দেখলাম, ছুরি মারার অপরাধে বেপ্পো গ্রেগোর হওয়ার ঠিক দুদিন আগে উধাও হয়েছে মুক্তোটা। বেপ্পো গ্রেগোর হয়েছে ঠিক তখনই যখন গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে নেপোলিয়নের ছটা মূর্তি তৈরি হচ্ছিল। বুঝতেই পারছ তারপর যা ঘটেছে। আমাকে অবশ্য উলটো দিক থেকেই সব বুঝতে হয়েছে। মুক্তোটা বেপ্পোর কাছেই ছিল। কী করে তার কাছে এসেছে, তা অবশ্য জানি না। পিয়েত্রোর কাছ থেকে চুরি করতে পারে সে, পিয়েত্রোর সঙ্গী হতে পারে সে, অথবা পিয়েত্রো আর লুক্রেতিয়ার মধ্যে সূত্রও হতে পারে। সে যাই হোক না কেন, তা জেনে আসল সমস্যার এতটুকু সমাধান করতে পারব না।

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে মুক্তটা তার কাছেই ছিল। এবং ঠিক সেই সময় পুলিশ পিছু নেয় তার। যে-কারখানায় সে কাজ করত, তাড়া খেয়ে সেখানে পৌঁছে ঝটপট একটা কিছু ভাবতে বসল বেপ্পো। কয়েক মিনিট মাত্র সময়। এই সময়ের মধ্যে মহা মূল্যবান পাথরটাকে কোথাও লুকোতে না-পারলে চিরকালের মতো তা হারাতে হবে। একবার দেহ তল্লাশ করলেই পুলিশের হাতে চলে যাবে কষ্টে পাওয়া জিনিসটা। ছ-টা নেপোলিয়নের মূর্তি শুকোচ্ছিল। একটা তখনও শক্ত হয়ে যায়নি। চকিতে কুশলী কারিগর বেপ্পো একটা মূর্তির ভিজে প্লাস্টারের মধ্যে ছোট্ট একটা ফুটো করে মুক্তোটাকে চালান করে দিল ভেতরে। হাতের দু-এক টানেই গর্ত বুজে গেল-আর পাঁচটা থেকে কোনো পার্থক্যই রইল না। এত অল্প সময়ে এমন চমৎকার লুকোনোর জায়গা বার করার জন্য তার তারিফ করি আমি। মূর্তি ভেঙে মুক্তো বার করার কল্পনা কারো মাথাতেও আসবে না। কিন্তু বিচারে এক বছরের জেল হয়ে গেল বেপ্পোর। ইতিমধ্যে লন্ডনে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল মূর্তি ছ-টা। ঠিক কোনটার মধ্যে যে মুক্তোটা আছে, তা সে নিজে জানত না। প্রত্যেকটা মূর্তি ভেঙে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঝাঁকানি দিলেও বোঝা সম্ভব নয়, কেননা ভিজে প্লাস্টারের গায়ে মুক্তোটা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, হয়েছেও তাই।

যাই হোক, দমে যাওয়ার পাত্র নয় বেপ্পো। অধ্যবসায় আর সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিয়ে শুরু হল তার তল্লাশ পর্ব। গেলডার অ্যান্ড কোম্পানিতে তার এক খুড়তুতো ভাই কাজ করত। তার মারফত সে জানতে পারলে কোন কোন দোকান মূর্তিগুলো কিনে নিয়ে গেছে। মর্স হাডসনের দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হল না তার পক্ষে। ফলে

তিনটে মূর্তির হদিশ বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুক্তো পাওয়া গেল না। তারপর কোন ইটালিয়ান কর্মচারীর সাথে যোগসাজশ করে বাকি তিনটে মূর্তির ঠিকানাও নিলে সে। প্রথমটা ছিল হার্কারের কাছে। সেখানে পিছু নিলে তার কুকাজের সঙ্গী পিয়েত্রো। মুক্তো হারানোর জন্যে বেপ্পোকে দায়ী করতেই বচসা শুরু হল। তারপর হাতাহাতি। সব শেষে বেপ্পোর ছুরিতে পিয়েত্রোর জীবন লীলা সাজ হল।

প্রশ্ন করলাম, পিয়েত্রো যদি বেপ্পোর কুকাজের সঙ্গীই হয়, তাহলে তার ফটোগ্রাফ নিয়ে ঘুরবে কেন?

তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে বেপ্পোকে খুঁজে বার করার জন্যই ফটোটা রেখেছিল সে। এ ছাড়া আর কোনো কারণই নেই। সে যাই হোক, ভেবেচিন্তে দেখলাম, খুনের পর আর অযথা দেরি না-করে চটপট কাজ সারার চেষ্টা করবে বেপ্পো। পুলিশ গোপন কথা জেনে ফেলতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার প্ল্যান করলে সে। পুলিশ কিছু জেনে ওঠার আগেই কাজ শেষ করে যাতে গা ঢাকা দিতে পারে। অবশ্য হার্কারের মূর্তির মধ্যে মুক্তোটা পাওয়া গেছে কি না তা জানতাম না আমি। জিনিসটা মুক্তো কিনা সে-বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত হতে পারিনি। সে যে মূর্তি চুরমার করেছে মূর্তির মধ্যে লুকানো অন্য কিছুর জন্য, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। মূর্তিটাকে অতটা বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের মধ্যে বাতির তলায় চুরমার করেছে দেখেই তা বুঝেছিলাম। বাকি তিনটে মূর্তির মধ্যে হার্কারের মূর্তিটা অন্যতম ছিল বলেই সাহস করে বাজি রাখতে পেরেছিলাম তোমার সাথে। দুটো মূর্তি তখনও বাকি। লন্ডনে যেটা আছে, প্রথমেই সেটা চুরমার হবে, তা বুঝেই বাড়ির লোকদের আমি আগে

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

থাকতেই সাবধান করে দিলাম যাতে আবার খুনখারাপির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তারপর গেলাম। ফলে লেসট্রেড পেল পিয়েত্রোর খুনিকে। আমি কিন্তু ততক্ষণে জেনে গেছি যে বর্জিয়ার মুক্তোর পেছনেই ধাওয়া শুরু হয়েছে আমাদের। নিহত লোকটার নাম জানার ফলেই দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ পেয়ে গেলাম। বাকি রইল শুধু একটা মূর্তি-রিডিং-এর মি. স্যান্ডিফোর্ডের মুক্তো সেখানেই আছে জেনে আনবার ব্যবস্থা করলাম। তোমাদের সামনেই তো পৌঁছেছে আমার টেবিলে এবং এই সেই বর্জিয়ার মুক্তো।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম সবাই।

টীকা

কালাপাহাড়ের কাণ্ড নয় : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়ন স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের মে ১৯০৪ সংখ্যায় এবং কলিয়ার্স উইকলির ৩০ এপ্রিল ১৯০৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

ডিভাইন : গবেষকরা মনে করেন ফ্রান্সে বসবাসকারী বেলজিয়ান ভাস্কর পল ডি ভিন (১৮৪৩-১৯০১) অথবা ইংরেজ ভাস্কর জেমস এস. ডি. ভিল (১৭৭৬-১৮৪৬)-এর আদলে এই নামটি লেখক গল্পে ব্যবহার করেছেন।

idce fixe : কোনো ভাবনা বা চিন্তাধারা মনে গেঁথে যাওয়ার ফরাসি প্রতিশব্দ। মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সংজ্ঞা।

সেন্ট্রাল প্রেস সিভিকেট : কাল্পনিক নাম। বাস্তবে একটি সংবাদ সংস্থা ছিল সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি নামে।

হার্ডিং ব্রাদার্স : মেট্রোপলিটান অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট রেলওয়ে স্টেশনের লাগোয়া ১২৩-১২৭, কেনসিংটন হাই স্ট্রিটে এই ধরনের একটি দোকান ছিল, যার নাম পন্টিং ব্রাদার্স।

নিহিলিস্ট : নিহিল শব্দের অর্থ নাই। শব্দটির প্রচলন মধ্যযুগ থেকে, কিন্তু জনপ্রিয় হয় ১৮৬২-তে প্রকাশিত আইভ্যান তুর্গেনিভের উপন্যাস ফাদার্স অ্যান্ড সন্স-এ আলোচিত হওয়ার পর। তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল নিহিলিস্টদের। কোনো সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্কে এদের বিশ্বাস ছিল না।

বেরড রিপাবলিকান : ফরাসি বিপ্লবের র্যাডিক্যাল নেতাদের ব্যবহৃত লাল রঙের জন্য তাদের এই নামে অভিহিত করা হত।

একে একে পেরিয়ে গেলাম : হোমস-গবেষক জেমস এডওয়ার্ড হলরয়েড জানিয়েছেন কেনসিংটন থেকে স্টেপনি যেতে হলে লন্ডনের এই অঞ্চলগুলি পার হওয়ার দরকার পড়ে না। এই জায়গাগুলি টেমস নদীর উত্তরে অবস্থিত। আর হোমসের গন্তব্যের সোজা

পথ গিয়েছে নদীর দক্ষিণ দিক ধরে। প্রাচীন লন্ডন শহরের বা হোমসের সমসাময়িক লন্ডন শহরের যে রোড-মাপ পাওয়া যায়, তা থেকে এই যাত্রাপথ বা অন্যান্য কাহিনিতে হোমসের বিচরণ-পথ সামান্য হলেও বোঝানো যেতে পারত। কিন্তু লন্ডন শহরের রাস্তাঘাট স্বচক্ষে দেখা না-থাকলে বর্তমানের সঙ্গে সেই মানচিত্রের যোগাযোগ সাধন করা দুষ্কর।

পদবি জানি না : ম্যানেজার কর্মচারীর পদবী জানে না, অথচ মাইনের খাতায় বেপ্লোর নাম আছে। সেখানে পদবী লেখা নেই, তা অবিশ্বাস্য।

স্যাফ্রন হিল : লন্ডন শহরের প্রধান দুটি ইতালিয়ান অধ্যুষিত এলাকা হল হলবর্ন এবং সোহোএদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম হলবর্নকে স্যাফ্রন হিল বলা হত।

মাফিয়া : শেষ মধ্যযুগে ইতালির সিসিলিতে বিদেশি আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে স্থানীয় জমিদারদের গড়ে তোলা ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী পরবর্তীকালে পরিণত হয় সংঘবদ্ধ অপরাধীদের জোট হিসেবে। মাফিয়া শব্দের অর্থ আশ্রয়।

প্রিয় হাতিয়ার : এই গল্প ছাড়া রেড-হেডেড লীগ এবং আ কেস অব আইডেন্টিটি গল্পে হোমসকে এই হাতিয়ার সঙ্গে রাখতে দেখা গিয়েছে।

বর্জিয়া : বর্জিয়া বংশ মূলত স্পেন দেশীয় হলেও এরা বহুকাল ইতালি শাসন করেছে। ভ্যালেন্সিয়ার কার্ডিনাল আর্চবিশপ আলফেসো ডি বোর্জা (১৩৭৮-১৪৫৮) পোপ নির্বাচিত

হন ১৪৫৫ সালে। তিনি ছিলেন পোপ তৃতীয় কালিক্সটাস। ১৪৯২-এ তাঁর ভাইপো রডরিগো হন পোপ চতুর্থ আলোকজান্দার। তার একাধিক অবৈধ সন্তানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সিজার এবং লুক্রেজিয়া। সিজার প্রথম দিকে চার্চে যোগদান করলেও পরে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং ফ্রান্সের দ্বাদশ লুইয়ের সঙ্গে যোগসাজশে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসন করায়ত্ত করেন। সিজারের মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার ভাই লুক্রেজিয়া-ও।

কোলোম্নার যুবরাজ : এই কাহিনির ঘটনাকালে কোলোম্নার দুজন যুবরাজ জীবিত ছিলেন। তারা হলেন ফ্যাব্রিজিও অব আভেলা এবং প্রসপেরো অব সন্নিনো।

বুটলে বুড়োর বুটফি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য উড বিল্ডার]

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মাত্র কয়েক মাস হল অজ্ঞাতবাস সাঙ্গ করে ঘরে ফিরেছে হোমস। আমিও তার অনুরোধে প্র্যাকটিস বেচে দিয়ে ফিরে এসেছি বেকার স্ট্রিটের পুরোনো বাড়িতে। চেয়ারে কাত হয়ে বসে হোমস অসলভাবে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে সকালের কাগজে। এমন সময়ে দুজনেই সজাগ হয়ে উঠলাম সদর দরজায় দারুণ জোরে ঘণ্টা বাজানোর শব্দে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে দুমদাম ঢাক পিটোনের মতো শব্দ-কেউ যেন আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াতে না-পেরে দমাদম ঘুসি মেরে চলেছে দরজার পাল্লার ওপর। দরজা খোলার সঙ্গেসঙ্গে তিরবেগে সে ছুটে গেল হল ঘরের মধ্যে দিয়ে, তার পরেই সিঁড়ির ওপর খটাখট জুতোর আওয়াজ একসঙ্গে কয়েকটা ধাপ উপকে লাফিয়ে উঠলে যেমন হয় এবং পরমুহূর্তেই ফ্লিগের মতো ঘরে ঢুকল একটি তরুণ। বিস্ফারিত চোখ, পাঙাশপানা মুখের রং, উশকোখুশকো মাথার চুল। হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দুজনের মুখের ওপর বারকয়েক চোখ বুলিয়েই তরুণটি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিদেখে। এ-রকম অশোভনভাবে ঘরে ঢোকাটা খুবই অন্যায় এবং এজন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত মনে করেই চেষ্টা করে উঠল, আমি দুঃখিত, মি. হোমস। পাগল হতে আমার আর বাকি নেই। মি. হোমস, আমিই হতভাগ্য হেক্টর ম্যাকফারলেন। এই মুহূর্তে লন্ডনের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোক আমিই। দোহাই মি. হোমস, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না! আমার গল্প শেষ করার আগেই যদি ওরা এসে পড়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে, ওদের কিছুক্ষণ আটকে রেখে আমাকে

অকপটে যা সত্য তা বলবার সুযোগ দিন। আপনি যে আমার হয়ে তদন্তে নেমেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমি খুশিমনে হাজতে যেতে রাজি আছি।

থ্রেপ্তার করতে আসছে আপনাকে? শুনে খুবই সুখী-দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। কী চার্জে আপনাকে থ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলুন তো?

লোয়ার নরউড-এর মি. জোনাথান ওলডাকারকে খুন করার চার্জে।

কাঁপা হাতে হোমসের হাঁটু থেকে ডেলি টেলিগ্রাফটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল ম্যাকফারলেন।

এই জায়গাটায় চোখ পড়লেই আপনি বুঝতে পারতেন স্যার কী জন্যে সকাল বেলাই এসে পৌঁছেছি আপনার কাছটিতে। লোকের মুখে মুখে এখন ঘুরছে আমার নাম আর আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনি। মাঝখানের পাতাটা খুলে ধরল ম্যাকফারলেন। এই যে, কিছু মনে করবেন না স্যার। আমিই পড়ে শোনাচ্ছি। হেডলাইন দিয়েছে : লোয়ার নরউডে রহস্যজনক ব্যাপার। প্রখ্যাত স্থপতির অন্তর্ধান। হত্যা এবং গৃহদাহের সন্দেহ। কে হত্যাকারী? একটি সূত্র। মি. হোমস এই সূত্র ধরেই ওরা এগিয়ে আসছে এবং আমি জানি শেষ পর্যন্ত থ্রেপ্তার হতে হবে আমাকেই। লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে ওরা পিছু নিয়েছে আমার আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুধু থ্রেপ্তারি পরোয়ানাটা বার করার জন্যই ওরা যা সময় নিচ্ছে। ওঃ, মি. হোমস, এ-খবর শুনলে আমার মা... আমার মায়ের মন

একেবারেই ভেঙে যাবে-কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না উনি। ভয়ে বেদনায় দু-হাত কচলাতে কচলাতে সামনে পেছনে দুলতে লাগল ম্যাকফারলেন।

ভালো করে তাকালাম তার দিকে। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত সে। কিন্তু তার সোনালি চুলে সুন্দর চেহায়ায়, নীল নীল ভয়াত চোখে এবং পরিষ্কার দাড়ি গোঁফ কামানো মুখে দুর্বল ভাবাবেগের চিহ্ন। বয়স তার খুব জোর বছর সাতাশ, জামাকাপড় হাবভাব বেশ ভদ্রলোকের মতোই।

হোমস বললে, যেটুকু সময় এখন আছে তার সদ্যবহার করা যাক। ওয়াটসন, কাগজটা তুলে প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ে শোনাও তো ভাই।

জমকালো শিরোনামার নীচেই পড়লাম ইঙ্গিতময় সুদীর্ঘ খবর:

গতকাল গভীর রাতে লোয়ার নরউড-এ এক গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। মি. জোনাথ ওলডাকার শহরতলির এই অঞ্চলের বহু দিনের বাসিন্দা এবং সকলকেই তাঁহাকে চেনে। বহু বছর ধরিয়া স্থপতি ব্যবসা করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন। মি. ওলডাকার চিরকুমার। তাঁহার বয়স বাহান্ন বছর। সিডেনহামের প্রান্তে ডীপ হাউসে তাহার নিবাস। রাস্তার নামকরণও তাঁহার বাড়ির নাম অনুসারে হইয়াছে। উকট খামখেয়াল স্বভাবের জন্য ওলডাকারের কিঞ্চিৎ নামডাক আছে। প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অবসর জীবনযাপনেই তিনি অভ্যস্ত। সারাজীবন তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। এবং সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বছর হইল ব্যবসা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তিনি

সরাইয়া আনিয়াছিলেন। বাড়ির পিছনে কাঠের বরগার ক্ষুদ্র একটি স্তূপ কিন্তু আর সরানো হয় নাই। তাহার এই কাঠের স্তূপেই নাকি আগুন লাগিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দমকল আসিয়া পৌঁছাইলেও কিন্তু আগুন বন্ধ করা গেল না। কাঠের বরগাগুলি এমনই শুষ্ক ছিল যে, দমকল বাহিনীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ভূপটি পুড়িয়া একেবারেই ছাই হইয়া যায়। এই পর্যন্ত সকলেই অগ্নিকাণ্ডটিকে নিছক দুর্ঘটনা ভাবিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই গুরুতর অপরাধ সংঘটনের চিহ্ন পাওয়া গেল। আগুন জ্বলার সময়ে বাড়ির মালিককে ধারেকাছে কোথাও দেখিতে না-পাওয়ায় সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। এখন দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার বাড়ি হইতে বেমালুম উধাও হইয়াছেন। ঘর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, রাত্রে তিনি শয্যা স্পর্শ করেন নাই। শয়নকক্ষের আয়রনসেফটি খোলা এবং ঘরময় বহু মূল্যবান কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত। আরও চিহ্ন পাওয়া গেল-ঘরে যেন একটি মরণ-যুদ্ধ, একটি খণ্ড-প্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। সামান্য রক্তের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। একটি ওক কাঠের বেড়াইবার ছড়ির হাতলে রক্তের দাগ দেখা গিয়াছে। প্রকাশ, সেদিন বেশি রাত্রে শয়নকক্ষে মি. ওলকার এক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ছড়িটি তাহারই। ইনি লন্ডনের একজন তরুণ সলিসিটর, গ্রেহাম হ্যান্ড ম্যাকফারলেন, ৪২৬ গ্রেস্যাংস বিল্ডিংস, ই. সি.র জুনিয়র পার্টনার, নাম-জন হেঙ্কর ম্যাকফারলেন। পুলিশের বিশ্বাস, প্রমাণাদি যা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া অনায়াসেই অপরাধের একটা বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসংগত মোটিভ খাড়া করা চলে। পরিণামে, অত্যন্ত শিহরনমূলক তথ্যাদি প্রকাশ পাইবে।

পরের খবর।-প্রেসে আসিবার সময়ে জোর গুজব শুনিলাম যে মি. জোনাস ওলডাকারকে হত্যার অভিযোগে মি. জন হেঙ্কর ম্যাকফারলেনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। অন্ততপক্ষে

গ্রেগারি পরোয়ানা যে বাহির হইয়াছে, এ-বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। নরউড-তদন্তের ফলে আরও কুটিল তথ্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। হতভাগ্য স্থপতির রুমে ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছাড়াও এখন জানা গিয়াছে যে, একতলার ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলিও উন্মুক্ত ছিল। হিচডাইয়া জানলার মধ্য দিয়া কাঠের সূপ পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং কাঠকয়লা ও ছাইগাদার মধ্যে পোড়া দেহাবশেষ দেখা গিয়াছে। পুলিশের ধারণা যে, অতি চাঞ্চল্যকর একটি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। হতভাগ্য স্থপতিকে তাঁহার শয়নকক্ষে পিটাইয়া হত্যা করার পর কাগজপত্র লুণ্ঠ করা হইয়াছে এবং হত্যার সব চিহ্ন মুছিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার মৃতদেহকে টানিয়া কাঠের পে ফেলিয়া আগুন দিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্বনামধন্য ইনস্পেকটর লেসট্রেডের হাতে তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ক্ষিপ্ততা ও উৎসাহ সহকারে সূত্র অনুসরণ করিয়া কাজ প্রায় সারিয়া আনিয়াছেন।

দু-চোখ মুদে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে হোমস একমনে শুনছিল এই বিচিত্র কাহিনি!

আমি থামলে পর অভ্যাসমতো অলস সুরে বললে, বাস্তবিকই বড়ো আজব কেস হে, বেশ কয়েকটা ভাববার মতো পয়েন্ট আছে। ভালো কথা মি. ম্যাকফারলেন, যা শুনলাম তাতে তো দেখছি যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার বলেই আপনার এতক্ষণে গ্রেগার হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখনও ধরা পড়েননি কেন বুঝলাম না তো?

মি. হোমস, আমার বাড়ি ব্লাকহিদের টরিংটন লজে। আমার বাবা মা-ও থাকেন সেখানে। কিন্তু গতরাতে মি. জোনাস ওলডাকারের সঙ্গে আমার কিছু কাজ থাকায় নরউডের

একটা হোটেলে আমায় রাত কাটাতে হয়েছিল। আজ সকালে ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি। ট্রেনে উঠেই কাগজে চোখ বুলোতে গিয়ে জানতে পারলাম সব। তখুনি বুঝলাম কী বিষম বিপদে পড়েছি সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে। কাজেই, আর এক সেকেন্ডও দেরি না-করে সিধে চলে এলাম আপনার কাছে আপনার সাহায্যের জন্যে! বেশ জানতাম, বাড়ি অথবা অফিস-এই দু-জায়গার কোনোটিতে গেলে থ্রেপ্তার হতাম আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লন্ডন ব্রিজ স্টেশন থেকে আমার পিছু নিয়েছে একটা লোক! বেশ বুঝছি-গ্রেট হেভেন, ও কী?

সদর দরজায় ঘটাং করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সিঁড়ির ওপর শুনলাম ভারী জুতোর শব্দ। পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকল বন্ধুবর লেসট্রেড। কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলাম পেছনে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ।

ঘরে ঢুকেই পুলিশি হুংকার ছাড়ল লেসট্রেড, মি, জন হেক্টর ম্যাকফারলেন!

আমাদের ক্লায়েন্ট বেচারি রক্তশূন্য মুখে উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে।

লোয়ার নরউডের মি. জোনাস ওলডাকারকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগে আপনাকে থ্রেপ্তার করছি।

হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকাল ম্যাকফারলেন। তারপর ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে এমনভাবে গা এলিয়ে দিলে যেন এইমাত্র গিলোটিনের নীচে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার।

হোমস বলল, এক সেকেন্ড, লেসট্রেড! আধ ঘণ্টার এদিক-ওদিক হলে তোমার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ভদ্রলোক সব আদ্যোপান্ত বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হলে তুমি। ঐর মুখে ঘটনাটা আগাগোড়া শুনলে আমার তো মনে হয় লেসট্রেড তোমার আমার দুজনেরই উপকার হবে তাতে।

গুম হয়ে বলল লেসট্রেড, শুনলেই-বা কী, না-শুনলেই-বা কী। জট ছাড়ানোর কোনো অসুবিধেই আমার হবে না।

তাহলেও লেসট্রেড, তোমার অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোকের মুখেই আমি এ-ঘটনার পুরো বিবরণটা শুনতে চাই।

বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন আর না বলব না। অতীতে বারদুয়েক ফোর্সকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আপনি। আপনার ঋণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তবু মি, ম্যাকফারলেন যা বলবেন, আমার সামনেই বলতে হবে এবং এ-ও জানিয়ে দিচ্ছি, তিনি যা কিছু বলবেন, সবই প্রমাণ হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগাব আমরা।

ম্যাকফারলেন বলল, আমিও তাই চাই। আমার একান্ত অনুরোধ, ধৈর্য ধরে আমি যা বলতে চাই তা শুনুন এবং বিশ্বাস করুন আমার বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষরই খাঁটি সত্য।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেসট্রেড বললে, ঠিক আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি আপনাকে।

ম্যাকফারলেন বলল, প্রথমেই বলে রাখি, মি. জোনাস ওলডাকার সম্বন্ধে আমি কিছু জানতাম না। পরিচয় ছিল শুধু নামের সঙ্গে। কেননা, বহু বছর আগে আমাদের বাবার মার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তারপর কে যে কোনদিকে ছিটকে গেছে, তার কোনো হদিশ ছিল না। সেই কারণেই গতকাল বেলা প্রায় তিনটার সময়ে তাকে আমার সিটি অফিসে ঢুকতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছিলাম। আর অবাক হলাম যখন শুনলাম তার আসার উদ্দেশ্য। হাতে করে নোটবইয়ের কয়েকটা ছেড়া পাতায় অনেক কিছু লিখে এনেছিলেন তিনি। এই দেখুন সেই কাগজগুলো।

টেবিলের ওপর ছেড়া পাতাগুলো রেখে বললেন মি. ওলডাকার, এই আমার উইল। মি, ম্যাকফারলেন, কানুনমাফিক যা কিছু করতে হয় করুন-পাকাপোক্ত হওয়া পর্যন্ত এখানেই বসে রইলাম আমি!

কপি করতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল আমার। আমার তখনকার অবস্থাটা আপনিও খানিকটা অনুমান করতে পারবেন সব শুনলে। দেখলাম, সামান্য একটু রাখাঢাকা ছাড়া তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই আমায় দিয়ে গেছেন তিনি। ভদ্রলোকের চেহারাটা অদ্ভুত। ছোটোখাটো মানুষ-অনেকটা নেউলের মতো খড়বড়ে! চোখের পাতাগুলো সমস্ত সাদা।

চোখ তুলতেই দেখি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে সকৌতুক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন উনি। উইলের শর্ত পড়তে পড়তে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু তিনিই বুঝিয়ে বললেন যে তিনি তো চিরকুমার, বয়েসও হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু জীবিত আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই। আমি যখন নাবালক, তখন থেকেই আমার বাবা-মাকে চেনেন তিনি। অনেকদিন ধরেই শুনেছেন যে ছেলে হিসেবে আমি নাকি হিরের টুকরো। সেইজন্যেই নিশ্চিত ছিলেন যে, আমার হাতে তার সম্পত্তি দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ মুদতে পারবেন। আমি তো সব শুনে এমন তোতলা হয়ে গেলাম যে, সামান্য ধন্যবাদটুকুও দিতে পারলাম না। যথাবিধি শেষ হল উইল, ওঁর সই হবার পর সাক্ষী হিসাবে সই করল আমার কেরানি। উইলটা লেখা হয়েছে নীল কাগজে। আর এই কাগজগুলো তো বললামই তাঁর নিজের হাতের লেখা উইলের খসড়া। উইলের পালা চুকে গেলে মি. ওলডাকার বললেন যে, বাড়ির লিজ, মর্টগেজ, রসিদ, টাইটেল-ডিড ইত্যাদি অনেকরকম দলিল আমার একবার দেখে এবং বুঝে নেওয়া দরকার। এসব কাজ একেবারে চুকেবুকে না-যাওয়া পর্যন্ত নাকি কিছুতেই শান্তি পাবেন না উনি। তাই অনেক করে অনুরোধ করলেন, গতরাতেই যেন উইলটা নিয়ে তার নরউডের বাড়িতে যাই সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্যে। যাবার সময়ে বলে গেলেন, তুমি কিন্তু বাবা একটা কথাও এখন তোমার বাবা মা-কে জানিয়ো না। সব শেষ করে তারপর তাঁদের চমকে দেওয়া যাবে, কি বল? এ নিয়ে বেশ জেদাজেদি শুরু করলেন উনি এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে তবে বিদায় নিলেন।

ঝুঝতেই পারছেন মি. হোমস তার এই সামান্য অনুরোধ না-শোনার মতো মনের অবস্থা আমার তখন নেই। তিনি যা বলতেন, তাই শুনতে রাজি ছিলাম তখন। আমার যা

উপকার তিনি করলেন, তা ভোলার নয় এবং তাঁর যেকোনো ইচ্ছাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেয়েছিলাম আমি। বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। জানিয়ে দিলাম যে জরুরি কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় কত রাতে যে বাড়ি ফিরব তার কোনো ঠিক নেই। মি. ওলডাকার বলে গেছিলেন ন-টার আগে তিনি বাড়িতে না-ও থাকতে পারেন। কাজেই ন-টার সময়ে পৌঁছে তার সঙ্গে সাপার খাওয়ার নিমন্ত্রণও জানিয়ে গেলেন। বাড়ি খুঁজে বের করতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল আমায়। কাজেই সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছোলাম আমি। তাঁকে দেখলাম—

এক সেকেন্ড! হোমস বলল, দরজা খুলেছিল কে?

একজন মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক। আমার তো মনে হল ঘরকন্নার বন্দোবস্ত তিনিই করেন।

আর আপনার নাম উল্লেখ করেছিলেন এই স্ত্রীলোকটিই, তাই না?

এগজ্যাক্টলি। বলল ম্যাকফারলেন।

তারপর বলে যান।

ঘামে-ভেজা কপাল মুছে নিয়ে বলে চলল ম্যাকফারলেন, পিছু পিছু এলাম বসবার ঘরে। পরিমিত সাপার আগে থেকেই সাজানো ছিল যেখানে। খাওয়ার পরে মি. জোনাথ ওলডাকার আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা আয়রন-সেফ

দেখলাম। মি. ওলডাকার সেফটা খুলে ফেলে একগাদা দলিল বার করে আমাকে দেখাতে বসলেন। দলিলের পাহাড় থেকে যখন চোখ তুললাম তখন রাত হয়েছে অনেক। এগারোটা কি বারোটা অথবা তার মাঝামাঝি হবে। মি. ওলডাকার আর স্ত্রীলোকটিকে বিরক্ত করতে চাইলেন না। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো আগাগোড়া ভোলাই ছিল-আমাকে তার মধ্যে দিয়েই বিদায় দিলেন তিনি।

পর্দা ফেলা ছিল কি? শুধোলেন হোমস।

ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় অর্ধেক ফেলা ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জানলাটা পুরোপুরি খুলে নেওয়ার জন্যে পর্দাটা তুলে ধরেছিলেন উনি। ছড়িটা খুঁজে পেলাম না। মি. ওলডাকার বললেন, ঘাবড়াও মাত বাবা, মাঝে মাঝে এখন তো দেখা হবেই। আবার না-আসা পর্যন্ত ওটা আমার কাছেই গচ্ছিত থাকুক, কেমন? চলে এলাম আমি। আসবার সময় দেখে এলাম আয়রন-সেফ খোলা, দলিলপত্র বান্ডিল বাঁধা অবস্থায় টেবিলের উপর রাখা। এত রাত হয়ে গেছিল যে ব্ল্যাকহিডে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি গতরাতে। তাই অ্যানারলি আর্মস-এ রাত কাটিয়ে আজ সকালে ট্রেনে উঠে কাগজে চোখ পড়তেই চক্ষুস্তির হয়ে গেল আমার। এর আগে কী হয়েছে না-হয়েছে, কিছুই জানি না আমি।

চমকদার এই ব্যাখ্যানা বলার সময়ে বারদুয়েক ভুরু তুলেছিল লেসট্রেড। এখন বলল, আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, মি. হোমস?

ব্ল্যাকহিমে পৌঁছানোর আগে নয় ।

নরউডে বলুন । বলল লেসট্রেড ।

ও হ্যাঁ, নরউডেই বটে । বলল হোমস মুখে তার অতি-পরিচিত পেটেন্ট দুর্বোধ্য হাসি ।

বিচিত্র কৌতূহল চোখে নিয়ে বলল লেসট্রেড, মি, শার্লক হোমস, দেখছি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা দরকার । মি. ম্যাকফারলেন,, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে নীচে । দুজন কনস্টেবল অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে বাইরে । শেষবারের মতো করুণ মিনতি-মাখানো চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকফারলেন । অফিসার দুজন দু-পাশে থেকে তাকে নিয়ে গেল অপেক্ষমাণ গাড়িতে । লেসট্রেড কিন্তু নড়ল না ।

উইলের খসড়া করা নোটবইয়ের ছোঁড়া কাগজগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল হোমস-তার সারামুখে আগ্রহের নিবিড় রোশনাই ।

কাগজগুলো লেসট্রেডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল সে, দলিলটায় কতকগুলো বিদঘুটে পয়েন্ট রয়েছে, তাই না লেসট্রেড?

এমনভাবে কাগজগুলো দেখতে লাগল লেসট্রেড যেন সব কিছুই গুলিয়ে গেল তার । একটু পরে বললে, লেখাটা পড়াও তো দেখছি বেশ মুশকিল । প্রথম কয়েকটা লাইন

বেশ পড়া যাচ্ছে, তারপর আবার দ্বিতীয় পাতার মাঝের লাইনগুলোও বেশ স্পষ্ট। আর বোঝা যাচ্ছে সবশেষের দু-একটা লাইন। এগুলো ঠিক যেন ছাপার অক্ষরে লেখা। কিন্তু মাঝেরগুলো, বিশেষ করে তিন জায়গায় লেখা এমনই যাচ্ছেতাই যে একদম পড়তে পারছি না আমি।

এর মানে কী? শুধোল হোমস।

আপনি বলুন না এর মানে কী? পালটা প্রশ্ন করল লেসট্রেড।

মানে অতি সোজা। এটা লেখা হয়েছে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। স্পষ্ট লেখা মানে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, খারাপ লেখা মানে ট্রেন চলছিল, আর একদম যাচ্ছেতাই লেখা মানে ট্রেন কোনো পয়েন্টের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। যেকোনো সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট এক নজরেই বলবেন যে খসড়া করা হয়েছে শহরতলির লাইনে কেননা কোনো বিরাট শহরের একেবারে কাছটিতে আর কোথাও পর পর এত পয়েন্ট দেখতে পাওয়া যায় না। ধরে নেওয়া যাক, ট্রেন চলার সময়ে সারাপথটুকুই খসড়া করতে গেছে। ট্রেনটা তাহলে এক্সপ্রেস; নরউড আর লন্ডন ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় শুধু থেমেছে একবারই।

হাসতে লাগল লেসট্রেড।

মস আপনি যখন আপনার থিয়োরি নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন, তখন আর ত নাগাল পাওয়া এ-শর্মার কর্ম নয়। বর্তমান কেসের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক তাই তো বুঝলাম না!

সম্পর্ক এইটুকু যে, জোনাস ওলডাকার যে গতকাল নরউড থেকে লন্ডন ব্রিজ আসার সময়ে উইলটা লিখেছিলেন-ম্যাকফারলেনের এই কাহিনির অন্তত এই অংশটুকুর সত্যতা প্রমাণিত হল। এ-রকম দরকারি একটা দলিল এমন যা-তা ভাবে লেখা হয়েছে ভাবলেও অদ্ভুত লাগে তাই না? এর অর্থ এই দাঁড়াতে পারে যে, ওলডাকার উইলটায় কোনোরকম গুরুত্বই আরোপ করেননি। উইলমতোই যে সব কিছু হবে, এ-রকম ধারণা একেবারেই তার মনে ছিল না। কার্যকর করার ইচ্ছে না-নিয়ে কোনো উইল যদি কেউ লেখে, তাহলে তা এইভাবেই লেখা স্বাভাবিক।

লেসট্রেড বলল, ভুলবেন না, নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাও লেখা হয়েছে এইসঙ্গে।

ওহো, তুমি বুঝি তাই মনে কর?

আপনি মনে করেন না?

হতেও পারে। কেসটা কিন্তু এখনও তেমন পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে।

এখনও হয়নি? এমন জলবৎ তরলং জিনিসটা যদি এখনও অপরিষ্কার থেকে যায় আপনার কাছে, তাহলে তো আমি নাচার। এমন কী আর কঠিন ব্যাপার! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যদি একটা জোয়ান ছেলে একদিন শোনে যে বিশেষ একটা বুড়ো অক্লা পেলেই বিরাট একটা সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে, তখন সে করবে কী? খবরটা পাঁচকান না-করে চুপিসারে বুড়োর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়ে সেই রাতেই তার বাড়িতে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করবে সবার আগে। দেখা করার অছিলা খুঁজে বার করাটা বিশেষ কিছু কঠিন নয়। তারপর বাড়ির বাইরে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কোথাও যতক্ষণ না বুড়োর একমাত্র সঙ্গী চাকরটার নাক ডাকতে শুরু করেছে। এরপর তো খুবই সহজ। নিরালায় নিশুতি রাতে বুড়োর ঘরে ঢুকে তাকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেওয়ার পর লাশটাকে কাঠের গাদায় ঢুকিয়ে সবসুদু আগুন লাগিয়ে দিয়ে খোশমেজাজে বাকি রাতটা কাছাকাছি কোনো হোটেলে কাটিয়ে দেওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক, মি. হোমস? ঘরের মধ্যে আর ছড়িটার ওপর রক্তের দাগ যা পাওয়া গেছে তা খুবই সামান্য। অর্থাৎ আগে থেকেই খুনির মতলব ছিল রক্তারক্তি না-করেই কাজ সারা। লাশ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার মূলেও সেই কারণ-সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কীরকম লাগল মি. হোমস? সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কি?

একটু বেশি রকমের সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। মাই গড লেসট্রেড, তোমার মস্ত মস্ত গুণগুলোয় কল্পনায় খাদ একেবারেই নেই। কিন্তু একটু যদি থাকত, এক মুহূর্তের জন্যেও যদি বেচারী ম্যাকফারলেনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে তাহলে তুমি যত বড়ো দুঃসাহসীই হও না কেন, দিনে উইল করার প্রায় সঙ্গেসঙ্গে সেই রাতেই বুড়ো ওলডাকারকে কি খুন করার প্ল্যান করতে? দু-দুটো অসাধারণ ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটে

যাওয়াটা তোমার পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত না? আর দেখ, খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে-অথচ সাক্ষী রেখে যাচ্ছে। চাকরকে। এ কেমনতরো প্ল্যান? সবশেষে, এত কষ্টে লাশটাকে সরিয়ে এনে কাঠের গাদায় আগুন দিলে খুনের প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে-অথচ, রক্তমাখা ছড়িটা রেখে এল বুড়োর ঘরেই তুমি হলে তাই করতে কি? কী হে, কীরকম বুঝছ? এসব সম্ভব বলে মনে হয়?

ছড়ি সম্বন্ধে বলা যায় যে, অবশ্য আপনিও তা জানেন, খুনের সময়ে এবং পরে খুনি বেসামাল হয়ে পড়ে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে, যা ঠান্ডা মাথায় কারোর পক্ষেই সম্ভব হয় না। আবার ঘরে ফিরে গিয়ে ছড়ি আনার সাহস বোধ হয় তার ছিল না। না, মি. হোমস, এতে চলবে না। অন্য কোনো থিয়োরি যদি থাকে তো দিন।

কম করে আধ ডজন থিয়োরি এই মুহূর্তে দিতে পারি তোমায়!

একটা পয়েন্ট শুধু মনে রাখবেন মি. হোমস, মৃতের ঘর থেকে যতদূর জানি কোনো কাগজপত্র খোঁয়া যায়নি। আর, কাগজপত্র খোঁয়া না-গেলে সমূহ লাভ যার-এমন লোক শুধু একজনই আছে পৃথিবীতে। আইনানুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক এখন মি. ম্যাকফারলেন, কাগজপত্র তো যথাসময়ে তার হাতে আসছেই, কাজেই সে তা সরাতে যাবে কেন?

কথাটা শুনে মনে হল হোমসের মনে খটকা লেগেছে।

অস্বীকার করে লাভ নেই যে প্রমাণগুলো সবই তোমার থিয়োরির অনুকূলে। তা সত্ত্বেও একটা কথাই শুধু বলে রাখতে চাই তোমায় লেসট্রেড-অন্যান্য থিয়োরি থাকা খুব বিচিত্র নয়। যাক, তোমার কথামতোই দেখা যাক, কার দৌড় কতদূর। গুড মর্নিং। নরউডে আজকে এলেও আসতে পারি। গেলে দেখতে পাব কীরকম কাজকর্ম চলছে তোমার।

লেসট্রেড চোখের আড়াল হতেই তৎপর হয়ে উঠল হোমস। এমনভাবে গোছগাছ শুরু করে দিলে না-জানি কী হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজই তাকে করতে হবে সারাদিন ধরে।

ফ্রক কোটটার মধ্যে হাত লাগাতে লাগাতে বলল হোমস, ওয়াটসন, আমার প্রথম গন্তব্যস্থান হচ্ছে, ব্ল্যাকহিড।

নরউড নয় কেন?

কেননা, কেসটার পয়লা নম্বর বৈচিত্র্য হচ্ছে একই দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো আশ্চর্য ঘটনা। পুলিশ মনোযোগ দিয়েছে দ্বিতীয় ঘটনায় কেননা খুনি সরাসরি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কিন্তু আমার মতে যুক্তির পথ ধরেই যদি চলতে হয়, তাহলে প্রথম ঘটনা থেকেই তদন্ত শুরু করা উচিত।

অনেক বেলায় ফিরল হোমস। শুকনো মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যর্থ হয়েছে সে।

ব্ল্যাকহিড গেছিলে?

গেছিলাম এবং গিয়েই জেনেছি যে বুড়ো ওলডাকার-এর মতো পাজির পা ঝাড়া দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। মা বাড়িতেই ছিলেন। ছোটোখাটো হুঁপুঁপুঁ ভদ্রমহিলা, নীল নীল চোখ। ভয়ে আর ঘৃণায় তার সেকাপুনি যদি দেখতে তুমি। ম্যাকফারলেনের অপরাধ স্বীকার করা তো দূরের কথা, এরকম কোনো সম্ভাবনাও তিনি মানতে রাজি নন। ভেবেছিলাম, ওলডাকারের শোচনীয় পরিণতি শুনে বিস্মিত হবেন ভদ্রমহিলা, নিদেনপক্ষে একটু দুঃখও প্রকাশ করবেন। কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেলেন না উনি। ওলডাকারের নাম শোনামাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে গিয়ে প্রথমেই ভদ্রমহিলা বললেন, মানুষ তো নয়, যেন একটা বড়ো সাইজের বাঁদর। শুধু আজ বলে নয়, ওর জোয়ান বয়স থেকেই এইরকম-যেমন ধড়িবাজ, তেমনি বদমাশ।

শুধোলাম-আপনি তাহলে সে সময় ওঁকে চিনতেন বলুন?

শুধু চিনতাম নয়, হাড়ে হাড়ে চিনতাম। লোকটা একসময়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মি, হোমস। কিন্তু আমার কপাল ভালো, সেই সময়ে আমার একটু সুমতি হওয়ায় এনগেজমেন্ট ভেঙে দিয়ে বিয়ে করি ওর চাইতে গরিব একজনকে।

ওলডাকার তাহলে এখন আপনাকে ক্ষমা করেছেন বলতে হবে। তা না-হলে তার সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলেকে দিয়ে যেতেন?

আগুনে যেন ঘি পড়ল। দপ করে জ্বলে উঠে চিৎকার করে উঠলেন ম্যাকফারলেনের মা-
জীবিত অথবা মৃত জোনাথান ওলডাকারের কাছ থেকে কানাকড়িও চাই না আমার ছেলে
অথবা

আমি।

বৃথাই চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু আমাদের অনুমানের অনুকূলে তোদূরের কথা,
প্রতিকূলেও কোনো পয়েন্ট পেলাম না ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। শেষকালে হাল ছেড়ে
দিয়ে গেলাম নরউডে।

প্রকাণ্ড হালফ্যাশনের ভিলা এই ডিপ ডেন হাউস। ইট বারকরা দেওয়াল, পলেন্সারার
কোনো বালাই নেই। অনেকটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটা, সামনের লনটা লরেল
লতায় ঢেকে গেছে। রাস্তা থেকে একটু পেছনে ডান দিকে কাঠের স্তূপ রাখার উঠোন-
আগুন লেগেছিল এইখানেই। নোটবইয়ের পাতায় মোটমুটি একটা স্কেচ করে এনেছি
জায়গাটার। বাঁ-দিকে জানলাটা মি. ওলডাকারের ঘরের। দেখতেই পাচ্ছ, রাস্তা থেকেই
জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যায়। আজকের অভিযানে এইটাই আমার
একমাত্র সাক্ষ্য। লেসট্রেডকে দেখতে পেলাম না ওখানে, কিন্তু হেড কনস্টেবল বেশ
খাতির করে সব দেখালে। আমি যাওয়ার ঠিক আগেই ওরা নাকি হিরে-জহরত পাওয়ার
মতো বিরাট একটা আবিষ্কার করেছে গুনলাম। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পোড়া
দেহাবশেষ ছাড়াও কতকগুলো বিরং ধাতুর চাকতি পেয়েছে। খুব যত্ন করে চাকতি
পরীক্ষা করে দেখলাম ওগুলো ট্রাউজার্সের বোতাম না হয়ে যায় না। একটা বোতামের

ওপর হিয়ামস লেখা দেখে চিনতে পারলাম বুড়ো ওলডাকারের দর্জিকে। এরপর লনটা তন্নতন্ন করে দেখলাম যদি কিছু চিহ্ন-টিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে জমি শুকিয়ে এমনই লোহার মতো হয়ে গেছিল যে শুধু পণ্ড্রমই হল। কাঠের গাদার সঙ্গে এক রেখায় নীচু একটা ঝোপ ছিল। এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ভারী একটা বস্তু টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে-এ ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না আমি। অর্থাৎ যা কিছু পেলাম, সবই পুলিশের থিয়োরির স্বপক্ষে। অগাস্টের সূর্য পিঠে নিয়ে লনের ওপর হামাগুড়ি দিলাম ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু যে-তিমিরে ছিলাম, রইলাম সেই তিমিরেই। যখন এত করেও এক কণা আলোকপাত করতে পারলাম না, তখন ধুত্তোর বলে উঠে দাঁড়িলাম ধুলো ঝেড়ে।

যাই হোক, এইসব বারম্বে লঘুক্রিয়ার পর গেলাম শোয়ার ঘরে। যথারীতি পরীক্ষা করলাম। রক্তের দাগ দেখলাম খুবই সামান্য, তাও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও চিহ্নটা যে তাজা রক্তের সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। ছড়িটাকে ওরা নিয়ে গেছিল, কিন্তু তাতেও শুনেছি রক্তের দাগ খুবই সামান্য। ছড়িটা যে আমাদের মক্কেলের, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ম্যাকফারলেন নিজেই তো স্বীকার করেছে। কার্পেটের ওপর দুজন পুরুষের পায়ের ছাপ পেলাম-কিন্তু কোনো তৃতীয় জনের নয় অর্থাৎ আর একবার টেক্সা মারল লেসট্রেড। প্রতিটি প্রমাণ, প্রতিটি খুঁটিনাটি একে একে জোরালো করে তুলছে ওর থিয়োরিকে, আর আমরাই শুধু ন যযৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে লম্বা থিয়োরিই আউড়ে যাচ্ছি।

আশার সামান্য একটু আলো দেখেছিলাম, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত টিকল না। আয়রন-সেফের জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে দেখলাম। বেশির ভাগ কাগজপত্রই অবশ্য লেসট্রেড রেখে গেছিল বাইরে টেবিলের ওপর। সিল-করা কতকগুলো খামে ছিল কাগজগুলো। পুলিশ দু-একটা খুলেছে দেখলাম। দেখে শুনে দলিলগুলো খুব বিশেষ দরকারি বলে মনে হল না। ব্যাক্সের পাশ বই দেখে মি. ওলডাকারের আর্থিক প্রাচুর্যেরও বিশেষ কোনো প্রমাণ পেলাম না। এইটুকু বুঝলাম যে সবগুলো কাগজ সেখানে নেই। কতকগুলো দলিলের বার বার উল্লেখ দেখে মনে হল আসল দলিল বোধ হয় সেগুলোই। কিন্তু খুঁজে পেলাম না একটাও। শুধু এইটুকুই যদি আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তো এক হাত নেওয়া যায় লেসট্রেডের ওপর। লেসট্রেড খুব বড়াই করে গেল না, যে লোক সব কিছুই মালিক হতে চলেছে দু-দিন পরেই, তার পক্ষে কাগজপত্র সরানো কোনোমতেই সম্ভব নয়? কাজেই, কাগজপত্র যে কিছু হারিয়েছে তা প্রমাণ করতে পারলে অন্তত কিছুটা কাজ হয়।

বাড়ির প্রতিটি মিলিমিটার তন্নতন্ন করে দেখে শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়লাম ঘরকন্নার কাজ যিনি দেখাশোনা করেন, তাঁকে নিয়ে। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস লেক্সিংটন। মাথায় খাটো, গায়ের রং ময়লা, কথাবার্তা খুবই অল্প বলেন, আর তেরচা চোখে সবসময়ে সন্দেহের ছায়া। ইচ্ছে করলে লেক্সিংটন আমাকে অনেক কিছুই বলতে পারতেন। কিন্তু অনেক কিছু তো দূরের কথা, সামান্য কিছুও বার করতে পারলাম না তাঁর মোম-আঁটা মুখ থেকে। সাড়ে নটার সময় মি. ম্যাকফারলেনকে তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার আগেই নাকি তার হাত দুটো খসে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে তো আর এত বড়ো কাণ্ডটা ঘটত না। সাড়ে দশটার সময় শুতে গেছিলেন তিনি। শোয়ার ঘর

বাড়ির আর এক প্রান্তে, কাজেই এরপর কী হয়েছে-না-হয়েছে তা জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় মি. ম্যাকফারলেন তার টুপি আর ছড়িটা হল ঘরে রেখে গেছিলেন। হঠাৎ আগুন, আগুন, চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। মি. ওলডাকারকে নিশ্চয় খুন করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তার কোনো শত্রু ছিল কি না? শত্রু কার নেই? কিন্তু মি. ওলডাকার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন চব্বিশ ঘণ্টা এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা না-থাকলে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন না। বোতামগুলো দেখেছেন মিসেস লেক্সিংটন। গত রাতে মি. ওলডাকার যে-ট্রাউজার্স পরেছিলেন বোতামগুলো তারই। মাসখানেক বৃষ্টি না-হওয়ায় কাঠের গাদা শুকিয়ে খটখটে হয়েছিল। কাজেই খড়ের গাদার মতো দাউ দাউ করে সব জ্বলতে থাকে। মিসেস লেক্সিংটন যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন আগুনের লকলকে শিখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়েছিলেন তিনি এবং দমকল বাহিনীর লোকেরা। মি. ওলডাকারের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা দলিলপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেন না মিসেস লেক্সিংটন।

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এই হল আমার আজকের ব্যর্থতার রিপোর্ট। কিন্তু তবুও-তবুও প্রবল প্রত্যয় যেন ঠিকরে পড়ে তার সরু সরু শিরাবহুল হাতের শক্ত মুঠির মধ্যে দিয়ে-তবুও আমি জানি সব ভুল, সমস্ত মিথ্যে। কোথায় যেন কী-একটা লুকিয়ে আছে। কিছুতেই আড়াল থেকে তা সামনে আসছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসেস লেক্সিংটন ভালোভাবেই জানেন তা কী। ভদ্রমহিলার দু-চোখে আমি এমন এক চাপা বেপরোয়া ভাব দেখেছি যা শুধু জেনেশুনে অপরাধ যারা করে বা লুকিয়ে রাখে তাদের চোখেই দেখা যায়। যাক, এ নিয়ে আর মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই, ওয়াটসন। দৈব যদি সহায় হয়, কপালজোরে আকাশ ছুঁড়ে কোনো প্রমাণ-টমান যদি হাতের মুঠোয় এসে

পড়ে, তবেই জেনো এ-রহস্যের আসল সমাধান আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিতে পারব জনসাধারণকে। তা না-হলে আমাদের সাফল্যের ইতিহাসে চিরকাল ব্যর্থতার কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকবে নরউড অন্তর্ধানের এই বিচিত্র মামলা।

আমি বললাম, অত ভেঙে পড়ছ কেন, ম্যাকফারলেনের চেহারা দেখেও তো জুরিদের মন টলতে পারে?

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, বড়ো বিপজ্জনক যুক্তি এনে ফেললে তুমি। পয়লা নম্বরের খুনে গুল্ডা বার্ট স্টিভেন্স-এর কথা তোমার মনে আছে? ৮৭ সালে আমাদেরও তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল? মনে পড়েছে? তার চেয়ে গোবেচারা, শান্তশিষ্ট, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ কি আর তুমি দেখেছ?

তা অবশ্য সত্যি।

দু-নম্বর থিয়োরি না-পেলে ত্রিলোকের কারো ক্ষমতা নেই ম্যাকফারলেনকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করে। ওর বিরুদ্ধে যে-মামলা দাঁড় করানো হবে, তার মধ্যে একরতি ভুলও খুঁজে পাবে না তুমি উলটে যত দিন যাচ্ছে, ততই নিত্যনতুন প্রমাণ বার করে কেসটা জোরালো করে তুলছে লেসট্রেড। ভালো কথা, কাগজপত্র দেখে মনে হল তদন্ত চালানোর মতো অন্তত একটা সূত্র পেয়েছি আমি। পাশবহিতে অত কম জমা দেখে সন্দেহ হওয়ায় একটু ভালো করে খুঁজতেই দেখলাম গত এক বছর এস্তার চেক কাটা হয়েছে মি. কর্নিলিয়াস নামে এক ভদ্রলোকের নামে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কমে যাওয়ার মূল

কারণ হল এইটাই। কে এই মি. কনিলিয়াস? অবসর নেওয়ার পরেও মি. ওলডাকারের সঙ্গে তার এত টাকা লেনদেনের কারণ কী, তা আমাকে জানতেই হবে। এ-ব্যাপারে লোকটার কোনো হাত আছে কি? এও হতে পারে আসলে কনিলিয়াস একজন দালাল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো কঁচা অথবা পাকা যা হয় একটা রসিদ থাকা দরকার। কিন্তু সে-রকম কিছুই নেই অথচ বিপুল অর্থের বিস্তর চেক কাটা হয়েছে তার নামে। আর কিছু যদি না-পারি তাহলে অন্তত এই খাতেই শুরু করতে হবে আমার গবেষণা। ব্যাঙ্কে গিয়ে তদন্ত করে জানতে হবে, যে-ভদ্রলোক এতগুলো চেক নিয়মিত ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে কী তার পরিচয়। কিন্তু সত্যিই কি শেষই পর্যন্ত কোনো সুরাহা হবে ওয়াটসন? আমার মন বলছে, হবে না। বুক ফুলিয়ে বেচারী ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে লেসট্রেড। আর কাগজ কাগজে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিজয়গাথা লেখা হবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের।

সে-রাতে শার্লক হোমস ঘুমোতে পেরেছিল কি না জানি না। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নেমে দেখলাম উশকোখুশকো অবস্থায় আগে থেকেই বসে রয়েছে সে। টেবিলের ওপর একটা খোলা টেলিগ্রাম।

আমাকে দেখেই টেলিগ্রামটা আমার দিকে টোকা মেরে এগিয়ে দিয়ে বললে, ওয়াটসন এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?

টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে:

গুরুত্বপূর্ণ তাজা প্রমাণ হাতে এসেছে। ম্যাকফারলেনের অপরাধ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হল। আমার উপদেশ-এ-কেস ছেড়ে দিন।-লেসট্রেড।

ব্যাপার বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে।

আমার ওপর এক হাত নেওয়ার আনন্দে এবার বক দেখাতে শুরু করেছে লেসট্রেড, তিক্ত হেসে বলল হোমস। আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না, সে সময় আসেনি এখনও। খুব দরকারি, দারুণ গুরুত্বপূর্ণ টাটকা প্রমাণের দু-দিকে ধার থাকে, জান তো। শাঁখের করাতির মতো যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। লেসট্রেড যেদিক দিয়ে আমায় কুপোকাত করতে চাইছে, ওরই শিলনোড়া দিয়ে উলটোদিক থেকে হয়তো আমিও ওকে বেকায়দায় ফেলতে পারি। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও ওয়াটসন। আজ আমরা একসঙ্গেই বেরোব। বেশ বুঝছি, তোমার সঙ্গ, তোমার উপদেশ, তোমার সাহায্য ছাড়া এক পা-ও আজ আমি চলতে পারব না।

হোমস নিজে কিন্তু মুখে একটা দানাও দিলে না। না-দেওয়ার কারণও আমি জানি। তার অদ্ভুত খামখেয়াল স্বভাবের এও একটা দিক। চিন্তাভাবনা উবেগের চরমে পৌঁছেলেই খাওয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে সে। কাজেই সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট স্পর্শ না-করে সে যখন আমাকে নিয়ে রওনা হল নরউডের দিকে, তখন খুব বেশি অবাক হইনি। ডিপডেন হাউসের চারদিকে তখনও এখানে-সেখানে বহু লোক দাঁড়িয়ে জল্পনাকল্পনা করছিল। মনে মনে বাড়িটা সম্বন্ধে যে-ছবি এঁকেছিলাম, বাস্তবেও দেখলাম

প্রায় তাই। ফটকের মধ্যে মোলাকাত হয়ে গেল লেসট্রেডের সঙ্গে। জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছিল তার চোখ-মুখের হাবভাবে।

আমাদের দেখেই সোল্লাসে চেষ্টা করে ওঠে লেসট্রেড, হ্যালো, মি. হোমস কতদূর এগোলেন? আমার থিয়োরি যে ভুল তা প্রমাণ করতে পারলেন নাকি? হাতের তাসে তুরূপ মিলল?

হোমস বলল, এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেইনি আমি।

কিন্তু আমরা পৌঁছেছি। গতকালই পৌঁছেছিলাম, আপনাকে তা বলেওছি। আর, আজ তা প্রমাণিত হল এবং এখন আপনাকে দেখাব। যাক, এবার তাহলে আপনার আগে আগেই চলেছি আমরা, কি বলেন মি. হোমস?

হোমস বলল, মনে হচ্ছে দারুণ অস্বাভাবিক একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছ? ব্যাপার কী!

অটহাস্য করে উঠল লেসট্রেড।

আপনি দেখছি কিছুতেই আমাদের মতো হার স্বীকার করতে রাজি নন। প্রতিবারেই ঠিক পথে চলব, এমনটি আশা করা উচিত নয়—কী বলেন, ডা. ওয়াটসন? দয়া করে এদিকে

আসুন, ম্যাকফারলেন যে খুনি, এ-সম্বন্ধে যদি কোনো সন্দেহ এখনও থাকে, তবে তা ভঞ্জন করে যান।

লেসট্রেডের পিছু পিছু প্যাসেজ পেরিয়ে অন্ধকার একটা হল ঘরে পৌঁছোলাম আমি আর হোমস।

লেসট্রেড বলল, খুন করার পর টুপি নেওয়ার জন্য এ-ঘরেই এসেছিল ম্যাকফারলেন ছোকরা। এদিকে দেখুন। বলেই আচম্বিতে নাটকীয়ভাবে ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়ালের সামনে ধরল সে।

সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে দেখলাম সাদা রক্তের দাগ। জ্বলন্ত কাঠিটা আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে যা দেখলাম তা নিছক রক্তের দাগ নয়, আরও কিছু। বুড়ো-আঙুলের একটা সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে রয়েছে সাদা দেওয়ালের ওপর।

মি. হোমস, আপনার আতশকাচ দিয়ে দেখুন দাগটা।

হ্যাঁ দেখেছি!

জানেন তো দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনো এক হয় না?

এ-রকম কথা শুনেছি বটে।

বেশ, তাহলে এই নিন মোমের ওপর তোলা ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ। এ-
ছাপ নেওয়া হয়েছে আজ সকালেই। এবার দয়া করে ছাপ দুটো পাশাপাশি রেখে একটু
মিলিয়ে দেখবেন কি?

দেওয়ালের রক্তের ছাপের পাশে মোমের ছাপটা ধরতেই আর আতশকাচের দরকার হল
না। শুধু চোখেই পরিষ্কার দেখলাম দুটো ছাপই উঠেছে একই বুড়ো আঙুল থেকে। এবং
চকিতে বুঝলাম, ম্যাকফারলেনের ফাঁসির দড়ি আলগা করার ক্ষমতা হোমসের কেন,
ত্রিভুবনের কারো নেই।

লেসট্রেড বললে, এইখানেই তদন্তের শেষ।

হ্যাঁ, সব শেষ। প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

সব শেষ। বলল হোমস।

হোমসের সুরটা যেন কীরকম! কানে লাগতেই ফিরে তাকালাম ওর পানে।

দেখি আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে ওর চোখে-মুখে সর্বদেহে। চাপা উল্লাসে যেন
ময়ূরের মতো নৃত্য জুড়েছে ওর দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু। আকাশের তারার মতো

ঝকঝক করছিল ওর চোখ দুটো। মনে হল যেন দেহের মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে অদম্য অটুহাসিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে সে।

কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! ছোকরার পেটে পেটে এত শয়তানি? আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি। দেখতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট যেন সাত চড়ে রা বেরোয় না। আর তলে তলে কিনা... নাঃ লেসট্রেড, খুব শিক্ষা হল আমার। নিজের বিচারবুদ্ধিকে দেখছি আর বিশ্বাস করা চলে না।

তা ঠিকই বলেছেন মি. হোমস। আমাদের মধ্যে কারো কারো আত্মবিশ্বাসের বড়ো বাড়াবাড়ি দেখা যায়। অতটা ঠিক নয়। লোকটার স্পর্ধা দেখে মাথা গরম হয়ে গেল আমার। হোমস কিন্তু গায়ে মাখল না কিছু।

বলল, আমাদের পরম সৌভাগ্য আলনা থেকে টুপি নেওয়ার সময়ে দেওয়ালের উপর আঙুল টিপে ছাপটা রেখে গেল ম্যাকরফারলেন। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে কী নিরেট গাধা আমি। এমন স্বাভাবিক জিনিস।... ভালো কথা লেসট্রেড, এতবড়ো আবিষ্কারটা কার শুনি? হোমসের স্বর অত্যন্ত শান্ত। কিন্তু কথা বলার সময় যেন চাপা উত্তেজনা ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল তার ভাবে ভঙ্গিতে।

মিসেস লেক্সিংটনের। রাতের পাহারাদারকে ডেকে দাগটা দেখান উনি।

রাতের পাহারাদার তখন ছিল কোথায়?

যে-ঘরে খুনটা হয়েছে সেই ঘরেই ডিউটি ছিল তার। ঘরের জিনিসপত্র যাতে খোয়া না-যায়, তাই তাকে রেখেছিলাম।

কিন্তু গতকাল এ-দাগ পুলিশের চোখে পড়েনি কেন?

হল ঘরের দেওয়াল পরীক্ষা করার মতো বিশেষ কোনো কারণ তখন ছিল না বলে। তা ছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘরটা এমন জায়গায় যে সবার চোখ এড়িয়ে যায়। আমরাও তাই বিশেষ নজর দিইনি।

ঠিক, ঠিক। দাগটা গতকাল তাহলে ছিল, কেমন?

লেসট্রেড এমনভাবে হোমসের পানে তাকালে যে আমার মনে হল তার ধারণা মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে তার। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমিও হোমসের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। চোখ-মুখে দেহে খুশির রোশনাই, অথচ কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ এলোমেলো, উদ্দাম।

লেসট্রেড বললে, মাঝরাতে ম্যাকফারলেন হাজত থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের ওপর আঙুলের ছাপ রেখে গেছে ফাঁসির পথ সুগম করতে-এই যদি আপনি ভেবে থাকেন, তাহলে আমার আর কোনো জবাব নেই। পৃথিবীতে যেকোনো বিশেষজ্ঞকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি-প্রমাণ করুন তিনি যে এ-ছাপ ম্যাকফারলেনের আঙুলের ছাপ নয়।

এ যে তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার।

তবে আর কী? মি. হোমস, আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। প্রমাণ যখন পাই, সিদ্ধান্ত তৈরি করি তখন। বসবার ঘরে চললাম আমি রিপোর্ট লিখতে। যদি আপনার আর কিছু বলবার থাকে এ-সম্বন্ধে চলে আসুন সেখানে।

আবার নির্বিকার হয়ে গেছিল হোমস। যদিও তখনও তার হাবেভাবে কৌতূকের ছটা আমার চোখ এড়াল না।

ওয়াটসন, ম্যাকফারলেনের তো ভারি বিপদ হল দেখছি। আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। এমন কতকগুলো আশ্চর্য পয়েন্ট এসেছে হাতে যে হাল ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না।

আন্তরিকভাবেই বললাম, শুনে আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছে, হোমস। আমি তো ভাবলাম দফারফা হয়ে গেল বেচারির।

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে? আসল ব্যাপার কি জান? লেসট্রেড খেটেখুটে যেসব প্রমাণ জড়ো করে খাড়া করেছে কেসটাকে, তাদের মধ্যে মারাত্মক গলদ থেকে গেছে একটায়। লেসট্রেড কিন্তু সেই ভুল প্রমাণ নিয়েই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

তাই নাকি! কোনটা শুনি?

গতকাল হল ঘরটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং আঙুলের কোনো ছাপ আমি তখন দেখিনি। এ-প্রসঙ্গ এখন থাকুক ওয়াটসন। চলো, খোলা রোদুরে এক পাক ঘুরে আসা যাক।

বাড়ির প্রতিটা দিক নতুন আশ্রয় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোমস। তারপর ভেতরে এসে একতলা থেকে শুরু করে চিলেকোঠা পর্যন্ত কিছুই দেখতে বাকি রাখল না। বেশির ভাগ ঘরেই আসবাবপত্রের কোনো বালাই নেই, তবুও তন্নতন্ন করে দেখতে ছাড়ল না হোমস। ওপরের শোবার ঘর মোট তিনটে, কিন্তু ফাঁকা পড়ে থাকে বারোমাস, কেউই থাকে না সেখানে। চারিদিক ঘিরে চওড়া একটা করিডোর। এইখানে এসেই আবার নতুন করে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল হোমস।

ওয়াটসন, বাস্তবিকই কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কেসটায়। আমার তো মনে হয় এবার লেসট্রেডকেও আমাদের দলে টেনে নেওয়া উচিত। আমাদের ওপর টেক্সা দেওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করেছে লোকটা। আমার অনুমান যদি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তার খানিকটা শোধ নেওয়া যেতে পারে। ঠিক, ঠিক, খাসা মতলব এসেছে মাথায়।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোয়ান ডয়ল । শার্লক হোমস

বাইরের ঘরে বসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-প্রবর পরম উৎসাহে রিপোর্ট লিখে চলেছিল। হোমস এসে বাধা দিয়ে বললে, কেসটার রিপোর্টে লিখছ নাকি?

হ্যাঁ।

শেষ না-দেখেই?

মানে?

মানে এই যে, আমার বিশ্বাস সব প্রমাণ এখনও তোমার হাতে আসেনি।

হোমসকে হাড়ে হাড়ে চেনে লেসট্রেড এবং বেশ জানে তার এ ধরনের কথাবার্তাকে আমল-দেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কলম রেখে অদ্ভুতভাবে হোমসের পানে তাকাল সে।

বলল, কী বলতে চান মি. হোমস?

শুধু একটি কথা-যে-সাক্ষীকে আমাদের দারুণ দরকার, তাকে তুমি এখনও দেখতেই পাওনি।

আপনি দেখাতে পারেন?

মনে হচ্ছে পারি।

তাহলে দেখান।

আমার যথাসাধ্য আমি করব লেসট্রেড। কতজন কনস্টেবল আছেন এখানে?

তিনজন।

চমৎকার! প্রত্যেকে ষগুমার্কী শক্তসমর্থ পুরুষ তো! তারস্বরে চোঁচাতে পারে সবাই?

হ্যাঁ, প্রত্যেকেই ষগুমার্কী গাউগোটা জোয়ান। কিন্তু তারস্বরে চোঁচানোর সঙ্গে এ-কেসের
কী সম্পর্ক তা বুঝলাম না।

বুঝিয়ে দেব একটু পরেই—শুধু এই সম্পর্কে নয়, আরও অনেক কিছু। তোমাদের
পালোয়ানদের তাহলে হাঁক দাও—আর দেরি করে কী লাভ!

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনজন এসে জমায়েত হল হল ঘরে।

হোমস বললে, আউটহাউসে প্রচুর খড় আছে। দুটো আঁটি সেখান থেকে নিয়ে এসো
তোমরা। খড়টা থাকলে চট করে সাক্ষী বেরিয়ে আসবে সবার সামনে অন্তত আমার তো

তাই বিশ্বাস । ধন্যবাদ । ওয়াটসনের পকেটে দেশলাই আছে । মি. লেসট্রেড, এবার সবাই মিলে আমার পিছু পিছু চলে এসো ওপরতলায় ।

আগেই বলেছি, ওপরতলায় তিনটে শোবার ঘর ঘিরে ছিল এক চওড়া করিডোর । করিডোরের এক প্রান্তে সদলবলে এসে পৌঁছাল হোমস । কনস্টেবলরা দাঁত বার করে হাসতে শুরু করে দিয়েছিল । লেসট্রেড বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়েছিল বন্ধুবরের পানে । হোমসের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন ঐন্দ্রজালিক এসে দাঁড়িয়েছে ভেলকি দেখিয়ে আমাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে ।

একজন কনস্টেবলকে দু-বালতি জল আনতে পাঠাও তো লেসট্রেড । খড়ের বাণ্ডিল দুটো এখানে রাখো মেঝের ওপর-দু-দিকের দেওয়াল থেকে যেন তফাতে থাকে । ঠিক আছে, আমরা তৈরি ।

রাগে লাল হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ ।

মি. শার্লক হোমস, এ কি ছেলেখেলা হচ্ছে? আপনি যদি সত্যিই কিছু জেনে থাকেন, তবে তা এভাবে লোকহাসানো ভড়ং না-দেখিয়ে খুলে বলা উচিত আপনার ।

মাই গড লেসট্রেড, তুমি তো জানই, জ্বরদস্ত কারণ না-থাকলে আমি কিছুই করি না । ঘণ্টা কয়েক আগে সাফল্যের সূর্য যখন প্রায় তোমার দিকেই ঢলে পড়েছিল, তখন আমাকে নিয়ে যে একটু ঠাট্টা-তামাশা জুড়েছিলে তা নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি ।

কাজেই আমি যদি একটু ধুমধাম করি, একটু উৎসব করি, তাহলে তো তোমার গায়ের জ্বালা হওয়া উচিত নয়। ওয়াটসন, এদিকের জানলাটা খুলে দিয়ে খড়ের গাদায় আগুন লাগাও।

করলাম তাই। জানলা দিয়ে হাওয়ার বাঁপটা আসায় পট পট শব্দে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল শুকনো খড়ের গাদা, পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে ভরে উঠল সমস্ত করিডোরটা।

লেসট্রেড, এবার দেখা যাক পাওয়া যায় কি না আমার সাক্ষীকে! সবাই মিলে একসঙ্গে গলা চিরে আগুন বলে চিৎকার করে উঠবে। সবাই তৈরি তো? আচ্ছা: এক, দুই, তিন—

আগুন! একসঙ্গে সবাই বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠলাম।

ধন্যবাদ। আর একবার কষ্ট দেব তোমাদের।

আগুন!

আর একবার—সবাই মিলে।

আগুন! নরউডের প্রত্যেকেই বোধ হয় আঁতকে উঠেছিল সে বাজখাই চোঁচানি শুনে!

শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটল আশ্চর্য ব্যাপারটা। করিডোরের যে-অংশটা চুনকাম করা নিরেট দেওয়াল ভেবেছিলাম, আচম্বিতে দড়াম করে সেখানকার খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল দরজার মতো এবং গর্তের মধ্যে থেকে খরগোশ যেমন তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে ছিটকে দরজার ওপাশ থেকে এপাশে এসে পড়ল শুনকনো চেহারার খর্বকায় একটি মানুষ।

শান্তস্বরে বলল হোমস, ক্যাপিটাল! ওয়াটসন, এক বালতি জল ঢেলে দাও খড়ের গাদায়। ঠিক আছে, ওতেই হবে! লেসট্রেড, এই হল তোমার পয়লা নম্বরের অদৃশ্য সাক্ষী, মি. জোনাস ওলডাকার।

ফ্যালফ্যাল করে নবাগতের দিকে তাকিয়েছিল লেসট্রেড। আর হঠাৎ করিডোরের জোরালো আলোয় বেরিয়ে এসে চোখ পিট পিট করে ধূমায়িত খড়ের গাদা আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল ভোজবাজির মতো বেরিয়ে আসা নবাগত লোকটা। জঘন্য মুখ তার-যেমন ধূর্ত, তেমনি কুটিল, মুখের পরতে পরতে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো। হালকা, ধূসর দুটি চঞ্চল চোখ আর ধবধবে সাদা চোখের পাতা দেখলেই কেমন যেন মনে হয় ফিচেল বুদ্ধিতে জুড়ি নেই এ-বুড়োর।

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে হুংকার দিয়ে ওঠে লেসট্রেড, এসবের মানে কী? এতদিন ওর ভেতরে কী করছিলেন শুনি!

রাগে গনগনে হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ। কুঁচকে ছোটো হয়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করল ওলডাকার। বলল, কারো কোনো ক্ষতি করিনি আমি।

করেননি? নিরপরাধ একটি ছেলেকে ফাঁসির কাঠে ঝোলাতে হলে যা যা দরকার সবই করছেন আপনি। এই ভদ্রলোক না-থাকলে তো আপনার টিকি ধরা যেত না।

কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল ওলডাকারের কুৎসিত জানোয়ারের মতো মুখখানা। প্যানপেনে নাকি সুরে বলল, বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক তামাশা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার।

আঁ, তামাশা? তামাশা বার করে দিচ্ছি আপনার কয়েক বছরের জন্য রামগরুড়ের ছানা বানিয়ে ছাড়ব আপনাকে। নীচে নিয়ে যাও একে-আমি না-আসা পর্যন্ত বসবার ঘরে আটকে রাখো।

ওয়াটসন! চলো এবার দেখা যাক ইঁদুরটা ঘাপটি মেরে বসে ছিল কোথায়।

কাঠের ওপর পলেন্ডারা করা পার্টিশনের ঘায়ে সুকৌশলে লুকোনো দরজাটা। দেখলে মনে হয়, প্যাসেজের শেষ বুঝি এইখানে, কিন্তু দরজা খুললে বোঝা যায় আরও ছ-ফুট পরে নিরেট দেওয়ালের ধারে এসে তার শেষ। বরগার কাছে সরু সরু ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো আসছিল ঘরটায়। দু-একটা আসবাবপত্র, খাবার আর জল ছাড়াও প্রচুর বই আর দৈনিক পড়ে থাকতে দেখলাম কুঠরির মধ্যে।

বেরিয়ে এসে হোমস বলল, স্থপতি হওয়ার সুবিধে তো এইখানেই। কাকপক্ষীকে না-জানিয়ে নিজেই বানিয়ে রেখেছে খাসা চোরাকুঠরিটা—বিটলেমোর সাক্ষী রেখেছে শুধু একজনকে, মিসেস লেক্সিংটন। লেসট্রেড, এ-ভদ্রমহিলাকেও ঝোলায় পুরতে ভুলো না যেন।

ভুলব না মি. হোমস। কিন্তু এ-জায়গার হদিশ কী করে পেলেন বলুন তো?

প্রথম থেকেই আমার স্থির বিশ্বাস ছিল বিটলে বুড়োটা বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। দুটো করিডোরেই পা মেপে মেপে হেঁটে দেখলাম, ওপরেরটা নীচেরটার চাইতে ছ-ফুট কম লম্বা। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে অমূলক নয় প্রমাণ পেলাম এবং তার গোপন জায়গারও হদিশ পেলাম। আগুন আগুন চিৎকার শুনলে প্রাণের ভয়ে কোটর ছেড়ে সে বেরোবেই—তাই ওই ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন। অবশ্য ওসব কিছু না-করেই তাকে থেপ্তার করা যেত, কিন্তু তার নিজে বেরিয়ে আসাটা বেশ একটা মজার দৃশ্য হবে মনে করেই এ-নাটকের অবতারণা করেছি। এ ছাড়াও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আজ সকালে তোমার মশকরার প্রতিফল এইভাবে তোমার পাওয়া উচিত।

সেদিক দিয়ে আপনি আমার উচিত শিক্ষাই দিয়েছেন, স্যার। কিন্তু লোকটি যে বাড়িতেই ঘাপটি মেরে আছে—এ-খবর আপনি পেলেন কার কাছ থেকে?

বুড়ো আঙুলের ছাপের কাছ থেকে। তুমি বললে, সব শেষ। আমিও বললাম তাই—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আমি জানতাম গতকাল এ-ছাপ ছিল না ওখানে। সব জিনিস আমি একটু বেশি খুঁটিয়ে দেখি, আড়ালে-আবডালে দু-চার কথা বলতেও ছাড় না তোমরা। গতকাল হল ঘরটাও আমি এইভাবে দেখেছিলাম বলে ভালো করেই জানতাম দেওয়ালে কোনো দাগ ছিল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ছাপটা ফেলা হয়েছে রাত্রেই।

কিন্তু কীভাবে?

খুব সহজে। প্যাকেটগুলো গালামোহরকরার সময়ে জোনাস ওলডাকার একবার ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলটা নরম মোমের ওপর চেপে ধরে গালাস ওপর টিপে ধরেন। জিনিসটা এমনই স্বাভাবিক এবং এতই তাড়াতাড়ি হয়েছে যে খুব সম্ভব ম্যাকফারলেনের নিজেরও তা মনে নেই। ওলডাকার অবশ্য মনে কোনো প্যাঁচ না-নিয়েই এ-কাজ করেছেন। পরে, চোরাকুঠরির মধ্যে একলা বসে সমস্ত কেসটা মনে মনে তোলপাড় করার সময়ে ওঁর মাথায় আসে যে, ছাপটাকেই কাজে লাগিয়ে অকাট্য প্রমাণ খাড়া করে আরও জোরালো করে তোলা যাবে বেচারি ম্যাকফারলেনের মামলাকে। গালামোহর থেকে বুড়ো আঙুলের ছাপটা মোমের ছাঁচে তুলে নেওয়া খুবই সোজা। তারপরে আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে রক্ত বার করে, সেই রক্ত দিয়ে মোমের ছাঁচটাকে ভিজিয়ে নিয়ে দেওয়ালে টিপেছেন হয় তিনি নিজেই, আর না হয় মিসেস লেক্সিংটন। দলিলপত্রগুলো যদি একবার নেড়েচেড়ে দেখ লেসট্রেড, আমি বাজি রেখে বলতে পারি অন্তত একটা গালামোহরে ম্যাকফারলেনের ছাপ তুমি পাবেই।

ওয়াভারফুল। সোল্লাসে চেষ্টা করে ওঠে লেসট্রেড। ওয়াভারফুল! আপনার কথা শুনে সব কিছুই ক্রিস্টালের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন মি. হোমস, এই সাংঘাতিক শঠতার উদ্দেশ্য কী?

আমার খুব মজা লাগছিল লেসট্রেডের ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করা দেখে, অশিষ্ট আচরণের খোলস চকিতে খসিয়ে ফেলে শিষ্যের মতো গুরুর কাছে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দেখে।

উদ্দেশ্য অনুমান করা খুব কঠিন নয়, লেসট্রেড। জোনাস ওলডাকারের মতো দারুণ ঈর্ষাকাতর, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক তুমি দুটি দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। জান কি, ম্যাকফারলেনের মা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি? জান না? তখনই আমি তোমায় বললাম শুরু কর ব্ল্যাকহিডে, শেষ কর, নরউডে। যাক, ম্যাকফারলেনের মায়ের এই প্রত্যাখ্যান ওলডাকারের বুকে যে-প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়েছিল, তা জ্বলেছে সারাজীবন। বয়সের ভারে ক্ষমার বারিসিঞ্চনে তা স্তিমিত হয়ে আসার বদলে আরও লেলিহান হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষ-বিষে জর্জর কুটিল মস্তিষ্কে সারাজীবন ধরে শুধু প্ল্যান এঁটেছেন আর প্রতীক্ষা করেছেন, সুযোগ কিন্তু আসেনি। গত দু-এক বছর ধরে কপাল বড়ো মন্দ গেছে তার। লুকিয়ে-চুরিয়ে শেয়ার মার্কেটে ভাগ্যপরীক্ষা করতে গিয়ে খুব সম্ভব বেকায়দায় পড়েছিলেন। পাওনাদারদের বড়ো আঙুল দেখানোর মতলব এঁটে মি. কর্নিলিয়াসের নামে মোটা টাকার চেক কাটতে শুরু করেন। আমার বিশ্বাস, জোনাস ওলডাকারের ছদ্মনাম কর্নিলিয়াস। চেকগুলো সম্পর্কে এখনও কোনো তদন্ত করিনি বটে, তবে আমার ধারণা, ছোটোখাটো কোনো টাউনে কর্নিলিয়াসের নামেই ভাঙানো হয়েছে

চেকগুলো। মাঝে মাঝে হয়তো সেখানে গিয়ে ওলকার কর্নিলিয়াস সেজে থেকেও এসেছেন। তাঁর আসল মতলব ছিল সমস্ত টাকা তুলে নেওয়ার পর একেবারে নাম-ধাম পালটে নতুন পরিবেশে নতুনভাবে নতুন জীবন শুরু করার।

আপনার অনুমান সঠিক হওয়াই স্বাভাবিক, মি. হোমস।

এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে পড়ার আগে তাঁর একদা প্রিয়তমার বুকে শেল হেনে যাওয়ার চমৎকার পরিকল্পনার জন্যে তুমি তার তারিফ না-করে পারবে না, লেসট্রেড। এক ঢিলে দু-পাখি মারার আয়োজন করেন ভদ্রলোক। পুলিশ যাতে তার পিছু নিতে না-পারে, তাই বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়া, সঙ্গেসঙ্গে ম্যাকফারলেনের মায়ের মন ভেঙে দেওয়া তার ছেলেকে খুনি প্রমাণ করে। কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর প্ল্যান। দক্ষ শিল্পীর মতোই ধাপে ধাপে নিখুতভাবে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন প্ল্যানটা। পাকাপোক্ত মোটিভ হিসাবে উইলের আইডিয়া, চুপিসারে মা বাপকে না-জানিয়ে ম্যাকফারলেনের ব্ল্যাকহিডে আসা, ছড়ি রেখে দেওয়া, রক্তের দাগ, ছাইয়ের গাদায় বোতাম আর জানোয়ারের দেহাবশেষ—সবই হয়েছিল অপূর্ব। কয়েক ঘন্টা আগেও আমিও হালে পানি পাইনি, ভেবেছিলাম, এ মরণ-জাল থেকে আর উদ্ধার নেই বেচারি ম্যাকফারলেনের। কিন্তু প্রত্যেক দক্ষ শিল্পীর একটা ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা থাকে। তা হচ্ছে, ঠিক কখন আর না-এগিয়ে থামা উচিত—সে-জ্ঞান। কেসটায় কোনো গলদই ছিল না, তবুও শিকারের গলায় দড়ির ফাঁস আরও একটু আঁট করে দেওয়ার বিকৃত কল্পনায় উল্লসিত হয়ে একটু এগোতেই গেল সব মাটি হয়ে। চলো হে লেসট্রেড, নীচে যাওয়া যাক। লোকটাকে দু-একটা প্রশ্ন করার আছে।

বৈঠকখানার দু-পাশে পুলিশম্যান নিয়ে বসে ছিলেন ধুরন্ধর শিরোমণি কুটিলমতি জোনাস ওলডাকার ।

আমরা ঢুকতেই আবার শুরু হল নাকিসুরে একঘেয়ে প্যানপ্যানানি, বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক রগড় করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমার । নিজেকে লুকিয়েছিলাম শুধু আমার অন্তর্ধানের ফলে কী হয় না হয় তাই দেখার জন্যে । বেচারি মি. ম্যাকফারলেনের কোনোরকম ক্ষতি করার মতলব নিয়ে আমি কিছু করিনি স্যার ।

লেসট্রেড বললে, সে-বিচার করবে জুরিরা । আমরা আপনার নামে ষড়যন্ত্র করার মামলা দায়ের করব । খুন করার প্রচেষ্টার চার্জ আনতে পারলে তো কথাই নেই ।

হোমস বললে, খুব সম্ভব এও দেখতে পাবেন যে আপনার পাওনাদারেরা আইনসংগতভাবেই মি. কর্নিলিয়াসের ব্যাঙ্ক তহবিল আটক করে বসেছে ।

চমকে উঠে খরখরে বিষাক্ত চোখে বন্ধুবরের পানে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন খর্বকায় বুড়ো ।

তারপর বললেন, ধন্যবাদ আপনাকে । আমার দেনা আমি শিগগিরই শোধ করে দেব ।

অল্প হেসে বলল হোমস, আমার তো মনে হয় আগামী কয়েক বছর অনেক ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে । ভালো কথা, আপনার পুরোনো ট্রাউজার্সের সঙ্গে

কাঠের গাদায় আর কী ফেলেছিলেন বলুন তো? মরা কুকুর? খরগোশ? তবে কী? বলবেন না? কী বিপদ! এত নিষ্ঠুর হলে চলে কী করে? বেশ, বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি পোড়ে হাড়, ছাই আর রক্তের চাহিদা মেটাতে গোটা দুয়েক খরগোশই যথেষ্ট? একাহিনি যদি কোনোদিন লেখ, ওয়াটসন, তবে খরগোশ দিয়েই তা শেষ কোরো।

টীকা

কুটিল বুড়োর কুচক্র : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য নরউড বিল্ডার ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের নভেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় এবং আমেরিকার কলিয়াস উইকলির ৩১ নভেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পের পাণ্ডুলিপি নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরির ব্রেগ সংগ্রহে এখনও সযত্নে রাখা আছে।

প্র্যাকটিস বেচে দিয়ে ফিরে এসেছি : বহু গবেষক এই বক্তব্য থেকে এবং আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা থেকে অনুমান করেন দ্য ফাইনাল প্রবলেম এবং দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এম্পটি হাউস-এর ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াটসনের স্ত্রী মেরি মর্সটান পরলোকগমন করেন।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

গতকাল গভীর রাতে : গতকাল গভীর রাতের ঘটনা এত বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সকালের সংবাদপত্রে প্রকাশ করা ডেলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিকের নিশ্চয় অতিমানবিক কৃতিত্ব।

থ্রেসিয়ামস বিল্ডিংস : বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ী, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং রয়্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার টমাস থ্রেসিয়াম-এর নামে অফিসবাড়ি অবস্থিত ছিল মটন স্ট্রিট-এ।

সাক্ষী হিসাবে সই করল আমার কেরানি : ইংলন্ডে এবং ভারতবর্ষের আইনে উইলে মাত্র একজন সাক্ষীর সই যথেষ্ট নয়। দরকার অন্তত দুজন সাক্ষী, সেক্ষেত্রে এই উইলটি আইনের চোখে অগ্রাহ্য।

ব্ল্যাকহিডে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি : লোয়ার নরউড থেকে ব্ল্যাকহিডের দূরত্ব কিন্তু মাত্র চার মাইল।

মরা কুকুর? খরগোশ?: সামান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই কিন্তু লেসট্রেড বা হোমস বুঝতে পারতেন পোড়া দেহাবশেষ মানুষের নাকি পশুর।

খেলোয়াড়ের খেলায় অফাট

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মিসিং থ্রি-কোয়ার্টার]

বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় দুর্বোধ্য বিদঘুটে টেলিগ্রাম পাওয়ায় মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। কিন্তু একটা কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে। বছর সাত-আট আগে ফেব্রুয়ারির এক বিষণ্ণ সকালে টেলিগ্রামটা এসে পৌঁছায় আমাদের হাতে। এবং তা পাওয়ার পর ঝাড়া পনেরো মিনিট রীতিমতো হকচকিয়ে বসে রইল মি. শার্লক হোমস। টেলিগ্রামটা এসেছিল তারই নামে :

দয়া করে আমার জন্যে অপেক্ষা করুন, ভয়ানক দুর্দৈব। রাইট উইং থ্রি-কোয়ার্টার* নিরুদ্দেশ। আগামীকাল অপরিহার্য।-ওভারটন।

পোস্টমার্ক স্ট্র্যান্ডের, ছাড়া হয়েছে সাড়ে দশটায়, টেলিগ্রামটা বার বার পড়তে পড়তে বলল হোমস। পাঠাবার সময়ে মি. ওভারটন বাস্তবিকই বিলম্বিত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই অসংলগ্ন তারবার্তার। বেশ, বেশ, আমার তো মনে হয় টাইমস পড়া শেষ হওয়ার আগেই এসে পড়বেন ভদ্রলোক। তখনই না হয় জানা যাবে এ-ব্যাপারে আদ্যোপান্ত। এই আকালের দিনে হাত-পা গুটিয়ে জড় হয়ে থাকার চাইতে অতি তুচ্ছ সমস্যাকে স্বাগতম জানাব আমি।

যেমনটি আশা করেছিলাম, টেলিগ্রাম আসার একটু পরেই পৌঁছে গেলেন তারপ্রেমক স্বয়ং। কার্ডে নাম দেখলাম, মি. সিরিল ওভারটন, ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজ। আর তারপরেই দোরগোড়ায় আবির্ভূত হলেন নিরেট হাড় আর মাংসপেশি দিয়ে গড়া পাক্কো যোেলো টন ওজনের এক অতিকায় যুবাপুরুষ। দুই বিশাল কাঁধ মেলে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে আমাদের দুজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। সুশ্রী সুন্দর মুখে দেখলাম উদবেগজনিত বিভ্রান্তি আর বিহ্বল শীর্ণতা।

মি. শার্লক হোমস?

মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল আমার বন্ধু।

আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গেছিলাম, মি. হোমস। ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনসের সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি আমায় পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে। তাঁর মতে কেসটা সরকারি

পুলিশবাহিনীর আওতায় যতটা না পড়ুক, তার চেয়ে বেশি পড়ে আপনার এজিয়ারে।

দয়া করে বসুন, তারপর বলুন কী ব্যাপারে আপনার আগমন।

ব্যাপার অতি ভয়ংকর, মি. হোমস, এক কথায় বলতে গেলে অতি ভয়ংকর! আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভাবনার চোটে আমার চুলগুলো এখনও সাদা হয়ে যায়নি কেন!

গডফ্রে স্টনটন নিশ্চয় তার নাম শুনেছেন আপনি? আমাদের টিমের মেরুদণ্ড সে-গোটা টিমটার খেলা নির্ভর করে তার উপর।

ঘটনাটা এইভাবে ঘটে, মি. হোমস। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির রাগবি টিমের ক্যাপ্টেন আমি। আমার দলের সেরা খেলোয়াড় হল গডফ্রে স্টনটন। আগামীকাল অক্সফোর্ডের সাথে আমাদের খেলা। গতকাল দলবল সমেত এসে উঠলাম বেন্টলির এক প্রাইভেট হোটেলে। দশটা নাগাদ এক চক্রর ঘুরে দেখে নিলাম প্রত্যেকেই যে যার কোটরে সঁধিয়েছে কি না। আমার বিশ্বাস, একটা টিমকে চটপটে রাখতে হলে দরকার কড়া ট্রেনিং আর প্রচুর ঘুম। গডফ্রে শুতে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে দু-একটি কথা বললাম। ওকে একটু ফ্যাকাশে আর উদবিগ্ন মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? ও বললে, সামান্য একটু মাথা রয়েছে। তা ছাড়া দিব্যি সুস্থ ওর শরীর। গুডনাইট জানিয়ে আধঘন্টাটাক বাদে দারোয়ান এসে জানালেন একজন রক্ষা চেহারার দাড়িওয়ালা লোক একটা চিরকুট নিয়ে আসে গডফ্রের জন্যে। তখনও শুতে যায়নি গডফ্রে। তাই চিরকুটটা নিয়ে যায় ওর ঘরে। গডফ্রে তা পড়ামাত্র এমনভাবে ধপাস করে চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ে যেন মোক্ষম কোনো চোট পাওয়ায় নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে ওর। দারোয়ান তো দারুণ ঘাবড়ে যায় ওর রকম-সকম দেখে। আমাকে ডাকতে আসছিল, কিন্তু গডফ্রে বাধা দেয় ওকে। এক গ্লাস জল খেয়ে সামলে নেয় নিজেকে। তারপর নীচে যায় ও। লোকটা হল ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলার পর দুজনেই বেরিয়ে যায় বাইরে। শেষবারের মতো ওদের সম্বন্ধে দারোয়ান যা দেখে তা এই-যে-রাস্তাটা স্ট্র্যান্ডের দিকে গেছে, সেই রাস্তাটা ধরে প্রায় ছুটে চলেছিল ওরা দুজন। আজ সকালে দেখলাম গডফ্রের ঘর শূন্য। বিছানা পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। ওর জিনিসপত্র আগের রাতে যেমন

দেখে গেছিলাম, ঠিক সেইরকমই আছে, এতটুকু নড়চড় হয়নি। দাড়িওয়ালা আগন্তুক আসার সঙ্গেসঙ্গে এক মুহূর্তের নোটিশেই উধাও হয়েছে সে এবং এখনও পর্যন্ত ওর তরফ থেকে একটা শব্দও এসে পৌঁছোয়নি আমার কাছে। ও যে আর ফিরে আসবে, তা আমার মনে হয় না। গডফ্রে স্টনটন মনে প্রাণে স্পোর্টসম্যান। কাজেই খুব জবরদস্ত কারণ না-থাকলে ট্রেনিং ফাঁকি দেওয়া, ক্যাপ্টেনকে না যোক ভোগান্তিতে ফেলার পাত্র সে নয়। না, না, বেশ বুঝেছি, এই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া। আর কোনোদিনই তাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না।

চোখে-মুখে নিবিড়তম তন্ময়তা নিয়ে এই আশ্চর্য কাহিনি শুনল শার্লক হোমস।

তারপর শুধোলে, এরপর আপনি কী করলেন?

কেম্ব্রিজে টেলিগ্রাম পাঠলাম যদি খবর পাওয়া যায় এই আশায়। উত্তর পেয়েছি। কেউ তাকে দেখেনি।

কেম্ব্রিজে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব ছিল তার পক্ষে?

ছিল। রাত সওয়া এগারোটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে।

কিন্তু আপনি খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছেন, নিশ্চয় সে ট্রেনে রওনা হয়নি?

না, কেউ তাকে দেখেনি।

তারপর কী করলেন?

লর্ড মাউন্ট-জেমসকে টেলিগ্রাম করলাম।

লর্ড মাউন্ট-জেমসকে কেন?

গডফ্রে মা-বাপ মরা ছেলে। লর্ড মাউন্ট-জেমস তার নিকটতম আত্মীয়-খুব সম্ভব কাকা।

সত্যি? তাহলে তো এ-ব্যাপারে নতুন আলোর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। ইংলন্ডের সেরা ধনীদেব অন্যতম লর্ড মাউন্ট-জেমস।

গডফ্রেকেও তাই বলতে শুনেছি।

আপনার বন্ধু তার নিকট আত্মীয়?

হ্যাঁ, তার উত্তরাধিকারী। বুড়োর বয়স প্রায় আশি-গেঁটে বাতের হৃদ রুগি। শোনা যায়, উনি নাকি আঙুলের গাঁট দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার ছড়ি কিউয়ের ডগা ঘষলেই খড়ি লাগানোর কাজ হয়ে যায়। সারাজীবনে একটা শিলিং দেননি গডফ্রেকে-এমনই হাড়কিপটে। অথচ বুড়ো চোখ বুজলে কানাকড়িটিরও মালিক হয়ে বসবে গডফ্রে।

লর্ড মাউন্ট-জেমসের কাছে থেকে কোনো খবর পেয়েছেন?

না।

লর্ড মাউন্ট-জেমসের কাছে আপনার বন্ধু কী মোটিভ নিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার?

আগের রাতে জানি না কী-এক দুশ্চিন্তায় ছটফট করছিল ও। এ-দুশ্চিন্তা যদি অর্থ সম্পর্কিত হয়, তাহলে নিকটতম আত্মীয়ের কাছেই এ-সমস্যা নিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব-বিশেষ করে তার যখন অর্থের অভাব নেই। কিন্তু বুড়ো সম্বন্ধে আমি যতদূর শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, খুড়োর একটা পেনিও খসিয়ে আনতে পারবে না গডফ্রে। তা ছাড়া বুড়োকে একদম দেখতে পারত না ও। উনি সাহায্য করতে চাইলেও যেত না বলেই মনে হয় আমার।

বেশ, বেশ, সে সমস্যার মীমাংসা শিগগিরই করে ফেলবখন। খুড়োমশাই লর্ড মাউন্ট-জেমসের কাছে যাওয়ারই মতলব যদি আপনার বন্ধুবরের থেকে থাকে তাহলে তো আর একটা জিনিসের ব্যাখ্যা শোনাতে হয় আপনাকে। অত রাতে ওই রুম্ফ লোকটাই-বা এল কেন এবং তার আসার ফলে আপনার বন্ধুটিই-বা এত উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন?

দুই হাত মাথা চেপে ধরে সিরিল ওভারটন বললেন, আমি এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

হোমস বললে, বেশ, বেশ, কাজকর্মের ঝামেলা আজ আর কিছু নেই, কাজেই আপনার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলে বিলক্ষণ সুখী হব আমি। একটা কথা বিশেষ করে বলে রাখি। এই তরুণ ভদ্রলোকটির জন্যে আর অপেক্ষা না-করে ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আপনি যা বললেন, নিশ্চয় অপারিসীম গুরুত্বপূর্ণ কোনো দরকারে এইভাবে তাকে উধাও হতে হয়েছে এবং এই দরকারটুকুর জন্যেই এখনও তার আটক থাকা সম্ভব। চলুন, সবাই মিলে একবার হোটেলটা দেখে আসি। এব্যাপারে দারোয়ানটা হয়তো নতুন কিছুর হদিশ দিতে পারে।

দীনহীন নগণ্য সাক্ষীদের ভয় ভাঙিয়ে তাদের সহজ করে তোলার আর্টে মহাওস্তাদ শার্লক হোমস। দেখতে দেখতে গডফ্রে স্টনটনের পরিত্যক্ত ঘরের গোপন পরিবেশে দারোয়ানের পেট থেকে সব কথাই সে নিপুণ কায়দায় বার করে নিলে একে একে। গতরাতে যে-লোকটি দেখা করতে এসেছিল গডফ্রে স্টনটনের সাথে, সে তো ভদ্রলোক ছিলই না, শ্রমিকশ্রেণির লোকও নয়। দারোয়ানের ভাষায় সে একজন নিছক মাঝামাঝি লোক। বছর পঞ্চাশ বয়স। কাঁচাপাকা চুল মেশানো ধূসর দাড়ি। সাদাসিদে পোশাক। খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল লোকটাকে। চিরকুটটা বাড়িয়ে ধরার সময় থর থর করে লোকটার হাতটা কাঁপতে দেখেছিল দারোয়ান। হল ঘরে নেমে এসে স্টনটন লোকটার সঙ্গে করমর্দন করেনি। শুধু কয়েকটি কথার আদানপ্রদান হয় ওঁদের মধ্যে। তার মধ্যে একটি শব্দ ধরতে পেরেছিল দারোয়ান। তা হল সময়। তার পরেই হস্তদন্ত হয়ে কীভাবে

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোনান ডয়েল । শার্লক হোমস

উধাও হন তাঁরা, তা তো আগেই বলা হয়েছে। হল ঘরের ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা বেজেছিল।

স্টনটনের বিছানায় বসে হোমস বললে, আচ্ছা, তুমি তো দিনের বেলায় ডিউটি দাও, তাই না?

ইয়েস স্যার। এগারোটায় শেষ হয় আমার ডিউটি।

রাতের দারোয়ান কিছু দেখেনি, কেমন?

না, স্যার। অনেক রাতে একটা থিয়েটার-পার্টি এসেছিল। আর কেউ না।

কালকে সারাদিনই তুমি ডিউটিতে ছিলে?

ইয়েস স্যার!

মি. স্টনটনের কাছে কোনো খবর নিয়ে যেতে হয়েছিল তোমায়?

ইয়েস স্যার। একটা টেলিগ্রাম।

আ! ইন্টারেস্টিং! তখন ক-টা বেজেছিল?

প্রায় ছ-টা ।

টেলিগ্রামটা নেওয়ার সময় কোথায় ছিলেন মি. স্টনটন?

এইখানে, তার ঘরে ।

উনি যখন টেলিগ্রামটা খোলেন, তখন ছিলে এখানে?

ইয়েস স্যার । যদি কোনো উত্তর নিয়ে যাওয়ার দরকার থাকে তাই অপেক্ষা করছিলাম ।

বেশ, বেশ, উত্তর কিছু-?

ইয়েস স্যার । উনি তখন লিখে ফেলেন ।

তুমি নিয়ে গিয়েছিলে ।

না, উনি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন ।

কিন্তু তোমার সামনেই লিখেছিলেন বললে না?

ইয়েস, স্যার। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর উনি বসে ছিলেন ওই গাঁটরিটার দিকে পেছন করে। ওনার লেখা হলে বললেন, ঠিক আছে, দারোয়ান, আমি নিজেই যাচ্ছি।

কী দিয়ে লিখেছিলেন?

কলম দিয়ে, স্যার।

টেবিলের ওপর ওই যে টেলিগ্রামের ফর্মগুলো রয়েছে, সেটাও কি ওদের মধ্যেই ছিল? ইয়েস, স্যার। সবার ওপরে ছিল।

উঠে দাঁড়াল হোমস। ফর্মগুলো নিয়ে গেল জানলার সামনে। তারপর খুব সাবধানে পরীক্ষা করতে লাগল একদম ওপরের ফর্মটা।

কপাল খারাপ তাই ফর্মটা পেনসিলে লেখেনি মি. স্টনটন, নিরাশ হয়ে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফর্মগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল হোমস। নিশ্চয় লক্ষ করেছ ওয়াটসন, পেনসিলে লিখলে কাগজ কুঁড়ে ছাপাটা গিয়ে পড়ে পরের পাতায়। যার ফলে বহুবার বহু সুখময় বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে নিতান্ত দুঃখজনকভাবে। সে যাই হোক, এখানে তো চিহ্নটির বালাই দেখছি না। তবুও আনন্দ হচ্ছে কেন জান? ভদ্রলোক চওড়া-মুখ পালকের কলম দিয়ে লিখেছিলেন ফর্মটা। সুতরাং ব্লটিং প্যাডের ওপর কোনো ছাপ পাব না, এ-রকম সন্দেহ যে আমি করতেই পারছি না। আ, হ্যাঁ, এই যে, যা খুঁজছি তাই!

ব্লটিং পেপারের একটা ফালি ছিঁড়ে নিলে হোমস। তারপর তা আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরতেই চোখ পড়ল নীচের বিদ্যুটে চিত্র-অঙ্করগুলো :

দারুণ উত্তেজিত হয়ে চোঁচিয়ে ওঠেন সিরিল ওভারটন, আয়নার সামনে ধরুন ফালিটা।

হোমস বললে, তার দরকার হবে না। কাগজটা খুবই পাতলা। কাজেই উলটো দিকেই পাওয়া যাবে টেলিগ্রামে পাঠানোর খবরটা। এই দেখুন। কাগজটা উলটে ধরতেই আমরা পড়লাম :

[ভগবানের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান]

উধাও হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গডফ্রে স্টনটন যে-তারবার্তা পাঠিয়েছে, এইটাই তাহলে সে-খবরের শেষের অংশটা। গোটা খবরটার অন্ততপক্ষে গোটা ছয়েক শব্দ রয়ে গেল আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ ভগবানের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান!-তা থেকে অন্তত একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। তা হচ্ছে এই একটা আসন্ন ভয়াবহ বিপদের করাল ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন, এই তরুণ খেলোয়াড়টি। এ-বিপদ থেকে একজন তাকে বাঁচাতে পারতেন। আমাদের, লক্ষ করেছ তো! আর একজন জড়িয়ে পড়েছে এ-ব্যাপারে। যাকে কিনা অমন দারুণ নার্ভাস অবস্থায়

দেখা গেছে, সেই ফ্যাকাশেমুখ, দাড়িওয়ালা লোকটিই এই দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে বলে মনে হয় কি! তাই যদি হয়, গডফ্রে স্টনটনের সঙ্গে দাড়িওয়ালার কী সম্পর্ক শুনি? এবং সেই তৃতীয় মানুষটিই-বা কে যার কাছ থেকে কিনা দুজনের প্রত্যেকেই এগিয়ে আসা বিপদের খপ্পর থেকে রেহাই পাবার জন্যে। সাহায্যের প্রত্যাশা করেছেন? আমাদের তদন্ত কিন্তু ইতিমধ্যেই সীমিত হয়ে এসেছে এইটুকু পরিধির মধ্যে।

টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছিল কার কাছে আমাদের এখন শুধু সেই খবরটা জানা দরকার। মত প্রকাশ করি আমি।

এগজ্যাক্টলি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। তোমার চিন্তাশক্তির মধ্যে প্রজ্ঞার স্বাক্ষর থাকলেও আগেই তা আমার মাথায় খেলে গেছে। কিন্তু একটা কথা না-বলে পারছি না। যেকোনো পোস্ট অফিসে হনহন করে সটান ঢুকে গিয়ে তুমি যদি অন্য কারো পাঠানো তারবার্তার প্রতিলিপি দেখতে চাও, তাহলে হয়তো কর্মচারীরা বিলম্বিত গররাজি হতে পারে তোমাকে অনুগৃহীত করার ব্যাপারে। আশা করি, এ-পয়েন্টটা তুমিও ভেবে দেখেছ। এসব ব্যাপারে লাল ফিতের দাপট এত বেশি যে কহতব্য নয়। যাই হোক, সামান্য একটু সূক্ষ্মবুদ্ধি ঘষামাজা কথাবার্তা দিয়েই কাজ হাসিল করা যাবে বলে মনে হয়। মি. ওভারটন, ইতিমধ্যে আপনার সামনেই আমি টেবিলের ওপর ফেলে যাওয়া এই কাগজপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।

অনেকগুলো চিঠি, বিল আর নোটবই পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। চটপট কিন্তু কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে সব কিছু উলটপালটে চকিত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিল

হোমস । তারপর বললে, কিছুই নেই এখানে । ভালো কথা, আপনার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিশ্চয় খুবই ভালো ছিল-মানে কোনোরকম গুণ্গোল ছিল না দেহযন্ত্রে-তাই তো?

লোহার মতো মজবুত আর সুস্থ ওর শরীর ।

কোনোদিন উনি অসুস্থ হয়েছেন বলে জানেন আপনি?

একদিনের জন্যেও নয় । বুটের ডগা দিয়ে শট করার ফলে একবার বিছানা নিতে হয়েছিল । আর একবার মালাইচাকি সরে গিয়েছিল । ব্যস, আর কিছু না ।

আপনি যতটা মনে করেন, হয়তো ততটা মজবুত উনি ছিলেন না । আমার মনে হয় কোনো গোপন অসুখ তাঁর থাকলেও থাকতে পারে । তাই আপনার সম্মতি নিয়ে দু-একটা কাগজ পকেটস্থ করছি । বলা যায় না, ভবিষ্যৎ তদন্তে কাজে লেগে যেতে পারে ।

ঠিক এই সময়ে খিটখিটে গলায় কে চেষ্টা করে উঠল, সবুর! সবুর! তাকিয়ে দেখি আজব চেহারার একজন খর্বকায় বুড়ো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত বেঁকিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি জুড়েছেন । লোকটার পরনে কুচকুচে কালো পরিচ্ছদ । চিমটি কাটলে ধুলো উঠে আসে এমন ময়লা । মাথায় বেজায় চওড়া কিনারাওলা সিল্কের লম্বা টুপি । গলায় টিলেঢালা সাদা নেকটাই । সব মিলিয়ে মিশিয়ে বাহার যা খুলেছে যে দেখলে পরে মনে হয় নিশ্চয় কোনো অভাব্য অমার্জিত গাঁইয়া । অথবা সমাধির ব্যবস্থা যারা করে তাদের ভাড়া করা কান্নাওয়ালা । কিন্তু এ-রকম নোংরা বিদঘুটে চেহারার লোকটার স্বরে এমন একটা

আতীক্ষ টংকার ছিল, হাবভাবের এমন একটা চকিত তীব্রতা ছিল যে তা জোর করে মানুষের মনোযোগ আদায় করে তবে ছাড়ে।

আরে, মশাই, আপনি কে শুনি? আর কীসের অধিকারেই-বা এই ভদ্রলোকের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন? শুধোলেন বৃদ্ধ।

আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এই ভদ্রলোকের অদৃশ্য হওয়ার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বার করছি মাত্র।

ওহো, তাই নাকি? কার নির্দেশে চেষ্টা করছেন শুনি?

এই ভদ্রলোকের নির্দেশে। ইনি স্টনটনের বন্ধু। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এঁকে সুপারিশ করেছিলেন আমার সাহায্য নেবার জন্যে।

আপনি কে, মশাই?

আমি সিরিল ওভারটন।

তাহলে আপনিই আমায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। আমার নাম লর্ড মাউন্ট-জেমস। খবর পেয়েই চটপট চলে এসেছি। বেইজওয়াটারের বাসে আসতে যতটা সময় লাগে, ঠিক

ততটুকু সময় গেছে আমার এসে পৌঁছোতে। আপনিই তাহলে ডিটেকটিভ নিয়োগ করেছেন?

খরচ বহন করতে আপনি প্রস্তুত তো?

আমার বন্ধু গডফ্রেকে খুঁজে বার করার পর সে-ই সে-খরচটা দিয়ে দেবে, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই, স্যার।

কিন্তু যদি কস্মিনকালেও খুঁজে না পাওয়া যায়, আঁ? উত্তর দিন এ-প্রশ্নের?

সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তার পরিবারই—

ওসব কিছু হবে না মশাই, কিছু হবে না! গলা চিরে চিলের মতো চিৎকার করে ওঠেন খর্বকায় বৃদ্ধ। একটা কানাকড়িও আমার কাছে পাবেন না—ভুলেও সে-প্রত্যাশা করবেন না আপনি একটা কানাকড়ির জন্যেও নয়! বুঝেছেন তো, মি. ডিটেকটিভ! ওই ছোকরার আত্মীয়স্বজন বলতে শুধু আমি। এবং পরিষ্কার বলে রাখছি এজন্যে আমি কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না। আমি কখনো পয়সার অপব্যয় করি না। সেইজন্যেই হয়তো তার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকতে পারে। কিন্তু এখন আর নতুন করে অপব্যয় শুরু করার অভিপ্রায় আমার নেই। আর ওই যে কাগজগুলো নিয়ে স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করছেন, ওর মধ্যে যদি মূল্যবান কিছু থাকে তো বলে রাখছি আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে সেসবের জন্যে।

শার্লক হোমস বললে, ভেরি গুড, স্যার। ইতিমধ্যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? এই তরুণটির অন্তর্ধান সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোনো থিয়োরি আছে কি?

না মশাই, নেই। যথেষ্ট লম্বা-চওড়া হয়েছে সে এবং নিজের ভালোমন্দ বোঝবার মতো বয়েসও হয়েছে। এখন যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো মহামূখ হয়ে থাকে সে, তো আমি তাকে গোরুখোজা করার কোনোরকম দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই।

আপনার অবস্থাটা বেশ বুঝছি আমি, বলে হোমস। দুষ্ট বুদ্ধি মিটমিট করে ওঠে ওর দুই চোখে। আপনিও হয়তো আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন। গডফ্রে স্টনটনকে গরিব মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কাজেই তাকে যদি গুম করাই হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয় তার নিজস্ব সম্পত্তির জন্যে করা হয়নি। আপনার ধন-বিভবের সুখ্যাতি সাগরপারেও পৌঁছেছে, লর্ড মাউন্ট-জেমস এবং সেইজন্যেই হয়তো আপনার ভাইপোকে একদল চোর-ডাকাত নিজেদের খপ্পরে এনে ফেলেছে আপনার বাড়ি, আপনার রোজকার অভ্যাস আর আপনার দৌলতের খবরাখবর আদায় করার জন্যে। আমার বিশ্বাস, এমনটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দেখতে দেখতে নেকটাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল খর্বকায় বুড়োর ত্রাসকম্পিত মুখখানা।

হায় ভগবান, এ কী ধারণা! এ-রকম শয়তানির কথা যে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি আমি! দুনিয়ায় এ-রকম অমানুষিক বদমাশের দলও আছে! কিন্তু গডফ্রে ছেলেটি খাসা-ভারি দুঁদে আর শক্ত ছেলে। কাকাকে পথে বসানোর মতো কাজ শত প্রলোভন দেখালেও তাকে দিয়ে করানো যাবে না। আজই সন্ধ্যায় মালকড়ি ব্যাঞ্চে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করছি। ইতিমধ্যে আপনি চেষ্টার কসুর করবেন না, মি. ডিটেকটিভ! আমার অনুরোধ, ছেলেটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্যে কিছুই করতে বাকি রাখবেন না আপনি। আর টাকা? বেশ, পাঁচ পাউন্ড, এমনকী দশ পাউন্ড

পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত রইলাম আমি।

বেকায়দায় পড়ে বেশ দমে গেছিলেন বুড়ো লর্ড মাউন্ট-জেমস। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিজাত কৃপণের কাছ থেকে আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো তথ্যই বার করা গেল না। ভাইপোর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবরাখবর রাখতেন না উনি। দ্বিখণ্ডিত টেলিগ্রামের সূত্র ছাড়া যখন আর কিছুই এল না হাতে, তখন কাগজটার এক কপি নিয়ে হোমস রওনা হল যুক্তি-শৃঙ্খলের দ্বিতীয় গ্রন্থটির প্রত্যাশায়। লর্ড মাউন্ট-জেমসকে বিদায় দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমরা। সিরিল ওভারটন গেছিলেন টিমের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই আকস্মিক দুর্দৈব সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে। হোটেল থেকে একটু এগিয়েই একটা টেলিগ্রাফ অফিস দেখতে পেলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল হোমস।

বলল, কপাল ঠুকে দেখা যাক, সফল হলেও হতে পারি। অবশ্য সময় থাকলে অনায়াসেই কাউন্টারফয়েলগুলো দেখে নিতে পারতাম কিন্তু সে-পর্যায়ে এখনও আমরা পৌঁছেইনি। এ-রকম ব্যস্তসমস্ত জায়গায় মুখ চিনে রেখে দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তো মনে হয়। সাহসে বুক বেঁধে দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

রেলিংয়ের ওদিকে বসে থাকা তরুণীটিকে মধুক্ষরিত কণ্ঠে শুধোল হোমস, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গতকাল যে-টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলাম তাতে কয়েকটা ছোট ভুল রয়ে গেছে। এখনও কোনো উত্তর না-পাওয়ায় আমার মনে হচ্ছে তলায় হয়তো আমার নামটাই লিখতে ভুলে গেছি। সত্যিই তাই কিনা বলতে পারেন আমায়?

এক তাড়া কাউন্টারফয়েলের ওপর ঝুঁকে পড়ল মেয়েটি।

ক-টায়? শুধায় সে!

ছ-টার একটু পরেই।

কার নামে?

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চকিতে আমার পানে তাকালে হোমস। তারপর, যেন বেজায় গোপনীয় কথা, এমনি সুরে ফিসফিস করে ওঠে, শেষ পঙক্তিতে লেখা ছিল ভগবানের দোহাই। উত্তর না-পাওয়ায় বড়ো উদবিগ্ন রয়েছি।

একটা ফর্ম আলাদা করে ফেললে মেয়েটি ।

এইটা । নাম নেই । বলে ফর্মটা কাউন্টারের ওপর পরীক্ষার করে বিছিয়ে ধরে ।

হোমস বলে উঠল, তাহলেই দেখুন, এইজন্যেই কোনো উত্তর পাইনি এখনও পর্যন্ত । কী বিপদ! বাস্তবিকই কী নিরেট বোকা আমি । গুডমর্নিং মিস । মন থেকে খামোখা চিন্তার বোঝা নামিয়ে দেওয়ার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ! রাস্তায় বেরিয়ে এসে দু-হাত ঘষতে ঘষতে নিঃশব্দে একচোট হেসে নিলে হোমস ।

হল? শুধোলাম আমি ।

এগিয়ে চলেছি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, দিব্যি এগিয়ে চলেছি আমরা । টেলিগ্রামখানায় এক ঝলক চোখ বোলাবার জন্যে মোটমাট সাতটা বিভিন্ন পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিলাম । কিন্তু একেবারে প্রথমটাতাই যে এইভাবে কেবল ফতে করে দেব, তা আশাই করতে পারিনি ।

লাভটা কী হল শুনি?

তদন্ত শুরু করার পয়লা নম্বর পয়েন্ট । একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ডাকল ও । দুজনে চড়ে বসার পর বললে, কিংস ক্রস স্টেশন ।

রেলপথে ভ্রমণ আছে মনে হচ্ছে?

আমার মনে হয়, এখুনি দুজনের কেস্টিজে যাওয়া দরকার। সবকটা পয়েন্ট থেকেই ওই একটি দিকেরই নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

সুপ্রাচীন ইউনিভার্সিটি শহরে যখন পৌঁছোলাম, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে আশেপাশে। স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিলে হোমস। গাড়োয়ানকে হুকুম করল ড. লেসলি আর্মস্ট্রংয়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে। মিনিট কয়েক পরেই শহরের জমজমাট অঞ্চলে রাস্তার ওপরেই একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। পথ দেখিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল বাটলার এবং বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রবেশ করলাম কনসালটিং রুমে। টেবিলের সামনে বসে ছিলেন ড. আর্মস্ট্রং।

আপনার নাম আমি শুনেছি, মি. শার্লক হোমস। আপনার বৃত্তিও আমার অজানা নয়। যেসব বৃত্তিকে আমি কোনোমতেই বরদাস্ত করি না, আপনারটিও পড়ে তাদের মধ্যে।

একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, ডক্টর, এদেশের প্রতিটি ক্রিমিনালের সঙ্গে এই বিষয়ে আপনি একমত, শান্ত স্বরে বললে বন্ধুবর।

আরে মশায়, আপনার বুদ্ধি শক্তি-প্রচেষ্টা যতক্ষণ কেবল অপরাধ নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের যেকোনো ব্যক্তিই তা সমর্থন করবে, প্রতিটি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অনুমোদন জানাবে আপনার উদ্যোগে আয়োজনের।

যদিও আমার বিশ্বাস এজন্যে সরকারি পুলিশবাহিনীই যথেষ্ট এবং এ-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই আমার মনে। কিন্তু যখনই আপনি কিনা ব্যক্তিবিশেষের গোপন করে চুপিসারে নাক গলান, যেসব পারিবারিক তত্ত্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেই মঙ্গল, সেগুলিকে খুঁচিয়ে তোলেন এবং আপনার চাইতে বেশি ব্যস্তবাগীশ যেসব পুরুষ, প্রসঙ্গক্রমে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে আসেন, তখনই জানবেন আপনার আবির্ভাবকে উটকো উৎপাত হিসেবেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে আলাপ করার চাইতে একটা গ্রন্থ রচনা করাই শ্রেয় মনে করি আমি।

নিঃসন্দেহে, ডক্টর। কিন্তু তবুও কি জানেন, গ্রন্থ রচনার থেকে এই আলাপটাই হয়তো দেখবেন বেশি প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে রাখি। আপনি যে-অভিযোগে এইমাত্র অভিযুক্ত করলেন আমাদের, আমরা কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটাই করছি। যেমন ধরুন না কেন, ব্যক্তিগত বিষয় সর্বজনসমক্ষে যাতে প্রকাশ না-পায়, সেই চেষ্টাই করতে এসেছি আমরা-যা হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না, যদি এ-কেস সরকারি পুলিশের হাতে যেত। কেননা তাদের হাতে পৌঁছানোর পরিণতিই হল সব কিছুই পাবলিকের সামনে উদঘাটিত হয়ে পড়া। আপনি আমায় একজন নিছক অনিয়ত পথ পরিষ্কারক সৈনিক হিসাবেই দেখতে পারেন। এদেশের বৈধ পুলিশ ফোর্সের আগেভাগেই চলে আমার অভিযান। আমি এসেছি মি. গডফ্রে স্টনটন সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

কী হয়েছে তার?

আপনি তো তাঁকে চেনেন, তাই না?

সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ।

আপনি জানেন উনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন?

আ, সত্যি! ডক্টরের সুকঠোর মুখের অমসৃণ রেখার বিন্দুমাত্র ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না ।

কাল রাতে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান উনি । তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর ।

ফিরে আসবে নিশ্চয় ।

আগামীকাল ভার্শিটি ফুটবল ম্যাচ ।

এসব ছেলেমানুষি খেলাধুলা সম্বন্ধে এতটুকু সমবেদনা নেই আমার । তরুণ গডফ্রেয় এহেন দূরদৃষ্টি শুনে খুবই আগ্রহ জাগছে সন্দেহ নেই, কেননা ওকে শুধু আমি চিনিই না, পছন্দও করি । কিন্তু ফুটবল ম্যাচ কোনোমতেই আমার এক্তিয়ারে আসে না ।

তাই যদি হয় তো মি. স্টনটনের এহেন অন্তর্ধানের তদন্তকার্যে আপনার সমবেদনা আমি দাবি করছি। উনি কোথায়, তা আপনি জানেন?

নিশ্চয় না।

গতকাল থেকে ওঁকে আপনি দেখেননি?

না, দেখিনি।

মি. স্টনটন কি স্বাস্থ্যবান পুরুষ?

নিরেট স্বাস্থ্য তার।

ওঁকে কোনোদিন অসুস্থ হতে দেখেছেন আপনি?

না।

ফট করে ডক্টরের চোখের সামনে এক তাড়া কাগজ মেলে ধরলে হোমস।

তাহলে তেরো গিনির এই রসিদটার একটা ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে আপনার কাছে। গত মাসে মি. গডফ্রে স্টনটন এ-টাকাটা দিয়েছেন কেম্ব্রিজের ড. লেসলি আর্মস্ট্রংকে। ওঁর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে থেকে এ-রসিদটা তুলে এনেছি আমি।

রাগে লাল হয়ে ওঠে ডক্টরের মুখ।

মি. হোমস, আপনার কাছে এ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা শোনার কারণ আছে বলে মনে হয় আমার।

রসিদটা আবার নোটবইয়ের মাঝে রেখে দিলে হোমস।

বলল, এ-সম্বন্ধে জনসাধারণের সামনে আপনার ব্যাখ্যা হাজির করা যদি ভালো মনে করেন তা, দু-দিন আগে হোক আর পরে হোক, তাই হবেখন। আগেই বলেছি আপনাকে, যে-খবর অন্য কেউ দৈনিক কাগজে ছেপে দিতে বাধ্য, আমি তা ধামাচাপা দিয়ে দিতে পারি অক্লেশে। এক্ষেত্রে, আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সব কথা খুলে বললেই সত্যি সত্যি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।

এ-সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।

লন্ডন থেকে মি. স্টনটন আপনাকে কোনো খবর পাঠিয়েছিলেন কি?

নিশ্চয় না।

কী মুশকিল! কী মুশকিল! আবার পোস্ট অফিস! অবসন্নভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল হোমস। গতকাল সন্ধ্যা ছ-টা বেজে পনেরো মিনিটে লন্ডন থেকে মি. গডফ্রে স্টনটন একটা অত্যন্ত জরুরি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন আপনাকে। তার অন্তর্ধানের সঙ্গে এ-টেলিগ্রামের একটা নিগুঢ় সম্পর্ক যে আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। আর, তবুও কিনা এখনও পর্যন্ত সে-টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোয়নি আপনার হাতে? ছিঃ ছিঃ, অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধজনক গাফিলতি। আমি এখনি স্থানীয় অফিসে গিয়ে একটা অভিযোগ লিখিয়ে রাখছি।

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো তড়াক করে টেবিলের সামনে লাফিয়ে উঠলেন, ড. লেসলি আর্মস্ট্রং। নিদারুণ ক্রোধে উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর মলিন মুখ।

বললেন, আপনাকে মশাই, একটু কষ্ট দেব। লম্বা লম্বা পা ফেলে চটপট বাড়ির বাইরে সরে পড়ুন। আপনার নিয়োগকর্তা লর্ড মাউন্ট-জেমসকে বলে দেবেন তার সাথে বা তার এজেন্টের সাথে কোনোরকম বাক্যলাপ করার বাসনা আমার নেই। না, না, মশায়, আর একটা কথাও নয়। খেপে গিয়ে ঢং ঢং করে দারুণ জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন ডক্টর। জন, এই ভদ্রলোকদের বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও। জমকালো চেহারার বাটলার এসে নির্দয়ভাবে দরজা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাদের এবং তার পরেই এসে দাঁড়ালাম রাস্তায়।

অউহাস্য করে উঠল হোমস ।

বলল, ড, লেসলি আর্মস্ট্রং বাস্তবিকই জীবনীশক্তিতে ভরপুর কড়াধাতের মানুষ । স্বনামধন্য মরিয়ার্টির তিরোধানের পর তার শূন্যস্থান পূর্ণ করার পক্ষে ডক্টরের চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আর আমি দেখিনি । অবশ্য ওই পথেই যদি ওঁর প্রতিভা পরিচালনা করতেন, তবেই পাওয়া যেত মরিয়ার্টির উপযুক্ত উত্তরসূরি । যাই হোক, বেচারি ওয়াটসন, আতিথেয়তামূল্য নির্বাহক এই শহরে আমরা এখন আটকে পড়লাম । হাতের কেস পরিত্যাগ না-করে এ-শহর ছেড়ে এক পা-ও নড়তে পারি না । আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির উলটোদিকে ওই ছোট সরাইখানাটা আমাদের চাহিদা মেটানোর পক্ষে আশ্চর্যরকমের উপযুক্ত । সামনের দিকের একটা ঘর দখল করে রাত কাটানোর মতো দরকারি জিনিসপত্র সওদা করার ব্যবস্থা যদি করতে পারি তো সেই অবসরে টুকটাক কয়েকটা তদন্ত করার সময় পাই আমি ।

হোমস যা ভেবেছিল, তার চাইতেও যে বিলক্ষণ দীর্ঘ এই কয়েকটি টুকটাক তদন্ত, তা প্রমাণিত হল ন-টা পর্যন্ত সরাইখানায় তারা না ফিরে আসায় । ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল বেচারি । বিমর্ষ মুখ হতাশায় শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছিল । সর্বান্তে ধুলোকাদার বিস্তর দাগ । ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আর ক্লান্তিতে অবসন্ন । রাতের খাওয়া ঠান্ডা হিম হয়ে পড়ে ছিল টেবিলের ওপর । জঠরানল শান্ত করে পাইপ ধরিয়ে বসার পর আবার ফিরে এল ওর অর্ধকৌতুকময় কিন্তু পুরোপুরি দার্শনিক ভাবভঙ্গি । কাজ করবার সিঁধে পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরলেই আচার আচরণের মধ্যে ঠিক এমনই দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তোলাই ওর স্বভাব ।

ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ শুনে উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ঝকঝকে গ্যাসবাতির আলোয় দেখলাম, একজোড়া ধূসর রঙের ঘোড়ায় টানা একটা ব্রহ্ম গাড়ি দাঁড়িয়ে ডক্টরের দরজার সামনে।

হোমস বললে, তিন ঘণ্টা লাগল। যাত্রা শুরু হয়েছিল সাড়ে ছটায়। ফিরে এলেন এখন। তার মানে এই যে দশ থেকে বারো মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা বৃত্ত অঞ্চলের মধ্যেই যাতায়াত করলেন উনি। প্রতিদিন এমনি যাত্রা দিনে একবার তো বটেই, মাঝে মাঝে দুবারও উনি করেন।

যে ডক্টর প্র্যাকটিস করেন, তার পক্ষে তা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু আর্মস্ট্রং তো আর সত্যি সত্যি প্র্যাকটিসের ডক্টর নন। উনি কলেজের লেকচারার এবং কনসালট্যান্ট অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ। জেনারেল প্র্যাকটিস করাকে খোড়াই পরোয়া করেন উনি। কেননা, এতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়, ফলে ক্ষতি হয় তার লেখাপড়ার। সেক্ষেত্রে এত লম্বা লম্বা পাড়ি দেওয়া তাঁর পক্ষে রীতিমতো বিরক্তিজনক। তা সত্ত্বেও কেন তার এত তৎপরতা! এবং রোজ রোজ কাকেই-বা দেখতে যান উনি?

ওঁর কোচোয়ান—

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, তার কাছেই আমি প্রথম আণ্ডয়ান হয়েছিলাম কি না, সে-বিষয়ে কি তোমার সংশয় আছে? বদখত স্বভাবচরিত্রের জন্যেই তোক বা মনিবের প্ররোচনাতেই

হোক, আমি যাওয়ামাত্র লোকটা একটা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল আমার পেছনে। ভারি চোয়াড়ে লোক। কিন্তু আমার ছড়িটার চেহারা কারোরই পছন্দ হল না, কুকুরটারও নয়, এবং ওই নচ্ছার লোকটারও নয়। কাজে কাজেই, এ-প্রসঙ্গে যবনিকা পড়ল ওইখানেই। এ-ব্যাপারের পর কোচোয়ানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমনই আড়ষ্ট হয়ে উঠল যে আরও কিছু খোঁজখবর নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যা কিছু জেনেছি তা আমাদের এই সরাইখানার উঠোনে একজন বন্ধুভাবাপন্ন স্থানীয় লোকের কাছ থেকে। ডক্টরের রোজকার অভ্যাস-টভ্যাস সম্বন্ধে অনেক খবর তার মুখেই শুনলাম। প্রতিদিন ব্রহ্ম হাঁকিয়ে যাবার খবর পেলাম তার কাছে। ঠিক এই সময়ে তার কথার যথার্থ্য প্রমাণ করার জন্যেই গাড়িটা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে!

অনুসরণ করলে না কেন?

চমৎকার, ওয়াটসন! আজকের সন্ধ্যায় দেখছি বুদ্ধির আভায় দিব্যি ঝলমল করছ তুমি! মতলবটা আমারও মাথায় এল। লক্ষ্য করেছ, হয়তো, সরাইখানার ঠিক পাশেই সাইকেলের একটা দোকান আছে। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে গিয়ে ঝটিতি একটা সাইকেল দখল করলাম সেখানে। তারপর ব্রহ্ম গাড়িখানা চোখের আড়ালে পুরোপুরি যাওয়ার আগেই শুরু করলাম অনুসরণ-পর্ব। দ্রুতগতিতে চালিয়ে নাগাল পেলাম গাড়িখানার। তারপর বুদ্ধিমানের মতো শ-খানেক গজ কি ওইরকম দূর থেকে গাড়ির আলো দেখে আঠার মতো লেগে রইলাম পেছনে। দেখতে দেখতে এসে পড়লাম শহরের বাইরে। গাঁয়ের রাস্তার ওপর দিব্যি চলেছে ডক্টরের গাড়ি, ঠিক এই সময়ে একটা নিতান্ত অপমানজনক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সামনের ব্রহ্ম। বেরিয়ে এলেন ডক্টর

আর্মস্ট্রং। দ্রুত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন ঠিক যেখানে আমি সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেঁতো হাসি হেসে ভারি চমৎকার অবজ্ঞা ছড়ানো ভঙ্গিমায় বললেন যে, রাস্তাটা যেহেতু বেজায় সরু, সুতরাং তার মনে হয় না আমার সাইকেলকে এগিয়ে যেতে দেওয়ার মতো জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হবে তাঁর গাড়ির পক্ষে। এমনভাবে কথাটা বললেন যে, তার চাইতে প্রশংসনীয় আর কিছু থাকতে পারে বলে আমার মনে হল না। ততক্ষণে গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। বড়োরাস্তা ধরে বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর সুবিধামতো একটা জায়গায় থেমে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইলাম গাড়িটার আসার প্রতীক্ষায়। কিন্তু তাঁর টিকিটিও যখন দেখতে পাওয়া গেল না, তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে বড়োরাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা যে কয়টি শাখা-পথ আছে, তাদেরই একটি ধরে উধাও হয়েছে ব্রুম গাড়ি। আবার বড়োরাস্তা ধরে ফিরে এলাম আমি কিন্তু গাড়ির চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। কিন্তু এখন তো তুমিও দেখলে, আমি ফিরে আসার পরেই ফিরে এল গাড়িটা। প্রথম প্রথম, এসব লম্বা গাড়ির সঙ্গে গডফ্রে স্টনটনের অদৃশ্য হওয়ার যে কোনোরকম সম্পর্ক থাকতে পারে, তা ভাববার মতো বিশেষ কারণ আমার মাথায় আসেনি সত্যি। মোটামুটি তদন্ত করতে গেলে যা যা দরকার, শুধু তারই ভিত্তিতে ড. আর্মস্ট্রং সম্পর্কিত সব কিছুই খোঁজখবর নিতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না, সে-বিষয়ে বেশ প্রখর চোখ রেখেছেন উনি, তখন ঘটনাটা বিলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। এবং এ-রহস্য ভেদ না-করা পর্যন্ত আমি খুশি হব না কোনোমতেই।

কালকে অনুসরণ করতে পারি তাঁকে।

পারি কি? যা ভাবছ অত সোজা নয় হে। কেম্ব্রিজ জেলার মাঠপ্রান্তরের সঙ্গে মোটেই পরিচয় নেই তোমার, গা ঢাকা দেওয়ার এতটুকু অবকাশ দেয় না এ-অঞ্চল। হাতের তেলোর মতো মসৃণ, চ্যাটালো, পরিষ্কার শুধু জমির পর জমি। তা ছাড়া যে-মানুষটার অনুসরণ করেছিলাম; তিনি তো আর হাঁদারাম নন। আজ রাতেই আমায় তা আচ্ছা করে সমঝে দিয়েছেন উনি। আমি ওভারটনকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। লন্ডনে টাটকা যদি কিছু ঘটে, উনি যেন চটপট সে-খবর পাঠিয়ে দেন আমায়। ইতিমধ্যে আমরা শুধু একটি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারি, তা হল ড. আর্মস্ট্রংয়ের গতিবিধির ওপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। পোস্ট অফিসের ভালোমানুষ মেয়েটির কৃপায় স্টনটনের পাঠানো জরুরি খবরের প্রতিলিপি দেখেই ড. লেসলি আর্মস্ট্রংয়ের নাম জেনেছিলাম। আমি শপথ করে বলতে রাজি আছি, গডফ্রে স্টনটন এখন কোথায় আছেন, তা ড. আর্মস্ট্রং জানেন। আর উনি যদি সে-খবর রাখেন, আর কায়দা করে আমরা যদি তা না জানতে পারি, তাহলে সে-দোষ আমাদেরই। বর্তমানে স্বীকার না-করে উপায় নেই যে এ-রহস্যের গোলমালে অংশের চাবিকাঠিটি উনি নিয়ে বসে রয়েছেন। আর আমার স্বভাব তো তুমি জানই, ওয়াটসন এ-রকম অবস্থায় এ-খেলা ছেড়ে আমি সটকান দেওয়ার পক্ষপাতী নই।

কিন্তু পরের দিনও রহস্যের মূল সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলাম না আমরা। প্রাতরাশের পর এসে পৌঁছোল একটা চিরকুট। মুচকি হেসে আমার দিকে কাগজটা সরিয়ে দিলে হোমস।

চিরকুটটায় লেখা ছিল :

মহাশয়,

একটা বিষয়ে আপনাদের নিশ্চিত রাখতে চাই আমি। আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার চেষ্টা করে শুধু সময়ের অপব্যয় করছেন আপনি। গতরাতে নিশ্চয় আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে আমার ব্রহ্মার পেছনে একটা জানলা আছে। কাজেই, না হোক কুড়ি মাইল সাইকেল চালানোর পর যাত্রাশুরুর জায়গাতেই যদি খালি হাতে ফিরে আসা মনস্থ করে থাকেন তো আমায় অনুসরণ করতে পারেন। এই অবসরে আপনাকে জানিয়ে রাখি, গোয়েন্দাগিরি করে গুপ্তচরের মতো দিনরাত আমার ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেও স্টনটনকে কোনোমতেই সাহায্য করতে পারবেন না আপনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মি. স্টনটনের সবচেয়ে বড়ো উপকার করতে পারেন যদি আপনারা লন্ডনে গিয়ে আপনার কর্মকর্তাকে রিপোর্ট পেশ করেন যে তার ভাইপোর হৃদিশ বার করতে আপনারা অক্ষম। কেম্ব্রিজে থাকলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না আপনাদের।

—ভবদীয়

লেসলি আর্মস্ট্রং

ভারি স্পষ্টবাদী আর সাক্ষা প্রতিপক্ষ এই ডক্টর ভদ্রলোক, বলে হোমস। বেশ, বেশ, আমার কৌতূহলকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন উনি। সুতরাং ওঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করার আগে সত্যিকারের আরও কিছু খবর আমায় জানতেই হবে।

আমি বললাম, দরজায় গাড়ি পৌঁছে গেছে দেখছি। গাড়ির ভেতর উঠেছেন উনি। ওঠবার সময় লক্ষ করলাম আমাদের জানলার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ডক্টর। সাইকেল নিয়ে আমি একবার কপাল ঠুকে দেখব নাকি?

না, না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। তোমার বুদ্ধিশক্তির সহজাত তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে যদিও আমার শ্রদ্ধা কিছুমাত্র ফিকে হয়নি, তবুও ওই ধড়িবাজ ডক্টরটার তুমি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে বলে মনে হয় না আমার। তার চেয়ে বরং আমি গিয়ে আমার নিজস্ব পদ্ধতিমাত্তিক স্বনির্ভর কয়েকটা অভিযান চালিয়ে কিছু কিছু আবিষ্কার করে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করলেও করতে পারি। তাই তোমাকে রেখে যাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই, ভায়া। নিরালা নির্জন গাঁয়ের ধারে, যেখানে শহরের হটগোল নেই, সেখানে দু-দুজন সন্ধানী আগন্তুককে ঘুরঘুর করতে দেখলে কানঘুসোটা কী পরিমাণে প্রবল হয়ে উঠবে বুঝতেই পারছ। হাটেবাজারে এ নিয়ে আলোচনা হোক, তা আমি চাই না। অনেক কিছু দেখবার জিনিস আছে এ পবিত্র শহরে। তুমি না হয় তারই কিছু কিছু দেখে ফেল, নিঃসন্দেহে বিস্তর আনন্দ পাবে তাতে। আশা করছি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব। সঙ্গে আনব এমন রিপোর্ট যাতে আরও সরল হয়ে উঠবে আমাদের অনুসন্ধান পর্ব।

কিন্তু আরও একবার নিরাশ হওয়া লেখা ছিল বন্ধুবরের ললাটে। শান্ত ক্লান্ত দেহে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল রাতের অন্ধকারে।

সারাদিনটা বিলকুল বরবাদ গেল, ওয়াটসন। ডক্টর মোটামুটি যদিকে গেলেন, সেই দিক বরাবর গিয়ে সারাদিন ধরে কেন্দ্রিজ শহরের ওইদিকের সবকটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

যেসব আড্ডাখানায় গাঁয়ের লোকেরা আসে, বসে পাঁচটা কথা বলে, এইরকম পুঁড়ির দোকানে গিয়ে এস্তার পয়েন্ট লিখেছি আর মিলিয়েছি। খবর সংগ্রহ করার আরও যে কয়েকটা আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে, কোথাও টু মারতে বাকি রাখিনি। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে চক্কর দিতে হয়েছে আমায়। চেস্টারটন, হিসটন, ওয়াটারবীচ আর ওকিংটন-প্রত্যেকটিতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। এবং প্রতিবারই হতাশ হয়েছি। এ-রকম খোলামেলা ফাঁকা জায়গা শহরের মতো যানবাহন পথচারীর ভিড় যেখানে মোটেই নেই, সেখানে অতবড়ো একটা ব্রুম আর গাড়িতে জোতা দু-দুটো ঘোড়া সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া তো উচিত নয়। আরও একবার টেক্সা মারলেন ডক্টর। আমার নামে টেলিগ্রাম আছে?

আছে। আমি খুলেছি। এই যে ট্রিনিটি কলেজের জেরেমি ডিক্সনের কাছ থেকে পমপিকে চেয়ে নিন। মানে বুঝলাম না।

আরে এ তো জলের মতো পরিষ্কার। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুবর ওভারটনের টেলিগ্রাম এটা। এখুনি একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিচ্ছি মি. জেরেমি ডিক্সনকে। তারপরেই যে আমাদের কপাল ফিরে যাবে সে-বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই। ভালো কথা ম্যাচ সম্বন্ধে কোনো খবর আছে নাকি?

আছে। এখানকার সাক্ষ্য দৈনিকের শেষ সংস্করণে বড়ো চমৎকার বিবরণ বেরিয়েছে ম্যাচটার। অক্সফোর্ড এক গোলে জিতেছে আর দুবার প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের কাছে সবার আগে বল স্পর্শ করেছে। সবসুদ্ধ এক গোল দু-ট্রাইজে কেম্ব্রিজকে হারিয়েছে।

বর্ণনার শেষ ক-টি লাইনে লেখা ছিল : লাইট ব্লু-দের হেরে যাওয়ার মূল কারণই হল তুখোড় ইন্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় গডফ্রে স্টনটনের আকস্মিক অনুপস্থিতি। কেমব্রিজের বাস্তবিকই মন্দ ভাগ্য বলতে হবে, কেননা খেলার প্রতিটি মুহূর্তে পদে পদে উপলব্ধি করতে হয়েছে তার অভাব। থ্রি-কোয়ার্টার লাইনে সহযোগিতা না-থাকায় এবং আক্রমণ চালানো আর আক্রমণ ঠেকানো-এই দুয়ের মধ্যেই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় দুর্মদ পরিশ্রমী দলটার সমস্ত প্রচেষ্টাই শুধু ব্যর্থ হয়নি, সূচনা করেছে আরও অনেক বিপর্যয়ের।

হোমস বললে, তাহলে বন্ধুর ওভারটনের আশঙ্কাই সত্য হল। ব্যক্তিগতভাবে ড. আর্মস্ট্রংয়ের সাথে আমিও একমত। ফুটবল আমারও এজিয়ারে পড়ে না। আজ সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করা যাক, ওয়াটসন। কেননা, এখনই দেখতে পাচ্ছি কালকের দিনটায়, অনেকরকম ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে!

পরের দিন সকালে হোমসের ওপর চোখ পড়তেই রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আগুনের ধারে ওর ছোটো হাইপেডারমিক সিরিজটা হাতে নিয়ে বসে ছিল ও। ওর প্রকৃতির একটিমাত্র দুর্বলতার সঙ্গে সিরিজটার যোগাযোগ ভাবতেই ভয় পেলাম। তারপর যখন ওর হাতের মধ্যে, ঝকঝক করে উঠতে দেখলাম জিনিসটাকে, তখন যেন নিঃসীম বিভীষিকা দেখলাম দুই চোখে। আমার মুষড়ে পড়া ভাব দেখে অউহাস্য করে উঠল হোমস। তারপর সিরিজটা নামিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর।

আরে না না মাই ডিয়ার, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এবারে এ-যন্ত্রের ব্যবহার অশুভ উদ্দেশ্যে নয়। বরং রহস্যমোচনের চাবিকাঠি হিসেবে এ-বস্তুটির প্রয়োজন যে

কতখানি, শিগগিরিই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই সিরিজের ওপরই রয়েছে আমার যাবতীয় আশা ভরসা। এইমাত্র ছোটোখাটো একটা অভিযান শেষ করে ফিরছি আমি। অভিযানটা গুপ্তচরগিরির। হাওয়া অনুকূল। জবরদস্ত ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও, ওয়াটসন। কেননা, আজ ড. আর্মস্ট্রংকে অনুসরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করছি আমি এবং একবার যদি ওঁর পেছনে ধাওয়া শুরু হয় আমাদের, তাহলে জেনে রেখো ভদ্রলোকের কোটের পর্যন্ত না-গিয়ে বিশ্রাম বা খাওয়ার জন্যে এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারব না।

আমি বললাম, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা ব্রেকফাস্ট সঙ্গে নিয়ে যাই। কেননা, আজ সকালে রওনা হচ্ছেন উনি। দরজার সামনে ওঁর গাড়ি এসে গেছে।

ঘাবড়াও মাং! যেতে দাও ওঁকে। উনি যদি চালাক হন তো এমন জায়গায় গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে তাকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। খাওয়া শেষ হলে নীচে নেমে এসো। একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। যে-কাজ এখন করতে চলেছি, সে-কাজে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

নীচে এসে হোমসের পেছনে পেছনে গেলাম আস্তাবলের ভেতরে। একটা আলগা বাক্সের দরজা খুলে ভেতর থেকে ও বার করে আনল একটা মোটাসোটা লটপটে কান, সাদা আর খয়েরি মিশানো কুকুর। দেখতে বিল্ল আর ফক্সহাউন্ডের মাঝামাঝি বলে মনে হয়।

হোমস বলল, এসো, পমপির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। এ-অঞ্চলে গন্ধ শুকে অনুসন্ধানপটু ওস্তাদ হাউন্ডের গর্ব এই পমপি। হাওয়ার বেগে দৌড়োতে পারে না বটে,

গড়ন দেখলে তা মালুম হয়, কিন্তু একবার গন্ধের ওপর নাক রাখলেই হল। তারপর গন্ধ শুকে শুকে ঠিক জায়গায় হাজির হতে মোটেই বিলম্ব হয় না। এ-রকম দুর্দে ব্লাডহাউন্ড আর নেই বললেই হয়। ওহে পমপি, তুমি বেগবান না হলেও, লন্ডন শহরের মাঝবয়েসি একজোড়া ভদ্রলোকের পক্ষে যে তুমি যথেষ্ট বেগবান, এমনটি আশা করতেই পারি আমি। কাজে কাজেই, তোমার গলাবন্ধে চামড়ার এই ফিতেটি আটকে দেওয়ার স্বাধীনতাটুকু নিচ্ছি। এখন বাপু চলে এসো দিকি সুড় সুড় করে। দেখাও তোমার কেরামতি। ডক্টরের দরজার সামনে পমপিকে নিয়ে গেল হোমস। মুহূর্তের জন্যে চারিদিকের গন্ধ শুকে নিলে পমপি। তারপরেই উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ শব্দে গোঁ গোঁ করে গর্জে উঠে এগিয়ে চলল রাস্তা বরাবর। আরও তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে ঘন ঘন হ্যাচকা টান পড়তে লাগল চামড়ার ফিতেতে। আধঘন্টা যেতে-না-যেতে শহর ছাড়িয়ে বাইরে পড়ে দ্রুতগতিতে ধেয়ে চললাম গাঁয়ের রাস্তা ধরে।

হোমস, কী কাণ্ডটা করেছ শুনি? শুধোই আমি।

একটা বস্তাপচা সস্তা কৌশল, কিন্তু শ্রদ্ধা করার মতো। বিশেষ করে এসব ব্যাপারে তো দারুণ কাজে লেগে যায় পদ্ধতিটা। আজ কাল ডক্টরের উঠোনে ঢুকে সিরিঞ্জ ভরতি মৌরির তেল ছড়িয়ে এসেছি হামের পেছনের চাকায়। জানই তো, শুধু গন্ধ অনুসরণে পটু হাউন্ডের নাক একবার মৌরির তেলের ওপর পড়লে এখান থেকে শুরু করে সারা গ্রেট ব্রিটেন পেরিয়ে স্কটল্যান্ডের একদম উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জন ও গ্রোটসয়ের আটকোনা ঘরে পৌঁছোতেও মোটেই বেগ পেতে হবে না তাকে। এ-রকম অবস্থায় পমপিকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যাম নদীর মধ্যে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া ছাড়া বন্ধুবর আর্মস্ট্রংয়ের আর

কোনো উপায় নেই। ধুরন্ধর রাসকেল। সেরাতে এইভাবেই আমার চোখে ধুলো দিয়েছিল লোকটা!

আচম্বিতে বড়োরাস্তা ছেড়ে ঘাসে ঢাকা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল কুকুরটা। আধ মাইলটাক যাওয়ার পরেই গলি শেষ হল আর একটা চওড়া রাস্তার ওপর। তার পরেই, আমাদের গতিপথ চট করে বেঁকে গেল ডাইনের শহরের দিকে-যে-শহর এইমাত্র ছেড়ে এসেছি আমরা। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বেঁকে গেল রাস্তাটা; শহরের দক্ষিণ দিকে পৌঁছোনের পর যদিকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, তার ঠিক বিপরীত দিকে এগিয়ে গেল পথটা।

হোমস বললে, ঘুরপথে চক্কর দিয়ে আমাদের তাহলে বিলক্ষণ উপকার হল বল? গ্রামগুলোর কাদা ঘাঁটাই সারা হয়েছে কেন, তা এখন বুঝেছি। এ-রকম ধড়িবাজি করে থাকলে পণ্ড্রম আর আশ্চর্য কী? এতখানি লুকোচুরি খেলার পেছনে ডক্টরের নিশ্চয় কোনো জবরদস্ত কারণ আছে এবং আমি জানতে চাই আটঘাট বেঁধে এই বিরাট প্রতারণার আসল মানেটা কী? ডাইনের গ্রামটাই বোধ হয় ট্রামপিংটন। আরে সর্বনাশ! দেখো, মোড় ঘুরে এগিয়ে আসছে ব্রহ্ম গাড়িটা! তাড়াতাড়ি ওয়াটসন তাড়াতাড়ি, নইলে আমরা গেছি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হোমস। পাশের একটা খেতের ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অনিচ্ছুক পমপিকে টেনে হিচড়ে নিয়ে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকোতে-না-লুকোতেই রাস্তা কাঁপিয়ে ঘড় ঘড় করে বেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পলকের জন্যে

ভেতরে ডক্টর আর্মস্ট্রংয়ের ওপর চোখ পড়ল আমার। দুই কাঁধ তার গোল হয়ে নেমে পড়েছে, মাথা এলিয়ে পড়েছে দু-হাতের মধ্যে। দুঃখ দুর্দশা আর যন্ত্রণা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসে ছিল গাড়ির মধ্যে। বন্ধুবরের গম্ভীর হয়ে-ওঠা মুখ দেখে বুঝলাম, দৃশ্যটি সে-ও লক্ষ করেছে।

আমার কী ভয় হচ্ছে জান, ওয়াটসন। খুবই নিরানন্দ ফলাফলের মধ্যে শেষ হবে আমাদের এই অভিযান, বলল হোমস। যাক, সে-ফলাফল যে কী, তা জানতে আর বিশেষ দেরি হবে না। এসো হে পমপি! খেতের মাঝে এই কাজটাই তাহলে আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের বিচিত্র তদন্ত-পর্ব যে অন্তে পৌঁছেছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। ফটকের বাইরের এদিকে সেদিকে দৌড়ে মহা উৎসাহে রীতিমতো চেষ্টামেচি জুড়ে দিল পমপি। ব্রুকের চাকার দাগ তখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল মাটির ওপর। একটা পায়ে-চলা-পথ গিয়ে শেষ। হয়েছিল নিরালা কটেজটার সামনে। ঝোঁপের মধ্যে কুকুরটাকে বেঁধে রেখে হোমস, আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। ধুলোকাদায় ছোট জীর্ণ দরজাটায় টোকা দিল হোমস। আবার টোকা দিলে, কিন্তু তবুও কোননা সাড়া এল না ভেতর থেকে। সাড়া না-এলেও কটেজটা যে পরিত্যক্ত নয়, তা বুঝলাম ভেতর থেকে ভেসে আসা একটা মৃদু শব্দ পেয়ে। অবর্ণনীয় বিষাদমাখা সেই একঘেয়ে করুণ গোঙানির মতো শব্দটায় ওতপ্রোতভাবে ফুটে উঠেছিল নৈরাশ্য আর দুর্গতির অভিব্যক্তি। দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল হোমস। তারপর পেছন ফিরে যে-পথ দিয়ে এইমাত্র আমরা

এসেছি, সেইদিকে তাকালে। একটা ব্রহ্ম গাড়ি আসছিল এদিকে। ধূসর ঘোড়া দুটি দেখে ভুল হবার জো-টি ছিল না।

সর্বনাশ, ডক্টর আবার ফিরে আসছেন দেখছি। চোঁচিয়ে ওঠে হোমস। আর দ্বিধা নয়। উনি আসার আগেই আমাদের দেখতে হবে এসবের মানে কী।

বলে দরজাটা খুলে ফেলল ও। দুজনে ঢুকলাম হল ঘরের মধ্যে। গোঙানির শব্দটা আরও জোরে আছড়ে পড়ল আমাদের কানের ওপর। কে যেন করুণ সুরে টেনে টেনে কাঁদছে, অপরিসীম বেদনা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে সেই গুঁড়িয়ে ওঠার মধ্যে। শব্দটা আসছিল ওপরের তলা থেকে। তিরবেগে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল হোমস, আমি লেগে রইলাম ওর পেছনে। একটা ভেজানো দরজায় ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল ও; সঙ্গেসঙ্গে ভয়-অবশ দেহে দুজনে দাঁড়িয়ে গেলাম সামনের দৃশ্যটি দেখে।

শয্যার ওপর শুয়ে ছিল একটি তরুণীর প্রাণহীন দেহ। স্তবকে স্তবকে ছড়ানো সোনালি চুলের মধ্যে থেকে ওপরের পানে তাকিয়ে ছিল একটি শান্ত সুন্দর বিবর্ণ মুখ, নিষ্প্রভ আধখোলা দুটি-নীল চোখ। শয্যাপ্রান্তে আধবসা আধনতজানু একটি যুবক কাপড়চোপড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অবোরে কাঁদছিলেন। প্রতিবার ফুঁপিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠছিল তার সর্বদেহ! নিঃসীম শোকে তিনি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে হোমস তার কাঁধের ওপর হাত রাখা সত্ত্বেও মুখ তুলে তাকালেন না উনি।

আপনিই কি মি. গডফ্রে স্টনটন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ও আর নেই।

এমন শোকাচ্ছন্ন মানুষকে বোঝানো মুশকিল যে আমরা ডক্টর নই এবং তার সাহায্যের জন্যেও আমাদের পাঠানো হয়নি। দু-চারটে সাক্ষ্যনার কথা বলার চেষ্টা করছিল হোমস। তার আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলে বন্ধুবরের মধ্যে যে কী ধরনের সাড়া পড়ে গেছে, তা বোঝাবার চেষ্টা করতে-না-করতেই সিঁড়ি ওপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই দরজার সামনে আবির্ভূত হল ড. আর্মস্ট্রংয়ের ইস্পাত কঠিন ভারী মুখ আর কটমটে জিজ্ঞাসু চাহনি।

বললেন উনি, জেন্টলমেন, শেষ পর্যন্ত দেখছি পৌঁছে গেছেন আসল জায়গায়। রবাহুতের মতো না বলে কয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ার পক্ষে বিশেষ রকমের জটিল একটি মুহূর্তও নির্বাচন করেছেন দেখা যাচ্ছে। মৃত্যুকে সামনে রেখে আর হট্টগোল করব না। কিন্তু আমার বয়স যদি কিছু কম হত জেনে রাখুন, আপনাদের এই অত্যন্ত জঘন্য নোংরা আচরণের সমুচিত দণ্ডবিধান না-করে রেহাই দিতাম না।

বেশ মর্যাদার সঙ্গে উত্তর দিলে বন্ধুবর হোমস, মাপ করবেন ড. আর্মস্ট্রং। আমার মনে হয়, একই উদ্দেশ্য নিয়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে। আপনি যদি আমাদের সাথে নীচে আসেন তো আমার বিশ্বাস আমরা প্রত্যেকেই এ-ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করতে পারি।

মিনিটখানেক পরেই নীচের তলায় বসবার ঘরে থমথমে মুখ ডক্টরের সাথে জমায়েত হলাম । আমরা ।

তারপর? শুধোলেন উনি ।

আমি চাই প্রথমেই একটা জিনিস আপনি বুঝুন । লর্ড মাউন্ট-জেমস আমার নিয়োগকর্তা নন । এবং এ-ব্যাপার সম্পর্কে আমার অন্তরের সবটুকু সমবেদনাই কিন্তু তার বিরুদ্ধে । কেউ হারিয়ে গেলে তার পরিণতিটা কী হল, তা জানার কর্তব্য আমার । কিন্তু কর্তব্য শেষ হলে সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে সেখানেই অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই । তারপর ধরুন, অপরাধ আখ্যা দেওয়া যায় এমনি কোনো কিছুরই যখন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন পারিবারিক কেলেকারিকে সমাজের মাঝে প্রচার করার চাইতে বরং ধামাচাপা দিয়ে দিতেই উদবিগ্ন হয়ে উঠি আমি । আমি যদি বুঝি যে এ-ব্যাপারে বেআইনি কিছুই নেই, তাহলে আমার বুদ্ধিবিবেচনা আর স্বাধীনতার ওপর আপনি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন । তা ছাড়া, কাগজে যাতে এসব ঘটনা প্রকাশ না-পায়, সে বিষয়েও আমার সহযোগিতা আপনি পাবেন ।

চট করে এক পা এগিয়ে এসে দু-হাতে হোমসকে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন ড. আর্মস্ট্রং ।

বললেন, আপনি তোক ভালো। আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম আমি। আমার বরাত ভালো, স্টনটন বেচারাকে এ-রকম দূরবস্থায় একলা ফেলে রেখে গিয়ে বিবেক-দংশন সহ্য করতে না-পেরে ফিরে এসেছিলাম গাড়ি নিয়ে, তাই দেখা হয়ে গেল আপনার সাথে। আপনি যা দেখলেন শুনলেন, তা থেকে অনায়াসেই বুঝে নিয়েছেন আসল ব্যাপারটা। বছরখানেক আগে লন্ডনে কিছুদিনের জন্য ভাড়াবাড়িতে থাকার সময়ে ল্যান্ডলেডির মেয়েকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে গডফ্রে স্টনটন এবং তাকে শেষে বিয়ে করে সে। মেয়েটি যেমন ভালো তেমনি সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী। এ-রকম বউ পেলে কোনো পুরুষেরই লজ্জিত হওয়ার কারণ থাকে না। কিন্তু তিরিক্ষে মেজাজের এই খিটখিটে বুড়োর উত্তরাধিকারী গডফ্রে। এবং তার বিয়ের খবর বুড়োর কানে যাওয়া মানেই যে ওয়ারিশি স্বত্বেরও বিলোপ হওয়া, সে-বিষয়ে আমাদের কারোরই সন্দেহ ছিল না। ছেলেটিকে আমি ভালো করেই জানি এবং তাকে ভালোবাসি অনেকগুলি চমৎকার গুণের জন্যে। ওকে যাতে কোনো ঝামেলায় না পড়তে হয়, তাই যথাসাধ্য সাহায্য করলাম আমি। এ-খবর যাতে আর কেউ না জানতে পারে, তাই চেষ্টার ক্রটি করলাম না। কেননা, কানাঘুসো একবার শুরু হলেই হল, দেখতে দেখতে প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু আঁচ করে নেবে! সাধুবাদ জানাই গডফ্রে স্বাধীন বিচার-বিবেচনার জন্যে। এই নির্জন কটেজটা নির্বাচন করার ফলে আজ পর্যন্ত কাকপক্ষীও কিছু টের পায়নি এবং আমরা সফল হয়েছি আমাদের প্রচেষ্টায়। এদের গোপন রহস্য আমি আর একজন অনুগত পরিচারক ছাড়া আর কেউ জানে না। পরিচারকটি এখন গেছে ট্রামপিংটনে সাহায্যের জন্যে। আচম্বিতে একদিন নেমে এল বিধাতার প্রচণ্ড আঘাত। বিপজ্জনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হল ওর স্ত্রী। রোগটা অত্যন্ত বিষময় প্রকৃতির এক ধরনের ক্ষয়রোগ। শোকে দুঃখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল বেচারি যে প্রায় অর্ধোন্মাদের মতো অবস্থা হল ওর।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে লন্ডনে আসতে হল এই ম্যাচটা খেলার জন্যে। ম্যাচ না-খেলে আসার উপায় ছিল না। কেননা তাহলে তো একটা কারণ দর্শাতে হবে ওকে। তখনই ফাঁস হয়ে যাবে সব রহস্য। একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ওকে উৎফুল্ল রাখবার চেষ্টা করলাম আমি। প্রত্যুত্তরে আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালে ও মিনতি করলে, আমার যথাসাধ্য যেন আমি করি। এই টেলিগ্রামই দেখেছিলেন আপনি। কিন্তু কী উপায়ে যে দেখেছিলেন তা অনেক বুদ্ধি খরচ করেও ভেবে পাইনি আমি। বিপদ যে আসন্ন তা আমি ওকে বলিনি। কেননা, এখানে সে থাকলেও তো কোনো লাভ হত না। কিন্তু মেয়েটির বাবার কাছে সত্য গোপন করলাম না-খবর পাঠালাম তাঁকে। তিনি অত্যন্ত অবিবেচকের মতো খবরটি জানিয়ে দিলে গডফ্রেকে। ফলে হল কী, প্রায় উন্মাদের মতো অবস্থায় সিধে এসে ও পৌঁছোল এখানে। তারপর থেকে সেই একই অবস্থায় শয্যাপ্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে ও। আজ সকালে মৃত্যু এসে মেয়েটির সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিলে। মি. হোমস, আর কিছুই নেই। আপনি এবং আপনার বন্ধু অবিবেচক নয়, সুতরাং নিশ্চিত মনে আপনাদের ওপর ভরসা রাখছি আমি।

দু-হাতে ডক্টরের হাত জড়িয়ে ধরলে হোমস।

তারপর বললে, এসো, ওয়াটসন। শোক-ভবন থেকে বেরিয়ে এসে আমরা দাঁড়ালাম শীতর্ষ দিনের মরা সূর্যের আলোয়।

টীকা

খেলোয়াড়ের খেলায় অরুচি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মিসিং থ্রি কোয়ার্টার্স অগাস্ট ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং ২৬ নভেম্বর ১৯০৪-এর কলিয়ার্স উইকলিতে প্রথম প্রকাশিত। এই গল্পের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রাখা আছে।

রাইট উইং : রাগবি দলের ফরোয়ার্ড লাইনে মাঝে থাকে সেন্টার ফরোয়ার্ড। তার ডাইনে রাইট উইং, বাঁয়ে লেফট উইং।

কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির রাগবি টিম : কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি রাগবি ইউনিয়ন ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২-এ। তার তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠা করা হয় অক্সফোর্ডের রাগবি ক্লাব। কিন্তু কেম্ব্রিজে রাগবি খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৯ সালে।

অক্সফোর্ডের সাথে আমাদের খেলা : অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ রাগবি খেলা প্রথম হয়েছিল ১৮৭২-এ। অক্সফোর্ডের মাঠে অনুষ্ঠিত সেই খেলায় জয়ী হয় অক্সফোর্ড। পরে, প্রথমত কেনিংটন ওভালে, আরও পরে ব্ল্যাকহিমে এবং শেষ পর্যন্ত কুইনস ক্লাবে এই বাৎসরিক খেলা অনুষ্ঠিত হত। খেলা হত প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার। বর্তমানে এই খেলা হয় টিউকেনহ্যাম স্টেডিয়ামে।

বেইজওয়াটারের বাসে : বার্ডেট রোড থেকে শেফার্ডস বাস গ্রিন পর্যন্ত চলাচলকারী বেইজওয়াটার বাস ছাড়ত প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর।

পয়সার অপব্যয় করি না : লর্ডের বাসে চড়া থেকেই তা বোঝা যায়। দূরত্বের অনুপাতে বাসের ভাড়া নির্ধারিত হত ১ থেকে ৬ পেনির মধ্যে।

জন ও গ্রোটস : ওলন্দাজ জন ডে গ্রোট ইংলন্ডের মূল ভূখণ্ডের উত্তরপ্রান্তে বসতি স্থাপন করেন তার দুই ভাইকে নিয়ে। তিনি একটি আটটি আলাদা প্রবেশপথ সংবলিত আটকোণাকৃতি বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার ওয়ারিশদের থাকবার জন্য। এই ঘটনা ইংলন্ডেশ্বর চতুর্থ জেমসের রাজত্বকালে (১৪৮৮-১৫১৩) ঘটেছিল।

ক্যাম নদী : এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কেম্ব্রিজ শহর।

গোফার খুরের রহস্য

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য প্রায়রি স্কুল]

বেকার স্ট্রিটে আমাদের ছোট রঙ্গমঞ্চে অনেকরকম নাটকীয় আসা যাওয়াই দেখেছি, কিন্তু ড. থনিফ্রফট হার্ডটেবল, এম. এ., পি, এইচডি, ইত্যাদির প্রথম আবির্ভাবের মতো চমকপ্রদ ও আকস্মিক আর কিছু মনে পড়ছে না। রাশি রাশি ডিগ্রির অনুপাতে অত্যন্ত পুঁচকে একটা কার্ড আসার কয়েক সেকেন্ড পরেই ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। চেহারাখানা যেমন বিপুল তেমনি জমকালো। সব মিলিয়ে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে, মনে হয় এমন দশাসই বপু যাঁর, তিনি আর যাই হোক অন্তঃসারশূন্য নন এবং আত্মবিশ্বাসেরও অভাব নেই তার। কিন্তু আশ্চর্য এমন চেহারা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে প্রথমেই সামনের টেবিলটা ধরে টলমল করে উঠলেন ভদ্রলোক, তারপরেই গিয়ে দড়াম করে পড়লেন মেঝের ওপর। আগুনের চুল্লির পাশে বিছানো ভালুকের চামড়ার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল তাঁর জ্ঞানহীন বিশাল বনেদি বপু।

হোমস ব্যস্ত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি একটা কুশন এনে খুঁজে দিল তাঁর মাথার নীচে। আমি ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যান্ডি ঢালতে লাগলাম দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

নাড়ি দেখলাম। জীবনের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ধুকধুক করে বয়ে চলেছে সুতোর মতো সরু এতটুকু অংশ দিয়ে। বললাম, খুব সম্ভব খিদে আর ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন—শেষ শক্তিবিন্দুটুকু ব্যয় করেছেন এখানে আসার জন্যে।

ঘড়ির পকেট থেকে রেলের টিকিট বার করে হোমস বললে, উত্তর ইংলন্ডের ম্যাকলটন থেকে এসেছেন দেখছি-রিটার্ন টিকিট। এখনও তো বারোটা বাজেনি। অর্থাৎ ভদ্রলোককে খুব সকাল সকালই রওনা দিতে হয়েছে বাড়ি থেকে।

কুঁচকোনো চোখের পাতা অল্প অল্প কেঁপে উঠল, তারপরেই একজোড়া শূন্য-দৃষ্টি ধূসর চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকালে আমাদের পানে। পরমুহূর্তেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, লজ্জায় অরুণ হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

আমার এ-দুর্বলতা মাপ করবেন, মি. হোমস, ভেতরে ভেতরে একেবারে ফোপরা হয়ে গেছি চিন্তায় ভাবনায়। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, এক গেলাস দুধ আর আর একটা বিস্কুট পেলেই আবার চাঙা হয়ে উঠব বলে মনে হয়।

দুধ বিস্কুট খাওয়া শেষ ডা. হাক্সটেবলের। ধীরে ধীরে লালভ হয়ে উঠল তার গাল; আলো ফিরে এল তার চোখে। চেয়ারে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিমায় গড়গড় করে বলে চললেন তার কাহিনি। উচ্চারণ আর বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রাণশক্তি।

জেন্টলমেন, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি যে প্রায়রি একটা প্রিপেরেটরি স্কুল অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হয় এইখানেই, তিন হপ্তা আগে যখন ডিউক অফ হোল্ডারনেস তার সেক্রেটারি মি. জেমস ওয়াইল্ডারকে পাঠালেন তাঁর একমাত্র ছেলে এবং

উত্তরাধিকারী দশ বছরের লর্ড স্যালটারকে আমার স্কুলে ভরতি করার জন্যে, তখন আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছিল এই কথা ভেবে যে সত্যসত্যই আমার স্কুলের সুনাম তাহলে চরমে পৌঁছোবে! তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে আমার জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের সূচনা আঁকা হয়েছিল সেদিনই।

মে মাসের প্রথম তারিখে পৌঁছোলো ছেলেটি। গ্রীষ্মের পাঠক্রম শুরু হল সেদিনই। ভারি মিষ্টি স্বভাব তার-দু-দিনেই আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল সে। অবিবেচক নই, মি. হোমস এবং এ-কেসে আধাআধি বিশ্বাস করাটাও সমীচীন নয়। তাই অকপটে সব খুলে বলছি। ছেলেটি বাড়িতে খুব সুখে ছিল না। ডিউকের বিবাহিত জীবন যে মোটেই শান্তিময় হয়নি, এ গুপ্ত কথা জানে না এমন কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি অনুসারে বিচ্ছেদ হয় দুজনের মধ্যে ডাচেস চলে যান দক্ষিণ ফ্রান্সে। এসব ব্যাপার তো এই সেদিনকার। মাকে খুবই ভালোবাসত ছেলে এবং ডিউক-ডাচেসের বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আগাগোড়া মা পেয়ে এসেছে ছেলের গভীর সহানুভূতি। এসব কথা সবাই জানে। এবং শুধু এই কারণেই ডিউক তাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দিন পনেরোর মধ্যেই আমাদেরই একজন হয়ে উঠল ছোট লর্ড স্যালটার এবং বাইরে থেকে দেখে যতটা বোঝা যায়, মনেপ্রাণে সুখী হয়েছিল সে।

তেরোই মে রাত্রে অর্থাৎ গত সোমবার রাত্রে তাকে শেষবারের মতো দেখা যায় প্রায়রিতে। ওর ঘর তিনতলায়। সে-ঘরে ঢুকতে হলে আরও একটা বড়ো ঘরের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। দুজন ছেলে এই ঘরটায় সে রাতে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে দিয়ে কাউকে যেতে দেখেনি তারা, কোনো শব্দও শোনেনি। কাজেই, স্যালটার যে এ-ঘর

দিয়ে যায়নি এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না। তার নিজের ঘরের জানলা খোলা ছিল। জানলা থেকে মাটি পর্যন্ত মোটা আইভি লতা থাকায় আমরা পায়ের ছাপ খুঁজেছিলাম মাটিতে কিন্তু কিছু পাইনি। না-পেলেও বেরোবার সম্ভাব্য পথ শুধু এইটাই এবং এ-সম্পর্কে দ্বিমত থাকারও কোনো কারণ নেই।

মঙ্গলবার সকাল সাতটায় আমরা জানতে পারলাম যে রাতারাতি ঘর থেকে উধাও হয়েছে লর্ড স্যালটার। বিছানা নিভাঁজ নয় দেখে বুঝলাম সে ঘুমোচ্ছিল। যাওয়ার আগে স্কুলের যা পোশাক, কালো ইটন জ্যাকেট আর গাঢ় ধূসর রঙের ট্রাউজার পরে নিয়েছে। ঘরে যে কেউ ঢুকেছিল সে-রকম কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। ধস্তাধস্তি বা চেষ্টামেচির শব্দও কান এড়াত না কটারের। মঝের বড়ো ঘরটায় শুয়েছিল কনটার। ওর ঘুম খুব পাতলা, বয়সও এদের চাইতে একটু বেশি।

লর্ড স্যাটারের অন্তর্ধানের খবর কানে আসবামাত্র আমি স্কুলের প্রত্যেককে ডেকে আনলাম নাম ডেকে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে ছাত্র, শিক্ষক, চাকরবাকর –কেউ বাদ গেল না।

তখনই জানা গেল যে লর্ড স্যালটার একলা পালায়নি।

জার্মান মাস্টার হেইডেগারও নিপাত্ত। তার ঘরও তিনতলায়, বাড়ির একদম শেষপ্রান্তে, লর্ড স্যালটারের ঘরের মুখোমুখি। বিছানা দেখে বুঝলাম হেইডেগারও ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু মেঝের ওপর পড়ে থাকা শার্ট আর মোজা দেখে মনে হল ধরাচুড়ো অর্ধেক

চাপিয়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। হেইডেগার কিন্তু আইভি লতা বেয়ে নেমেছেন। কেননা, লনের ওপর যেখানে উনি নেমেছেন সেখানে তার পায়ের ছাপ পেয়েছি আমরা। লনের পাশে ছোট্ট একটা শেডে তার বাইসাইকেল থাকত। শেড খুলে দেখলাম হেইডেগারের সঙ্গে তাঁর সাইকেলও উধাও হয়েছে।

বছর দুয়েকের মতো আমার স্কুলে রয়েছেন হেইডেগার। খুব নির্ভরযোগ্য সুপারিশ দেখে তাকে কাজে বহাল করেছিলাম আমি কিন্তু সবসময়ে বড়ো মুষড়ে পড়তেন ভদ্রলোক, কথাবার্তাও বড়ো একটা বলতেন না। ছাত্র বা শিক্ষক সবার কাছ থেকেই দূরে দূরে থাকার ফলে কেউই তাকে আপন বলে ভাবতে পারত না। যাই হোক, আজ পর্যন্ত ওঁদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার আমরা যে-তিমিরে ছিলাম আজ বেস্পতিবার সকালেও সে-তিমির থেকে। একচুলও এগোতে পারিনি। হোলডারনেস হল-এ খোঁজ নিয়েছিলাম তখুনি। প্রায়রি স্কুল থেকে হোলডারনেস হলের দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। ভেবেছিলাম হঠাৎ হয়তো বাড়ির জন্যে মন কেমন করায় বাবার কাছেই ফিরে গেছে লর্ড স্যালটায়ার। কিন্তু সেখানেও কোনো খবর পাওয়া গেল না তার। উদবেগ-উত্তেজনায় ডিউকের অবস্থা কী হয়েছে, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন। আর নিজের চোখেই দেখলেন আপনারা, এই তিনদিনের মধ্যে উৎকণ্ঠা আর দায়িত্ববোধ কুরে কুরে শেষ করে এনেছে আমার নার্ভের শক্তি।

নোটবুক বার করে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিল হোমস। তারপর কড়া সুরে বললে, এত দেরিতে আমার কাছে এসে খুবই অন্যায় করেছেন আপনি। অত্যন্ত গুরুতর অসুবিধার

মধ্যে দিয়ে আমায় এখন তদন্ত করতে হবে। যেমন ধরুন না কেন, তিনদিন পর আইভি বা লন দেখে কোননা বিশেষজ্ঞের পক্ষেই কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

মি. হোমস, আমার কোনো দোষ নেই। হিজ থ্রেস নিজেই প্রকাশ্য কেলেক্সারি এড়ানোর জন্যে এ-খবর পাঁচ কান হতে দেননি। পারিবারিক অশান্তি দুনিয়ার লোকে জানুক, এ তার ইচ্ছা নয়। শুধু ইচ্ছা নয় বললে অল্প বলা হবে, এ ধরনের কিছু ভাবতেও শিউরে ওঠেন উনি।

পুরো তিনটে দিন বিলকুল বাজে নষ্ট হয়েছে। বাস্তবিক ড. হাক্সটেবল, প্রথম থেকেই এ-কেস নিয়ে যা করেছেন আপনারা, তা অতি যাচ্ছেতাই, ক্ষমার অযোগ্য।

আমিও তা বুঝতে পারছি।

কিন্তু তবুও এ-সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কেসটা আমি নিলাম, ড. হাক্সটেবল। ভালো কথা, লর্ড স্যাটারার আর জার্মান মাস্টারের মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন কি?

একেবারেই না।

ছেলেটি কি মাস্টারের ক্লাসেই ছিল?

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । অর্থার বেনান ডয়েল । শার্লক হোমস

না । যতদূর জানি দুজনের মধ্যে কোনোরকম কথাবার্তাই হয়নি ।

ভারি আশ্চর্য তো! ছেলেটারও বাইসাইকেল আছে নাকি?

না ।

আর কোনো সাইকেল উধাও হয়েছে?

না ।

ঠিক তো?

হ্যাঁ!

ভালো কথা । আপনি কি তাহলে মনে করেন মাঝরাতে জার্মান মাস্টার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন?

নিশ্চয় না । তাহলে আপনার থিয়োরিটা কী শুনি?

বাইসাইকেলটা নিছক ধোঁকা ছাড়া কিছু নয় । সাইকেলটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনেই হাঁটা দিয়েছে কোনো গোপন জায়গার দিকে ।

ঠিক । কিন্তু ধোঁকাটা একটু বিদঘুটে রকমের মনে হচ্ছে, তাই না? শেডে অন্য কোনো সাইকেল ছিল নাকি?

কয়েকটা ছিল ।

আপনার থিয়োরি অনুসারে দুজনেই যে সাইকেলে চড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে, এ-ধারণাই যদি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে হেইডেগারের, তাহলে তার পক্ষে একটা না-লুকিয়ে একজোড়া সাইকেল লুকোনোই স্বাভাবিক নয় কি?

মনে তো হয় তাই ।

আমার শুধু মনে হয় না, আমার বিশ্বাস যে এইটাই স্বাভাবিক । আপনাকে ধোঁকা দেওয়ার থিয়োরি এখানে খাটবে না, ডক্টর । তদন্ত শুরু করার পক্ষে ঘটনাটির গুরুত্ব কিন্তু অনেকখানি । আস্ত একটা সাইকেল বেমানুম লোপাট করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা বা নষ্ট করে ফেলাটাও খুব সোজা কাজ নয় । আর একটা প্রশ্ন । অদৃশ্য হওয়ার আগের দিন কেউ কি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

না ।

কোনো চিঠিপত্র এসেছিল তার নামে?

একটা এসেছিল বটে ।

কার কাছ থেকে?

বাবার কাছ থেকে ।

ছেলেদের চিঠি আপনি খোলেন নাকি?

না ।

কী করে জানলেন চিঠিটা তার বাবার কাছ থেকে?

খামের ওপর হোল্ডারনেস বংশের প্রতীক-চিহ্ন ছিল । তা ছাড়া, ডিউক নিজের হাতে ঠিকানা লিখেছিলেন-ও-রকম অদ্ভুত আড়ষ্ট হাতের লেখা ডিউক ছাড়া যে আর কারো নয়, তা আমি জানি । সবচেয়ে বড়ো কথা, এ-চিঠির কথা ডিউকেরও মনে আছে ।

এ-চিঠি পাওয়ার আগে আবার কবে সে চিঠি পেয়েছে?

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তো নয়ই ।

ফ্রান্স থেকে কোনো চিঠি এসেছিল তার নামে?

না । কোনোদিনই না ।

এসব প্রশ্নের পেছনে আমার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন আপনি। হয় লর্ড স্যালটারকে জোরজবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নইলে সে নিজেই গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তার মতো ছেলেমানুষের পক্ষে বাইরের জগৎ থেকে কোনোরকম উৎসাহ বা প্রেরণা না-পেলে এ ধরনের ডানপিটের মতো কাজ করাও সম্ভব নয়। কেউ যদি দেখা করতে না-এসে থাকে, তাহলে নিশ্চয় চিঠিপত্রের ভেতর দিয়েই এ-উৎসাহ সে পেয়েছে। সেই কারণেই আমি জানতে চাইছি কে কে তাকে চিঠি লিখেছিলেন।

এ-সম্পর্কে আপনাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না মি. হোমস। যতদূর জানি, বাবা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রায়রিতে চিঠি লেখেননি।

এবং যেদিন ছেলে উধাও হয়ে গেল, সেদিনই এল তার চিঠি। বাপছেলের মধ্যে সম্পর্ক কীরকম ছিল, ডক্টর? বন্ধুর মতো কি?

হিজ গ্রেস কারোর সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখেন না। দেশের এবং দশের কাজ নিয়েই অহরহ তাকে ডুবে থাকতে হয়-কাজেই সাধারণ মানুষের মধ্যে যেসব আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখি, তার নামগন্ধও পাওয়া যায় না তার মধ্যে। তবে ওরই মাঝে ছেলের প্রতি তাঁর

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

স্নেহ-ভালোবাসার অন্ত ছিল না। তাঁর কড়া স্বভাবের নমুনাও কোনোদিন পায়নি লর্ড স্যাটায়ার।

কিন্তু লর্ড স্যাটায়ার বেশি ভালোবাসত তার মাকে?

তা সত্যি।

কোনোদিন সে-কথা তার নিজের মুখে শুনেছেন?

না।

ডিউকের মুখে?

সর্বনাশ! না, মশাই না!

তাহলে জানলেন কী করে?

হিজ থ্রেসের সেক্রেটারি মি. জেমস ওয়াইল্ডারের সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথাবার্তা হয়েছিল। মায়ের ওপর লর্ড স্যাটায়ারের দুর্বলতার খবর তার মুখেই আমি শুনেছি।

বটে। লর্ড স্যালটায়ার নিখোঁজ হওয়ার পর তার নামে আসা ডিউকের শেষ চিঠিটা ঘরে পেয়েছেন কি?

না, যাবার সময়ে চিঠিটা নিয়ে গেছে সে। মি. হোমস, আর তো দেরি করা যায় না, এবার রওনা হওয়া যাক।

ঘোড়ার গাড়ি আনতে বলে দিই। মিনিট পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমরা। ড. হাক্সটেবল, রওনা হওয়ার আগে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানোর ইচ্ছে থাকলে আপনার প্রতিবেশী মহলে বেশ করে এই কথাটা ছড়িয়ে দিন যে পুলিশ এখনও লিভারপুল বা অন্য কোথাও তদন্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ধীরেসুস্থে আমরা কিছু কাজ সেরে নেব অকুস্থলে পৌঁছে। গন্ধ এখনও এমন ফিকে হয়ে যায়নি যে ওয়াটসন আর আমার মতো দু-দুটো বাঘা হাউন্ডের নাকে তা ধরা পড়বে না।

সেদিন সন্ধ্যায় পীক কাউন্টির শীত-শীত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এসে পৌঁছোলাম আমরা। ড. হাক্সটেবলের বিখ্যাত স্কুল এই অঞ্চলেই। স্কুলে পৌঁছোতেই আঁধার ঘন হয়ে এল চারদিকে। টেবিলের ওপর একটা কার্ড পড়ে ছিল। ড. হাক্সটেবল ঘরে ঢুকতেই বাটলার এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁর কানে কী বললে। শুনেই রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন ডক্টর।

বললেন, ডিউক এসেছেন। সেক্রেটারি মি. ওয়াইল্ডারকে নিয়ে উনি স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আপনারা আসুন, আলাপ করিয়ে দিই ওঁর সাথে।

অতি বিখ্যাত এই রাজনীতিবিদের ছবির সঙ্গে অবশ্য আমি আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু ছবিতে শুধু মুখের আদলই দেখেছি-আসল মানুষটির সঙ্গে ছবির মানুষের আকাশ-পাতাল তফাত। দীর্ঘ সম্ভ্রান্ত চেহারায় উগ্র আভিজাত্যের ছাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ নিখুত এবং সুরুচির পরিচয় বহন করে, পাতলা মুখ, কিন্তু বেশ গম্ভীর, দীর্ঘ নাক-সামনের দিকে অদ্ভুতভাবে বাঁকা। মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে মুখের ওপর লাল টকটকে দাড়িটা কীরকম জানি বেমানান লাগে। সুদীর্ঘ দাড়ি সাদা ওয়েস্ট কোটের ওপরেও ঝুলে পড়েছিল ঝালরের মতো ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করছিল ঘড়ির চকচকে চেনটা। রাজপুরুষের মতোই জমকালো চেহারা ভদ্রলোকের। আগুনের চুল্লির সামনে বিছানো পশুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি। ঘরে ঢুকতেই পাথরের মতো কঠিন চোখে তাকালেন আমাদের পানে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন খুবই অল্প বয়সের একজন তরুণ-তিনিই যে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি ওয়াইল্ডার তা কেউ না-বললেও বুঝে নিলাম। ছোটোখাটো চেহারা ভদ্রলোকের, নার্ভাস, কিন্তু আকাশের মতো হালকা নীল-নীল চোখ আর চটপটে হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় আকারে খাটো হলেও সতর্কতায় আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অনেককেই হার মানিয়ে দিতে পারেন তিনি। আমরা ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ইনিই অনাড়ম্বর তীক্ষ্ণ স্বরে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন।

ড, হাক্সটেবল, আজ সকালেই আমি এসেছিলাম আপনার লন্ডনে যাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। শুনলাম আপনার লন্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্য মি. শার্লক হোমসকে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাকে এ-কেসের তদন্তভার দেওয়া। হিজ গ্রেস

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন, ড. হাক্সটেল-এ ধরনের কিছু করার আগে তাঁর সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল।

যখনই শুনলাম যে পুলিশও ব্যর্থ হয়েছে—

পুলিশ যে ব্যর্থ হয়েছে এ-কথা হিজ গ্রেস মোটেই বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু মি. ওয়াইন্ডার—

আপনি তো ভালো করেই জানেন, ড. হাক্সটেল, প্রকাশ্য কেলেক্সারি এডানোর জন্যে কতখানি উদবিগ্ন হিজ গ্রেস। এই কারণেই তিনি মনে করেন এ-ব্যাপার যত অল্প লোকে জানে ততই মঙ্গল।

দ্রুত করে ডক্টর বললেন, যাক, যা হবার তা হয়েছে। এবার প্রতিকারের কথা ভাবা যাক। কাল ভোরের ট্রেনে মি. শার্লক হোমস লন্ডনে ফিরে গেলেই সব ঝামেলা মিটে যায়।

নির্বিকার নিরুত্তাপ সুরে হোমস বলে উঠল, উঁহু, ডক্টর, এত তাড়াতাড়ি লন্ডনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। উত্তর দেশের এই তাজা ফুরফুরে হাওয়ায় মনটা এত হালকা লেগেছে যে কয়েকটা দিন আপনার জলাভূমিতে কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে

আমার । আপনার ছাদের তলায় মাথা গুজতে না-পারি গাঁয়ের সরাইখানা তো আছেই ।
অবশ্য সে-ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই হবে ।

মহা ফাঁপরে পড়লেন ড. হাক্সটেবল । বেচারির দোনামোনা ভাব দেখে বড়ো মায়া হল
আমার । কিন্তু এই শাঁখের করাতের মতো অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন ডিউক নিজেই ।
ডিনার-ঘণ্টার মতো গুরুগম্ভীর গমগমে গলায় কথা বলে উঠলেন উনি ।

ড. হাক্সটেবল, মি. ওয়াইল্ডারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত । যাওয়ার আগে আমার
সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল । কিন্তু মি. শার্লক হোমসকে যখন সব জানানোই
হয়েছে, তখন তাঁর সাহায্য না-নেওয়ার কোনো মানেই হয় না । মি. হোমস, সরাইখানায়
না-গিয়ে আমার হোলডারনেস হল-এ ক-দিন গেলে আমি খুবই খুশি হব ।

ধন্যবাদ, ইয়োর গ্রেস । তদন্তের সুবিধার জন্যে লর্ড স্যাটারার যে-জায়গা থেকে অদৃশ্য
হয়েছেন, সেখানে থাকাটাই আমার পক্ষে সমীচীন হবে ।

যা ভালো বোঝেন । আমার বা মি. ওয়াইল্ডারের কাছে যদি কোনো খবর আশা করেন
তো জিজ্ঞেস করতে পারেন ।

হোমস বললে, আপনার সঙ্গে হয়তো হল-এ দেখা করার দরকার হবে আমার । এখন
স্যার শুধু একটা প্রশ্নই করব আপনাকে । আপনার ছেলের এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের
কোনো কারণ কি আপনি ভেবেছেন?

না মশাই, কোনো কারণই পাইনি!

মাপ করবেন, আপনার পক্ষে বেদনাদায়ক দু-একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখছি না। আপনার কি ধারণা এ-ব্যাপারে ডাচেসের কোনো হাত আছে?

রীতিমতো দ্বিধায় পড়লেন মন্ত্রীমশায়।

অবশেষে বললেন, আমার তা মনে হয় না।

তাহলে বাকি থাকে আর একটি সম্ভাবনা। মোটা টাকা দাও মারার জন্যে কেউ হয়তো আপনার ছেলেকে গুম করেছে। এ ধরনের দাবিদাওয়া নিয়ে লেখা কোনো চিঠি আপনি পেয়েছেন?

না।

আর একটি প্রশ্ন ইয়োর গ্রেস। শুনলাম, যেদিন লর্ড স্যালটারার উদ্বোধন হয়, সেইদিনই আপনি তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

না, তার আগের দিন লিখেছিলাম।

এগজ্যাক্টলি । কিন্তু চিঠিটা তার হাতে সেদিনই পড়ে?

হ্যাঁ ।

আপনার চিঠিতে এমন কিছু ছিল কি যা পড়ার পর বেসামাল হয়ে পড়তে পারে সে অথবা এই ধরনের কাজ করার মতো প্রবৃত্তি মনে জাগতে পারে?

না, না, সে-রকম কিছুই ছিল না ।

চিঠিটা কি আপনি নিজেই ডাকে দিয়েছিলেন?

ডিউক উত্তর দেওয়ার আগেই বেশ একটু গরম হয়ে কথা বলে উঠলেন তার সেক্রেটারি, নিজের হাতে চিঠি ডাকে দেওয়ার মতো অভ্যাস হিজ গ্রেসের এখনও হয়নি, অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এ-চিঠিও স্টাডি টেবিলে রেখেছিলেন উনি-আমি নিজে পোস্ট ব্যাগে ফেলে দিয়ে আসি চিঠিগুলো ।

এ-চিঠিটাও সেসবের মধ্যে যে ছিল সে-বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ নেই তো?

নিশ্চয় না, চিঠিটা আমি লক্ষ করেছিলাম ।

সেদিন হিজ গ্রেস ক-টি চিঠি লিখেছিলেন?

বিশ থেকে তিরিশটা। চিঠিপত্র আমাকে একটু বেশিই লিখতে হয়। কিন্তু এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে না?

পুরোপুরি নয়, বলল হোমস।

এবার ডিউক বলে উঠলেন, আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি দক্ষিণ ফ্রান্সে তদন্ত চালানোর জন্যে। আগেই বলেছি আপনাকে, এ-রকম নোংরা কাজ ডাচেস কোনোদিনই প্রশয় দেবেন না। কিন্তু ছেলেটার মাথাটাকে উদ্ভট খেলার একটা কারখানা বললেই চলে। হয়তো জার্মান মাস্টারের সাহায্য নিয়ে সে মায়ের কাছে পালিয়েছে। ড. হাক্সটেবল, আমরা এবার হল-এ ফিরব।

হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু মন্ত্রীমশাই এমনই আচম্বিতে কথাবার্তার ওপর যবনিকা টেনে দিলেন যে তারপর প্রশ্ন তো দূরের কথা, সাধারণ আলাপ-আলোচনাও আর সম্ভব নয়। তার মতো উগ্র অভিজাত পুরুষের পক্ষে একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে একজন আগন্তুকের সাথে আলোচনা করা যে একেবারেই অসহ্য, তা বুঝতে কারোরই বাকি রইল না। আরও একটা ভয় তিনি করেছিলেন। হোমসের নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হয়তো তার ডিউক-জীবনের ইতিহাস-প্রসঙ্গও এসে যাবে, আর, অতি সংগোপনে যেসব অন্ধকারময় কোণগুলো এতদিন ধরে ঢেকে রেখেছেন ফ্যামিলির চৌহদ্দির মধ্যে, তা আর গুহ্য থাকবে না-সাধারণ লোকের মুখরোচক আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

সেক্রেটারিকে নিয়ে ডিউক চোখের আড়ালে যেতেই হোমস আর একটুও দেরি করলে না, স্বভাবমতো সঙ্গেসঙ্গে পরম আগ্রহে শুরু করে দিলে।

লর্ড স্যালটায়ারের ঘর তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেও কোনো সুরাহা হল না।

জানলা ছাড়া যাওয়ার যে রাস্তা আর নেই, এ-বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল সব কিছু দেখার পর। জার্মান মাস্টারের ঘর থেকেও নতুন কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকের দেহের ভারে আইভি লতাগুচ্ছের গোড়ায় মাটির ওপর তার গোড়ালির ছাপও পেলাম। ছোটো ছোটো সবুজ ঘাসের ওপর শুধু ওই একটি খাঁজ-গভীর রাতে রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধানের পার্থিব সাক্ষী শুধু ওইটুকুই আর কোনো ছিদ্র লনের ওপর পাওয়া গেল না।

শার্লক হোমস একলাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল কোথায়, ফিরল রাত এগারোটার পর। দেখলাম কার কাছ থেকে এ-অঞ্চলের মস্ত বড়ো একটা সামরিক মানচিত্র জোগাড় করে এনেছে সে। আবার ঘরে এসে বিছানার ওপর ম্যাপটা বিছিয়ে ঠিক মাঝখানে ল্যাম্পটা রাখল ও। তারপর শুরু হল ধূমপান। মাঝে মাঝে পাইপের ধূমায়িত অঙ্গারের দিকটা দিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে এমনি জায়গাগুলো দেখিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কায়দায় কথা বলে চলল সে।

কেসটা আমায় পেয়ে বসেছে, ওয়াটসন। সত্যিই কয়েকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে এ-
ব্যাপারে। প্রথমেই কিছু ভূগোল-তত্ত্ব বুঝে রাখ, তদন্তের সময় খুবই কাজে আসবে এসব
খুঁটিনাটি।

ম্যাপটা দেখছ তো। এই কালো রঙের চৌকোনা জায়গাটা হল প্রায়রি স্কুল। আলপিন
গেঁথে রাখলাম এখানে। আচ্ছা, এই যে লাইনটা দেখছ, এটা প্রধান সড়ক। দেখতেই
পাচ্ছ, সড়কটা স্কুলের পাশ দিয়ে পূব আর পশ্চিমে চলে গেছে। দু-দিকেই
মাইলখানেকের মধ্যে রাস্তাটা থেকে কোনো শাখাপ্রশাখা বেরোয়নি। জার্মান মাস্টার
ছেলেটিকে নিয়ে যদি রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে। তাহলে এটাই সে-রাস্তা।

ঠিকই বলেছ।

সৌভাগ্যক্রমে, সেদিন রাতে এই রাস্তা দিয়ে যা কিছু গেছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব
আমি পেয়েছি। আমার পাইপটা যেখানে রয়েছে এইখানে রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা
পর্যন্ত একজন চৌকিদার পাহারায় ছিল। দেখতেই পাচ্ছ, পূবদিকের প্রথম শাখা-রাস্তা
এইটাই। চৌকিদারটা দিব্যি গেলে বলছে যে এক মুহূর্তের জন্যেও চৌকি ছেড়ে এদিকে-
ওদিকে যায়নি সে এবং তার চোখে ধুলো দিয়ে কোনো ছেলে বা লোকই এ-রাস্তা দিয়ে
সেরাত্রে যায়নি। কনস্টেবলটার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম তাকে অনায়াসেই বিশ্বাস করা
চলে। কাজেই, পূবদিকের তদন্তে এইখানেই ইতি। এবার আসা যাক অন্যদিকে। দেখছ,
এদিকে রেড বুল নামে একটা সরাইখানা রয়েছে, রেড বুল-এর ল্যান্ডলেডির শরীর

অসুস্থ ছিল সেরাতে। ম্যাকলটন থেকে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু অন্য কেস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ডাক্তার এলেন পরের দিন সকালে। কাজেই সারারাত সজাগ থাকতে হয়েছে সরাইখানার লোকেদের। শুধু সজাগ নয়, ডাক্তারের প্রতীক্ষায় রাস্তার ওপরও নজর রাখতে হয়েছে প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত। সেরাতে রাস্তা দিয়ে কোনো প্রাণীই যে যায়নি, এ-খবর বেশ জোর দিয়েই জানালে ওরা। সুতরাং ওদের সাক্ষ্য সত্য বলেই মেনে নিয়ে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চিমদিকের তদন্তে দাঁড়ি টেনে দিলাম। তাহলে সংক্ষেপে আমরা পাচ্ছি কী? না, চম্পট দেওয়ার সময়ে পলাতকেরা প্রধান সড়ক একেবারেই ব্যবহার করেনি।

কিন্তু সাইকেলটা? প্রতিবাদ জানালাম আমি।

ঠিক ঠিক। সাইকেল প্রসঙ্গেও আসছি এখুনি। আপাতত শুধু যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা যাক। এরা যদি রাস্তা দিয়ে না-গিয়ে থাকে, তাহলে বাড়ির উত্তর বা দক্ষিণ দিক বরাবর এদের রওনা হতে হয়েছে রাতারাতি এ-অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। আচ্ছা, এবার এই দুটো সম্ভাবনা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। বুঝতেই পারছ, বাড়ির দক্ষিণ দিকে এই বিরাট অঞ্চলটা আসলে মস্তবড় একটা আবাদি জমি ছাড়া আর কিছু নয়। চাষের সুবিধের জন্যে চাষিরা পাথরের দেওয়াল দিয়ে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো জমিতে ভাগ করে নিয়েছে অতবড়ো জমিটা। এ-পথ দিয়ে সাইকেল যাওয়া অসম্ভব, কাজেই নাকচ হয়ে গেল এদিককার সম্ভাবনা। এবার এসো উত্তর দিকে। এদিকে দেখছি লম্বা লম্বা গাছের ছোটোখাটো একটা কুঞ্জবন—নাম লেখা রয়েছে এবড়ো-খেবড়ো উপবন। আরও উত্তরে দেখছি ধু-ধু জলাভূমি, লোয়ার গিল মূর!মস্তবড়ো

জলাভূমি। বিস্তারে কম করে মাইল দশেক তো বটেই, আস্তে আস্তে ঢাল পথে উঠে গেছে ওপরদিকে। এই ধু-ধু। তেপান্তরের একধারে হোলডারনেস হল, রাস্তা বরাবর গেলে পুরো দশ মাইল, জলাভূমির মধ্যে দিয়ে গেলে মাত্র ছ-মাইল। বড়ো অদ্ভুত জায়গা, এ-রকম জনবসতিবিরল জায়গা সাধারণত দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কৃচিৎ কয়েকটা মাথা গুঁজবার মতো ঠাঁই, জলাভূমির চাষিরা গোরু ছাগল চরাবার জন্যে এ-রকম চালা বানিয়ে রেখেছে এদিকে-সেদিকে। এ ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরলে শুধু প্লোভার আর কারলু পাখির দঙ্গল ছাড়া আর কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। চেস্টারফিল্ড হাই রোডে আসার পর আবার শুরু হল জনবসতি। একটা গির্জা, কয়েকটা কুঁড়েঘর আর একটা সরাইখানা। এর পরেই আচমকা খাড়াই হয়ে উঠেছে পাহাড়ের শ্রেণি। কাজেই বুঝতে পারছ ওয়াটসন, আমাদের তদন্ত শুরু করতে হবে উত্তর দিক থেকেই।

কিন্তু সাইকেলটা? আমি লেগে থাকি নাছোড়বান্দার মতো।

অসহিষ্ণুস্বরে হোমস বললে, আরে গেল যা! ওস্তাদ সাইক্লিস্ট কখনো রাস্তার বাছবিচার করে না এবং বড়োরাস্তাকে সে বাদ দিয়ে গলিঘুজির ভেতর দিয়েও অনায়াসেই চালাতে পারে তার দ্বি-চক্রযান। জলাভূমিতেও অজস্র সরু সরু রাস্তার অভাব নেই, তা ছাড়া সেরাত্রে আবার জোছনার ফুটফুটে আলোয় স্পষ্ট ছিল না কিছু। আরে, আরে, একী!

কে যেন দারুণ উত্তেজিত হয়ে খটাখট শব্দে টোকা দিলে দরজায়। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন ড. হাক্সটেবল স্বয়ং। হাতে একটা নীল রঙের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের টুপি। টুপির

ওপরের অংশে সাদা জমির ওপর সোনালি জরি দিয়ে আঁকা উলটোনো V মার্ক মর্যাদাসূচক অলংকরণ।

পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র আমরা পেয়েছি! জয় ভগবান, এবার পাওয়া গেছে। ছেলেটার হদিশ। এ-টুপি লর্ড স্যালটারের।

কোথায় পেলেন?

জলায় একদল জিপসি আস্তানা গেড়েছিল, তাদের ভ্যানে। মঙ্গলবার পাততাড়ি গুটোয় ওরা। আজকে পুলিশ ওদের পিছু নিয়ে ক্যারাবান তল্লাশ করতেই এ-টুপি পাওয়া যায়।

ওরা কী বলছে?

ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে ছাড়া কী আর বলবে! মঙ্গলবার সকালে ওরা নাকি টুপিটাকে জলাভূমিতে পড়ে থাকতে দেখেছিল। রাসকেল কোথাকার! সব জানে ওরা, ছেলেটাকে কোথায় গুম করে রাখা হয়েছে, সে-খবর ওরা ছাড়া কেউই দিতে পারবে না। আপাতত তো হাজতে পচুক হতভাগারা। তারপর, আইনের চোখরাঙানি তো আছেই। তাতেও না হলে ডিউকের টাকার জোরে মুখ খুলবে ওদের।

আনন্দে আটখানা হয়ে ডক্টর বেরিয়ে যাওয়ার পরেই হোমস বললে, খবরটা মোটামুটি খুব খারাপ নয়, ওয়াটসন। সূত্র হিসেবে এর মূল্য কতখানি জানি না, কিন্তু এ থেকে যে

থিয়োরি পাওয়া যাচ্ছে, তার মূল্য অনেক। সমস্ত তৎপরতা লোয়ার গিল মূরেই সীমিত রাখতে হবে-আর কোথাও নয়। জিপসিদের গ্রেপ্তার ছাড়া পুলিশ এ অঞ্চলে সত্যিকারের কোনো কাজই করতে পারেনি। ওয়াটসন, দেখেছ? জলার ওপর দিয়ে একটা জলের ধারা বয়ে গেছে। ম্যাপেতেই তো দাগ দিয়ে রাখা হয়েছে দেখছি। মাঝে মাঝে ধারাটা চওড়া হয়ে গিয়ে মিশেছে। নীচু জলা জায়গায়। ধারাটা বিশেষ করে দাগানো হয়েছে স্কুল আর হোলডারনেস হল-এর মাঝামাঝি জায়গায়। এখন আবহাওয়া যা শুকনো, তাতে জলাভূমির অন্যদিকের মাথা খুঁড়লেও পায়ের দাগ-টাগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না আমার। চিহ্ন-টিহ্ন পাওয়া যেতে পারে শুধু এই জলে স্যাৎস্যাতে জায়গাটাতেই। কাল ভোরেই তোমায় ডাক দেব, ওয়াটসন। দুজনে মিলে দেখা যাক এ-রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারি কি না।

সবে পাখির ডাক শুরু হয়েছে, রক্তরাগের আভা দেখা দিয়েছে পুবে, হোমস এসে টেনে তুলল আমায়। চোখ মেলেই দেখলাম শয্যার পাশে ওর দীর্ঘ মূর্তি দাঁড়িয়ে। অত ভোরেও সেজেগুঁজে তৈরি হয়ে নিয়েছে ও। মনে হল, ইতিমধ্যে এক চক্রর ঘোরাও হয়ে গেছে।

আমি চোখ খুলতেই ও বলল, লন আর সাইকেল রাখার শেডটা দেখে এলাম, ওয়াটসন। এবড়ো-খেবড়ো উপবনএর মধ্যে দিয়েও এক পাক ঘুরে এলাম। পাশের ঘরে তোমার কোকো তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। চটপট তৈরি হয়ে নাও, বিস্তর কাজ সারতে হবে আজকে।

দু-টুকরো হিরের মতো ঝকঝক করছিল ওর চোখ দুটো। কাজে হাত দেওয়ার আগে ওস্তাদ কারিগরের চোখ যেমন নিবিড় উৎসাহের রোশনাইতে জ্বলে ওঠে, এ যেন ঠিক তেমনি। এ যেন আর এক হোমস। বেকার স্ট্রিটের আত্মসমাহিত হোমস, দু-চোখে যার বিরং স্বপ্নালু তন্ময়তা; আর আজকের চটপটে, তৎপর হোমস, চোখে-মুখে দেহে মনে যার শুধু কাজের দীপ্তি-চেনা যায় না, যেন দু-রকমের ধাতুতে তৈরি দুজনে। মানসিক শক্তিতে ভরপুর সেই দীর্ঘ নমনীয় মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হল, বাস্তবিকই আজ বড়ো কঠোর পরিশ্রমের দিন।

কিন্তু তবু চরম নিরাশার মধ্যে দিয়েই শুরু হল আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব। বুকভরা আশা নিয়ে গেছিলাম জলাভূমিতে গাছপালার পচা শিকড়ে বোঝাই রাঙামাটির ওপর দিয়ে ব্লাড হাউন্ডের মতোই এগিয়ে গেলাম, ভেড়া যাতায়াতের অজস্র পথে শতধা বিভক্ত জলাভূমির গোলকধাঁধার মতো গলিখুঁজিতে বৃথাই ঘুরে বেড়িলাম, তারপর এসে পড়লাম জলাভূমির আর হোলডারনেসের মধ্যকার চওড়া হালকা সবুজ রঙের বৃত্তাকার নীচু জলা জায়গায়। ছেলেটা যদি বাড়ির দিকেই গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এ-পথ মাড়িয়েই যেতে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কোনো রকম চিহ্ন না-রেখে তার পক্ষে যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সে তো নয়ই, এমনকী জার্মান মাস্টারও যে কস্মিনকালে এ-পথ দিয়ে গেছিল, তার কোনো নিশানা দেখলাম না। মুখ কালো করে হোমস সবুজ জলাভূমির কিনারা বরাবর হাঁটতে লাগল-প্যাঁচপেচে জমির ওপর কোনোরকম কাদা-চটচটে চিহ্ন দেখার প্রবল আশা তার আকুল চোখে। ভেড়া যাতায়াতের চিহ্ন দেখতে পেলাম বিস্তর কয়েক মাইল ধরে এক জায়গায়, গোরুর পায়ের ছাপও পেলাম। কিন্তু ওই পর্যন্ত-নতুন কিছুই ধরা পড়ল না আমাদের ব্যগ্র সন্ধানী চোখে।

খুবই মুষড়ে পড়ল হোমস। শূন্য চোখে জলাভূমির ধু-ধু বিস্তারের পানে তাকিয়ে বললে, এদিকটা তো কোনো রকমের হল, এখন ওদিকে রয়েছে আর একটা নীচু জলা জায়গা, মাঝামাঝি এক ফালি জমিও দেখতে পাচ্ছি। আরে! আরে! একী দেখছি, একী দেখছি এখানে!

কালো ফিতের মতো সরু একটা রাস্তার ওপর এসে পড়েছিলাম আমরা। ঠিক মাঝখানে ভিজে মাটির উপর দেখলাম সুস্পষ্ট সাইকেলের চাকার দাগ।

হুররে। পেয়েছি। পেয়েছি। এবার উল্লসিত হওয়ার পালা আমার।

কিন্তু হোমস যেন হতভম্ব হয়ে গিয়ে মাথা নাড়তে লাগল আপন মনে, চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাসের বদলে দেখলাম নতুন কিছু পাওয়ার আশা।

বলল, সাইকেল তো বটেই, কিন্তু সেই সাইকেলটা নয়। টায়ারের বিয়াল্লিশ রকমের বিভিন্ন ছাপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেখতে পাচ্ছ। এ-ছাপটা ডানলপ টায়ারের, বাইরের কভারের ওপর একটা দাগও আছে। কিন্তু হেইডেগারের পামার টায়ার লাগানো আছে। ভিজে মাটির ওপর লম্বালম্বি স্ট্রাইপের ছাপ পড়ে তার সাইকেলের টায়ারে। এ-বিষয়ে গণিতের পণ্ডিত র্যাভেলিংয়ের অগাধ বিশ্বাস। কাজে কাজেই, এ-সাইকেল হেইডেগারের সাইকেল নয়।

তাহলে নিশ্চয় ছেলেটার?

তা হত যদি প্রমাণ করতে পারতাম যে তারও দখলে ছিল আরও একটি সাইকেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আমরা পারিনি। এই দাগটার সৃষ্টি যার সাইকেল, সে কিন্তু স্কুলের দিক থেকেই এসেছে।

স্কুলের দিকেও তো যেতে পারে?

আরে না, না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। যে-ছাপটা গভীর হয়ে ফুটে ওঠে মাটির ওপর, সেইটাই কিন্তু পেছনকার চাকার, কেননা ভারটা তো বেশির ভাগ পেছনের চাকার ওপরেই পড়ে। কয়েক জায়গায় লক্ষ করলেই দেখবে পেছনের চাকাটা অনেক বার সামনের চাকার হালকা অগভীর ছাপের ওপর দিয়ে গেছে। সুতরাং স্কুলের দিক থেকেই আসছিল সাইকেলটা। আমাদের বর্তমান তদন্তের সঙ্গে এ-ব্যাপারের সম্পর্ক থাকুক আর না-থাকুক, আমরা দাগ বরাবর গিয়ে দেখব কোথা থেকে এসেছে সাইকেলটা।

করলাম তাই। কয়েকশো গজ যাওয়ার পরেই জলাভূমির ভিজে মাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই টায়ারের দাগও গেল মিলিয়ে। আবার পিছিয়ে এলাম খানিকটা। এক জায়গার দাগের ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে চলেছিল ঝরনা। এখানে পেলাম আবার সাইকেলের দাগ। কিন্তু গোরুর খুরের অজস্র ছাপে দাগ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে বললেই চলে। এরপর আর কোনো ছাপ নেই। রাস্তাটা কিন্তু সিধে চলে গেছে স্কুলের পেছন দিককার এবড়োখেবড়ো উপবনের ভেতরে। বুঝলাম, সাইকেলের আবির্ভাব ঘটেছে এই

উপবনের ভেতর থেকেই। হাতের ওপর চিবুক রেখে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে পড়ল হোমস। পর পর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেললাম, কিন্তু পাথরের খোদাই করা মূর্তির মতো ওর মধ্যে এতটুকু স্পন্দন দেখলাম না।

দু-দুটো সিগারেট ছাই হয়ে যাওয়ার পর হোমস বললে, এমনও তো হতে পারে যে, অচেনা ছাপ ফেলার উদ্দেশ্যে কোনো চতুরচূড়ামণি সাইক্লিস্ট রওনা হওয়ার আগে টায়ার দুটো পালটে নিয়েছে। এ ধরনের বুদ্ধি যে-ক্রিমিনালের মাথায় আসে, তার সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা কষেও আনন্দ আছে। আপাতত এ-প্রশ্নের সমাধান না-করে জলাভূমির দিকেই ফিরে যাই চলো। এখনও অনেক কাজ বাকি ওদিকে।

ভিজে ভিজে জমির ওপর আবার শুরু হল আমাদের অভিযান, চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে ধুলো থেকে সোনা খোঁজার মতোই তন্নতন্ন করে অতি নগণ্য জিনিসও খুঁটিয়ে দেখতে কসুর করলাম না। অচিরেই আমাদের এত পরিশ্রম হল সার্থক, ফলাফল পেলাম হাতে হাতে।

জলাভূমির নীচের অংশে আড়াআড়ি একটা পাঁকাল রাস্তা চোখে পড়ায় সেদিকে এগুচ্ছি, এমন সময় খানিকটা তফাত থেকেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল হোমস। পথটার ঠিক মাঝখানেই একগোছা টেলিগ্রাফের সূক্ষ্ম তারের মতো একটা লম্বা ছাপ। পামার টায়ার।

মহা খুশিতে রীতিমতো চোঁচামেচি জুড়ে দিল হোমস, এই হল হের হেইডেগারের সাইকেল! এবার আর ভুল হবার জো নেই। কী হে ওয়াটসন আমার যুক্তি-টুক্তিগুলো খাঁটি মনে হচ্ছে না?

আমার অভিনন্দন রইল।

কিন্তু এখনও যে অনেক দূর যেতে হবে, বন্ধু। দয়া করে রাস্তা ছেড়ে হাঁটো। এবার শুরু হোক পামার টায়ার অনুসরণ পর্ব। বেশি দূর যেতে হবে বলে তো মনে হয় না।

কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, জলাভূমির একদিককার অংশে নরম মাটির টুকরো টুকরো জমির সংখ্যা বড়ো কম নয়। কাজেই মাঝে মাঝে পামার টায়ার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে থেকে, কিন্তু একেবারে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই।

হোমস বললে, একটা জিনিস লক্ষ করেছ ওয়াটসন? লোকটা সাইকেলের গতিবেগ কিন্তু এবার বাড়িয়ে দিয়েছে। না, কোনো সন্দেহই নেই সে-বিষয়ে। এই ছাপটা দেখ, দুটো টায়ারের দাগই পরিষ্কার উঠেছে এখানে। লক্ষ করেছ, দুটো ছাপই সমান গভীর। তার মানে কী? হেইডেগার হ্যান্ডেলবারের ওপর দেহের ভর দিয়ে সাইকেল চালিয়েছে। তিরবেগে সাইকেল চালাতে গেলে সামনের দিকে এইভাবেই ঝুঁকে পড়তে হয়। সর্বনাশ একবার আছাড়ও খেয়েছে দেখছি।

বেশ কয়েক গজ পর্যন্ত টায়ারের সুস্পষ্ট ছাপ নষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা জুড়ে একটা ধ্যাবড়া। দাগে। এরপর কতকগুলো পায়ের ছাপ। ঠিক তার পরেই আবার দেখা দিয়েছে পামার টায়ার।

পাঁকের ওপর চাকা পিছলে গেছে মনে হচ্ছে, বললাম আমি।

দোমড়ানো-মোচড়ানো কাটা-ফুলের একটা শাখা তুলে ধরলে হোমস। সভয়ে দেখলাম টুকটুকে লাল রঙের ছাপ লেগেছে হলুদ কুঁড়িগুলোয়। এমনকী রাস্তার ওপরে আর ছোপের মধ্যেও দেখলাম চাপ চাপ জমাট রক্তের কালো দাগ।

খারাপ। ভারি খারাপ! বিড়বিড় করতে থাকে হোমস। সরে দাঁড়াও ওয়াটসন। এলোমেলো পায়ের ছাপ আর একটিও নয়! কী দেখছি জান? আহত হয়ে পড়ে গেলেন হেইডেগার, তবুও দাঁড়িয়ে উঠলেন রক্তাক্ত দেহে, বসলেন সাইকেলের সিটে, শুরু হল যাত্রা। কিন্তু নতুন দাগ তো আর দেখছি না। পাশের সরু পথটায় গোরু ঘোড়া মোষ ভেড়া চলার চিহ্ন তো দেখছি অনেক। ষাঁড়ের গুতো-টুতো খাননি তো? অসম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণীর চিহ্নও তো দেখছি না হে। ওয়াটসন, চল এগিয়ে যাই, যা থাকে কপালে। রক্তের দাগ আর চাকার ছাপ এই আমাদের সম্বল, চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া এবার আর সম্ভব নয় বাছাধনের পক্ষে।

এবারের অনুসন্ধান পর্ব হল খুবই সংক্ষিপ্ত। ভিজে ভিজে চকচকে পাথরের ওপর দিয়ে হঠাৎ মাতালের মতো ঐক্যবৈক্যে এগিয়ে গেল পামার টায়ার। তার পরেই সামনের দিকে

তাকাতে আচম্বিতে আমার চোখে পড়ল ঘন কাটাঝোঁপের মধ্যে ঝকঝকে ধাতুর মতো কী-একটা জিনিস। ভেতর থেকে টেনে বার করলাম আমার টায়ার লাগানো একটা সাইকেল। একটা প্যাডেল দুমড়ে গেছে। সামনের দিকটা আগাগোড়া ভিজে গেছে টস টস করে ঝরে পড়া রক্তে। বীভৎস! ঝোঁপের অন্যদিকে আকাশমুখো একটা জুতো দেখে ঘুরে দৌড়োলাম আমরা। সাক্ষাৎ মিলল হতভাগ্য সাইক্লিস্টের। বেশ লম্বা চেহারা ভদ্রলোকের, একমুখ ঘন দাড়ি, চোখের চশমার একটা কাচের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। মাথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে তার খুলির সামনে দিকটা একেবারেই চুরমার হয়ে গেছে সেই সাংঘাতিক ঘায়ে। এ-রকম মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পরেও যে-পুরুষ এতটা পথ আবার সাইকেল চালিয়ে আসতে পারে তার প্রাণশক্তি আর সাহসের প্রশংসা করতে হয় সহস্রমুখে। ভদ্রলোকের পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু মোজা নেই, বুক খোলা কোটের নীচে দেখলাম রাত্রে পরার একটা নাইট-শার্ট। না, কোনো সন্দেহই নেই, এ-লাশ পলাতক জার্মান মাস্টার হেইডেগারেরই।

সশঙ্কভাবে মোলায়েম হাতে দেহটা উলটে ফেলে অনন্যমনা হয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল হোমস। তারপর কিছুক্ষণ ডুবে রইল গভীর চিন্তায়। কুঁচকানো কপালের অজস্র রেখা দেখে বেশ বুঝলাম, এই শোচনীয় আবিষ্কারে আমাদের সত্যিকারের সমস্যার সুরাহা হয়নি কিছুই এবং আমরা যে-তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও বললে, কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, ওয়াটসন। আমার নিজের অভিমত হচ্ছে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই আমার টায়ার রহস্য নিয়ে এত সময় নষ্ট করে ফেলেছি যে আর একটা ঘণ্টাও বাজেভাবে কাটাতে রাজি নই আমি। পক্ষান্তরে

পুলিশের কানেও এখনকার খবর পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্য আমাদেরই। হতভাগ্য মাসটারের দেহটার গতি যাতে হয় সে-ব্যবস্থাও তো করা দরকার।

খবর নিয়ে আমিই ফিরে যেতে পারি।

কিন্তু তোমার সঙ্গ আর সাহায্য আমার এখন বিশেষ দরকার। সবুর। ওদিকে ওই যে লোকটা পচা শেকড় মেশানো মাটি কাটছে-ডাকো ওকে, ওকে দিয়েই খবর পাঠানো যাক।

চাষি লোকটাকে ডেকে আনলাম। খুনখারাপি দেখে তো ভয়ের চোটে তার ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। হোমস একটা চিরকুট লিখে তার হাতে দিল ডা. হাক্সটেবলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

লোকটা বিদেয় হলে হোমস বললে, ওয়াটসন, আজ সকালে তাহলে মোট দুটো সূত্র পেলাম। এক নম্বর হচ্ছে পামার টায়ার লাগানো বাইসাইকেল। তদন্ত শুরু করার আগে একবার ভেবে নেওয়া যাক আমাদের হাতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কী কী তথ্য এসেছে। যে-তথ্য নিছক দৈবাৎ, তা বাদ দেব, হাতে রাখব শুধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো।

সবার আগে একটা বিষয় তোমায় বলে রাখি, ওয়াটসন। ছেলেটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় পালিয়েছে স্কুল ছেড়ে। নিজেই জানলা গলে আইভিলতা বেয়ে নীচে নেমেছে সে, যাবার

সময়ে হয় একলা গেছে, আর না হয় সঙ্গে কাউকে নিয়েছে। এ-বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহ আমার নেই।

আমিও একমত হলাম হোমসের সাথে।

বেশ, এবার তাহলে আসা যাক হতভাগ্য জার্মান মাস্টারের প্রসঙ্গে। যাওয়ার সময়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়েছে ছেলেটি। তার মানে, সে জানত কী করতে চলেছে সে। কিন্তু হেইডেগার মোজা না-পরেই বেরিয়ে পড়লেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে তৈরি হয়ে নিতে হয়েছে—মোজা পরার সময় বা সুযোগ হয়নি সেই কারণেই।

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু হেইডেগার গেলেন কেন? কারণ শোবার ঘরের জানলা থেকে ছেলেটার পলায়ন-দৃশ্য উনি দেখতে পেয়েছিলেন। সাইকেলে পিছু নিয়ে ওকে ধরে ফেলে ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায় নিয়েই শুরু হয়েছে ওঁর নিশা-অভিযান। তাই তাড়াতাড়ি সাইকেল বার করে বেরিয়েছিলেন উনি। কিন্তু ওই বেরোনোই হল ওঁর কাল।

আমার তাই মনে হয়।

এবার আসছি বিতর্কের সবচেয়ে গোলমালে অংশে। একটা ছেলের পিছু নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে যেকোনো পুরুষের পক্ষে পেছন পেছন দৌড়ানোই স্বাভাবিক। কেননা, দৌড়ে

তাকে টেকা দেওয়া তো আর ছোটো ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জার্মান মাস্টার এই সহজ পথ না-নিয়ে শরণ নিলেন সাইকেলের। শুনেছি, ভদ্রলোক ওস্তাদ সাইক্লিস্ট ছিলেন এবং উনি কখনোই তার দ্বি-চক্রানের সাহায্য নিতেন না যদি-না উনি দেখতেন যে ছেলেটি চম্পট দেওয়ার জন্যে শরণ নিয়েছে কোনো বেগবান বাহনের।

আর একটা বাইসাইকেলের সম্ভাবনা এসে গেল কিন্তু।

দেখাই যাক না যুক্তির পথে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। স্কুল থেকে পাঁচ মাইল দূরে খুন হলেন হেইডেগার। মনে রেখো, মৃত্যু কিন্তু বুলেটের চুম্বনে নয়। শক্তিশালী হাতের অত্যন্ত বর্বরোচিত আঘাতে। বুলেট ছুঁড়ে মানুষ খুন করা যেকোনো ছেলেমানুষের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু মাথার খুলি গুঁড়ো করার মতো পাশবিক আঘাত হানার ক্ষমতা তার হাতে নেই। কাজেই, ছেলেটির নৈশ-পলায়নের সঙ্গী ছিল একজন। এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই পাঁচ মাইল পেরিয়ে এসেছে তারা-কেননা, এই সুদীর্ঘ পথেও হেইডেগারের মতো পাকা সাইক্লিস্ট তাদের পেরিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করে, আশেপাশের জায়গা-জমি তন্নতন্ন তরে দেখেও আমরা পাচ্ছি কী? গোরু, মোেষ, ভেড়ার আনাগোনার চিহ্ন ব্যস, আর কিছুই নয়। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে ঘুরে এসেও পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোনো পথঘাটের সন্ধান পেলাম না। খুনের সঙ্গে আর একজন সাইক্লিস্টের কোনো সম্পর্কই নেই। এমনকী, কোনো মানুষের পায়ের ছাপও নজরে এল না।

হোমস, কী বলছ তুমি, এ যে অসম্ভব!

শাবাশ! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য! অসম্ভব বটে, হয় আমার বলার ভঙ্গিমাই ভুল, আর না হয় ভুল লুকিয়ে আছে যা বলেছি তার মধ্যে। কিন্তু নিজের চোখেই তো তুমি সব দেখলে, যুক্তিতর্কের কোনো কারচুপি নিয়ে তোমার খটকা লাগছে?

আছাড় খাওয়ার সময় মাথার খুলি ভেঙে যায়নি তো?

এইরকম একটা জলা জায়গায়, ওয়াটসন?

ভাই, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে।

আরে ছাঃ, কী বলছ। অনেকগুলো ঘোরালো সমস্যার সমাধান করলাম আমরা। মালমশলা পেয়েছি বিস্তর-এখন শুধু তাদের কাজে লাগানোই বাকি। পামার-পর্ব তো শেষ হল, এবার এসো ডানলপের পিছু নিয়ে দেখা যাক কোথায় পৌঁছেই আমরা।

শুরু হল ডানলপের চিহ্নিত পথে শিকারী কুকুরের মতো আমাদের অভিযান। কিছু দূরে যাওয়ার পরেই জলাভূমি ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে উঠে গেল ওপর দিকে, জলের ধারা পেছনে ফেলে এসে পড়লাম গুল্মসমাকীর্ণ বৃত্তাকার সুদীর্ঘ একটা অংশের ওপর। এইরকম জায়গায় কোনো চিহ্নই পাওয়া আর সম্ভব নয়। শেষবারের মতো যেখানে ডানলপের চিহ্ন দেখলাম, সেখান থেকে হোলডারনেস হলের দিকে যাওয়া যায়। কয়েক

মাইল দূরে বাঁ-দিকে হল-এর আকাশছোঁয়া জমকালো চূড়াগুলো চোখে পড়ছিল। আবার সামনের দিকে চেস্টারফিল্ডের হাইরোডের পাশে ধূসর গ্রামটার দিকে যাওয়াও সম্ভব।

শ্রীহীন, অপরিচ্ছন্ন সরাইখানার দিকে এগুচ্ছি দুজনে, দূর থেকেই দরজার ওপর লড়ায়ে-মোরগের প্রতীকটা দেখা যাচ্ছিল, এমন সময়ে আচমকা গুঙিয়ে উঠে আমার কাধ চেপে ধরে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলে হোমস। বেকায়দায় গোড়ালি মচকে গেলে যেমন অসহায় হয়ে পড়ে মানুষ, তারও অবস্থা হল তাই। অতি কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার সামনে পৌঁছোল ও ময়লা রঙের স্থূল চেহারার একজন প্রৌঢ় কালো মাটির পাইপে ধূমপান করছিল আসনসিঁড়ি হয়ে বসে।

কেমন আছেন, মি. রিউবেন হেইজ? জিজ্ঞেস করে হোমস।

কে আপনি? আমার নামটাই-বা জানলেন কোথেকে? একজোড়া ধূর্ত চোখে সন্দেহের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

আপনার মাথার ওপর বোর্ডেই তো লেখা রয়েছে নামটা! আর, বাড়ির মালিককে দেখলে তত চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। আপনার আস্তাবলে ঘোড়ার গাড়ি বা এ-জাতীয় কিছু আছে নাকি?

না নেই।

যন্ত্রণায় মাটির ওপর পা-টাও রাখতে পারছি না আমি ।

তাহলে রাখবেন না ।

হাঁটতেও পারছি না ।

তাহলে লাফান ।

মি. রিউবেন হেইজের হাবভাব আর যাই হোক বরদাস্ত করার মতো নয় । কিন্তু বলিহারি যাই হোমসের, যেন নিছক রঙ্গ-পরিহাস করছে অভদ্র লোকটা, এমনভাবে দিব্যি কথাবার্তা চালিয়ে গেল ও ।

বলল, আরে মশাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন কীরকম বেকায়দায় পড়েছি আমি । যানবাহন না হয় একটা পেলেই হল, ও নিয়ে আমি অত ভাবি না ।

আমিও না, গম্ভীর মুখে বলে সরাইখানার মালিক ।

এত হালকাভাবে নেবেন না, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণে এখুনি আমার একটা সাইকেল দরকার এবং ভাড়া হিসাবে একটা গিনি দিতে রাজি আছে আমি ।

কান খাড়া করে মি. রিউবেন হেইজ, কোথায় যেতে চান?

হোলডারনেস হলে ।

ডিউকের চ্যালাচামুণ্ডা মনে হচ্ছে? আমাদের কাদামাখা পোশাকের ওপর সবিক্রপ চাহনি
বুলিয়ে নেয় লোকটা ।

হো হো করে হেসে ওঠে হোমস । বলে, ডিউকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলে তার
আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকবে না ।

কেন শুনি?

তার হারানো ছেলের খবর এনেছি বলে ।

দস্তুরমতো চমকে ওঠে মি. রিউবেন হেইজ ।

ছেলেটার পিছু পিছু এখানে এসে পৌঁছেছেন নাকি?

খবর এসেছে, লিভারপুলে রয়েছে সে । যেকোনো মুহূর্তে পুলিশ তাকে পাকড়াও করার
আশা রাখছে ।

চকিতে মুখচোখের ভাব পালটে যায় লোকটার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফভরা ভারী মুখে
আচম্বিতে ফুটে ওঠে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

বলে, ডিউককে অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছে মোটেই নেই আমার এবং তার কারণ আছে।
এক সময়ে তার প্রধান কোচোয়ান ছিলাম আমি। কিন্তু বড়ো জঘন্য ব্যবহার করেছিলেন
আমার সাথে। একটা মিথ্যেবাদী ভুট্টাওলার কথা বিশ্বাস করে আমায় বরখাস্ত করেছিলেন
উনি। কিন্তু লিভারপুলে লর্ড স্যাটারারের খোঁজ পাওয়া গেছে শুনে খুশি হলাম। আমি
দেখছি যাতে আপনি

এ-খবর হল-এ নিয়ে যেতে পারেন।

হোমস বললে, ধন্যবাদ। প্রথমেই পেটে কিছু দানাপানি পড়া দরকার। সাইকেলটা তার
পরে আনবেন।

আমার কোনো সাইকেল নেই।

একটা গিনি বার করে হোমস।

আরে মশাই, বললাম তো আমার সাইকেল নেই। হল পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে দুটো ঘোড়া
আমি দিচ্ছি আপনাদের।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে কিছু খেয়ে নিই, তারপর হবেখন এসব কথা।

এবড়োখেবড়ো পাথরে বাঁধানো রান্নাঘরে বসিয়ে মি. রিউবেন হেইজ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পলক ফেলার আগেই বেমালুম সেরে গেল হোমসের গোড়ালির মচকানি।

দিনের আলো নিভে আসতে বিশেষ দেরি নেই। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি দুজনে, সারাদিন দাঁতে কুটোটি কাটবার সময় বা সুবিধে হয়নি। তাই, প্রথমেই কিছুটা সময় ব্যয় করলাম খাওয়ার জন্যে। চিন্তাচ্ছন্ন মুখে হোমস বার কয়েক জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে তাকালে বাইরে। নোংরা উঠানটার খানিকটা নজরে পড়ছিল খোলা জানলা দিয়ে। দূরে এককোণে কামারশালার কাজ করছিল কালিঝুলিমাখা একটা ছোকরা। আর একদিকে রয়েছে আস্তাবল। দ্বিতীয়বার জানলা থেকে ঘুরে এসে আবার বসে পড়েছিল হোমস, তারপরেই আচমকা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল ও।

ওয়াটসন, ওয়াটসন, পেয়েছি! হ্যাঁ, তাঁ, যা ভেবেছি, তাই। ওয়াটসন আজকে গোরুর খুরের ছাপ দেখেছ বলে মনে পড়ে তোমার?

এস্তার দেখেছি।

কোথায়?

কোথায় নয়? জলা জায়গায় দেখেছি, দেখেছি রাস্তার উপর, বেচারি হেইডেগার যেখানে শেষ ঘুমে শুয়েছেন সেখানেও দেখেছি বলে মনে পড়ছে।

এগজ্যাক্টলি। আচ্ছা, ওয়াটসন, জলাভূমিতে আজ ক-টা গোরু দেখেছ বলো তো?

আদৌ দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

আশ্চর্য, ওয়াটসন, সত্যি আশ্চর্য! যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে গেছি, দেখেছি এস্তার গোরুর পদাঙ্ক, কিন্তু সারাজলাভূমিতেও দেখিনি একটাও গোরু। আশ্চর্য! অদ্ভুত! কি বল, ওয়াটসন?

আশ্চর্যই বটে।

এবার একটু মাথা খাটাও দিকি ব্রাদার। মনটাকে পাঠিয়ে দাও জলাভূমিতে! রাস্তার ওপর দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ তো?

তা পাচ্ছি।

তোমার মনে পড়ে কি খুরের ছাপগুলো একবার ছিল এক রকম, বলে অনেকগুলো টুকরো রুটি এইভাবে সাজালে সে—ঃঃঃঃঃ—আর একবার ছিল এইরকম—ঃঃঃঃঃ—এবং মাঝে মাঝে ছিল এইরকম—ঃঃঃঃঃ কি, মনে পড়ছে তোমার?

না, ভাই।

কিন্তু আমার মনে আছে। দিব্যি গেলে বলতে পারি ভুল হয়নি আমার। যাই হোক, অবসরমতো ফিরে গিয়ে যাচাই করে দেখলেই হবেখন। আমি একটা অন্ধ গর্দভ, ওয়াটসন। তখনই আমার সমাধানে পৌঁছোনো উচিত ছিল।

সমাধানটা কী, তাই শুনি?

সমাধান শুধু একটাই-এবং তা হচ্ছে একটা পরমাশ্চর্য গোরুর পদাঙ্কদর্শন! এ-গোরু দিব্যি হাঁটে, কদম চালে চলে, আবার দরকার হলে, লম্বা লম্বা লাফ মেরে ছুটেও কসুর করে না। ওয়াটসন, আমি শপথ করে বলতে রাজি আছি, এ-জাতীয় ধোঁকাবাজি যার মগজে আছে, তাকে আর যাই হোক, গাঁইয়া বলা চলে না। কামারশালার ওই ছোকরাটা ছাড়া পথ পরিষ্কার হবে বলে মনে হচ্ছে না। চলো হে, টুক করে বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসি কী ব্যাপার।

আস্তাবলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল দুটি ঘোড়া। ককট চুল উশকোখুশকো-যেন দলাইমলাই হয়নি কতদিন। একটা ঘোড়ার পেছনের পা তুলে ধরে সজোরে হেসে উঠল হোমস।

পুরোনো খুর, কিন্তু লাগানো হয়েছে নতুন পুরোনো নাল, কিন্তু পেরেকগুলো নতুন। ক্লাসিক কেসের পর্যায়ে ফেলা যায় এ-কেসটাকে। চলো, কামারশালায় একবার টু মেরে আসি।

আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে একমনে কাজ করে চলল ছোকরাটা। মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে ছিল লোহা আর কাঠের বিস্তর টুকরো। দেখলাম ডাইনে বাঁয়ে সামনে ঘুরছে হোমসের সন্ধানী দৃষ্টি এইসব আবর্জনার মধ্যে। আচম্বিতে পেছনে পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ফিরে তাকিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেলাম স্বয়ং রিউবেন হেইজের সাথে; ঝোঁপের মতো পুরু কালো কুচকুচে ভুরুজোড়া নেমে এসেছিল শ্বাপদের মতো জ্বলন্ত চোখ দুটোর ওপর, সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে উঠেছিল অবরুদ্ধ ক্রোধে।

ধাতুর টুপি লাগানো একটা খাটো লাঠি হাতে সাক্ষাৎ কালান্তকের মতো এমন ভঙ্গিমায় সে এগিয়ে এল আমাদের পানে যে তৎক্ষণাৎ পকেটের মধ্যে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে স্বস্তিবোধ করলাম আমি।

শয়তান স্পাই কোথাকার! কী করছেন এখানে? বাজের মতো চিৎকার করে ওঠে লোকটা।

নিরীহ স্বরে হোমস বললে, আরে মশাই, আপনার রকম-সকম দেখে তো লোকে ভাববে-জানি কী গোপন কথাই ফাঁস হয়ে গেল আপনার।

প্রবল প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত করে নিলে মি. রিউবেন হেইজ । কুটির চাইতেও ভয়ংকর হয়ে উঠল তার মুখের সঁতো হাসি ।

কামারশালায় কিছু দেখার ইচ্ছে থাকলে দেখতে পারেন, কোনো আপত্তি নেই আমার । কিন্তু মিস্টার আমার চোখের আড়ালে আমার বাড়িতে ঘুরঘুর করাটা একবারেই পছন্দ করি না আমি । চটপট পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সরে পড়ুন এখান থেকে, তাহলেই খুশি হই আমি ।

হোমস বললে, ঠিক আছে, মি. হেইজ আপনার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই । আপনার ঘোড়াগুলো একটু দেখছিলাম । কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে হেঁটেই যেতে পারব আমরা-খুব দূর নয়, কী বলেন?

হলের ফটক এখান থেকে দু-মাইলের বেশি নয় । বাঁ-দিকের ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে যান । বাড়ি থেকে বেরিয়ে না-আসা পর্যন্ত কুতকুতে চোখে আমাদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বর্বর লোকটা ।

রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর মোড় ঘুরে মি. রিউবেন হেইজের চোখের আড়ালে আসতেই দাঁড়িয়ে গেল হোমস ।

বলল, বেশ গরম ছিলাম সরাইখানার ভেতর । যতই দূরে যাচ্ছি, ততই যেন ঠান্ডাটা জাঁকিয়ে বসছে আমার ওপর । না, না, ও-জায়গা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে ।

আমি বললাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস রিউবেন হেইজ এ-রহস্যের সব খবর রাখে। এরকম ধরনের মূর্তিমান যমের মতো বদমাশ খুব অল্পই দেখেছি আমি ওর চেহারাই ওর মনের ছবি।

আহা! লোকটার মধ্যে শুধু ওইটুকুই দেখলে তুমি? ঘোড়াগুলো রয়েছে কামারশালাটা রয়েছে-এসব কিছুই নয়? না, হে, না, লড়ায়ে মোরগওলা এমন খাসা সরাইখানা ছেড়ে যেতে মন সরছে না আমার ভারি ইন্টারেস্টিং জায়গা কিন্তু। চলো, গায়ে পড়ে আর একবার দেখে আসি ভেতরটা।

ঢালু হয়ে পাহাড়টা উঠে গেছিল ওপরদিকে, বড়ো বড়ো চুনাপাথরের ধূসর রঙের চাই পড়ে ছিল বিস্তর। রাস্তা ছেড়ে এই পাহাড় বেয়ে সবে উঠতে শুরু করেছি ওপরে, এমন সময় হোল্ডারনেস হল-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের পানে বেগে ছুটে আসছে একটা সাইকেল।

বসে পড়ো, ওয়াটসন, বসে পড়ো!সজোরে আমার কাঁধে চাপ দিয়ে চাঁচিয়ে উঠল হোমস। পাথরের আড়ালে লুকোতে-না-লুকোতেই ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে সাঁ করে আমাদের পেরিয়ে গেল লোকটা। কুণ্ডলীপাকানো রাশিরাশি ধুলোর মেঘের মতো এগিয়ে এসে সাঁ করে লহমার জন্যে চোখে পড়ল উদবেগ থর থর ফ্যাকাশে একটা মুখ মুখের পরতে পরতে প্রকট হয়ে উঠেছে অপরিসীম আতঙ্ক; হাঁ হয়ে গেছে মুখ, চোখ দুটো যেন উন্মাদ আবেগে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। গতরাতে চটপটে চালাকচতুর যে জেমস

ওয়াইল্ডারকে আমরা দেখেছি, এ যেন তাঁর এক কিস্তুতকিমাকার প্রতিচ্ছবি, বিকট রূপ দেখিয়ে সঙের মতো লোক হাসানোর প্রচেষ্টা।

ডিউকের সেক্রেটারি? চেষ্টা করে ওঠে হোমস। নেমে এসো ওয়াটসন, দেখা যাক ভদ্রলোক যান কোথায়।

পাথরের চাঁই ধরে ধরে খানিকটা নেমে এমন একটা জায়গায় এলাম যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় সরাইখানার সামনের দরজাটা। দেওয়ালে হেলান রাখা ওয়াইল্ডারের বাইসাইকেলটা চোখে পড়ল। বাড়ির মধ্যে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখলাম না, জানলাতেও দেখতে পেলাম না কারো মুখ। হোল্ডারনেস হল-এর সুউচ্চ চুড়োগুলোর ওপাশে সূর্য হেলে পড়তেই নেমে এল। গগাধূলির ম্লান বিষাদাভা। তারপর, আলো আঁধারির মাঝে আস্তাবলের সামনে উঠোনে একটা ঘোড়ার গাড়ির দু-পাশের আলো দুটো জ্বলে উঠতে দেখলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শুনলাম অশ্বখুরধ্বনি। খটাখট শব্দে রাস্তার ওপর বেরিয়ে এল গাড়িটা এবং প্রচণ্ড বেগে যেন উড়ে গেল চেস্টারফিল্ডের দিকে।

কী মনে হয়, ওয়াটসন, ফিসফিস করে ওঠে হোমস।

সরে পড়ল মনে হচ্ছে?

দু-চাকার গাড়িতে শুধু একজনকেই বসে থাকতে দেখেছি আমি এবং তিনি জেমস ওয়াইল্ডার নন এই কারণেই যে, দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক।

একটা লাল চৌকো আলো ভেসে উঠেছিল অন্ধকারের সমুদ্রে। ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো লালের পটভূমিকায় দেখলাম সেক্রেটারির কালো মূর্তি সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে অন্ধকারের বুকে উঁকি মেরে কী যেন খুঁজছেন। হাবভাব দেখে মনে হল, কারো প্রতীক্ষায় রয়েছেন মি. ওয়াইল্ডার। বেশ কিছুক্ষণ পরে রাস্তার ওপর শোনা গেল কার পদশব্দ। আলোর পটভূমিকায় মুহূর্তের জন্যে আবির্ভূত হল দ্বিতীয় একটি মূর্তি, বন্ধ হয়ে গেল দরজা এবং সঙ্গেসঙ্গে নিচ্ছিদ্র তমিস্রায় হারিয়ে গেল সব কিছু। পাঁচ মিনিট পরে দোতলার ঘরে একটা বাতি জ্বলে উঠল।

হোমস বললে, লড়ায়ে মোরগের আস্তানায় দেখছি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটে রাতের অন্ধকারে?

মদ খাওয়ার জায়গাটা কিন্তু বাড়ির অন্যদিকে।

ঠিক বলেছ। এখন যাঁদের দেখছি, তাদের তাহলে প্রাইভেট অতিথি বলা উচিত। কিন্তু ভায়া, এত রাতে এ রকম একটা নোংরা সরাইখানায় মি. জেমস ওয়াইল্ডারের কী হেতু আগমন এবং চুপিসারে তার সাথে ওই যে লোকটা দেখা করতে এল, সে-ই বা কে না-জানা পর্যন্ত তো আমি শান্তি পাব না। চল, বুঁকি নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। সাহস করে কাছে গিয়ে দেখে আসতে হবে কী ব্যাপার।

কসরত করে দুজনে রাস্তার ওপর নেমে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম সরাইখানার দিকে। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ছিল বাইসাইকেলটা। ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পেছনের চাকার কাছে ধরল হোমস। আলো এসে পড়ল ডানলপ টায়ারের ওপর। নিঃশব্দে হেসে ওঠে ও।

মাথার ওপরেই আলোকিত জানলাটা দেখিয়ে হোমস বললে, ওয়াটসন ঘরের ভেতরে উঁকি-দিয়ে আমি নড়ছি না এখান থেকে। দেওয়াল ধরে পিঠ পেতে দাঁড়াও তুমি, তারপর যা করবার আমি করছি!

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে আমার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে উঠল হোমস এবং দাঁড়াতেনা-দাঁড়াতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল নীচে।

বন্ধু এবার যাওয়া যাক। সারাদিন বড়ো খাটাখাটুনি গেছে বটে, কিন্তু সবরকমের পয়েন্ট জোগাড় করতে পেরেছি বলেই আমার বিশ্বাস। স্কুল এখান থেকে অনেকটা দূরে-কাজেই চল, আর অযথা দেরি না-করে রওনা হওয়া যাক।

সুদীর্ঘ পথে আর বিশেষ কোনো কথা বলল না হোমস। কাদা-প্যাঁচপেচে জলাভূমি পেরিয়ে এলাম, শান্ত অবসন্ন দেহ, কিন্তু সারাপথে প্রায় বোবা হয়ে রইল ও। স্কুলে পৌঁছে ভেতরে না-চুকে গেল ম্যাকলিটন স্টেশনে। সেখান থেকে কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে এল স্কুলে। আরও রাত গভীর হলে শুনলাম বেচারি ড. হাক্সটেবলকে সাত্বনার বাণী শোনাচ্ছে সে। মাস্টারের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকে

ভদ্রলোক শয্যা নিয়েছিলেন। এবং এরপরেও যখন সে আমার ঘরে ঢুকল তখন তাকে দেখে অবাক না-হয়ে পারলাম না। ভোরবেলা চোখ মেলে শয্যার পাশে সতর্ক-চক্ষু প্রাণরসে ভরপুর যে-মানুষটিকে দেখেছিলাম, সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও দেখলাম অবিকল সেই মানুষটিকে। এতটুকু বিরক্ত হয়নি, অফুরন্ত প্রাণরসে টলমল তার মুখচ্ছবি। ঘরে ঢুকেই খুশি খুশি গলায় ও বললে, বন্ধু হে, হাওয়া অনুকূলে। কাল সন্ধ্যে হওয়ার আগেই এ-রহস্যের সমাধান সম্পূর্ণ করে ফেলব-কথা দিচ্ছি তোমায়।

পরের দিন সকাল বেলা এগারোটা নাগাদ শার্লক হোমস আর আমি হোলডারনেস হল-এর সুবিখ্যাত ইউ বীথিকার মাঝ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হলাম রানি এলিজাবেথ আমলের জমকালো তোরণের সামনে। সেখান থেকে পৌঁছেলাম হিজ থ্রেসের স্টাডিতে। মি. জেমস ঘরে ছিলেন। আমাদের দেখেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বাইরে থেকে দেখে ভদ্রলোককে একটু গম্ভীর মনে হলেও গতরাতের বুনো আতঙ্কের ফিকে রেশ যেন তখনও লেগে ছিল তার চোরা নজর আর থেকে থেকে কেঁপে ওঠা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

হিজ থ্রেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? দুঃখিত, ডিউক এখন অত্যন্ত অসুস্থ। খারাপ খবরটা শোনার পর থেকেই উনি খুবই উতলা হয়ে পড়েছেন। গতকাল বিকেলে ড. হাক্সটেবলের টেলিগ্রামে আপনার আবিষ্কারের কাহিনি জেনেছি আমরা।

মি. ওয়াইল্ডার, ডিউকের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।

উনি এখন ওঁর ঘরে...

তাহলে তার ঘরেই যাব আমরা ।

খুব সম্ভব শুয়ে আছেন এখন ।

সেই অবস্থাতেই তার সঙ্গে দেখা করব আমি ।

হোমসের নিরুত্তাপ কিন্তু অটল ভাবভঙ্গি দেখে সেক্রেটারি বুঝলেন যে তার সঙ্গে তর্ক করে লাভই হবে না ।

ভালো কথা । আপনারা এসেছেন, এ-খবর আমি নিজেই দিচ্ছি ওঁকে ।

আধঘণ্টা পর ঘরে ঢুকলেন, অভিজাত মহলের মুকুটমণি ডিউক স্বয়ং । আগের চাইতেও বিরং, বিবর্ণ, হতশ্রী মনে হচ্ছিল তাঁকে, যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে । কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে আগের দিন যাকে দেখেছিলাম, তিনি যেন ইনি নন । এক লাফে যেন বেশ কয়েকটা বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর । রাজকীয় সৌজন্য আর শিষ্টাচার শেষ হলে পর লাল দাড়ি টেবিলের উপর লুটিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন উনি ।

তারপর? কী খবর, মি. হোমস? গুরুগম্ভীর গলায় শুধোলেন ডিউক ।

কিন্তু শার্লক হোমস দেখি একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে সেক্রেটারির পানে, ডিউকের চেয়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রলোক ।

ওইভাবে তাকিয়েই বলল ও, ইয়োর গ্রেস, আমার মনে হয় মি. ওয়াইল্ডার না-থাকলেই বরং আমি খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব ।

যেন আর এক পোচ ছাই রং চড়ল মি. ওয়াইল্ডারের মুখের ওপর । বিষাক্ত চোখে হোমসের পানে তাকালেন উনি ।

ইয়োর গ্রেস যদি ইচ্ছে করেন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এখন এস । এবার বলুন, মি. হোমস, কী বলার আছে আপনার?

সেক্রেটারি বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল বন্ধুবর ।

তারপর বলল, ইয়োর গ্রেস, ড. হাক্সটেবল আমাকে এবং আমার সহকর্মী ড. ওয়াটসনকে একটা খবর দিয়েছিলেন । আপনি নাকি একটা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন এ-ব্যাপারে । খবরটা আপনার মুখ দিয়েই আমি যাচাই করে নিতে চাই ।

তা করেছিলাম বই কী, মি. হোমস ।

শুনেছি, আপনার ছেলে কোথায় আছে, এ-খবর যে দিতে পারবে, তাকে আপনি দেবেন পাঁচ হাজার পাউন্ড? এগজ্যাক্টলি। আর এক হাজার দেবেন যে বলতে পারবে আপনার ছেলেকে কে বা কারা লুকিয়ে রেখেছে, তাকে?

এগজ্যাক্টলি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তাকে যারা গুম করেছে তাদের নাম ছাড়াও তার এই অবস্থার জন্যে ষড়যন্ত্রে যাঁরা লিপ্ত, তাদেরকেও নিশ্চয় ধরেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অধীরভাবে চিৎকার করে ওঠেন। মি. শার্লক হোমস, আপনার কাজ যদি সন্তোষজনক হয়, তাহলে কৃপণতা করেছি, এ ধরনের অভিযোগ করার কোনো কারণ আপনার থাকবে না।

এমন লোভাতুরভাবে দু-হাত ঘষতে লাগল হোমস যে দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেলাম আমি। ওর পরিমিতি রুচির খবর আর কেউ না-জানলেও আমি তো জানি।

চকচকে চোখে হোমস বললে, ইয়োর থ্রেসের চেকবইটা টেবিলের ওপরে রয়েছে মনে হচ্ছে। ছ-হাজার পাউন্ডের চেক আমার নামে লিখে দিলে খুবই খুশি হব আমি। ক্রস করে দেওয়াই ভালো। দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাঙ্কের অক্সফোর্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ আমার এজেন্ট।

ঝড়ু দেহে অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গিমায় বসে পাথরের মতো চোখে বন্ধুবরের পানে তাকালেন হিজ থ্রেস ।

তামাশা করছেন নাকি, মি. হোমস? রসিকতা করার মতো বিষয় এটা নয় ।

নিশ্চয় নয়, ইয়োর থ্রেস । জীবনে এতখানি উৎসুক আর আমি হইনি ।

আমি বলতে চাই যে, পুরস্কারটা আমারই প্রাপ্য । আপনার ছেলে কোথায় আছে, তা আমি জানি । যাঁরা তাকে আটকে রেখেছেন, তাঁদের অন্তত কয়েকজনকেও আমি চিনি ।

কাগজের মতো অস্বাভাবিক সাদা মুখের পটভূমিকার ডিউকের উগ্র লাল দাড়ি যেন আরও টকটকে হয়ে ওঠে ।

কোথায় সে? রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেন উনি ।

আপনার পার্ক-গেট থেকে মাইল দুয়েক দূরে লড়ায়ে-মোরগের প্রতীক লাগানো সরাইখানার কাছে, সে অন্তত গতকাল রাত পর্যন্ত ছিল সেখানে ।

চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন ডিউক ।

অপরাধী সাব্যস্ত করছেন কাকে?

সুস্থিত হয়ে গেলাম শার্লক হোমসের উত্তর শুনে। চট করে এগিয়ে এসে ডিউকের কাঁধ স্পর্শ করে ও বললে, আপনাকে। ইয়োর থ্রেস, চেকটার জন্যে এবার একটু কষ্ট দেব আপনাকে।

ডিউকের সে-মূর্তি আমি জীবনে ভুলব না। হোমসের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই তোক করে লাফিয়ে উঠে এমনভাবে বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন যেন পাতালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন উনি কুটো আশ্রয় করার মতোও অবলম্বন না-পেয়ে। পরক্ষণেই অসাধারণ সংঘমবলে নিজেকে সামলে নিলেন। এ-রকম আতীত আবেগকে চকিতে দমন করে ফেলে সহজ হয়ে ওঠার মতো আশ্চর্য ক্ষমতা বোধ হয় শুধু তার মতো অভিজাত পুরুষেরই থাকে। চেয়ারের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে দু-হাতে মুখ লুকোলেন উনি। বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতার মধ্যে দিয়ে।

তারপর, হাত থেকে মুখ না-তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, কতখানি জানেন আপনি?

গত রাতে আপনাদের সবাইকে আমি দেখেছি।

আপনার বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে এ-কথা?

না, কাউকে আমি বলিনি।

কাঁপা আঙুলে কলম তুলে নিয়ে চেকবই খুললেন ডিউক ।

আমার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না মি. হোমস । আপনার আনা সংবাদ আমার কাছে যতই অপ্রীতিকর আর অবাস্তব হোক না কেন, চেক আমি লিখে দিচ্ছি । পুরস্কার ঘোষণা করার সময়ে আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি এ-রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে আমায় । আপনি আর আপনার বন্ধু, দুজনেই তো স্বাধীন, কারো অধীন নন, তাই না মি. হোমস?

ঠিক বুঝতে পারলাম না, ইয়োর গ্রেস ।

আরও সরল করেই তাহলে বলি, এ-ঘটনা যদি কেবলমাত্র আপনারা দুজনেই জেনে থাকেন, তাহলে তা শুধু আপনাদের মধ্যেই সীমিত থাকুক । আপনারা যখন কারো অধীন নন, তখন তা তৃতীয় ব্যক্তির কানে যাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না । তাহলে, বারো হাজার পাউন্ড আপনাকে আমায় দিতে হবে, কী বলেন মি. হোমস?

কিন্তু হোমস শুধু হাসল । মাথা নেড়ে বললে, ইয়োর গ্রেস, এত সহজে এ কেলেক্সারি ধামাচাপা দেওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না আমার । স্কুলমাস্টারের মৃত্যুর কারণ আমাদের দর্শাতেই হবে ।

কিন্তু জেমস সে-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে না। এজন্যে তো আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। এ-কাজ ওই জানোয়ার বদমাশটার। অবশ্য জেমসই তাকে কাজে লাগিয়েছিল ছেলেটাকে রাতারাতি পাচার করার জন্যে।

ইয়োর গ্রেস, একবার যদি কোনো অপরাধের পথে কেউ আগুয়ান হয়, তাহলে পথ চলতে গিয়ে আরও পাঁচটা অপরাধের উদ্ভব হলে ন্যায়ত তাকেই সব কিছুর জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাই নয় কি?

ন্যায়ত, মি. হোমস। ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু আইনত নিশ্চয় নয়। খুনের দৃশ্যে হাজির-থাকলে আপনি কোনো মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না। বিশেষ করে, আপনার আমার মতোই খুনকে যে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, খুনের কথা শুনলেও যে শিউরে ওঠে, তাকে তো নয়ই। এ-খবর তার কানে আসামাত্র আতঙ্কে, অনুতাপে ভেঙে পড়ে সেই মুহূর্তে অকপটে সমস্ত আমার কাছে স্বীকার করেছে সে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খুনেটার সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরকালের মতো চুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। মি. হোমস ওকে বাঁচান-ওকে আপনি বাঁচান। আমার একান্ত অনুরোধ, ওকে আপনি এ-বিপদ থেকে বাঁচান।

ভেঙে পড়ে তার সংযমের বাঁধ। মুখের পরতে পরতে আকুল আকুঞ্চনের মধ্যে দিয়ে আতীব্র আকিঞ্চন ফুটিয়ে তুলে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে অস্থিরভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে থাকেন উনি। কিছুক্ষণ পরে আবার সংযমের নিগড়ে বেঁধে ফেললেন নিজেকে। টেবিলের সামনে বসে পড়ে বললেন, আর কারো কাছে না

গিয়ে আমার কাছে আসার জন্যে আপনার বিবেচনা আর বুদ্ধির তারিফ করছি আমি । এ জঘন্য কেলেকারি যাতে আর পাঁচ কান হয়, সে-সম্বন্ধে আসুন সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা কিছু বন্দোবস্ত করা যাক ।

ইয়োর থ্রেস, আমার বিশ্বাস আমরা পরস্পরের কাছে অসংকোচে এবং অকপটে যদি সরল হতে পারি, তাহলে আপনি যা বললেন, তা সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না আমার । আমার ক্ষমতা যতদূর কুলোয়, ইয়োর থ্রেসকে সাহায্য করতে আমি রাজি আছি । কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো কিছুই গোপন না-থাকা উচিত এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি শুনে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধেও আমার ওয়াকিবহাল থাকা দরকার । আপনার কথা শুনে এটুকু বুঝলাম যে আপনার সেক্রেটারি মি. জেমস ওয়াইল্ডার খুনি নন ।

না, খুনি এখন আমাদের নাগালের বাইরে ।

গম্ভীরভাবে একটু হাসল শার্লক হোমস ।

ইয়োর থ্রেস আমার সামান্য নাম-যশের বিশেষ কিছু শুনেছেন বলে মনে হয় না । শুনলে পরে এমন কথা বলতেন না । আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া এত সহজ নয় । গতকাল রাত এগারোটায় আমার নির্দেশমতো চেস্টারফিল্ডে থ্রেণ্ডার হয়েছে মি. রিউবেন হেইজ । আজ সকালে স্কুল থেকে রওনা হওয়ার আগেই এ-সম্পর্কে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি ওখানকার পুলিশের বড়োকর্তার কাছ থেকে ।

চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে বন্ধুবরের পানে তাকালেন ডিউক ।

আশ্চর্য! আপনি তো দেখছি অমানবিক ক্ষমতার অধিকারী । রিউবেন হেইজ তাহলে এখন হাজতে? শুনে সত্যিই সুখী হলাম আমি । অবশ্য জানি না এর ফলাফল জেমসকে স্পর্শ করবে কি না ।

আপনার সেক্রেটারি?

না মশায়, না । আমার ছেলে ।

এবার অবাক হওয়ার পালা হোমসের ।

ইয়োর গ্রেস, আমি স্বীকার করছি এ-খবর আমার কাছে একেবারেই নতুন । আর একটু খুলে বলবেন কি?

কিছুই লুকোব না আপনার কাছে । এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত । জেমসের বোকামো আর ঈর্ষার পরিণামস্বরূপ যে-সংকটে আমরা পড়েছি, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় অকপটে সব কথা খুলে বলা । যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, তবু আমি কিছু গোপন করব না । মি. হোমস, যৌবনে আমি একজনকে ভালোবেসেছিলাম । যে-ভালোবাসা জীবনে কেবল একবারই আসে মনের কোণে চির

বসন্তের ফুল ফোঁটাতে এ সেই ভালোবাসা। ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু তিনি রাজি হননি পাছে এ-বিয়ের ফলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বেঁচে থাকলে জীবনে আমি আর কাউকে বিয়ে করতাম না। মারা গেলেন তিনি, আমার হাতে সাঁপে গেলেন শিশু জেমসকে। ওকে আমি মানুষ করেছি। শুধু ওর মায়ের কথা ভেবে। দুনিয়ার সামনে ওর পিতৃত্ব আমি স্বীকার করতে পারিনি বটে, কিন্তু ওকে আমি উচ্চশিক্ষা দিয়েছি, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সবসময়ে রেখেছি একান্ত কাছটিতে। কী কৌশলে জানি না, আমার গুপ্ত কথা জেনে ফেলে ও। তারপর থেকেই তার অনেক আবদার আমি মেনে নিয়েছি। আমার ওপর ওর প্রকৃত অধিকার কী, তা তার অজানা নয়। এ নিয়ে একটা কেলেক্সারি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যে তার আছে, এবং তাহলে সমাজে যে আমার মাথা তোলার উপায় থাকবে না, তাও সে জানে ভালো করেই। বিবাহিত জীবনে আমি সুখী হইনি-সেজন্য জেমসই কতকাংশে দায়ী। সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানেন, প্রথম থেকেই আমার একমাত্র আইন-অনুজ্ঞাত উত্তরাধিকারীকে ও সমানে ঘৃণা করে এসেছে। অনুক্ষণ এই ঘৃণায় এতটুকু বিরাম দেখিনি আমি। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, এত কাণ্ডের পরও কেন জেমসকে আমারই কাছে কাছে আমি রেখেছি। উত্তরে আমি বলব, এ দীর্ঘ যন্ত্রণা সহ্য করছি শুধু ওর মায়ের জন্যে। ওর মুখের মধ্যে আমি ওর মায়ের মুখ দেখি, আমার প্রথম যৌবনের প্রথম ভালোবাসার ছবি দেখি; ওর প্রতিটি হাবভাব, চালচলন ঠিক ওর মায়ের মতোই এতটুকু অমিল এতদিনেও দেখিনি আমি। তাই ওর মধ্যে দিয়ে অতীতকে দেখি চোখের সামনে। এই কারণেই, ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারিনি। কিন্তু পাছে আর্থারের মানে, লর্ড স্যালটারারের কোনো ক্ষতি করে বসে ও, তাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ড. হাক্সটেবলের স্কুলে নিছক নিরাপত্তার খাতিরে।

হেইজ লোকটা আমার প্রজা ছিল এককালে। জেমস তখন আমার এজেন্ট হিসাবে কাজ করত, তখনই ওদের আলাপ হয়। চিরকালই লোকটা পয়লা নম্বরের পাকা বদমাশ। কিন্তু কী বিচিত্র কারণে জেমসের সঙ্গে ওর নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে। বার বার লক্ষ করেছি, নীচ সঙ্গে দিকে ওর কেমন জানি কেঁক আছে। লর্ড স্যালটারকে গুম করার পরিকল্পনা ওর মাথায় আসার পর এই লোকটাকেই কাজে লাগাল জেমস। আপনার মনে আছে নিশ্চয়, আগের দিন আর্থারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি। জেমস খামটা খুলে একটা চিরকুট ভরে দেয় ভেতরে। চিরকুটে লেখা ছিল, আর্থার যেন অমুক দিনে অমুক সময়ে স্কুলের কাছে এবড়োখেবড়ো উপবন-এ দেখা করে তার সঙ্গে। চিরকুটে ডাচেসের নাম থাকায় আর্থার আর দ্বিধা করেনি। সেদিন সন্ধ্যায় জেমস সাইকেল চালিয়ে গেল সেখানে আমাকে ও যেমনটি বলেছে, ঠিক সেইরকমভাবে বলছি আপনাকে বনের মধ্যে নিরালায় আর্থারকে বললে যে তার জন্যে তার মায়ের মন কেমন করছে বলে তার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। জলাভূমিতে আর্থারের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। মাঝরাতে বনে এলে ঘোড়া নিয়ে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে সে। সে-ই তাকে পৌঁছে দেবে তার মায়ের কাছে। আর্থার বেচারার ফাঁদে পা দিলে। নির্দিষ্ট সময়ে উপবনে এসে হেইজকে দেখলে একটা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। দুজনেই সওয়ার হল একই ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু জার্মান মাস্টার যে তাদের পিছু নিয়েছিলেন, এ-খবর জেমস শুনলে মাত্র গতকাল। হাতের লাঠি দিয়ে হেইজ তার মাথায় মারতে পথের ওপরেই মারা যান ভদ্রলোক। সরাইখানায় আর্থারকে আনার পর দোতলার একটা ঘরে নজরবন্দি রাখা হয় মিসেস হেইজের তত্ত্বাবধানে। ভদ্রমহিলার মনটি বড়ো ভালো, কিন্তু জানোয়ার স্বামীর কোনো আদেশ ঠেলে ফেলবার মতো ক্ষমতা তার নেই।

মি. হোমস, দু-দিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ে আপনি যা জানতেন, তার থেকে একটিলও বেশি জানতাম না আমি। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, এ ধরনের অপকর্ম করার পেছনে জেমসের মোটিভ কী? উত্তরে আমি বলব, আমার আইনত উত্তরাধিকারীর প্রতি ওর উন্মাদ ঘৃণার মধ্যে যুক্তির কোনো বালাই ছিল না। ওর ধারণায়, আমার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ নাকি সে-ই হতে পারে। কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুনের জন্যে তা সম্ভব নয়। তাই এদিক দিয়েও সীমা নেই তার বিদ্বেষের। এসব ছাড়াও তার একটা বিশেষ মোটিভ ছিল। তার প্রবল ইচ্ছে ছিল যে, আমি ওয়ারিশ পরিবর্তন করি এবং তার মতে আমার নাকি সে-ক্ষমতা আছে। এই সম্পর্কেই আমার সঙ্গে দরাদরি করতে চেয়েছিল ও। আর্থারকে যদি সে উদ্ধার করতে পারে, তাহলে আমি পুরস্কারস্বরূপ আর্থারের নাম খারিজ করে ওয়ারিশ হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দেব তাকে! ও বেশ জানে, স্বেচ্ছায় আমি তাকে কোনোদিনই পুলিশের হাতে তুলে দেব না। কিন্তু দরাদরি করার আর সময় পেল না জেমস। এ-প্রস্তাব আমার কাছে আসার আগেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতা ওকে দিশেহারা করে তুললে। ফলে, পরিকল্পনামতো কাজ করার সুযোগই পেল না ও।

ওর সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল আপনার আবিষ্কারে। জলায় হেইডেগারের মৃতদেহ পেয়েছেন আপনারা-এ-খবর শোনামাত্র আতঙ্কে নীল হয়ে গেল জেমস। গতকাল এই ঘরে আমরা বসে রয়েছি, এমন সময়ে ড. হাক্সটেবলের টেলিগ্রামে খবরটা পেলাম। শোকে উদ্বেগে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল জেমস যে দেখেই খটকা লাগল আমার। সত্য কথা বলতে কী, প্রথম থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল। ওর ওইরকম

মুহ্যমান অবস্থা দেখামাত্র সন্দেহ পরিণত হল স্থির বিশ্বাসে এবং তখনই ওকে চাপ দিলাম আমি। কাজ হল তৎক্ষণাৎ। স্বেচ্ছায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল জেমস। করার পর আমাকে অনুন্নয় করলে যে, দিন তিনেকের জন্যে আমি যেন মুখ বন্ধ করে থাকি, ইতিমধ্যে তার দুষ্কর্মের সঙ্গী গা-ঢাকা দিক। রাজি হলাম আমি। এইভাবেই চিরকাল ওর কাকুতিমিনতির কাছে সাঁপে দিয়েছি নিজেকে। সঙ্গেসঙ্গে ও ছুটল সরাইখানায় হেইজকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে রাতারাতি তাকে এ-অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে দিয়ে আমি যেতে পারলাম না, কিন্তু অন্ধকার হতে-না-হতেই রওনা হলাম মাই ডিয়ার আর্থারকে দেখতে। দেখলাম নিরাপদেই আছে সে। শরীরও সুস্থ। তবে চোখের সামনে ওই বীভৎস খুন দেখার পর থেকে আতঙ্ক যেন ওর অণু-পরমাণুতেও শেকড় গেড়েছে-কী পরিমাণে যে ভয় পেয়েছে ও, তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না, মি. হোমস। প্রতিশ্রুতি অনুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিন দিনের জন্যে মিসেস হেইজের হেপাজতে রেখে এলাম ওকে। কেননা, পুলিশকে সংবাদ দিতে গেলেই তাদেরকে প্রথমে জানাতে হবে এতদিন তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সঙ্গেসঙ্গে তারাই জানতে চাইবে, হত্যাকারী কে। হত্যাকারীর সমুচিত শাস্তির আয়োজন করতে গেলে হতভাগ্য জেমসের সর্বনাশ ডেকে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এইসব ভেবেই তিন দিন চুপচাপ থাকাই বিধেয় বলে মনে করলাম। আপনি অকপটে সরল হতে বলেছিলেন, মি. হোমস। তাই কোনোরকম বাগাড়ম্বর বা কোনো কিছু লুকোবার চেষ্টা না-করে অসংকোচে সব খুলে বললাম। আপনার কথায় নির্ভর করে আমার কথা রেখেছি। এবার আপনার পালা আমাকে সাহায্য করার।

এবং আমি তা করব, বলল হোমস। ইয়োর গ্রেস, প্রথমেই একটা কথা না-বলে পারছি না। আইনের চোখে নিজেকে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন আপনি। একটা মহাপাতককে আপনি সহ্য করেছেন এবং একজন খুনে গুলাকে গা-ঢাকা দেওয়ার সহায়তা করেছেন। এ-কথা বললাম এই কারণে যে, রাতারাতি এ-অঞ্চল থেকে শাকরদকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে জেমস ওয়াইল্ডারের যত অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, তা যে আপনার পকেট থেকেই গেছে, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন ডিউক।

বাস্তবিক ব্যাপারটা বড়োই সিরিয়াস। ইয়োর গ্রেস, তার চেয়েও নিন্দনীয় হচ্ছে আপনার ছোটো ছেলের প্রতি আপনার অসংগত আচরণ। তিন দিনের জন্যে একটা নোংরা আস্তানায় তাকে আপনি ফেলে এসেছেন।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রয়েছে—

এ ধরনের লোকদের কাছে প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু? জেমস ওয়াইল্ডার যে আবার নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে না, এ-রকম কোনো গ্যারান্টি কি কেউ কাউকে দিতে পারে? অপরাধী বড়ো ছেলেকে খুশি করার জন্যে নিরপরাধ ছোটো ছেলেকে অনাবশ্যক অথচ আসন্ন বিপদের মধ্যে আপনি ফেলে এসেছেন, আপনার এই আচরণ অত্যন্ত অসংগত এবং অন্যায়।

নিজের হলে দাঁড়িয়ে এভাবে ধমকধামক খাওয়ার মতো দুর্দিন হোলডারনেসের দর্পিত লর্ডের জীবনে কোনোদিন আসেনি। উন্নত ললাট রাঙা হয়ে উঠল রক্তোচ্ছাসে, কিন্তু তবুও উনি মূক হয়ে রইলেন বিবেকবুদ্ধির তর্জনী হেলনে।

একটিমাত্র শর্তে আপনাকে সাহায্য করব আমি। শর্তটা এই-ঘণ্টা বাজিয়ে আপনারা পেয়াদাকে ডেকে পাঠান এবং আমার খুশিমতো তাকে আদেশ দেওয়ার অনুমতি আমাকে দিন।

একটি কথাও না-বলে বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলেন ডিউক। ঘরে ঢুকল একজন পরিচারক।

হোমস বললে, সুখবর আছে তোমাদের জন্যে লর্ড স্যালটারকে পাওয়া গেছে। ডিউকের ইচ্ছে এই মুহূর্তে যেন একটা গাড়ি লড়ায়ে মোরগওলা সরাইখানায় গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসে।

আনন্দে আটখানা হয়ে পেয়াদা বেরিয়ে যেতেই হোমস বলল, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়ার পর এবার অতীত নিয়ে পড়া যাক। আমি সরকারি কাজ করি না এবং যতক্ষণ সুবিচারের সম্ভাবনা রয়েছে, আমি যা জানি তা প্রকাশ করারও কোনো কারণ দেখি না। হেইজ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। ফাঁসি তার হবেই এবং তা থেকে তাকে বাঁচানোর কোনো প্রচেষ্টা আমি করব না। সে কী ফাঁস করবে-না-করবে, তা আমি জানি না। তবে ইয়োর গ্রেস তাকে অনায়াসেই সমঝে দিতে পারেন যে, বোবা হয়ে

থাকাটাই তার স্বার্থের অনুকূল হবে। পুলিশ জানবে মোটা দাঁড়য়ের লোভেই লর্ড স্যালটারকে গুম করেছিল সে। আসল তথ্য যদি তারা নিজেরাই খুঁজে না পায়, তাহলে যেচে তাদেরকে সব কথা বলার কোনো কারণ দেখছি না আমি। ইয়োর গ্রেস, এক বিষয়ে আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এর পরেও যদি মি. জেমস ওয়াইল্ডার আপনার কাছে থাকেন, তাহলে আরও অনেক নতুন সংকটের সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আমিও তা বুঝেছি, মি. হোমস। এ-বিষয়ে আমাদের কথা হয়ে গেলে জেমস অস্ট্রেলিয়ায় যাবে ভাগ্যান্বেষণে।

তাই যদি হয়, ইয়োর গ্রেস, তাহলে আরও একটা কথা বলব। আপনি নিজেই বলেছিলেন আপনার বিবাহিত জীবনের অশান্তির জন্যে জেমস ওয়াইল্ডারই কতকাংশে দায়ী। আমার মতে, এতদিন ডাচেসের প্রতি যে-অবিচার করা হয়েছে, তা সুরাহা করার ব্যবস্থা এবার আপনি করুন এবং চরম অশান্তির ভেতর দিয়ে যে-সম্পর্কে ছেদ পড়েছিল নিতান্ত আকস্মিকভাবে, আবার তা নতুন করে স্থাপন করার আয়োজন আপনার দ্বারাই হোক!

সে-ব্যবস্থাও আমি করেছি হোমস। আজ সকালেই ডাচেসকে চিঠি লিখেছি আমি।

হোমস উঠতে উঠতে বললে, তাহলে আমি এবং আমার বন্ধু নিজেদেরকেই অভিনন্দন জানাতে পারি এই কারণে যে, উত্তর দেশে এত অল্প সময়ের জন্যে বেড়াতে এসেও

অনেকগুলো অত্যন্ত সুখময় পরিণতির সূচনা করে যেতে পারলাম। ছোট্ট একটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমার খটকা কিন্তু এখনও যায়নি। হেইজ ঘোড়ার খুরে কতকগুলো আশ্চর্য নাল লাগিয়েছিল। ফলে হয়েছে কী, মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের ছাপ না-পড়ে পড়েছে গোরুর খুরের ছাপ। এ ধরনের অসাধারণ পদ্ধতি কি জেমস ওয়াইল্ডারই শিখিয়েছিলেন তাকে?

ক্ষণকাল চিন্তাচ্ছন্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ডিউক। তারপরেই চোখের তারায় নিবিড় হয়ে উঠল বিস্ময়। দরজা খুলে মিউজিয়ামের মতো সাজানো মস্ত একটা ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। কোণের দিকে মাথা রাখা একটা কাচের আলমারির কাছে গিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন ভেতরে পাথরের ওপর খোদাইকরা কয়েক ছত্র বিবরণের দিকে।

বিবরণটা এই : হোলডারনেসের হলের পরিখা খনন করে এই নালগুলি পাওয়া গেছে, নালগুলি ঘোড়ার পায়ে লাগানোর জন্যে। কিন্তু অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্যে তলার লোহা বিশেষভাবে খণ্ডিত। অনুমান, মধ্যযুগে হোলডারনেসের কয়েকজন লুঠেরা ব্যারনের আমলে এদের সৃষ্টি।

কেসটা খুলে ফেলল হোমস, তারপর থুথু দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে আলগোছে বুলিয়ে নিলে একটা নালের ওপর দিয়ে। টাটকা কাদার একাট পাতলা স্তর উঠে এল আঙুলে।

কাচের ডালাটা বন্ধ করতে করতে ও বলল, ধন্যবাদ। উত্তর দেশে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু যা দেখলাম, তার মধ্যে এইটাই হল দ্বিতীয়।

আর প্রথমটা?

চেকটা ভাঁজ করে সন্তর্পণে নোটবইয়ের মধ্যে রেখে দিলে হোমস। তারপর সন্মুখে বারকয়েক হাত বুলিয়ে নিয়ে আমি বড়ো গরিব বলে ভেতরকার পকেটের কোণায় বইটা চালান করে দিলে ও।

টীকা

গোরুর খুরের রহস্য : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য প্রায়রি স্কুল ইংলন্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যায় এবং আমেরিকায় কলিয়াস উইকলির ৩০ জানুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যায়।

ম্যাকলটন : লেসলি ক্লিংগার জানিয়েছেন, এই গল্পের পাণ্ডুলিপিতে ম্যাকলটন-এর বদলে ডার্বিশায়ারের ক্যাসলটন-এর নাম লিখেছিলেন কন্যান ডয়েল। পরে তা বদলে দেন।

ইটন জ্যাকেট : কোমরের ওপর পর্যন্ত খাটো বুলের এই জ্যাকেট প্রথম ব্যবহার করত ইটন স্কুলের ছাত্ররা। পরে অন্যান্য স্কুলের ইউনিফর্মে এই ধরনের জ্যাকেট ব্যবহৃত হতে থাকে।

ওয়াটসন আর আমার মতো দু-দুটো বাঘা হাউন্ডের : শার্লক হোমস কি সত্যিই এ-কথা বলেছিলেন, নাকি ওয়াটসন নিজেকে জাহির করতে লিখেছেন এই কথা।

এটা প্রধান সড়ক : পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় প্রথমে লেখা হয়েছিল, ম্যাঞ্চেস্টার থেকে বাক্সটন যাওয়ার প্রধান সড়ক।

ডানলপ টায়ার : ইংলন্ডে হাওয়া ভরা টায়ারের প্রথম পেটেন্ট ১৮৪৫ সালে রবার্ট উইলিয়াম থমসন নিয়ে থাকলেও, হাওয়া ভরা বা নিউম্যাটিক সাইকেল টায়ারের পেটেন্ট নেন জন বয়েড ডানলপ ১৮৮৮ সালে। পরের বছর তার কোম্পানি বায়ার্ন ব্রাদার্স ইন্ডিয়া রাবার কোম্পানি লিমিটেড এই টায়ার প্রস্তুত করতে শুরু করে এবং তা প্রবল জনপ্রিয় হয়। ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডানলপ রাবার কোম্পানি লিমিটেড। গাড়ির টায়ার এই কোম্পানি বাজারে আনে ১৯০৬ সালে।

পরপর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেললাম : ওয়াটসন কি নিয়মিত সিগারেট খেতেন? প্রশ্ন তুলেছেন কয়েকজন হোমস-গবেষক। কারণ, এই গল্প ছাড়া শুধুমাত্র দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস উপন্যাসে তাকে সিগারেট খেতে দেখা গিয়েছে।

দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাঙ্ক : এই ব্যাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায় দ্য ম্যান উইদ দ্য টুইস্টেড লিপস এবং দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস গল্পে। আর্থার কনান ডয়েল নিজেও ছিলেন এই ব্যাঙ্কের গ্রাহক। এই ব্যাঙ্ক ১৯১৮-তে লয়েডস ব্যাঙ্কের সঙ্গে একত্রিত হয়। লয়েডস ব্যাঙ্কের এখনকার নাম লয়েডস টি. এস. বি. ব্যাঙ্ক।

বারো হাজার পাউন্ড : ওয়াটসনের মুখ বন্ধ রাখতে আরও ছয় হাজার?

নালগুলি পাওয়া গেছে : সিভিল ওয়ারের সমসাময়িক ঠিক এই ধরনের নাল, যাতে ঘোড়ার খুরের ছাপকে গোরুর খুরের বা শিশুদের পায়ের ছাপ মনে হবে, কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে টিউসবেরির কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত বার্টসমর্টন কোর্টে। (দ্রষ্টব্য : মে ১৯০৩-এ স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন)।

তিন ঢেলাসের রহস্য

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য অ্যাবি গ্যাঞ্জ]

১৮৯৭ সালের শীতকাল। তুষার পড়ছিল সেরাত্রে। কনকনে ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। ভোররাতের দিকে কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে কে আমায় ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। দেখি হোমস। হাতের মোমবাতির আলো ঝিকমিকিয়ে উঠছিল তার মুখের ওপর। সতর্ক ব্যগ্র মুখে আগ্রহের দীপ্তি আর তার ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গিমা দেখে এক নজরেই বুঝলাম, শুরু হয়েছে নতুন কোনো ঝামেলা।

আমি চোখ মেলতেই চৈঁচিয়ে উঠল ও, উঠে পড়ো, ওয়াটসন, উঠে পড়ো। ডাক এসে গেছে, খেলা শুরু হল বলে। একটা কথাও নয়! ধড়াচুড়ো এঁটে নিয়ে চলে এসো চটপট!

দশ মিনিট পরেই আমাদের নিয়ে নিস্তর পথ কাঁপয়ে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলল শেরিং ক্রস স্টেশনের দিকে। ভোরের প্রথম আলো তখন সবে দেখা দিচ্ছে পূর্ব দিগন্তে। মাঝে মাঝে দু-একজন শ্রমিকের আবিল আবছা মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লন্ডনের শ্বেতপাথরের মতো অস্বচ্ছ ধোঁয়ার মধ্যে। ভারী কোট জড়িয়ে চুপচাপ বসে ছিল হোমস। আমারও সেই অবস্থা। প্রথমত, হাড়কাঁপানো হিমেল হাওয়া। তার ওপর পেটে কিছু না-দিয়েই রওনা হতে হয়েছে দুজনকে। কাজেই মুখ বুজে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। স্টেশনে পৌঁছে কিছু গরম চা পেটে পড়বার পর কেন্ট-অভিমুখী একটা ট্রেনে জাঁকিয়ে বসে বেশ আরাম বোধ করলাম। আর তখনই কথা ফুটল

হোমসের মুখে। পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে চেষ্টা করে চেষ্টা করে পড়তে শুরু করল বন্ধুবর :

অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ, মার্শহাম, কেন্ট, রাত সাড়ে তিনটে।

মাই ডিয়ার মি. হোমস, আপনার সাহায্য এখনি দরকার এবং তা পেলে খুবই খুশি হব। কেসটা অত্যন্ত আশ্চর্য রকমের। আপনার এজিয়ারেই পড়ছে। শুধু লেডিকে রেহাই দেওয়া ছাড়া আপনি না-আসা পর্যন্ত কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করা হবে না। তাকে মুক্তি না-দিলেই নয়। কিন্তু দোহাই আপনার, একটা মুহূর্তও আপনি অযথা নষ্ট করবেন না। কেননা, স্যার অস্টেসকে এভাবে ফেলে রাখা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

আপনার বিশ্বস্ত
স্ট্যানলি হপকিনস।

হোমস বললে, একটা কথা কিন্তু না-বলে পারছি না, ওয়াটসন। কেস নির্বাচন তোমার ঠিকই হয় না। এর যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। সব কিছুই তুমি গল্প লেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখ। এই মারাত্মক অভ্যাসেই মাটি করেছে কেসগুলো। তা না-করে যদি বৈজ্ঞানিক চোখ নিয়ে দেখতে, তাহলে বোধ হয় এ-রকম সর্বনাশ হত না ঘটনাগুলোর।

নিজে লিখলেই তো পার? তিক্ত স্বরে বলি আমি।

লিখব মাই ডিয়ার ওয়াটসন, লিখব। ইচ্ছে আছে, জীবনের শেষ বছরগুলোয় এমন একটা বই লিখে যাব যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় আর্ট। বর্তমান কেসটা মনে হচ্ছে খুনের ব্যাপারে।

তুমি কি তাহলে মনে কর স্যার অস্টেস মারা গেছেন?

তাই তো মনে হচ্ছে। হপকিনসের লেখার মধ্যে রয়েছে প্রচুর উদবেগ। কিন্তু জানই তো, আবেগপ্রবণ মানুষ নয় সে। খুনখারাপি নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে। লাশটাকেও রেখে দিয়েছে আমাদের পরীক্ষার জন্যে। নিছক আত্মহত্যার কেস হলে আমার কাছে আসার পাত্র সে নয়। শোচনীয় দৃশ্য দেখে পাছে আঘাত পান লেডি, তাই বোধ হয় তাকে তালাচাষি দিয়ে রেখেছে। ঘরে। ওয়াটসন, খুবই অভিজাত মহলে চলেছি আমরা। খড়মড়ে কাগজে, E.B. মনোগ্রাম, বংশের প্রতীক চিহ্ন আর ছবির মতো সুন্দর ঠিকানা-সবগুলিরই মানে এক। আমার তো মনে হয় বন্ধুবর হপকিনসের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে এযাত্রা এবং আমাদেরও সকালটা মন্দ কাটবে না। খুনটা হয়েছে গতরাতে বারোটার আগে।

কী করে বুঝলে তুমি?

ট্রেনগুলোর গতিবিধি লক্ষ করে আর সময়ের দিকে নজর রেখে। স্থানীয় পুলিশ ডাকতে হয়েছে, তারা এসে খবর দিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, হপকিনসকে বেরোতে হয়েছে,

তারপর সে খবর পাঠিয়েছে আমাকে। রাত ভোর হয়ে যায় এত কাজ করতে গেলে। যাক, চিশলহাস্ট স্টেশন এসে গেছে। সব সন্দেহ ভঞ্জন করা যাবে এবার।

গ্রামাঞ্চলের অলিগলির মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইল দুয়েক পেরিয়ে এলাম ঘোড়ার গাড়িতে। তারপর পৌঁছোলাম একটা পার্কের ফটকে। খোলা দরজায় আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনস। যৌবনরসে টলমল তার দেহে আর সতর্ক চোখে-মুখে লক্ষ করলাম নিবিড় আগ্রহের দ্যুতি।

মি. হোমস, আপনি এসেছেন দেখে সত্যিই বড়ো খুশি হলাম! ড. ওয়াটসন, আপনিও এসেছেন দেখছি। হাতে সময় থাকলে আপনাদের আর কষ্ট দিতাম না। ভদ্রমহিলার জ্ঞান ফিরে আসার পর তার মুখেই ঘটনার এমন পরিষ্কার একটা বিবরণ শুনলাম যে আপনাদের আর কিছু করণীয় আছে বলে মনে হয় না আমার। লুইহ্যামের সিঁধেল চোরাদের দলটার কথা মনে আছে আপনার?

বল কী! আবার সেই তিন র্যাব্ভ্যাল?

ধরেছেন ঠিক। বাপ আর দুই ছেলে। এ-কাজ তাদেরই। এ-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। দিন পনেরো আগে সিডেনহ্যামে একটা গোলমাল করেছে এই তিনজনে। সেই সময়ে যারা ওদের দেখেছে, তারাই বর্ণনা দিয়েছে ওদের চেহারার। এত তাড়াতাড়ি এবং কাছাকাছি আবার যে ওরা তৎপর হয়ে উঠবে, তা কি আর ভাবতে পেরেছিলাম

আমি। আশ্চর্য বুকের পাটা! বাহাদুর বটে! কিন্তু যাই বলুন, এ-কাজ তাদেরই। এবার ওদের বরাতে জানবেন ফাঁসির দড়ি ঝুলছে।

স্যার অস্টেস তাহলে মারা গেছেন? হ্যাঁ। চুল্লি খোঁচাবার লোহার ডাঙায় চুরমার হয়ে গেছে তার মাথার খুলি।

স্যার অস্টেস ব্র্যাকেনস্টল? কোচোয়ানের মুখে শুনলাম। ওঁর স্ত্রী এখন শোকে ভেঙে পড়ছেন। বেচারি। বড়ো ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে ওঁকে। প্রথমে এসে তো প্রায় আধমরা দেখেছিলাম ভদ্রমহিলাকে। আমার মনে হয় আপনার উচিত প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত শুনে নেওয়া। তারপর, সবাই মিলে খাওয়ার ঘরটা পরীক্ষা করা যাবে।

লেডি ব্র্যাকেনস্টল সাধারণ মহিলা নন। এ-রকম অভিজাত্যপূর্ণ তনু, রমণীয় কান্তি আর এত সুন্দর মুখ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বরবর্তিনী যুবতী। বড়ো মিষ্টি, ফুরফুরে চেহারা তাঁর। সোনা-সোনা চুল। নীল নীল চোখ! চুল-চোখের সাথে গায়ের রংও নিশ্চয় মানানসই ছিল কাল রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আগে পর্যন্ত। তার আতঙ্ক-বিহ্বল উদ্ভান্ত মুখের সঙ্গে যেন আঁখি-কেশ-তনুর সৌন্দর্য খাপ খাচ্ছিল না মোটেই। উপদ্রব শুধু মনের ওপর নয়, দেহের ওপরেও গেছে। চোখের ঠিক ওপরে কিশমিশ রঙের বীভৎস একটা ফুলো দেখলাম। অতি যত্নে ভিনিগার আর জল দিয়ে একনাগাড়ে ফুলোটা ধুয়ে দিচ্ছিল পরিচারিকা। মুখে তার তপঃকৃশ রুক্ষতার ছাপ। মাথায় বেশ লম্বা। কোচের ওপর শ্রান্তদেহে আড় হয়ে শুয়ে ছিলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। আমরা ঘরে ঢোকামাত্র তার চকিত

সন্ধানী চাহনি আর সুন্দর চোখে সতর্কতার প্রতিচ্ছবি থেকে বুঝলাম, এমন ভয়ানক অভিজ্ঞতার পরেও সাহস বা উপস্থিত বুদ্ধি বিন্দুমাত্র লোপ পায়নি। নীলচে রূপালি রঙের টিলে ড্রেসিং গাউনে আবৃত ছিল তার বরতনু। কিন্তু পাশের কোচের ওপর ঝুলছিল রূপপার চাকতি দিয়ে সেলাই করা কালো রঙের একটা ডিনারের পরিচ্ছদ।

শ্রান্তকণ্ঠে বললেন উনি, মি. হপকিনস, সবই তো বললাম আপনাকে। আমার হয়ে এঁদের আপনি বললেই তো পারতেন? বেশ, যদি দরকার মনে করেন, আবার না হয় বলছি। খাওয়ার ঘরে গিয়েছিলেন এঁরা?

বন্দোবস্ত যা করার তাড়াতাড়ি করুন। ওভাবে ওঁকে ওখানে ফেলে রাখতে চাই না আমি। ও-দৃশ্য ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। বলতে বলতে সত্যি সত্যিই থর থর করে কেঁপে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। সঙ্গেসঙ্গে হাতের ওপর থেকে গাউনের টিলে হাতা খসে পড়তেই বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল হোমস।

ম্যাডাম, শুধু চোখের ওপর নয়, হাতেও আঘাত পেয়েছেন দেখছি। এটা কী? দুটো সুস্পষ্ট লাল বিন্দু পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল শুভ্র, পেলব হাতে। ঝাটিতি গাউনের হাতা দিয়ে বিন্দু দুটো ঢেকে ফেললেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল।

ও কিছু না। গতরাতের বীভৎস ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা বসুন। আমি বলছি আমার কাহিনি :

আমি স্যার অস্টেস ব্র্যাকেনস্টলের স্ত্রী। বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে আমাদের। গোপন করে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না, তাই বলছি, মোটেই সুখের হয়নি আমাদের বিয়ে। এ-রকম মাতালের সঙ্গে এক ঘণ্টা থাকাও খুব সুখকর নয়। আর, যে-মেয়ের অনুভূতি আছে, অন্তরে তেজ আছে, আছে অফুরন্ত প্রাণরস, তাকে যদি এ-রকম একটা লোকের সঙ্গে দিনের পর দিন রাতের পর রাত বিয়ের বাঁধনে বাঁধা থাকতে হয়, তখন তার অবস্থাটা কী হতে পারে কল্পনা করতে পারেন আপনি।

গতরাতের কথাই বলি আপনাদের। জানেন বোধ হয়, এ-বাড়ির চাকরবাকরেরা নতুন তৈরি অংশটায় ঘুমোয়। মাঝখানের ব্লকটায় থাকি আমরা। পেছনদিকে রান্নাঘর। ওপরে শোয়ার ঘর। আমার ঘরের ওপরেই ঘুমোয় আমার এই পরিচারিকা থেরেসা। আর কেউ থাকে না এদিকটায়। এখানকার কোনো শব্দই দূরের ব্লকে পৌঁছোয় না, কাজেই কারো ঘুম ভাঙাও সম্ভব নয় সেখানে। এসব খবর নিশ্চয় জানত ডাকাতগুলো। তা না হলে ওভাবে ওরা কাজ সারতে পারত না।

রাত প্রায় সাড়ে দশটায় শুতে যান স্যার অস্টেস। চাকরেরা আগেই চলে গেছিল তাদের কোয়াটারে। পাছে আমার কোনো দরকার পড়ে, তাই থেরেসা ঘুমোয়নি। বাড়ির একদম ওপরে জেগে বসে ছিল সে। এই ঘরেই বসে বই পড়ছিলাম আমি। রাত এগারোটা বাজার পর উঠে পড়লাম। ওপরতলায় ওঠার আগে সব ঠিক আছে কি না দেখে নেওয়ার জন্যে এক পাক ঘুরতে বেরোলাম। এ-কাজ আমিই করি। কারণ তো বললাম। স্যার অস্টেসকে সবসময়ে বিশ্বাস করা চলে না। প্রথমে গেলাম রান্নাঘরে। সেখান থেকে প্যান্ট্রিতে। তারপর গানরুম, বিলিয়ার্ড রুম। ড্রয়িং রুম। সবশেষে খাওয়ার ঘরে। ঘরের

জানলাটা সবসময়ে পুরু পর্দায় ঢাকা থাকে। ঘরে ঢুকে এই জানলার কাছেই এগুছি, এমন সময়ে মুখের ওপর বাতাসের ঝাঁপটা অনুভব করায় বুঝলাম, জানলাটা বন্ধ নেই, খোলা রয়েছে। একটানে পর্দাটা সরিয়ে ফেলতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম একটা চওড়া কাঁধ লোকের সঙ্গে। বয়স হয়েছে লোকটার। সবে ঘরের মধ্যে পা দিয়েছিল সে। জানলাটা লম্বা আকারের ফ্রেঞ্চ উইনডো, নামে জানলা হলেও দরজার মতোই তার মধ্যে দিয়ে যাওয়া যায় লনের ওপর। আমার হাতে ছিল শোয়ার ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতি। বাতিটা তুলে ধরতেই প্রথম লোকটার পেছনে আরও দুজনকে দেখলাম। তারাও ঢোকার উদ্যোগ করছিল। দেখেই, কয়েক পা পিছিয়ে এলাম আমি। কিন্তু চকিতে প্রৌঢ় লোকটা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। প্রথমে আমার কবজি ধরেছিল সে। তারপর ধরল গলা। আমি হাঁ করলাম চিৎকার করবার জন্যে। তখন লোকটা জানোয়ারের মতো প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল আমার চোখের ওপর। এক ঘুসিতেই ছিটকে পড়লাম আমি। নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম কয়েক মিনিটের জন্যে। কেননা, জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম, ঘণ্টাটানার দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে একটা ওক কাঠের চেয়ারের সঙ্গে বেশ শক্ত করে ওরা আমায় বেঁধে ফেলেছে। ডাইনিং রুমে টেবিলের মাথার দিকে থাকে এই চেয়ারটা। এমন আঁট করে বেঁধেছিল যে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও ছিল না। পাছে চিৎকার করি, তাই একটা রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল মুখটা। ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন আমার দুর্ভাগা স্বামী। নিশ্চয় সন্দেহজনক কোনো শব্দ উনি শুনতে পেয়েছিলেন, তাই এ ধরনের দৃশ্যের জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার্স। একহাতে তার প্রিয় ব্ল্যাকথন কাঠের ছড়ি। তিরবেগে একজনের দিকে ছুটে যেতেই, আধবুড়ো লোকটা চুল্লির ভেতর থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বসিয়ে দিলে তার মাথার ওপর। ওঃ সে কী মার! এতটুকু গোঙানি শুনলাম না

তাঁর কণ্ঠে। ধপ করে পড়ে গেলেন মেঝেতে এবং সঙ্গেসঙ্গে নিস্পন্দ হয়ে গেল দেহ। আর একবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম আমি। এবারও নিশ্চয় কয়েক মিনিটের জন্যে চেতনা ছিল না আমার। চোখ মেলার পর দেখলাম সাইডবোর্ড থেকে রূপোর বাসনপত্রগুলো নামিয়ে জড়ো করে রেখেছে ওরা। এক বোতল মদ ছিল, তাও নামিয়েছে। প্রত্যেকের হাতে একটা গেলাস দেখলাম। একটু আগেই আপনাদের বললাম না, তিনজনের একজনের বয়স হয়েছে? তার আবার একগাল দাড়িও আছে। বাকি দুজন ছেলেমানুষ— মুখে গোঁফ দাড়ির বালাই নেই। দেখে মনে হল, বাপ তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে রাতের শিকারে। ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা হল তিন মূর্তিতে। তারপর আমার কাছে এসে দেখাল বাঁধন শক্ত আছে কি না। এরপর, একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে গেল জানলার পাশাটা। মিনিট পনেরো ধস্তাধস্তি করার পর মুখের বাঁধন খসিয়ে ফেললাম আমি। কয়েকবার সজোরে চিৎকার করে উঠতেই থেরসা নেমে এসে বাঁধন খুলে দিল আমার। অন্যান্য চাকরবাকরদেরও ঘুম ভাঙানো হল তখুনি। লোক্যাল পুলিশকেও খবর পাঠালাম। খবর পেয়ে ওরা তৎক্ষণাৎ সরাসরি যোগাযোগ করলে লন্ডনের সঙ্গে। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার। আমার বিশ্বাস, এ বুকফাটা কাহিনির পুনরাবৃত্তি করারও আর প্রয়োজন হবে না।

কোনো প্রশ্ন করবেন মি. হোমস? হপকিনস জিজ্ঞেস করলে।

না, এঁকে আর বিরক্ত করার ইচ্ছে নেই আমার। ধৈর্যের সীমা আছে, সময়েরও মূল্য আছে। বললে হোমস। তারপর ফিরল থেরসার দিকে, খাওয়ার ঘরে যাওয়ার আগে তোমার মুখেই শুনে যেতে চাই কাল রাতের ঘটনার বিবরণ।

শুরু করে থেরেসা, এ-বাড়িতে লোকগুলো ঢোকার আগেই ওদের আমি দেখেছিলাম। জানলার সামনে বসে ছিলাম। বাইরের ফুটফুটে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম দূরে লজের ফটকের সামনে তিনজন লোককে। কিন্তু তখন ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি। তারপর ঘণ্টাখানেক গেছে। হঠাৎ শুনলাম গিল্লিমার আর্ত চিৎকার। শুনেই এক দৌড়ে নেমে এসে যা দেখলাম, ওক কাঠের চেয়ারটায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বেচারি। আর, ঘরময় ছড়িয়ে রক্ত আর টুকরো টুকরো মগজ। রক্তের ছোপ ছোপ দাগ হতভাগিনীর পোশাকেও লেগে ছিল। ওইরকম বাঁধা অবস্থায় চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখলে যেকোনো মেয়েরই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়া স্বাভাবিক। এমনকী পাগল হতেও বিশেষ দেরি লাগে না। কিন্তু অ্যাডেলেড-এর মিস ফ্রেজারের এবং অধুনা অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর লেডি ব্র্যাকেনস্টলের সাহসের অভাব কোনোদিনই হয়নি। ওকে অনেক সওয়াল করেছেন আপনারা। এবার রেহাই দিন। নিজের ঘরে গিয়ে এবার একটু বিশ্রাম নিক বেচারি।

মায়ের মতো স্নেহ কোমল হাতে আলগোছে গৃহকত্রীর কোমর জড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল থেরেসা।

হপকিনস বললে, জন্মাবধি এক মুহূর্তের জন্যেও লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাছছাড়া হয়নি থেরেসা। শিশু অবস্থায় ধাইমার কাজ করেছে। তারপর, আঠারো মাস আগে ওঁরা যখন সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ইংলন্ডে আসেন, থেরেসাও এসেছিল সঙ্গে। ওর পুরোনাম থেরেসা রাইড। এ ধরনের পরিচারিকা আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না মি. হোমস।

সুনিবিড় আগ্রহের দীপ্তি মুছে গেছিল হোমসের ভাবব্যঞ্জক মুখ থেকে । রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়েছিল কেসটার যাবতীয় আকর্ষণ । এখন বাকি শুধু একটা গ্রেপ্তার করার । কিন্তু এই জাতীয় অতি সাধারণ বদমাশ ঘেঁটে সে কি তার হাত কলঙ্কিত করতে চাইবে? বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গম্ভীর প্রকৃতির মহাপণ্ডিত কোনো চিকিৎসাবিদকে সামান্য হাম জ্বরের জন্যে ডেকে আনলে তার মুখে যেমন অপরিসীম বিরক্তি ফুটে ওঠে, আমার বন্ধুটির মুখেও সেদিন অবিকল সেইরকম প্রতিচ্ছবিই দেখলাম । কিন্তু তবুও, অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর খাওয়ার ঘরে ঢুকে ওই বিচিত্র দৃশ্য দেখার পর আবার জাগ্রত হয় তার ক্ষীয়মাণ আগ্রহ, একাগ্র হয়ে ওঠে তার অন্তর ।

বিশাল ঘর । আর ঠিক সেই অনুপাতে অনেকটা উঁচু । ওক কাঠের কারুকার্য করা সিলিং, ওক কাঠের প্যানেল এবং দেওয়াল জুড়ে সারি সারি হরিণের মাথা আর প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রাদির সমাবেশ । লম্বা আকারের ফ্রেঞ্চ-উইনডোটা দেখলাম দরজার অপর প্রান্তে । ডান দিকের ছোটো সাইজের তিনটি জানলা দিয়ে শীতের হিমেল রোদূর এসে আলোকিত করে তুলেছিল ঘরটা । বাঁ-দিকে খুব গভীর আর মস্তবড়ো একটা ফায়ার প্লেস । ওক কাঠের তৈরি অতিকায় ম্যান্টেলপিসের কিনারাটা বেরিয়ে এসেছিল ফায়ার প্লেসের ওপরে । চুল্লির বাঁ-দিকে ওক কাঠের একটা হাতলওলা ভারী চেয়ার-তলার কাঠ দুটো ক্রস করা । লাল টকটকে একটা দড়ি জড়ানো চেয়ারের চারদিকে । দড়ির দুই প্রান্ত নীচের ক্রস করা কাঠ দুটোয় বাঁধা । লেডি ব্র্যাকেনস্টল বন্ধনমুক্ত হওয়ার পর ঢিলে হয়ে পড়েছিল দড়িটা, কিন্তু যেমন তেমন বাঁধা ছিল গিটগুলো । এসব খুঁটিনাটি আমরা পরে দেখেছিলাম । কেননা, ঘরে ঢোকামাত্র আমাদের চিন্তাধারা একমুখী হয়ে কেন্দ্রীভূত

হয়েছিল ফায়ার-প্লেসের সামনের বিছানো বাঘের চামড়ার ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা ভয়াবহ বস্তুটির দিকে।

দেহটি এক দীর্ঘকায়, সুগঠিত পুরুষের। বছর চল্লিশ বয়স তার। সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে চিত হয়ে পড়ে ছিল তাঁর দেহ। কুচকুচে কালো ছোটো দাড়ির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে ছিল ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি, যেন মুখ খিচিয়ে রয়েছেন বিকটভাবে। মুঠো করা হাত ছিল মাথার ওপরদিকে ব্ল্যাকথন কাঠের একটা ছড়ি আড়াআড়িভাবে পড়ে ছিল দু-হাতের মধ্যে। প্রতিহননের ইচ্ছায় আর প্রবল ঘৃণায় দুমড়ে মুচড়ে গেছিল তার মলিন কিন্তু সুশ্রী মুখের ধারালো নাক, চোখ আর প্রতিটি রেখা। নিপ্রাণ মুখের পরতে পরতে জমাট বেঁধে ছিল একটা পৈশাচিক বিভীষিকা। নীচের আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত শয্যায় ছিলেন উনি। কেননা, পরনে দেখলাম এমব্রয়ডারি করা একটা সূচীসুন্দর শৌখিন রাত্রিবাস, আর ট্রাউজার্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা পা দুটো সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথার আঘাত অতি ভয়াবহ। এক আঘাতেই প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়েছিল। সে-আঘাত যে কতখানি মারাত্মক, পাশবিক আর প্রচণ্ড তার প্রমাণ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলোলেই পাওয়া যায়। আঘাতের প্রচণ্ডতায় বেঁকে যাওয়া লোহার ভারী ডান্ডাটা পড়ে ছিল পাশেই। ডান্ডা আর ডান্ডা রচিত ধ্বংসাবশেষ-দুটোই পরীক্ষা করল হোমস।

র্যাভালদের দলপতি আধবুড়ো হলেও গায়ে বেশ শক্তি রাখে দেখছি, মন্তব্য করল ও।

হপকিনস বললে, হ্যাঁ, তা রাখে। লোকটা সম্বন্ধে কিছু রেকর্ড তো আমার দপ্তরেই আছে। বেজায় চোয়াড়ে লোক।

তাহলে তাকে পাকড়াও করতে মোটেই বেগ পাওয়া উচিত নয় তোমার ।

নিশ্চয় নয় । এ-কাণ্ড হওয়ার আগে থেকেই ওর খোঁজখবর নিচ্ছিলাম আমরা । অনেকের ধারণা ছিল, ও নাকি আমেরিকায় পালিয়েছে । এখন তো দেখছি পুরো দলটাই রয়েছে এখানে । এবার তো বাছাধনেরা চোখে সর্ষেফুল দেখবে আমাদের চোখে ধুলো দিতে । বন্দরে বন্দরে খবর চলে গেছে । আজ সন্দের আগেই একটা পুরস্কারও ঘোষণা হবে । আমার খটকা লাগছে শুধু একটা কথা ভেবে । ওরা জানত, ওদের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা যথাসময়ে লেডি ব্র্যাকেনস্টলের মুখে শুনতে পাবে পুলিশ এবং সে-বর্ণনা শুনলে তিনজনকে শনাক্ত করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না । এসব জেনেও এ-রকম উন্মাদের মতো কাণ্ডটা ওরা কেন করল ?

এগজ্যাক্টলি । এ-ঘটনা শুনলেই মনের মধ্যে একটা খটকা থেকে যায় যে ভদ্রমহিলাকে শেষ করে ফেললেই তো গোল চুকে যেত ।

আমি বললাম, ওরা হয়তো ধারণাও করতে পারেনি যে আবার জ্ঞান ফিরে পেতে পারেন উনি ।

তা হলেও হতে পারে । অজ্ঞান অবস্থায় দেখে ভদ্রমহিলাকে হত্যার চেষ্টা করেনি ওরা । ভালো কথা, হপকিনস, স্যার অস্টেস সম্বন্ধে খবর-টবর কিছু রাখ ? ওঁর সম্বন্ধে আশ্চর্য কিছু কিছু গল্প আমার কানে এসেছে বলেই জিজ্ঞেস করছি ।

মেজাজ ঠান্ডা থাকলে বিলক্ষণ মায়া দয়া থাকত তার অন্তরে। কিন্তু নেশা জমলে আর রক্ষে নেই-পুরোপুরি পিশাচের পর্যায়ে পৌঁছে যেতেন উনি। একদিন মদ রাখার ডিক্যান্টার ছুঁড়ে মেরেছিলেন থেরেসাকে। এ নিয়েও কম গণ্ডগোল হয়নি। আপনাকেই শুধু বলে রাখি, স্যার অস্টেস-এর অবর্তমানে সুখেই থাকবেন এ-বাড়ির সবাই। কী দেখছেন?

জানু পেতে বসে পড়ে চেয়ারের চারিদিকে জড়ানো লাল দড়ির গিটগুলো পরীক্ষা করছিল হোমস! মুখের প্রতিটি রেখায় নিবিড় তন্ময়তার নিখুঁত অভিব্যক্তি। টান মেরে দড়িটাকে ছিঁড়েছিল চোরের দল। গিটগুলো দেখা শেষ হবার পর শুয়ো বার করা ছেড়া প্রান্তটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করল ও।

তারপর বলল, দড়িটা ছেড়ার সময়ে বেশ জোরেই টানতে হয়েছিল। ফলে, রান্নাঘরের ঘণ্টাটাও নিশ্চয় বেজে উঠেছিল দারুণ শব্দে।

বাজলেও কেউ তা শুনতে পায়নি। রান্নাঘরটা এ-বাড়ির একদম পেছনদিকে।

কিন্তু চোরেরা জানলে কী করে যে কেউ শুনতে পাবে না? এ-রকম বেপরোয়াভাবে ঘণ্টার দড়ি টানার সাহস ওরা পেল কোথেকে?

ঠিক বলেছেন, মি. হোমস, ঠিক বলেছেন। আমি নিজেও এ-প্রশ্ন বার বার করেছি নিজেকে। লোকটা যে বাড়ির সব খবরই রাখত, সে-বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহই অবকাশ থাকতে পারে না। খুব ভালো করেই সে জানে যে বাড়ির প্রতিটি চাকর সে সময়ে শুতে চলে যায় দূরের কোয়ার্টারে। রান্নাঘরের ঘণ্টার আওয়াজ কারো কানে পৌঁছোনোই সম্ভব নয়। চাকরবাকরদের কারো সঙ্গে নিশ্চয় যোগসাজশ ছিল ওর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বাড়ির আটজন চাকরের প্রত্যেকেরই স্বভাবচরিত্র ভালো।

হোমস বললে, আর কারো কথা জানি না, কিন্তু একজনের ওপর আপনা হতেই সন্দেহ এসে পড়ছে। সে হল থেরেসা-যার মাথা লক্ষ করে ডিক্যান্টার ছুঁড়ে মেরেছিলেন স্যার অস্টেস। কিন্তু সে আবার লেডির একান্ত অনুগত এবং প্রতিহিংসা নিতে যাওয়া মানেই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। খুবই তুচ্ছ পয়েন্ট এটা। র্যান্ডালকে হাজতে পোরার পর তার দুষ্কর্মের সঙ্গীদের খুঁজে বার করতেও বিশেষ বেগ পেতে হবে তোমায়। লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনি একেবারে সত্যি। ঘরের প্রতিটি জিনিসই তার চাক্ষুষ প্রমাণ। বলতে বলতে ফ্রেঞ্চ-উইনডোর সামনে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলে সে। এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। জমি লোহার মতো শক্ত, পায়ের ছাপ পাওয়ার আশা দুরাশা। ম্যান্টলপিসের ওপরে রাখা মোমবাতিগুলো জ্বালানো হয়েছিল দেখছি।

হ্যাঁ, হয়েছিল। ওই আলোয় আর লেডির শোয়ার ঘরের মোমবাতির আলোয় পথ চিনে চম্পট দিয়েছে চোরেরা।

যাওয়ার সময়ে কী কী নিয়ে গেছে?

বেশি কিছু নয়। সাইডবোর্ডে রাখা মাত্র আধডজন প্লেট। লেডির মতো, স্যার অস্টেসের মৃত্যুতে ওরা এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে সারাবাড়ি লুণ্ঠ করা আর হয়ে ওঠেনি। অন্য সময় হলে অবশ্য এত অল্পের ওপর রেহাই দিত না।

খাঁটি কথাই বলেছেন। ওরা তো মদও খেয়েছে, তাই না?

নার্ভ শক্ত রাখার জন্যে।

ঠিক। সাইডবোর্ডের ওই গেলাস তিনটেতে কেউ হাত দেয়নি তো?

না। বোতলটা ওরা যেভাবে ফেলে গেছে, সেইভাবেই রেখেছি আমি।

তাহলে ওইগুলোই দেখা যাক। আরে, আরে! এ কী?

পাশাপাশি তিনটে গেলাস সাজানো ছিল সাইডবোর্ডে। মদের দাগ লেগে ছিল প্রত্যেকটার ভেতরে। অনেকদিন রেখে দেওয়ার ফলে বহু পুরোনো মদে দ্বিতীয়বারের মতো যে সর পড়ে, তারই খানিকটা তলানি দেখলাম একটা গেলাসের নীচে। তিন ভাগের দু-ভাগ ভরতি বোতলটা ছিল পাশেই। সুরার রঙে গভীরভাবে রাঙানো লম্বা আকারের একটা

ছিপি পড়ে ছিল একদিকে। ছিপি আর বোতলের গায়ে ধুলোর পুরু স্তর দেখেই বুঝলাম, দ্রাক্ষারসটি সাধারণ মদিরা নয় এবং সেরা জিনিসটিই চেখে গেছে খুনিরা।

আকস্মিক পরিবর্তন এসেছিল হোমসের আচরণে। নিরুদ্যম ভাব অন্তর্হিত হয়েছিল নিমেষের মধ্যে। কোটরাগত সজাগ দুই চোখে আবার জেগে উঠেছিল আগ্রহ আর সতর্কত। ছিপিটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করতে লাগল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ছিপিটা খুলল কেমন করে?

আধখোলা একটা ড্রয়ার দেখিয়ে দিলে হপকিনস। টেবিল মোছার খানিকটা কাপড় আর ছিপি খোলার বড়ো সাইজের একটা প্যাচানো স্ত্র ছিল ভেতরে।

কিন্তু এই স্ত্র দিয়েই ছিপিটা খোলা হয়েছিল কি না, তা কি লেডি স্বচক্ষে দেখেছেন?

না, বোতলটা খোলার সময়ে তার জ্ঞান ছিল না।

ঠিক বলেছ। সত্যি কথা বলতে কী, কোনো কাজেই লাগানো হয়নি এই স্ত্রটিকে। ছিপিটা খোলা হয়েছে একটা পকেট ক্র দিয়ে। যতদূর মনে হয় ছুরির সঙ্গে লাগানো ছিল স্কুটা এবং তা লম্বায় দেড় ইঞ্চির বেশি নয়। ছিপির ওপরটা লক্ষ করলেই দেখতে পাবে, তিন-তিনবার স্কুটাকে ভেতরে ঢোকানোর পর তবে খোলা গেছে ছিপিটা। তিনবার ঢুকিয়েও কিন্তু কোনোেবারই এফেঁড়-ওফোঁড় করতে পারেনি। কিন্তু এই বড়ো ক্র দিয়ে তা করা যেত এবং এক টানেই ছিপিটাকে খুলে আনা যেত বাইরে। হপকিনস,

লোকটাকে খেপ্তার করতে পারলে তার পকেটে একটা ছুরি পাবে। ছুরিটার ফলা একটা নয়-অনেকগুলো এবং অনেক রকমের।

চমৎকার! উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে হপকিনস।

কিন্তু, হপকিনস, ওই গেলাস দুটোই যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে দিচ্ছে! লেডি সত্যিই তিনজনকে সুরা পান করতে দেখেছিলেন, তাই না?দেখেছিলেন শব্দটার ওপর সামান্য জোর দেয় হোমস।

নিশ্চয়। এ-সম্পর্কে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই তার জবানবন্দিতে।

তাহলে যবনিকা পড়ুক এ-প্রসঙ্গে। তা ছাড়া কী আর করা যায় বল? কিন্তু গেলাস তিনটে যে রীতিমতো অসাধারণ, তা তোমায় মেনে নিতেই হবে, হপকিনস। কী বললে? আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই দেখতে পাচ্ছ না? বেশ, বেশ, ইতি করে দাও এ-আলোচনার। আমার মতো কেউ যদি কোনো বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ ক্ষমতাকে বিশেষভাবে রপ্ত করে থাকে, তখন হয় কি, সোজা জিনিসকে ঠিক চোখে সে দেখে উঠতে পারে না। হাতের কাছে থাকা সহজ সমাধান উপেক্ষা করে। জটিল আর দুর্বোধ্য উত্তরের পেছনেই ধাওয়া করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে তার মনে। আমার হয়তো সেই দশাই হয়েছে। এমনও হতে পারে, গেলাসগুলো নিশ্চয় দৈবের দেওয়া নিছক একটা সুযোগ। গুড মর্নিং, হপকিনস। এ-ব্যাপারে তোমায় বিশেষ সাহায্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া, কেসটা সম্পর্কে তোমার নিজের মনেও কোনো অস্বচ্ছতা, আবিলতা দেখছি না।

র্যাভালকে গ্রেপ্তার করতে পারলে অথবা নতুন কিছু ঘটলে খবর পাঠিয়ে আমাকে । আমার তো বিশ্বাস, শিগগিরই এ-কেসের সফল সমাপ্তির জন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে আসতে হবে । এসো হে ওয়াটসন, আমরা বরং ঘরে বসে অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করি । তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না ।

ফেরার পথে হোমসের চোখ-মুখ দেখে মনে হল রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে । অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এ এমন কিছু দেখে এসেছে ও, যা ভাবতে গিয়ে বারে বারে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে ওর যুক্তিতর্কের ইমারত । বার বার দেখছিলাম, জোর করে এই হতবুদ্ধি ভাবটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল সে । ঘটনাটা যেন জলের মতোই নির্মল, এমনিভাবেই আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছিল । কিন্তু প্রতিবারেই মনের ওপর চেপে বসছিল প্রচ্ছন্ন সন্দেহটা । ওর ললাটরেখা আর তন্ময় দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারছিলাম, মনে মনে হোমস আবার ফিরে গেছে অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর সুবিশাল খাওয়ার ঘরে-মধ্যরাতের ট্রাজেডি যে ঘরের মস্তুর আবহাওয়াকে শিহরিত করে তুলেছে আপন ভয়াবহতায় । শহরতলির একটা স্টেশন থেকে ধীরগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রেনটা । ঠিক এমনি সময়ে আচম্বিত আবেগের আচমকা কশাঘাতে ও তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে । আমাকেও টেনে আনল কামরার ভেতর থেকে ।

ক্ষমা করো আমায়, বাঁকের আড়ালে, অপস্রিয়মাণ শেষ কামরাটার দিকে তাকিয়ে বলল ও । ভাবছ, নিছক খেয়ালের ঝেকে কষ্ট দিচ্ছি তোমায় । কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি ওয়াটসন, কেসটা আমি এ-অবস্থায় রেখে যেতে পারছি না, কিছুতেই না । আমার সমস্ত সত্তা, প্রতিটি অনুভূতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে । ওয়াটসন, ভুল-আগাগোড়া ভুল-আমি শপথ করে বলছি-

সমস্ত ভুল। তুমি হয়তো বলবে, কী করে তা সম্ভব? লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনিতে কোনো খুঁত নেই। থেরেসার রিপোর্টে রয়েছে সে-কাহিনির পূর্ণ সমর্থন। খুঁটিনাটিগুলো মোটামুটি নির্ভুল। এসবের বিরুদ্ধে খাড়া করার মতো মালমশলা কী? না, তিনটে মদের গেলাস। ব্যস, আর কিছু না। কিন্তু কারো ওপর নির্ভর না-করে যদি সরাসরি কেসটা হাতে নিতাম আমরা, কারো কাটছাঁট গল্প শুনে নিজের মনকে আবৃত না-করতাম, সরেজমিন তদন্তে এসে প্রথম থেকেই সব কিছু মেনে না-নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে দেখতাম সব কিছু তাহলে কি তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার মতো এর চাইতেও জোরালো কোনো পয়েন্ট আমি আবিষ্কার করতে পারতাম না? নিশ্চয় পারতাম। বেঞ্চটায় বসে পড়ো ওয়াটসন। আমাদের ট্রেন না-আসা পর্যন্ত বসে বসে শোনো। তার আগে একটা আবেদন আছে। লেডি অথবা তার পরিচারিকার কাহিনির যে নির্ভেজাল সত্যি হতেই হবে, এ-রকম ধরনের কোনো ধারণা যদি তোমার মাথায় থেকে থাকে, তবে অবিলম্বে বিনা দ্বিধায় তাকে নির্বাসন দাও। ভদ্রমহিলার মন ভোলানো ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে।

এমন কতকগুলো পয়েন্ট রয়েছে লেডির কাহিনিতে যা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু ভাবলেই সন্দেহ হয়। মাত্র দিন পনেরো আগে সিডেনহামে বেশ বড় রকমের একটা কাণ্ড করে এসেছে র‍্যাভাল বাহিনী। এদের কীর্তিকলাপের বিবরণ এবং দৈহিক বর্ণনা কাগজে বেরিয়েছিল। কাজেই, কেউ যদি মনগড়া গল্পের মধ্যে ওই চোরদের দিয়ে কোনো দৃশ্য অভিনীত করাতে চায়, তাহলে সহজেই এরা এসে পড়বে সেইসব চরিত্রে। কিন্তু আসলে কী হয় জান, চোরেরা যদি বেশ কিছুদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনের মতো মোটা দাঁও পিটতে পারে, তাহলে নতুন কোনো বিপদের মধ্যে নাক না-গলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে

নিরুপদ্রবে চোরাই অর্থ নিজেদের ভোগে লাগিয়ে নিতে চায় পরম শান্তিতে। এইটাই নিয়ম। আবার দেখ, রাত গভীর হতে-না-হতেই এত সকাল সকাল তৎপর হয়ে ওঠাটা চোরদের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। স্ত্রীলোকের চাঁচানি বন্ধ করার জন্যে ঘুসি মারাও চোরদের পক্ষে অস্বাভাবিক। কেননা, সবাই জানে চিকারটা তাতেই বরং বেশি হওয়া স্বাভাবিক। খুন করাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। বিশেষ করে ওরা যখন সংখ্যায় বেশি। একজনকে কাবু করে ফেলা এমন কিছু কঠিন নয় তিন তিনটে পুরুষের পক্ষে। নাগালের মধ্যে প্রচুর লোভনীয় জিনিস থাকা সত্ত্বেও এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকাটাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। সবশেষে, দামি দুস্ত্রাপ্য মদের অর্ধেকও না-খেয়ে ফেলে রেখে যাওয়াটা তাদের মতো লোকদের পক্ষে রীতিমতো অস্বাভাবিক। ওয়াটসন, এবার বল এতগুলো অস্বাভাবিকতা। শুনে কী মনে হয় তোমার?

অস্বাভাবিকতাগুলোর সম্মিলিত ফলাফল নিশ্চয় ভাববার মতো। তা ছাড়া, আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে গেলে আবার প্রতিটাই সম্ভব। সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপার অন্তত আমার কাছে যা মনে হয়, তা হল ভদ্রমহিলাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাওয়া।

এ-সম্পর্কে অবশ্য আমি নিশ্চিত নই, ওয়াটসন। কেননা, দুটি পথ খোলা ছিল দুবৃত্তদের সামনে। হয় ওঁকে খতম করে দেওয়া, না হয় এমনভাবে বেঁধে রেখে যাওয়া যাতে ওদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উনি শোরগোল তুলতে না-পারেন। সে যাই হোক, লেডি ব্র্যাকেনস্টলের কাহিনিতে কোথাও-না-কোথাও অবিশ্বাসের একটা কণিকা যে লুকিয়ে আছে, তা আমি দেখতে পেয়েছি। তাই নয় কি? আর এখন এসব কিছুর ওপরে আসছে তিনটে মদের গেলাসের রহস্য।

মদের গেলাসের রহস্য?

মনের চোখ দিয়ে গেলাসগুলো দেখতে পাচ্ছ তো?

ছবির মতো ।

লেডি ব্র্যাকেনস্টল বলেছেন, গেলাসগুলো নিয়ে মদ খেয়েছে তিনজন পুরুষ । জবানবন্দির এই অংশটুকুর সম্ভবপরতা সম্বন্ধে তোমার মনে কি কোনো খটকা জাগছে?

সম্ভবই-বা নয় কেন শুনি? প্রত্যেকটা গেলাসেই তো মদ ছিল ।

মোটাই না । সরে ভরতি ছিল বোতলটা । কাজেই প্রথম দুটো গেলাসে কোনো সর পড়ল না, কিন্তু তৃতীয়টায় পড়ল প্রচুর পরিমাণে এ-রকম উদ্ভট ধারণা মনে আনতেও কষ্ট হয় । দুটি—মাত্র দুটি ব্যাখ্যা আছে এ-রহস্যের । একটা হল, দ্বিতীয় গেলাসটা ভরবার পর বেশ জোরে কঁকিয়ে নেওয়া হয়েছিল বোতলটা । তাই সরগুলো পড়েছে শেষের গেলাসে । কিন্তু এ-সম্ভাবনা কষ্টকল্পিত এবং মোটেই সম্ভব বলে মনে হয় না । না, না, ওয়াটসন আমার অনুমানই সত্য । কোনো ভুল নেই তাতে ।

তোমার অনুমান কী শুনি ।

মদ খাওয়া হয়েছে মাত্র দুটি গেলাস থেকে। ঘটনাস্থলে যে তিনজন হাজির ছিল, এমনি একটা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দুটি গেলাসের তলানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে তৃতীয় গেলাসে। তাহলেই, সমস্ত সর এসে পড়েছে শেষের গেলাসে। তাই নয় কি? হ্যাঁ, তাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। কিন্তু এই ছোট কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটার সত্য ব্যাখ্যা যদি আবিষ্কার করতে পেরে থাকি তাহলেই কেসটা এক লাফে সাধারণ থেকে উঠে আসছে রীতিমতো অসাধারণের পর্যায়ে। কেননা, এসব কিছুর একমাত্র সহজ সরল ব্যাখ্যা হল এই যে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং তার পরিচারিকা থেরেসা স্বেচ্ছায় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে একটা আঘাতে গল্প শুনিয়েছেন আমাদের এবং এ-গল্পের একটা বর্ণও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসল অপরাধীকে এভাবে আড়াল করে রাখার পেছনে নিশ্চয় কোনো বড় রকমের কারণ আছে ওঁদের। এ-রহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছোতে হলে তাদের কোনোরকম সাহায্য না-নিয়ে নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে তদন্তের বনিয়াদ। বর্তমানে এইটাই হল আমাদের একমাত্র কর্তব্য। ওয়াটসন, আমাদের ট্রেন এসে গেছে।

আমাদের আবার ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ-এর অধিবাসীরা। কিন্তু শার্লক হোমস যখনই শুনলে লেসট্রেড হেড কোয়ার্টারে গেছে রিপোর্ট পেশ করতে, সঙ্গেসঙ্গে কাল বিলম্ব না-করে দখল করে বসল খাওয়ার ঘরটা। ভেতর থেকে তালা এঁটে দিয়ে শুরু হল ঝাড়া দু-ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর শ্রমসাধ্য তদন্ত পর্ব। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, ঠিক এমনি ধরনের মজবুত বনিয়াদের ওপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে পাওয়া শার্লক হোমসের অতি উজ্জ্বল অনুমান-ইমারত। জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য হাতেনাতে প্রমাণ করার সময়ে অনুগত ছাত্র যেমন অধ্যাপকের

দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আমিও ঘরের কোণে বসে নিঃশব্দে তার তাক লাগানো গবেষণার প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করতে লাগলাম একাত্ম মনে। জানলা, পর্দা, কার্পেট, চেয়ার, দড়ি পরপর প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল হোমস। প্রতিবার পরীক্ষা শেষে তন্ময় হয়ে রইল চিন্তায়। ব্যারনেটের দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঘর থেকে। এ ছাড়া ঘরের আর কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করা হয়নি। তারপর হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে অতিকায় ম্যান্টলপিস বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল হোমস। ওপরে ওঠার পরেও মাথা থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে ঝুলতে লাগল লাল দড়ি এতটুকু একটা প্রান্তভাগ। তারের সঙ্গে তখনও দড়িটুকু লেগে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষে দড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল হোমস। তারপর আরও কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টায় হাঁটু ঠেস দিলে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটা কাঠের ব্র্যাকেটের ওপর। ফলে হাতের নাগালের কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই পৌঁছে গেল দড়ির ছোঁড়া টুকরোটা। কিন্তু শুধু দড়ি নয়, ব্র্যাকেটটাও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হল। সবশেষে, একটা পরিতৃপ্তির শব্দ শুনলাম ওর কণ্ঠে এবং পরমুহূর্তেই লাফিয়ে নেমে পড়ল হোমস মেঝের ওপর।

সব ঠিক আছে, ওয়াটসন। হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি কেসটাকে। যতগুলো চমক লাগানো কেস আছে আমাদের সংগ্রহে, তাদের মধ্যে অন্যতম হবে অ্যাবি গ্রাঞ্জ-এর রহস্য। কিন্তু কী মুশকিল বল তো? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি যে এত মস্তুর হয়ে এসেছে তা কে জানত! আর একটু হলেই মস্ত ভুল করে ফেলেছিলাম আর কি! সারাজীবনেও সে-ভুল শোধরানোর সুযোগ পেতাম না। কিন্তু এখন আর কোনো কুয়াশা নেই আমার চোখের

সামনে। আর কয়েকটা হারিয়ে যাওয়া অংশ পেলেই সম্পূর্ণ হয়ে যায় আমার যুক্তি বিচার ও বক্তব্য।

লোকগুলোর হদিশ পেলে?

লোক, ওয়াটসন, লোক। মাত্র একজন কিন্তু অতি ভয়ংকর লোক। সিংহের মতো শক্তিমান সে। দেখছ না, এক আঘাতেই কতখানি দুমড়ে গেছে লোহার ডান্ডাটা। মাথায় ছ-ফুট তিন ইঞ্চি, কাঠবেড়ালের মতো চটপটে, আঙুলের কাজেও রীতিমতো পটু। আরও আছে-উপস্থিত বুদ্ধি তার অসাধারণ। কেননা, সমস্ত আঘাতে গুল্লটা তারই মগজ থেকে বেরিয়েছে। হ্যাঁ, ওয়াটসন, হ্যাঁ। একজন অতি আশ্চর্য লোকের চাতুর্যের প্রদর্শনীর মধ্যে এসে পড়েছি আমরা। কিন্তু ঘণ্টা টানার ওই দড়িটার মধ্যে এমন একটা সূত্র রেখে গেছে সে, যা দেখলে আর তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সূত্রটা পেলে কোথায়?

ওয়াটসন, ঘণ্টা টানার দড়ি ছেড়ার জন্যে যদি নীচে থেকে টান মার, তাহলে দড়িটা কোথায় ছেড়া উচিত? না, তারের সঙ্গে যেখানে লাগানো আছে, ঠিক সেইখানে। ওপর থেকে তিন ইঞ্চি নীচুতে ছেড়া কি সম্ভব? কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে তাই।

তার কারণ ওই জায়গায় গুলো উঠে যাওয়ায় নিশ্চয় পলকা হয়ে গেছিল দড়িটা।

ঠিক বলেছ। দেখতেই তো পাচ্ছ, হাতের প্রান্তটায় শুয়ো উঠে উঠে রয়েছে। মহা ধড়িবাজ লোক। ছুরি দিয়ে শুয়ো তুলে এই অবস্থা করে রেখে গেছে সে। কিন্তু অপর প্রান্তটা শুয়ো-ওঠা নয়। এখান থেকে তা দেখতে পাবে না। ম্যান্টলপিসের ওপর দাঁড়ালেই দেখবে ছুরি দিয়ে পরিষ্কারভাবে কাটা হয়েছে দড়িটাকে। শুয়োর কোনো চিহ্নই দেখতে পাবে না। আচ্ছা, এবার অনায়াসেই সমস্ত ঘটনাটিকে নতুন করে ঢেলে গড়ে নিতে পার তুমি। দড়ির দরকার হয়েছিল লোকটার। ছিঁড়ে নামানো সম্ভব নয়-ঘণ্টা বাজার শব্দে লোকজন সচকিত হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তার? ম্যান্টলপিসের ওপর লাফিয়ে উঠেও দড়ির নাগাল পেল না সে। তখন হাঁটু ঠেস দিলে দেওয়ালের কাঠের ব্র্যাকেটের ওপর। ফলে, ছাপ পড়ল ধুলোর ওপর। ব্র্যাকেটটায় একবার চোখ বুলিয়ে এলেই দাগটা দেখতে পাবে তুমি। তারপর সে ছুরি বার করলে দড়িটা কাটার জন্যে। দেখতেই তো পেলে, কম করে ইঞ্চি তিনেকের জন্যে দড়িটার নাগাল পেলাম না আমি। সেই কারণেই বললাম, লোকটা আমার থেকে অন্ততপক্ষে তিন ইঞ্চি লম্বা। ওক কাঠের চেয়ারে বসবার জায়গাটা লক্ষ করেছ? কী দেখছ?

রক্ত।

নিঃসন্দেহে রক্ত এবং শুধু এই রক্তের দাগ দিয়েই আদালতে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, ভদ্রমহিলা যা বলেছেন আমাদের সামনে, তা নিছক একটা বানানো গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। ওঁর কথামতো খুনের সময়ে উনি যদি চেয়ারেই বসা থাকতেন, তাহলে রক্তের দাগ ও জায়গায় এল

কী করে শুনি? না, না, আগে নয়-স্বামী মারা যাওয়ার পরেই চেয়ারে বসেছিলেন উনি। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, কালো পোশাকটা যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে এই দাগের সঙ্গে মিলে যায় এমনি একটা রক্তের দাগ তাতে তুমি পাবে। ওয়াটসন, ওয়াটসন, ওয়াটারলুতে এখনও পৌঁছোতে পারিনি বটে, কিন্তু এই হল আমাদের মারেনগোড, কেননা, পরাজয় দিয়ে শুরু করে বিজয় গৌরবের মধ্যে শেষ হল আমাদের তদন্ত-পর্ব। এবার দু-একটা কথা বলা দরকার থেরেসার সঙ্গে। যে-সংবাদের প্রয়োজন এখন, তা পেতে হলে আরও কিছুক্ষণ একটু হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে আমাদের।

কঠোর মূর্তি অস্ট্রেলিয়ান নার্স থেরেসা মানুষ হিসেবে কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং। স্বল্পভাষী, অনুদার সন্ধিগ্ধমনা হলেও শেষ পর্যন্ত হোমসের মিষ্টি ব্যবহার আর কথাবার্তায় কাজ হল। বিনা প্রতিবাদে সরলভাবে সবই শুনে যাচ্ছিল হোমস। বেশ কিছুক্ষণ পর এহেন থেরেসার চিত্তও নরম হয়ে এল। হোমসের স্বভাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন মধুর হয়ে উঠল তার আচরণ। ঠিক তখনই লোকান্তরিত অন্তদাতার বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না সে।

হ্যাঁ, স্যার, সত্যিই আমার দিকে ডিক্যান্টার ছুঁড়ে মেরেছিলেন উনি। লেডিকে একটা বিশ্রী গালি দিতেই তা আমার কানে যায়। আমি তখন বলেছিলাম ওর ভাই হাজির থাকলে এ-শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতাও হত না তার। তাইতেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে ডিক্যান্টারটা উনি ছুঁড়ে মারেন আমার দিকে। আরও ডজনখানেক ডিক্যান্টার হাতের কাছে হাজির থাকলে সবকটাই ছুঁড়তে দ্বিধা করতেন না উনি। বিয়ের শুরু থেকেই ভদ্রলোক অতি জঘন্য ব্যবহার করে আছেন লেডির সাথে। মেয়েটিরও স্বভাব এমন যে মরে গেলেও

এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইত না। এমনকী, আমার কাছেও সব কথা বলত না। আজ সকালেই ওর হাতে ওই দাগ দুটো দেখলেন, ও-সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলেনি। কিন্তু আমি জানি ও-দাগ হয়েছে হ্যাট-পিনের খোঁচায়। শয়তান কুকুর কোথাকার। মরে গেছে লোকটা, তাই তাকে এভাবে গালাগাল দেওয়ার জন্যে ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমায়। সারাদুনিয়ায় কিন্তু ওর মতো শয়তান আর দুটি দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। আঠারো মাস আগে ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমাদের। তখন কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর ছিল ওঁর স্বভাব। চমৎকার মানুষ ছিলেন উনি। তারপর, এই আঠারো মাস যেন আঠারোটা দীর্ঘ বছরের মতোই মনে হয়েছে আমাদের কাছে। সবে লন্ডনে পৌঁছেছিল লেডি। হ্যাঁ, এই তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। বাড়ি থেকে আগে কখনো বেরোয়নি। খেতাব, টাকা আর লন্ডনের ভূয়ো আদবকায়দার চমক দেখিয়ে বেচারির চিত্ত জয় করে ফেললেন উনি। ভুল যদি সে করে থাকে তবে খেসারতও দিয়েছে। বড়ো বেশি দিয়েছে। কোনো স্ত্রীলোক এভাবে আর দিয়েছে কিনা জানি না। কোন মাসে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের? এখানে পৌঁছোনের ঠিক পরেই। জুন মাসে পৌঁছেছিলাম আমরা। দেখা হয়েছিল জুলাইয়ে। গত বছরের জানুয়ারিতে বিয়ে হয় ওদের। হ্যাঁ, হা শোকে এখন ডুবে আছে ও। আপনারা গেলে তবুও দেখা করবে নিশ্চয়। কিন্তু একটা কথা, ওকে বেশি প্রশ্ন করবেন না। রক্তমাংসের মানুষ তো! নির্যাতনও বড়ো কম যায়নি কাল রাত থেকে।

কোচে আড় হয়ে শুয়ে ছিলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল। আগের থেকে বেশ সপ্রতিভ মনে হল তাঁকে। চোখ-মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন অনেকটা ফিরে এসেছে। থেরেসা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছিল। ভিনিগার আর জল দিয়ে আবার সে ধুইয়ে দিতে বসল লেডির কালশিটে পড়া ফুলোটা।

আমরা ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলেন, আশা করি, আবার জেরা করতে আসেননি?

না। খুব নরম সরে উত্তর দিলে হোমস। আপনি যে পরিশ্রান্ত, তা আমি জানি, লেডি ব্র্যাকেনস্টল। তাই আপনাকে বিব্রত করার কোনো অভিপ্রায় নেই। আমি শুধু একটি জিনিস চাই এবং তা হল আপনি যাতে কোনো বিড়ম্বনায় না পড়েন। তাই, সব জটিলতার জট খুলে ধরে সমস্ত ঘটনাকে সরল করে তুলে ধরায় আমার এত আগ্রহ। আমাকে বন্ধু হিসেবে নিন। আমাকে বিশ্বাস করুন। পরিণামে হয়তো দেখবেন সত্যিই আপনার আস্থাভাজন হতে পেরেছি আমি।

কী করতে বলেন আমাকে?

যা সত্য, তাই বলুন।

মি. হোমস!

না, না লেডি ব্র্যাকেনস্টল, ওতে কোনো সুবিধে হবে না। আমার যৎসামান্য নামঘশের কিছু কিছু হয়তো শুনে থাকবেন। এই সামান্য ক্ষমতার সবটুকু দিয়ে আমি প্রমাণ করে দেব, যে-কাহিনি আমাদের গুনিয়েছেন, তা আগাগোড়া বানানো।

বিবর্ণ মুখে এবং ভয়াত দৃষ্টি মেলে লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং থেরেসা দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন হোমসের পানে ।

তারপরই চেষ্টায়ে ওঠে থেরেসা, আপনার ধৃষ্টতা তো দেখছি কম নয় । আপনি কি বলতে চান, লেডি মিথ্যে বলেছে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস, কিছু বলার নেই আপনার?

সবই তো বলেছি আপনাকে ।

আর একবার ভাবুন লেডি ব্র্যাকেনস্টল! অকপটে সমস্ত খুলে বললে ভালো হত না কি?

মুহূর্তের দ্বিধার ছায়া দূলে ওঠে লেডির ছবির মতো সুন্দর মুখে । পরক্ষণেই তার চাইতেও এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তা । মুখোশের মতোই স্থির হয়ে আসে মুখের প্রতিটি রেখা ।

যা জানি, সবই বলেছি আপনাকে ।

টুপি তুলে নিলে হোমস । কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, আমি দুঃখিত । আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ-করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে । পার্কে একটা পুকুর দেখেছিলাম । হোমস এই পুকুরটার দিকেই নিয়ে গেল আমায় । ওপরের জল জমে বরফ হয়ে গেছে ।

তবু একটিমাত্র ছিদ্র দেখলাম তার মাঝে। ঠিক যেন একটা রাজহাঁস ডুব দিয়েছে বরফের স্তর ভেদ করে। ছিদ্রটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে হোমস। তারপর গেল বাড়ির ফটকে। সেখানে দাঁড়িয়ে স্ট্যানলি হপকিনসের জন্যে ছোটো একটা চিরকুট লিখে বৃদ্ধ পাহারাদারকে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

চলতে চলতে বললে, অন্ধকারে ঢিল ছুড়লাম ওয়াটসন। লাগলেও লেগে যেতে পারে। কিন্তু বন্ধুবর হপকিনসের জন্যেও তো কিছু করা দরকার। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর। এখনও কিন্তু ওকে আমি দলে টানতে রাজি নই। যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা গোপন থাকুক আমাদের দুজনের মধ্যেই। আমার তো মনে হয়, এরপর আমাদের তৎপর হওয়া দরকার একটি বিশেষ যাত্রাপথের জাহাজ অফিসে। ওখানে একটু খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন। যতদূর মনে হয়, অফিসটা পলমলের একদম শেষের দিকে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া আর ইংলন্ডের মধ্যে আরও একটা লাইনে স্টিমার যাতায়াত করে। কিন্তু আপাতত অনেকখানি জায়গা জুড়ে আরম্ভ করা যাক অনুসন্ধান আর তদন্ত।

হোমসের কার্ড ম্যানেজারের কাছে পৌঁছোনোমাত্র ডাক পড়ল। প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ১৮৯৫ সালের জুন মাসে স্বদেশের বন্দরে পৌঁছেছে মাত্র একটি স্টিমার। জাহাজের নাম, রক অব দি জিব্রালটার-এ-কোম্পানির সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে ভালো জলপোত এইটাই। যাত্রীতালিকায় চোখ বুলোতেই পাওয়া গেল অ্যাডিলেডের মিস ফ্রেজার আর তার পরিচারিকার নাম। দুজনেই সাগর পাড়ি দিয়েছে রক অব দি জিব্রালটার-এ। জাহাজটা এখন অস্ট্রেলিয়ার পথে। সুয়েজ খালের

দক্ষিণে কোথাও তাকে পাওয়া যেতে পারে। ১৮৯৫ সালে যে যে অফিসারেরা জাহাজে ছিলেন, এখনও তাঁরাই আছেন শুধু একজন ছাড়া। ফাস্ট অফিসার মি. জ্যাক ক্রোকার এখন ক্যাপ্টেন হয়েছেন। দিন দুয়েকের মধ্যেই সাদাম্পটন থেকে তাদের নতুন জাহাজ বাস রক পাড়ি জমাবে সাগরের বুকে। এই জাহাজেরই চার্জ বুঝে নেবেন মি. ক্রোকার। উনি থাকেন সিডেনহামে। কিন্তু ওইদিন সকালে তার আসার কথা আছে নির্দেশ বুঝে নেওয়ার জন্যে। দরকার মনে করলে আমরা অপেক্ষা করতে পারি তার জন্যে।

না, তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনো অভিপ্রায় হোমসের নেই। তবে ভদ্রলোকের কাজের রেকর্ড আর চরিত্র সম্বন্ধে আরও বিশদ খবর পেলে বিলক্ষণ খুশি হবে সে।

অতি চমৎকার তার কাজের রেকর্ড। যোগ্যতার দিক দিয়ে ক্যাপ্টেন ক্রোকারের ধারেকাছে আসার মতো অফিসার কোম্পানির অতগুলি জাহাজের মধ্যে একজনও নেই।

আর চরিত্র? ডিউটিতে বহাল থাকার সময়ে ওঁর মতো বিশ্বস্ত কর্মচারী আর দুটি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। কিন্তু জাহাজের ডেকের বাইরে গেলেই উনি অন্য পুরুষ। দূরন্ত দুর্বীর বেপরোয়া। তখন একটুতেই মাথা গরম হয়ে যায়। অতি সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। চকিতে লোপ পায় কাণ্ডজ্ঞান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উনি অনুগত এবং সৎ। অন্তরে মায়াদয়ার অভাব হয় না কখনো। সব খবরের সার-খবর এই তথ্যটি জোগাড় করে অ্যাডিলেড-সাদাম্পটন কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল হোমস। একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সামনে। ভেতরে কিন্তু ঢুকল না! গাড়ির মধ্যেই বসে রইল তন্ময় হয়ে। কুণ্ডিত জু যুগল আর ললাট রেখায় দেখলাম নিবিড় চিন্তার ছায়া।

ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পৌঁছোল সে শেরিং ট্রাস টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে। কার নামে একটা খবর পাঠালে সেখান থেকে। সব শেষে, সোজা ফিরে এল বেকার স্ট্রিটের বাসায়।

না হে ওয়াটসন, পারলাম না, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল হোমস। শমন একবার বেরিয়ে গেলে দুনিয়ার আর কারো ক্ষমতা থাকবে না ওকে বাঁচানোর। আমার এ-কর্মজীবনেই আমি দেখেছি, দু-একবার অপরাধী অপরাধ করে যত না ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সত্যিকারের ক্ষতি করেছে ক্রিমিনালকে আবিষ্কার করে। কিন্তু এখন আমি সাবধান হয়ে গেছি। শিখেছি এসব পরিস্থিতিতে কীভাবে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়। বিবেককে ছলনার চাইতে বরং ইংলন্ডের আইনকানুনের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলা যাক। চরম ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমাদের আরও কিছু জানা দরকার।

সন্ধে হওয়ার আগেই এসে গেল ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনস। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, মোটেই সুবিধা করতে পারছে না বেচারি।

মি. হোমস, আমার বিশ্বাস নিশ্চয় ভেলকি-টেলকি কিছু জানেন আপনি। মাঝে মাঝে সত্যিই আমি ভাবি, ভোজবাজির যেসব নমুনা দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দেন, তা কখনো মাটির মানুষের থাকতে পারে না। চোরাই রূপোর বাসন যে পুকুরের নীচে আছে তা, আপনি কী করে জানলেন বলুন তো।

আমি জানতাম না।

কিন্তু আপনিই তো আমায় লিখে পাঠালেন পুকুরের তলাটা পরীক্ষা করে দেখতে?

পেয়েছ তাহলে?

নিশ্চয়!

তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছি জেনে সত্যিই খুব খুশি হলাম।

সাহায্য আর করলেন কোথায়! উলটে আরও জটিল করে তুললেন সমস্ত ব্যাপারটাকে।
কী ধরনের চোর এরা? এত কাঠ খড় পুড়িয়ে রূপোর বাসন চুরি করার পর চোরাই মাল
ফেলে যায় সবচেয়ে কাছের একটা পুকুরের জলে?

বাস্তবিকই, বড়ো উৎকট কাণ্ড! দেখে শুনে এদের মাথা-পাগলের দল ছাড়া আর কিছু
মনে হয় না। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। রূপোগুলো যদি নেহাতই ধোঁকা দেওয়ার
উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়ে থাকে এবং বাসনগুলো নেওয়ার কোনো দরকারই থাকে না
লোকগুলোর, তাহলে স্বভাবতই চোরাই মাল ঝটপট পাচার করে ফেলে ঝাড়া হাত-পা
হওয়ার জন্যেই উদবিগ্ন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক তাদের পক্ষে।

কিন্তু এ ধরনের ভাবনাই-বা আপনার মাথায় আসছে কেন, তাই তো বুঝলাম না?

মনে হল, তাই বললাম। এমনটা হলেও তো হতে পারে। খোলা জানলা গলে বেরিয়ে আসার পরেই সামনে পড়ল পুকুরটা। বরফের মধ্যে ছোট ছাদাটি লুন্ধ করে তুলল ওদের। এর চাইতে লুকোনোর ভালো জায়গা পাওয়া কি আর সম্ভব ছিল তখন?

লুকোনোর জায়গা ঠিক বলছেন। সোল্লাসে ঢেঁচিয়ে ওঠে হপকিনস, ঠিক, ঠিক! এখন বুঝছি সব! ভোর হয়ে আসছিল, লোকজন বেরিয়ে পড়েছিল পথে! সে সময়ে অত বাসন-কোসন নিয়ে রাস্তায় বেরোনো মানেই লোকের চোখে পড়া। তাই, পুকুরের তলায় গচ্ছিত রেখে গেল ওদের চোরাই মাল। ইচ্ছে ছিল, পরে, সুযোগমতো সরিয়ে নিয়ে যাবে মালগুলো। এক্সেলেন্ট মি. হোমস। আপনার ওই ধোঁকা দেওয়ার থিয়োরির চাইতে আমার থিয়োরি কিন্তু অনেক ভালো।

হ্যাঁ, বাস্তবিকই, প্রশংসা করার মতো থিয়োরি তোমার। আমার চিন্তাধারা যে একটু বক্সাছাড়া বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল, সে-বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ কিন্তু যতই বিশৃঙ্খল হোক না কেন, ভেবেচিন্তেই যে রূপোগুলো আবিষ্কার করেছি, তা তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না হপকিনস।

তা সত্যি, স্যার। সবই তো আপনি করলেন। আমাকে কিন্তু হোঁচট খেতে হয়েছে।

হোঁচট খেতে হয়েছে?

হ্যাঁ, মি. হোমস। আজ সকালে পুরো র্যাভাল দলটা ধরা পড়েছে নিউইয়র্কে।

সর্বনাশ। তাহলে তোমার থিয়োরিটাই যে বানচাল হয়ে গেল, হপকিনস। ওরাই যে কাল রাতে কেটে খুন করে গেছে, এ-ধারণা তবে নস্যাৎ হয়ে গেল।

মারাত্মক, মি, হোমস, ওদের এই গ্রেপ্তার সংবাদ মারাত্মক আমার থিয়োরির পক্ষে। খবরটা পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে আমার থিয়োরি। কিন্তু আশা ছাড়িনি। র্যাভালরা ছাড়াও তিনজনের দল তো আরও থাকতে পারে। অথবা পুলিশ নাম শোনেনি, এমন কোনো নতুন দলও হতে পারে এরা।

ঠিক বলেছ। খুবই সম্ভব তাই। কিন্তু, একী, চললে নাকি?

হ্যাঁ, মি. হোমস। এ-ব্যাপারের কিনারা না-করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। দেওয়ার মতো আর কোনো খোঁজখবর আছে নাকি আপনার?

একটা তো দিয়েছি।

কোনটা?

ওই যে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা।

কিন্তু কেন, মি. হোমস, কেন?

হ্যাঁ, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু এ-সমস্যা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম এবারের মতো। মাথা ঘামিয়ে এই ধোঁয়ার আড়ালে একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলা নিশ্চয় কঠিন কাজ হবে।

তোমার পক্ষে। ডিনারের জন্যে থেকে যাবে না? বেশ, গুডবাই। কাজ কীরকম চলছে জানাতে ভুলো না কিন্তু।

ডিনার শেষ হল। টেবিলও পরিষ্কার হল। তারপর আবার এই প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করল হোমস। পাইপটা ধরিয়ে নিয়েছিল ও। চটি পরা পা দুটো এগিয়ে দিয়েছিল আগুনের চুল্লির দিকে। আগুনের মিষ্টি তাতের আমেজটুকু মনপ্রাণ দিয়ে আমিও উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালে ও, ওয়াটসন, নতুন কিছুর আশা করছি আমি।

কখন?

এখুনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কী ভাবছ? স্ট্যানলি হপকিনসের সঙ্গে বড়ো খারাপ ব্যবহার করলাম?

তোমার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা আছে আমার।

খুবই সংগত উত্তর, ওয়াটসন। দেখ আমি যা জানি, তা বেসরকারি। আর ও যা জানে, তা সরকারি। ব্যক্তিগত ন্যায়বিচারের অধিকার আমার আছে, কিন্তু তার নেই। সে যা জানে, তার প্রতিটি অক্ষর প্রকাশ করতে সে বাধ্য, তা না হলে কর্মকর্তার কাছে সে বিশ্বাসঘাতক। এ ধরনের দ্বিধাযুক্ত ব্যাপারে তাকে আমি অযথা কষ্ট দিতে চাই না। তাই, কেসটা সম্পর্কে আমার নিজের মন পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমার তথ্য আমার কাছেই রেখে দিতে চাই।

কিন্তু কতক্ষণ? কেসটা পরিষ্কার হবে কখন?

সময় হয়ে গেছে। ছোটোখাটো কিন্তু আশ্চর্য একটা নাটকের দৃশ্যে এবার তোমায় হাজির থাকতে হবে ওয়াটসন।

সিঁড়ির ওপর কীসের আওয়াজ শুনলাম। তারপরেই, দরজা খুলে ধরলেন মিসেস হাডসন এবং খোলা দরজার ভিতর দিয়ে যিনি ঢুকলেন, তাঁর মতো ব্যক্তিত্বময় নিখুঁত পৌরুষব্যঞ্জক মূর্তি এ-ঘরের চৌকাঠ আর কোনোদিন পেরোয়নি। ভদ্রলোকের চেহারা বেজায় লম্বা। বয়সে যুবক। সোনালি রঙের গোঁফ। নীল নীল চোখ। নিরক্ষীয় অঞ্চলের কড়া রোদে গায়ের রং তামাটে হয়ে। গেছে। হালকা পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, অতবড়ো দেহটা শুধু বলশালীই নয়, রীতিমতো ক্ষিপ্র। ঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন উনি। তারপর ফিরে দাঁড়ালেন আমাদের দিকে। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত আর ঘন নিশ্বাসে উথালিপাথালি বুক দেখে মনে হল যে কোনো এক

প্রবল আবেগ অভিভূত করে ফেলার চেষ্টা করছে ওঁকে। কিন্তু উনি তা দাবিয়ে রাখছেন প্রাণপণ শক্তিতে।

বসুন, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?

হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। তারপর জিজ্ঞাসা চোখে তাকালেন আমাদের দুজনের পানে।

টেলিগ্রাম পেয়েছি। যে সময়ে আসতে বলেছিলেন, সেই সময়তেই এসেছি। শুনলাম, অফিসেও গিয়েছিলেন আপনি। দেখছি, রেহাই নেই আপনার হাত থেকে। খারাপ খবর যদি কিছু থাকে, বলুন! আমি সব শুনছি। কী করতে চান আপনি আমায় নিয়ে? গ্রেপ্তার? বলুন, বলুন! চুপচাপ বসে আপনি যে আমার সঙ্গে ইঁদুর-বেড়ালের খেলা খেলবেন, তা আমি হতে দেব না।

হোমস বললে, ওঁকে একটা সিগার দাও, ওয়াটসন। কামড়ে নিন, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। নার্ভাস হয়ে যাবেন না। একটা কথা শুনে রাখুন আপনাকে যদি সাধারণ ক্রিমিনাল বলে ভাবতাম, তাহলে একসঙ্গে বসে কখনো ধূমপান করতাম না। খোলাখুলি কথা বলুন। আপনার ভালো করব। চালাকি করতে গেলেই শেষ করে ফেলব।

কী করতে বলেন আমাকে?

সত্যি বলতে বলি। গতরাতে অ্যাবি-গ্র্যাঞ্জ-এ যা যা ঘটেছে, তার অবিকল বিবরণ শোনাতে বলি। মনে রাখবেন, যা বলবেন, তা সত্য হওয়া চাই। একটা অক্ষরও নড়চড় হলে চলবে না। একটা শব্দও জুড়তে পারবেন না, বাদ দিতে পারবেন না। এ-ব্যাপারে আমি এত বেশি জেনে ফেলেছি যে, আপনি যদি সোজা পথ ছেড়ে এক ইঞ্চিও বেঁকে যান, তাহলেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাজার এই পুলিশ লুইসল এবং চিরকালের মতো আমার আওতার বাইরে চলে যাবে এ-কেস।

মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করলেন ক্যাপ্টেন। তারপরে, রোদে পোড়া ভারী হাতে সশব্দে সজোরে পায়ের ওপর এক ঘুসি মেরে চাঁচিয়ে উঠলেন জোর গলায়, দেখা যাক কপাল ঠুকে। আশা করি, আপনার কথার দাম আছে। তার ওপরে, আপনি সাদা চামড়ার মানুষ। সমস্ত কাহিনিটা আপনাকে আমি বলছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখি, কথাটা আমার প্রসঙ্গে। নিজের সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করি না, কারো পরোয়াও করি না। কৃতকর্মের জন্যে তিলমাত্র অনুশোচনা আমার নেই। যা করেছি, তার জন্যে আমি গর্বিত। সুযোগ পেলে আবার তা করতে মুহূর্তের জন্যেও কুণ্ঠাবোধ করব না। অভিসম্পাত দিন ওই জানোয়ারটাকে। বেড়ালের মতো মরেও যদি সে না মরে তবে প্রতিবার ওকে নিকেশ করতে পেছপা হব না। আমার কিন্তু যত ভাবনা লেডির জন্যে। মেরি মেরি ফ্রেজার। ওর ওই অভিশপ্ত নাম ধরে কোনোদিনই ওকে আমি ডাকতে পারব না। অথচ ওর ওই মিষ্টি মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। তাই যখনই ভাবি, কতকগুলো অবাঞ্ছিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চলেছে ও বুক ভেঙে যায় আমার। মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কিন্তু কিন্তু এ ছাড়া আর কীই-বা করার

ছিল আমার? আগে আপনাদের শোনাই আমার কাহিনি। সব শোনার পর আপনারাই বলবেন, এর চাইতে নির্দোষ আর কিছু করণীয় আমার ছিল কি না।

একটু পিছিয়ে যেতে হবে আমায়। আপনি তো সবই জানেন বলেই মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা রক অব জিব্রালটারে। আশা করি, এ-খবরও রাখেন। সে-জাহাজে মেরি ছিল প্যাসেঞ্জার। আর আমি ফাস্ট অফিসার। প্রথম আলাপেই ভালোবেসেছিলাম। সেই দিনটি থেকে আমার মনের আকাশ জুড়ে ওকে ছাড়া আর কোনো নারীকে আমি দেখিনি। ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে প্রতিদিন তাকে দেখেছি। যতবার দেখেছি, ততবারই যেন আরও গভীরভাবে ভালোবেসেছি। তার ফুল-কোমল চরণ ডেকের যে যে অংশ মাড়িয়ে যেত দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে ডিউটিতে থাকার সময়ে কতবার হাঁটু গেড়ে বসে চুম্বন করেছি ডেকের সেইসব বিশেষ অংশ। বিয়ের প্রসঙ্গ কোনোদিনই ওঠেনি। পুরুষ হিসেবে নারীর কাছ থেকে যেরকমটি মার্জিত ব্যবহার আশা করা যায়, তার কাছ থেকে তাই পেয়েছিলাম। এ-সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই আমার। প্রেম ছিল শুধু আমার দিকেই। আর, তার দিকে ছিল শুধু নিকষিত নির্মল বন্ধুত্ব আর মধুর সাহচর্য। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর, আগের মতোই ও রইল স্বাধীন, বন্ধনহীন। আমি কিন্তু পারলাম না, পারলাম না মনের দিগন্তকে মুক্তির রঙে রাঙিয়ে নিতে।

পরের বার সাগর থেকে ফিরে আসার পর পেলাম তার বিয়ের সংবাদ। মনের মতো মানুষকে বিয়ে করেছে সে। আর কেনই-বা করবে না? তার মতো মেয়েকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে উপাধি আর অর্থের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বাহন আর আছে কি? যা কিছু সুন্দর,

যা কিছু মনোরম, তাদের জন্যেই তো ওর জন্ম। তাই ওর বিয়ের খবর শুনে অযথা কষ্ট দিলাম না মনকে। ও-রকম স্বার্থপর আমি নই। সৌভাগ্যের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে ওর জীবনে। তাই তো সে কপর্দকহীন নাবিকের জীবনে নিজেকে জড়িয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করেনি। এইসব ভেবে আনন্দে ভরে উঠল আমার অন্তর। এমনিভাবেই ভালোবেসেছিলাম আমি মেরি ফ্রেজারকে।

তার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, তা কিন্তু ভাবিনি। গতবার সাগর পাড়ি দেওয়ার পর পদোন্নতি হল আমার। নতুন জাহাজ তখনও পর্যন্ত না-পৌঁছোননায় সিডেনহ্যামে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে কয়েক মাসের জন্যে রইলাম আমি। একদিন একটা গলির মধ্যে দেখা হয়ে গেল মেরির বুড়ি পরিচারিকা থেরেসার সঙ্গে। সব কথাই বলল সে। মেরির কথা, তার স্বামীর কথা। কিছুই বাদ গেল না। সব শোনার পর আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। মাতাল কুকুর কোথাকার! যে নারীর জুতোর ফিতে বাঁধার যোগ্যতা তার নেই, তারই গায়ে কিনা যখন-তখন সে হাত তোলে! আবার দেখা হল থেরেসার সঙ্গে। তারপর, দেখা করলাম স্বয়ং মেরির সাথে একবার নয়, পরপর দুবার। অবশ্য তারপর আর দেখা করতে চাইলে না মেরি। সেদিন নোটিশ পেলাম কোম্পানির, হুগাখানেকের মধ্যে আবার পাড়ি দিতে হবে সাগরের বুকে। নোটিশ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেনতেনপ্রকারে রওনা হওয়ার আগে তাকে অন্তত একবার দেখা দিয়ে যেতে হবে। প্রথম থেকেই থেরেসার সঙ্গে আমার সম্ভাব। মেরিকে ও ভালোবাসত। আর, আমার মতোই মনেপ্রাণে ঘৃণা করত ওই পিশাচটাকে। বাড়ির কোথায় কী আছে জেনেছিলাম ওরই মুখে। নীচের তলায় ছোট ঘরটায় বসে পড়াশুনা করত মেরি। গতরাতে গুড়ি মেরে গিয়ে আঁচড় কাটলাম জানলায়। প্রথম তো জানলাই খুলতে চাইল না ও। কিন্তু আমি

জানতাম, মুখে যাই বলুক না কেন, অন্তরে সে সত্যিই ভালোবাসতে শুরু করেছে আমায়। তাই, ওই তুষারঝরা রাতে আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফিসফিস করে আমাকে সামনের বড়ো জানলাটার নীচে আসতে বলল ও। জানলা খোলা পেয়ে ঢুকলাম খাওয়ার ঘরে। আবার ওর মুখে শুনলাম সেই কাহিনি। আবার ফুটে উঠল আমার রক্ত। যে-পশু আমার প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে এতখানি দুর্ব্যবহার করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে শাপশাপান্ত বর্ষণ করলাম প্রচুর। জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম দুজনে-ঈশ্বর সাক্ষী আছেন, কোনোরকম অশোভন আচরণ আমরা করিনি। ঠিক এমনি সময়ে উন্মত্তের মতো তিরবেগে ঘরে ঢুকল ওর স্বামী। ঢুকেই এমন একটা কুৎসিত গালি দিলে মেরিকে, যা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়। পরমুহূর্তেই হাতের লাঠিটা দিয়ে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে ওর মুখের ওপর। এক লাফে চুল্লির সামনে গিয়ে তুলে নিলাম চুল্লি খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা। শুরু হল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। হাতটা দেখুন, এইখানেই আমায় প্রথম চোট দেয় ও। তারপর এল আমার পালা। ডান্ডাটা মনে হল যেন পচা লাউয়ের মধ্যে বসে গেল। ভাবছেন বুঝি আমি দুঃখিত? না, মশাই, না! মরণ-বাঁচন যুদ্ধ তখন, দুজনের একজনকে মরতে হতই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা কি জানেন, এ মরণ বাঁচন শুধু আমাদের দুজনের নয়। ওদের দুজনের বেলাও প্রযোজ্য। কেননা ওই উন্মাদ লোকটার খপ্পরে মেরিকে ফেলে আসা আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল কি? তাই, ওকে খুন করেছি আমি। ভুল হয়েছে আমার? এ-রকম পরিস্থিতিতে আপনাদের দুজনের একজনও যদি থাকতেন তাহলে এ ছাড়া আর কী করতেন বলতে পারেন?

ছড়ি দিয়ে মারার সময়ে আত চিৎকার করে উঠেছিল মেরি, তাই শুনেই ওপরের ঘর থেকে বুড়ি থেরেসা নেমে এসেছিল। এক বোতল মদ ছিল সাইডবোর্ডে। বোতল খুলে একটু ঢেলে দিলাম মেরির ঠোঁটে। শক পেয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল বেচারি। নিজেও এক ঢোক খেলাম। থেরেসা কিন্তু আগাগোড়া বরফের মতো ঠান্ডা। প্লটটা শুধু আমার নয়, তারও বটে। ঠিক করলাম, এমনভাবে দৃশ্যটাকে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে দেখলে মনে হয় একদল চোরের কাজ। গল্পটা বার বার মেরিকে শোনাতে লাগল থেরেসা। ইতিমধ্যে, আমি ফায়ার প্লেসের ওপর উঠে দড়িটা কেটে নামিয়ে আনলাম। তারপর ওকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে দড়ির কাটা দিকটায় শুয়ো বার করে দিলাম ছুরি দিয়ে। এ না-করলে ছুরি দিয়ে কাটা দড়ি দেখলেই টনক নড়বে পুলিশের। এত কসরত করে ওপরে উঠে দড়ি কেটে আনে, না-জানি সে কী ধরনের চোর। তারপর জড়ো করলাম কতকগুলো রূপোর বাসনপত্র। লোকে দেখলে যেন ভাবে নিছক চুরি করতেই এসেছিল খুনিরা। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলাম মিনিট পনেরো বাদে যেন শোরগোল তোলে ওরা। ততক্ষণে নাগালের বাইরে চলে যাব আমি। রূপপার বাসনগুলো জলে ফেলে দিয়ে রওনা হলাম সিডেনহ্যামের দিকে। মনে আমার এতটুকু গ্লানি ছিল না। শুধু অনাবিল আনন্দ। জীবনের অন্তত একটা রাতকে সত্যিকারের সৎ কাজ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পেরেছি। মি. হোমস, সত্য শুনতে চেয়েছিলেন, সত্যই বললাম। এক বর্ণ মিথ্যে নেই, খাদ নেই, অতিরঞ্জন নেই। জানি না, এ-সত্যের মূল্য আমার গর্দান দিয়ে দিতে হবে কি না। কপালে যাই থাকুক, অকপটে সবই বললাম আপনাকে।

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করল হোমস। তারপর উঠে দাঁড়াল। ঘরের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে করমর্দন করল ক্যাপ্টেন ক্রোকারের সাথে।

বলল, এইরকমটাই ভেবেছিলাম আমি। জানি, আপনার কাহিনির প্রতিটি বর্ণ সত্য। কেননা, আমি যা জানি না, সে-রকম কথা আপনি বিশেষ কিছু বলেননি। ব্যায়ামবিদ বা নাবিক ছাড়া ব্র্যাকেটের ওপর উঠে ঘণ্টার দড়িতে যে-গিট দেখেছি, সে-গিটও নাবিক ছাড়া আর কারো পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব নয়। জীবনে একবারই নাবিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং তা সাগর পাড়ি দেওয়ার সময়ে। জীবনের যে-স্তরে উনি মানুষ, এই নাবিকটিও সেই স্তরের। খুনিকে আড়াল করার ওঁর প্রয়াস থেকেই জেনেছি এই তথ্যটি। আরও জেনেছি, তাঁকে উনি ভালোবাসেন। সঠিক সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করতে পেরেছিলাম বলেই তো এত সহজে আপনার নাগাল পেয়েছি, ক্যাপ্টেন।

আমি ভেবেছিলাম পুলিশ কোনোদিনই আমাদের ফাঁকি ধরে উঠতে পারবে না।

এবং পারেনি। আমার যতদূর বিশ্বাস পারবেও না। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা বিষয় আপনার সামনেই স্বীকার করছি আমি। চরম আক্রমণের সম্মুখীন হলে যেকোনো পুরুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক আপনিও তাই করেছেন। নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে আপনি যা করেছেন, তা যে আইনানুগ নয়, এমন রায়ও কেউ দেবে বলে মনে হয় না আমার। যাইহোক, এ নিয়ে মাথা ঘামাবে ব্রিটিশ জুরিরা। ইতিমধ্যে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আপনার ওপর সহানুভূতি এতই গভীর যে

আপনি যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, তাহলে আপনার পিছু ধাওয়া করবে না।

আর তারপরেই সব প্রকাশ পাবে? নিশ্চয়।

সবই প্রকাশ পাবে।

রাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠেন ক্যাপ্টেন, এ কী ধরনের প্রস্তাব? এ-প্রস্তাব কি কোনো পুরুষের কাছে করা চলে? আইন আমি যতটুকু জানি, তাতে অন্তত এইটুকু বুঝি যে, বিচার চলার সময়ে মেরিকেও দুষ্কর্মের সঙ্গিনী হিসেবে গণ্য করা হবে। আপনি কি ভাবেন তাকে এই বিষম বিপদের মধ্যে একলা ফেলে রেখে আমি বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে মজা দেখব আড়াল থেকে? ওরা যা করতে চায়, আমাকে নিয়ে করুক। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, মি. হোমস এমন একটা উপায় বাতলান যাতে বেচারি মেরিকে আদালতের জাঁতাকলে না পড়তে হয়।

দ্বিতীয়বার ক্যাপ্টেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হোমস।

যাচাই করে দেখছিলাম আপনাকে, ক্যাপ্টেন ক্রোকার। প্রতিবারেই দেখছি, আপনি নিখাদ সোনা। যাক, এ বড়ো গুরুদায়িত্ব নিতে হচ্ছে আমায়। কিন্তু হপকিনসকে একটা চমৎকার ইঙ্গিত দিয়েছি। সে যদি তার যথাযথ ব্যবহার না করতে পারে, আমার কিছু করার নেই। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, যা করতে চাই তা আইনমাফিক হোক। আপনি আসামি।

ওয়াটসন, তুমি ব্রিটিশ জুরি। ব্রিটিশ জুরি হওয়ার মতো তোমার চাইতে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না আমার। আমি বিচারপতি। এবার শুরু হোক। জুরি মহোদয়গণ, এজাহার আপনারা শুনলেন। আসামি দোষী না নির্দোষ?

নির্দোষ, মাই লর্ড, বললাম আমি।

জনগণের ইচ্ছাই ঈশ্বরের বাণী। ক্যাপ্টেন ক্রোকার, আপনি মুক্ত। আইনের কবলে আর কোনো নিরপরাধ না-পড়া পর্যন্ত আমার কাছে আপনি নিরাপদ। বছরখানেকের মধ্যেই ফিরে আসুন লেডির কাছে। আজকের রাতে ন্যায়বিচারের পর যে রায় আমরা দিলাম, তার মর্যাদা প্রমাণ করুন আপনার এবং তাঁর মিলিত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে।

টীকা

তিন গেলাসের রহস্য : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি অ্যাবি এ্যাঞ্জ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯০৪-এর কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

অ্যাবি এ্যাঞ্জ, মার্শহাম : চিলহাস্ট-এর কাছাকাছি অ্যাবি উড নামে একটি ছোটো গ্রাম আছে। এর দূরত্ব লন্ডন থেকে কমবেশি এগারো মাইল। আবার নরফোকে আছে মার্শহাম নামের একটি গ্রাম।

লিখব মাই ডিয়ার ওয়াটসন, লিখব : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্ল্যাশড সোলজার এবং দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য লায়ন্স মেন-এই দুটি গল্প লিখেছিলেন শার্লক হোমস নিজে। কিন্তু দু-বারই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তার লিখনশৈলি ওয়াটসনের লেখার মতো জনপ্রিয় নাও হতে পারে।

বিয়ের বাঁধনে বাঁধা থাকতে হয় : ১৮৫৭ সালে ডিভোর্স অ্যান্ড ম্যাট্রিমনিয়াল কজেস অ্যাক্ট পাশ হলেও, হোমসের সমকালে আধুনিক যুগের মতো সহজে ডিভোর্স পাওয়া সম্ভব ছিল না।

যে সর পড়ে : পোর্ট বা ওই ধরনের মদ পুরোনো হলে তাতে একটা সর পড়ে। যারা পোর্ট বা তদনুরূপ মদ পছন্দ করেন তারা বোতল ঝাঁকিয়ে বা উলটো করে ধরে সরটিকে ভাঙতে চান না। তবে অ্যাবি গ্যাঞ্জের খাওয়ার ঘরে রাখা বোতলটিতে কী-জাতের মদ ছিল, ওয়াটসন তা জানাননি।

মারেনগো : ওয়াটারলুর যুদ্ধ ফরাসি জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শেষ যুদ্ধ। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে ফরাসিদের এই যুদ্ধে ইংলন্ডের সেনাপতি ছিলেন লর্ড নেলসন। মারেনগোর যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন অস্ট্রিয়ান জেনারেল মাইকেল

ফ্রিডরিশ ভন মেলাস । উত্তর ইতালির পিয়েডমন্টের কাছে অবস্থিত মারেনগো গ্রামের এই যুদ্ধে প্রথম চোটে ফরাসিদের হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন মেলাস । কিন্তু তারপর তিনি নিজের বাহিনীর ভার এক অধস্তন অফিসারের হাতে দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে এগিয়ে যান । সেই সময়ে ফরাসি বাহিনী জেনারেল লুই দিশে-র অধিনায়কত্বে প্রতিআক্রমণ করলে অস্ট্রিয়ান সৈন্যদল পর্যদস্ত হয়ে যায় । মারেনগোর যুদ্ধে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও, নেপোলিয়ন এটিকে একটি স্মরণীয় যুদ্ধ জয় হিসেবে চিহ্নিত করেন । জনগণের ইচ্ছাই ঈশ্বরের বাণী : The voice of the people is the voice of the God, বলেছিলেন দ্বাদশ শতকের উইলিয়াম অব ম্যাসবেরি ।

ন্যায়বিচার : ১৮৯৭-এর ঘটনা ১৯০৪-এ প্রকাশ করলেন ওয়াটসন । তখনও কিন্তু ক্রকার, লেডি ব্র্যাকেনস্টল এবং থেরেসা প্রত্যেকেই স্যার অস্টেসকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হতে পারত । শুধু তাই নয়, দোষী সাব্যস্ত হতে পারতেন শার্লক হোমস-ও, ঘটনার পর খুনিকে পালাতে সাহায্য করবার জন্য ।

তিমি শিগরির বুকে হারপুন

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব ব্ল্যাক পিটার]

১৮৯৫ সালের জুলাইয়ের প্রথম হপ্তায় বন্ধুবরকে ঘন ঘন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমাদের আচ্ছা থেকে উধাও হতে দেখে অনুমান করেছিলাম একটা কিছু নিয়ে আবার মাথা ঘামাতে শুরু করেছে ও। এই সময় আবার রুক্ষ চেহারার কয়েকজন লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ায় আমি বুঝেছিলাম আবার ছদ্মবেশে কোথাও-না-কোথাও তৎপর হয়ে উঠেছে হোমস। অপরাধী মহলে ও ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। তাই অসংখ্যবার ওকে ভোল পালটাতে দেখছি অগণিত নামের আর রূপের খোলসে। লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো আছে ওর অন্তত পক্ষে গোটা পাঁচেক খুদে আস্তানা – সংক্ষেপে যাদের বলা যায় বহুরূপী হোমসের মেক-আপ রুম। কিন্তু কী কাজ নিয়ে যে তার এত ব্যস্ততা, সে-সম্বন্ধে আমার কাছে কোনোরকম উল্লেখ না-করায় আমিও তার গোপন কথা জানবার চেষ্টা করিনি। সে-রকম স্বভাবই নয় আমার। ওর তদন্তধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে ছোট্ট একটু ইঙ্গিত প্রথম যেদিন পেলাম, সেইদিন বুঝলাম, কাজটা অসাধারণ। প্রাতরাশের আগেই বেরিয়েছিল ও। আমি টেবিলে একলা। এমন সময়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকল হোমস। মাথায় টুপি, ছাতার বাঁটের মতো মুখের দিকে বেকানো মস্ত একটা হারপুন হাতে ঝুলছে।

কী সর্বনাশ! চেষ্টায়ে উঠি আমি। লন্ডনের রাস্তাঘাটে এই জিনিসটা নিয়ে তুমি হাওয়া খেয়ে এলে নাকি হে?

কসাইয়ের কাছ থেকে আসছি। গেছি গাড়িতে, এসেছি গাড়িতে।

কসাই?

খিদেয় পেট জ্বলছে মাই ডিয়ার ওয়াটসন, ব্রেকফাস্টের আগে ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে আমার আর কোনোরকম সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজি ফেলে বলতে পারি যে কী ধরনের ব্যায়াম করে এখন ফিরছি, তা তুমি অনুমান করতে পারবে না কোনোমতেই।

সে-চেপ্টাও আমি করব না।

কফি ঢালতে ঢালতে নিঃশব্দে এক চোট হেসে নিলে ও। তারপর বলতে আরম্ভ করলে, অ্যালবারডাইসের দোকানের পেছনের ঘরে হাজির থাকলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হত তোমার। কড়িকাঠে আংটা থেকে ঝুলছিল একটা মরা শুয়োর। আর, শার্টের হাতা গুটিয়ে এক ভদ্রলোক এই হাতিয়ারটা দিয়ে বীরবিক্রমে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাতের পর আঘাত হানছিল বেচারির গতায়ু দেহটার ওপর। জানো, এই শর্মাই সেই উৎসাহী ভদ্রলোক! হাজার কায়দা করেও গোটা শুয়োরটাকে এক ঘায়ে এফেঁড়-ওফোড় করা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তুমি একবার চেপ্টা করে দেখবে নাকি?

হাজার টাকা দিলেও না। কিন্তু হঠাৎ এ-খেয়াল হল কেন তোমার?

আমার ধারণা, উডম্যানস লীর কেসের সঙ্গে এ-ব্যাপারের একটা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে, -তাই। এই যে হপকিনস, তোমার টেলিগ্রাম কাল রাতে পেয়েছি। এতক্ষণ তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।

হপকিনসের বয়স তিরিশ হবে। অত্যন্ত সজাগ সতর্ক পুরুষ। পরনে সাদাসিধে একটা টুইডের সুট! কিন্তু খাপখোলা তলোয়ারের মতো সিধে চেহারাটি দেখলেই বোঝা যায় অফিশিয়াল ইউনিফর্ম পরাই তার বারোমাসের অভ্যাস। ভদ্রলোকের পুরো নাম স্ট্যানলি হপকিনস। এই তরুণ ইনস্পেকটরটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করে হোমস। হপকিনসও গুণমুগ্ধ শিষ্যের মতো প্রখ্যাত শখের গোয়েন্দা শার্লক হোমসের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলো একবার প্রশংসা করতে শুরু করলে আর থামতে চায় না। আমার বন্ধুটির ওপর তার শ্রদ্ধা অসীম। হপকিনসের কুণ্ঠিত ললাটে আজ কিন্তু চিন্তার আবিলতা। চোখে-মুখে অপরিসীম তিক্ততা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে।

ধন্যবাদ, স্যার। বেরোবার আগেই প্রাতরাশ সেরে নিয়েছি আমি। গতকাল রিপোর্ট দিতে এসেছিলাম। শহরেই কাটিয়েছি রাতটা।

কীসের রিপোর্ট?

ব্যর্থতার, স্যার-চরম ব্যর্থতার।

সেকী, তাহলে এক পা-ও এগোতে পারোনি বল?

একদম না। সর্বনাশ! তাহলে তো দেখছি আমাকেই দেখতে হয় কী ব্যাপার।

মি. হোমস, আমারও তাই একান্ত ইচ্ছা। এত বড়ো সুযোগ হাতের মুঠোতে পেয়েও কিছু করতে পারছি না আমি-সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে আমার। দয়া করে আপনি একবার গা ঝাড়া দিন-একটু সাহায্য করুন আমাকে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তদন্তের রিপোর্ট এবং কেস সম্পর্কে যা কিছু আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, সবই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। মন দিয়েই পড়েছি। ভালো কথা, তামাক রাখার যেথলিটা পাওয়া গেছে, সে-বিষয়ে তোমার মতামত কী শুনি? কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?

অবাক হয়ে যায় হপকিনস।

থলিটা লোকটারই, স্যার। ভেতরে তার নামের আদ্যক্ষর পাওয়া গেছে। সীল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি-লোকটা নিজেও এককালে সীল শিকারি ছিল।

কিন্তু তার নিজের কাছে তো কোনো পাইপ নেই।

না স্যার, পাইপ আমরা পাইনি। লোকটা খুব বেশি ধূমপান করত বলে মনে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন করার জন্যেই হয়তো খানিকটা তামাক রেখে দিয়েছিল।

কোনো সন্দেহই নেই তাতে! এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম না এইজন্যে যে, আমি যদি এ কেসটা হাতে নিতাম, তাহলে হয়তো এই পয়েন্ট থেকেই তদন্ত শুরু হত। সে-কথা এখন থাকুক। ড. ওয়াটসন এ-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও শোনেনি! আমিও সমস্ত ব্যাপারটা তাগাগোড়া শুনতে পেলে খুশি হতাম। যেসব পয়েন্টগুলো নিতান্তই প্রয়োজন, সেইগুলো দিয়ে সংক্ষেপে কেসটা শুনিয়ে দাও দিকি।

পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে শুরু করল স্ট্যানলি হপকিনস। নিহত ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির কর্মজীবন সংক্রান্ত কয়েকটা তারিখ লেখা আছে এই কাগজটায়। পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৪৫ সালে তাঁর জন্ম। সীল আর তিমি মাছ শিকারে তার মতো দুর্দান্ত অথচ পাকা শিকারি সচরাচর দেখা যায় না। ১৮৮৩ সালে ডানভীর সীল শিকারের জাহাজ সী ইউনিকর্ন-এর কম্যান্ডার ছিলেন তিনি। এর পর থেকেই কয়েকবার সমুদ্রযাত্রায় বেরোন। প্রতিবারেই সফল হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি। অবসর নিয়ে কয়েক বছর শুধু দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু শেষে, সাসেক্স ফরেস্ট রো-র কাছে উডম্যানস লী নামে একটা জায়গা কিনে শুরু করেন বসবাস। বছর কয়েক এইখানেই কেটে যায়। তারপর আজ থেকে মাত্র সাত দিন আগে উডম্যানস লীতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন।

বিচিত্র চরিত্র ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির। দু-একটা নমুনা শুনলেই বুঝবেন কেন এ-কথা বললাম।

সাধারণ জীবনে উনি ছিলেন কড়া পিউরিটান। ধর্ম আর আচার সম্বন্ধে তার অতি-নিষ্ঠা লক্ষ্য করার মতো। স্বল্পভাষী, সদাই বিষণ্ণ তার প্রকৃতি। সংসারে থাকবার মধ্যে আছেন স্ত্রী, বছর বিশ বয়সের এক মেয়ে আর দুজন পরিচারিকা। পরিচারিকারা কেউই বেশিদিন টিকতে পারত না। নতুন নতুন মুখ দেখা যেত এ-সংসারে। বেচারিদের চাকরিতে সুখ ছিল না কোনোদিনই। মাঝে মাঝে অবস্থা এতদূরে গড়াত যে ওদের সহ্যশক্তি হার মানত। ক্যাপ্টেন লোকটা কিছুদিন অন্তর মদে চুর হয়ে বাড়ি ফিরতেন। এবং যতক্ষণ সুরার রং থাকত তার চোখে, ততক্ষণ তাঁকে একটা আস্ত পিশাচ ছাড়া আর কিছু বলা যেত না। একবার নাকি বউ আর মেয়েকে মাঝরাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বার করে পার্কের মধ্যে দিয়ে চাবকাতে চাবকাতে নিয়ে চলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের আতঁ চিৎকারে গ্রামসুদ্ধ লোক উঠে এসে বাঁচায়।

একবার তার নামে আদলতের শমনও এসেছিল গ্রামের বুড়ো পাদরির ওপর বর্বরের মতো হামলা করার জন্যে। ভদ্রলোক ক্যাপ্টেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন তার আচরণের প্রতিবাদ জানাতে। মি. হোমস, সংক্ষেপে, পিটার ক্যারির কীর্তিকলাপকে ম্লান করার মতো বিপজ্জনক লোক আপনি আর দুটি দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ। শুনেছি জাহাজের কম্যান্ডার থাকার সময়েও নাকি তার চরিত্র ছিল এইরকম। ও-মহলে লোকে তাকে ব্ল্যাক পিটার বলে ডাকত। শুধু ষণ্ডামার্কী ত্রুর চেহারার সঙ্গে মানানসই কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড দাড়ি থাকায় তার এমনতরো নামকরণ হয়নি, হয়েছে উত্তট রঙ্গপরিহাসের

জন্যে যা তার সান্নিপাতদের কাছে নিছক আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রতিবেশীদের কেউই তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। তার ছায়া মাড়াতেও যেন সবাইয়ের ঘৃণা। সেই কারণেই, এমন কোনো লোক পাইনি যে তার এহেন নিষ্করণ ভয়ংকর মৃত্যুতে শোক পেয়েছে, অন্তত সহানুভূতির একটি শব্দও উচ্চারণ করেছে।

মি. হোমস, লোকটার কেবিনসম্পর্কে তদন্তের বিবরণ নিশ্চয় পড়েছেন আপনি। আপনার বন্ধু হয়তো শোনেননি, তাই বলছি। বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটা কাঠের আউট হাউস তৈরি করেছিলেন ক্যাপ্টেন। নাম দিয়েছিলেন কেবিন। এই কেবিনেই প্রতি রাতে ঘুমোতে আসতেন তিনি। কেবিনটা আসলে ছোট এক কামরার একটা কুঁড়ে, লম্বায় ষোলো ফুট, চওড়ায় দশ ফুট। কেবিনের চাবি থাকত তারই পকেটে। নিজের বিছানা নিজেই পাততেন। ধুলোময়লা সাফ করতেন নিজেই। দ্বিতীয় কোনো প্রাণীকে চৌকাঠ পেরোতে দিতেন না। চারদিক পর্দায় ঢাকা ছোটো চারটে জানলা আছে কেবিনে, কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনেও সে-জানলা কেউ খোলে না। একটা জানলা আছে বড়োরাস্তার দিকে। রাতের অন্ধকারে ঘরের মধ্যে আলো জ্বললে পথচারীরা পরস্পরকে তা দেখিয়ে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করত-না-জানি কী কাণ্ডই করছে ব্ল্যাক পিটার। মি. হোমস, তদন্তের ফলে আমরা যে ক-টা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম এই জানলাটা।

আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে হত্যার দু-দিন আগে রাত একটার সময়ে ফরেস্ট রোর দিক থেকে একজন পাথরের কারিগর আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় গাছপালার মধ্যে দিয়ে চৌকোনা আলোর ঝিকিমিকি দেখে। আলোকিত পর্দার ওপর ফুটে

উঠেছিল একটা মুখের কালো ছায়া। পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল লোকটা। ক্যাপ্টেন ক্যারির সঙ্গে তার অনেকদিনের পরিচয় এবং এ-মুখ যে তার মুখ নয়, এ-কথা হলফ করে বলতে রাজি আছে। সে। ছায়া-মুখের দাড়ি ছিল বটে কিন্তু সে-দাড়ি আকারেও ছোটো এবং সামনের দিকে ঠেলে বার করা-ক্যাপ্টেনের মতো মোটেই নয়। এ-দৃশ্য দেখবার আগে ঘণ্টা দুয়েক ভাটিখানায় কাটিয়ে এসেছিল সে, পথ থেকে জানলার দূরত্বও ছিল অনেকখানি। আর কি জানেন, এ-দৃশ্য সে দেখেছে সোমবার, কিন্তু খুন হয়েছে বুধবার।

মঙ্গলবার পিটার ক্যারিকে তার জঘন্যতম মেজাজে দেখা গিয়েছে। মদ্যপানের ফলে আরক্ত মুখ আর বুনো জন্তুর মতো দুর্দান্ত হাবভাব দেখে ভয় পেয়েছে সবাই। বাড়িময় দুমদাম করে বেড়িয়েছেন তিনি। যতবার তার পায়ের শব্দ পাওয়া গেছে ততবারই অন্যদিকে দৌড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে বাড়ির মেয়েরা। রাত গভীর হয়ে এলে নিজের কেবিনে গেছেন পিটার ক্যারি।

রাত দুটোর সময়ে বিকট একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসে কেবিনের দিক থেকে। শব্দটা শোনে ক্যাপ্টেনের মেয়ে প্রতিরাত্রে জানলা খুলে ঘুমোনের অভ্যাস তার। মদের নেশায় এ ধরনের চিৎকার বা অনর্থক হট্টগোল করা ক্যাপ্টেনের চিরকালের স্বভাব-তাই এ-বিষয়ে কেউ আর মাথা ঘামায়নি। সকাল সাতটায় উঠে একজন ঝি লক্ষ করে কেবিনের দরজা খোলা। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে ওরা এমনই যমের মতো ভয় করত যে দুপুর বারোটোর আগে কারোরই সাহসে কুলোয়নি একবার উঁকি মেরে দেখে ব্যাপারটা কী। ভরদুপুরে ওরা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরকার দৃশ্য একবার উঁকি মেরে দেখেই রক্তশূন্য

সাদা মুখে উর্ধ্বশ্বাসে ছোট গাঁয়ের দিকে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে কেসটা হাতে নিই আমি।

মি. হোমস, আপনি তো জানেন আমার স্বাস্থ্য দুর্বল নয়। কিন্তু সেদিন সত্যি কথা বলতে কী ওই ছোট আউট হাউসের ভেতরে মাথা গলানোর পরে আমার মতো লোকেরও আপাদমস্তক। কেঁপে উঠেছিল। ছোটো বড়ো হরেকরকম মাছির ভনভনানিতে যেন হারমোনিয়ামের বাজনা বাজছিল ঘরের মধ্যে। মেঝে আর দেওয়াল দেখে মনে হল যেন কসাইখানায় এসে পড়েছি। ব্ল্যাক পিটার ঘরটার নাম দিয়েছিলেন কেবিন এবং নামটা অযৌক্তিক নয় মোটেই। বাস্তবিকই একটা কেবিনের মতো সাজানো ঘর। ঢুকলেই মনে হবে যেন জাহাজের মধ্যে এসে পড়েছেন আপনি। এক প্রান্তে একটি বাক্স, জাহাজি সিন্দুক, অনেকগুলো ম্যাপ আর চার্ট, সী ইউনিকর্ন-এর একটা ছবি, তাকের ওপর জাহাজের গতি হিসেব রাখার একসারি কেতাব। যেকোনো ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে পড়লে ঠিক যেমনটি আশা করা যায়, তেমনিভাবে সাজানো ঘরটা। এসবের মাঝখানে পড়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি স্বয়ং। অনেক অত্যাচারে বীভৎসভাবে যেন দুমড়ে মুচড়ে গেছে তার মুখ। মস্তবড়ো কালো দাড়িটা যেন অসীম যন্ত্রণায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সামনের দিকে। ইস্পাতের একটা হারপুন চওড়া বুক ভেদ করে গভীরভাবে গেঁথে গেছে পেছন দিককার দেওয়ালে। কার্ডের ওপর গুবরে-পোকাকে পিন দিয়ে যেভাবে লাগিয়ে রাখা হয়, ঠিক তেমনিভাবে হারপুন দিয়ে তাকে গেঁথে রাখা হয়েছিল কাঠের দেওয়ালে। ভদ্রলোকের প্রাণবায়ু যে অনেক আগেই শূন্যে মিলিয়েছে, তা আর না-বললেও চলে। অপরিসীম যন্ত্রণায় শেষ মরণ-চিৎকার দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সাক্ষ হয়েছে তাঁর ইহলীলা।

আপনার পদ্ধতি আমি জানি, স্যার। কাজ শুরু করলাম সেইমতো। কোনো কিছু স্থানচ্যুত হওয়ার আগে ঘরের মেঝে এবং বাইরের জমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। আশ্চর্য, ঘরে বাইরে কোথাও কোনোরকম পায়ের ছাপ নেই।

তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে তুমি দেখতে পাওনি?

বিশ্বাস করুন, স্যার, কোনোরকম ছাপ নেই।

হপকিনস, বহু রহস্য গ্রন্থি মোচন করেছি আমি। কিন্তু ডানা মেলে উড়ে এসে কেউ অপরাধ করে সরে পড়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত শুনিনি বা দেখিনি। অপরাধী যতক্ষণ দু-পায়ে হাঁটছে, ততক্ষণ কিছু ছাপ, কিছু ঘষা, কিছু অতি তুচ্ছ নাড়াচাড়ার চিহ্ন সন্ধানীর বৈজ্ঞানিক চোখে ধরা পড়বেই। রক্ত ছড়ানো এ-রকম একটা ঘরে আমাদের পথ দেখানোর মতো কোনো নিশানা যে নেই, তা হতেই পারে না। যাক, তোমার রিপোর্ট শুনে মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে অন্তত কতকগুলো

জিনিস তোমার নজর এড়াতে পারেনি, তাই তো?

শ্লেষের সূক্ষ্ম খোঁচাটুকু গায়ে না-মেখে চোখ মিটমিট করে হপকিনস বলে, সে সময়ে আপনাকে না-ডেকে খুবই বোকামো করেছি মি. হোমস। যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এখন বর্তমান নিয়ে পড়া যাক। আপনার অনুমানই ঠিক, ঘরের মধ্যে এমন কয়েকটা

জিনিস আমি পেয়েছি যা উপেক্ষা করা চলে না কোনোমতেই। একটা হচ্ছে খুনির হাতিয়ার—হারপুন। অস্ত্রটা হ্যাচকা টানে নামিয়ে আনা হয়েছে দেওয়ালের তাক থেকে। পাশাপাশি রাখা দুটি হারপুনের পাশে তৃতীয়টির স্থান শূন্য। এস. এস. সী ইউনিকর্ন, ডানডী—এই শব্দ ক-টা প্রত্যেকটার হাতলেই খোদাই করা। দেখে শুনে মনে হয়, খুনটা হয়েছে নিছক রাগের ঝোঁকে। হত্যাকারী প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ হয়ে আচম্বিতে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই টেনে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাক পিটারের বুকে। খুনটা হয়েছে রাত দুটোর সময়ে। অথচ ব্ল্যাক পিটারের পরনে দেখা গেছে বাইরে বেরোনোর জন্যে সম্পূর্ণ সাজসজ্জা। এসব দেখে মনে হয় আগে থেকেই কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্থির হয়ে ছিল তার। এ ধারণার আর একটা কারণ হচ্ছে টেবিলের ওপর রাখা দুটো নোংরা গেলাসের পাশে এক বোতল র্যম।

হোমস বললে, মন্দ বলনি, তোমার দুটো সিদ্ধান্তই দেখছি বরদাস্ত করা চলে। র্যম ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনো মদ ছিল কি?

ছিল। জাহাজি সিন্দুকের মধ্যে মদ রাখার উপযুক্ত তালা লাগানো একটা আধারে পেয়েছি হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি। এ-পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের বিশেষ কোনো কাজে আসবে না। কেননা, মদ রাখার পাত্রগুলো ভরতি থাকায় সিন্দুকের বোতলে কেউই হাত দেয়নি।

কাজে লাগবে কি না বলতে পারি না, তবে ঘরের মধ্যে হুইস্কি আর ব্র্যান্ডির উপস্থিতিটাই ভাববার বিষয়। সে-কথা এখন থাকুক, কেসটা সম্পর্কে আর কিছু দরকারি তথ্য যদি জানা থাকে তো বলে ফেল।

টেবিলের ওপর তামাক রাখার থলিটা পাওয়া গেছে।

টেবিলের কোন দিকে?

ঠিক মাঝখানে। সীলমাছের খসখসে পুরু চামড়ার ব্যাগ-মুখ চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। P.C.অক্ষর দুটো ভেতর দিকে লেখা। প্রায় আধ আউন্সের মতো কড়া জাহাজি তামাক পাওয়া গেছে ভেতরে।

চমৎকার! আর কিছু?

পকেট থেকে ছাইরঙের পুরু পশমি কাপড়ে ঢাকা একটা নোটবই বার করল স্ট্যানলি হপকিনস। বাইরের দিকটা ককর্শ, বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে কোনাগুলো, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে পাতাগুলো। প্রথম পাতায় লেখা আছে J.H.N. আর ১৮৩। টেবিলের ওপর নোটবইটা রেখে তন্ময় হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল হোমস আর চোখে অসীম প্রত্যাশা নিয়ে তার দু-কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়লাম আমি আর হপকিনস। দ্বিতীয় পাতায় C.P.R., এই ছাপা অক্ষর তিনটির পর কয়েক পাতা জুড়ে লেখা অজস্র সংখ্যা। এ-রকম শিরোনামা আরও তিনটে দেখলাম। আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা আর স্যান পাওলো। প্রত্যেকটা শিরোনামার পর কয়েক পাতা জুড়ে কেবল দুর্বোধ্য চিহ্ন আর সংখ্যার সারি।

হোমস জিজ্ঞেস করলে, এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, তাই আগে শুনি।

আমার তো মনে হয় স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটির ফিরিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয় ওগুলো। দালালটার নাম বোধ হয় J.H.N.।C.P.R. তারই মক্কেলের নামের আদ্যক্ষর।

হোমস বললে, আমি যদি বলি ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে?

উরুর ওপর একটা ঘুসি মেরে দাঁতে দাঁত পিষে চেষ্টা করে ওঠে হপকিনস, ওঃ, কী বোকা আমি। আপনার ধারণাই সত্য, মি. হোমস। বাকি রইল তাহলে J.H.N.-এর রহস্য মোচন। ১৮৮৩ সালের পুরোনো স্টক এক্সচেঞ্জ খুলে দালালদের লিস্ট আমি দেখেছি। কিন্তু হাউস-এর ভেতরে অথবা বাইরের এমন কোনো নাম আমি পাইনি J.H.N. যার আদ্যক্ষর। না-পেলেও আমার বিশ্বাস, এই মুহূর্ত পর্যন্ত যত সূত্র আমার হাতে এসেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে দরকারি হচ্ছে এই নোটবইটা। একটা বিষয়ে আপনিও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, মি. হোমস। নামের আদ্যক্ষরগুলো ব্ল্যাক পিটারের সংগ্রহ নয়, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির এবং দ্বিতীয় কোনো

ব্যক্তি বলতে এখানে হত্যাকারীকেই বোঝাচ্ছে। আরও বলব এ-কैसे রাশি রাশি মূল্যবান সিকিউরিটি সংক্রান্ত একটা দলিলের আবির্ভাব ঘটায় এই প্রথম খুনের একটা যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য আমরা পাচ্ছি।

খবরটা শার্লক হোমসের কাছে একেবারেই নতুন, তা তার দারুণভাবে চমকে ওঠা দেখেই বুঝলাম।

তোমার দুটো পয়েন্টই মেনে না-নিয়ে পারছি না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তদন্ত চলার সময়ে নোটবইটা রঙ্গমঞ্চে না-পৌঁছোনোয়, আমার মতামতেও একটু আধটু রদবদল করা দরকার হয়ে পড়েছে। এই খুন সম্বন্ধে আমি একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলাম। সে-থিয়োরিতে নোটবইয়ের কোনোরকম স্থান তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। সিকিউরিটি সম্বন্ধে এইমাত্র যা বলছিলে, তা বাস্তবিকই কৌতূহল জাগায়। এ-রকম এক-আধটা সিকিউরিটি হাতে এসেছে নাকি?

অফিসগুলোর তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ভয় কী জানেন, দক্ষিণ আমেরিকার এই কোম্পানিগুলোর স্টকহোল্ডারদের নামধামের রেজিস্টার দক্ষিণ আমেরিকায় থাকায় কয়েক হাজার আগে শেয়ারগুলোর কোনো হদিশ পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আতশকাচ দিয়ে নোটবইয়ের মলাটটা পরীক্ষা করছিল হোমস। এই জায়গার রংটা দেখছি অন্যরকম হয়ে গেছে।

হ্যাঁ স্যার, ওটা রক্তের দাগ। আপনাকে তো বললাম মেঝে থেকে নোটবইটা কুড়িয়ে পেয়েছি আমি।

রক্তের দাগলাগা মলাটটা নীচে ছিল, না ওপরে ছিল?

নীচে ছিল ।

তার মানে এই বোঝাচ্ছে, ব্ল্যাক পিটার খুন হয়ে যাওয়ার পর নোটবইটা পড়েছে মাটিতে ।

এগজ্যাক্টলি, মি. হোমস । বড়ো সুন্দর পয়েন্ট বলেছেন । আমার অনুমান, তাড়াহুড়ো করে পালাবার সময়ে নোটবইটা ফেলে যায় হত্যাকারী । দরজার কাছেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম বইটা ।

নিহত ব্ল্যাক পিটারের সম্পত্তির মধ্যে কোনো সিকিউরিটির হদিশ নিশ্চয় পাওয়া যায়নি?

না, স্যার ।

চুরি গেছে বলে মনে হয়?

না, স্যার । কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না ।

বেশ ইন্টারেস্টিং কেস তো! ছুরিও তো পাওয়া গেছে, তাই না?

খাপওলা একটা ছুরি। খাপসমেত পড়ে ছিল ব্ল্যাক পিটারের পায়ের কাছে। মিসেস ক্যারি শনাক্ত করেছেন ছুরিটা তার স্বামীরই।

মুহূর্তের জন্যে চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় হোমস। তারপর শুধোয়, হপকিনস, নিজের চোখে জায়গাটা একবার আমার না-দেখলেই নয়!

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে হপকিনস।

ধন্যবাদ, স্যার। মনের ওপর থেকে আমার একটা মস্ত বোঝা নেমে যাবে আপনার পায়ের ধুলো পড়লে।

আঙুল নাড়তে নাড়তে হোমস বলে, হুগাখানেক আগে হলে কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠত, ইনস্পেকটর। এখনও এক চক্রর ঘুরে এলে খুব বিফল হবে বলে মনে হয় না। ওয়াটসন, হাতে যদি সময় থাকে, আমার জন্যে একটু নষ্ট করো। তোমার সঙ্গ আমায় আনন্দ দেবে প্রচুর। হপকিনস, একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকো তো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফরেস্ট রোর দিকে রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ছোট স্টেশনটায় নেমে একটা গাড়ি নিয়ে কয়েক মাইল পেরিয়ে এলাম বহুদূর বিস্তৃত বনভূমির মধ্য দিয়ে, কোনো এক সময়ে এ-বনভূমি ছিল এক বিরাট অরণ্যের অংশ যার সুকঠিন বর্মে সুদীর্ঘকালের জন্যে বারে বারে মাথা খুঁড়ে ফিরে গেছে স্যাক্সন যোদ্ধারা। বনভূমির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ উঠে গেছে অনতিউচ্চ বাড়িটার দিকে। রাস্তার

তিন দিকে ঝোপে ঢাকা ছোট্ট একটা আউট হাউস। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে তার দরজা এবং জানলা। ব্ল্যাক পিটার খুন হয়েছে এখানেই।

হপকিনস প্রথমেই আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলে নিহত ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। আলুথালু অবস্থা ভদ্রমহিলার। চুলগুলো ধবধবে সাদা। চওড়া, ভারী মুখে অজস্র বলিরেখা আর দু-চোখের লালাল আভার আড়ালে আতঙ্কের উদ্ভাস্ত দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠেছিল বহু বছরের দুর্ব্যবহার আর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের স্বাক্ষর। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার মেয়েও ছিলেন। ফ্যাকাশে ফর্সা রং মেয়েটির। বাবা মারা যাওয়াতে এতটুকু দুঃখ নেই, বরং বেশ খুশিই হয়েছে সে। বাপকে শেষ করে গেছে যে তার কাছে সে যেন সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ব্ল্যাক পিটারের নিজের হাতে গড়া এই ভয়াবহ পৃথিবী থেকে সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমি। নিহত ক্যাপ্টেনের যাতায়াতের ফলে ঘাসজমির ওপর একটা সরু পথ ফুটে উঠেছিল আউট হাউস পর্যন্ত। এই পথ ধরেই আমরা আবার এগিয়ে চললাম তার পরম প্রিয় কেবিনের দিকে।

খুবই সাদাসিধে গঠনের আউট হাউস। কাঠের দেওয়াল, কাঠের ছাদ, দরজার পাশে একটা মাত্র জানলা, আর একটা শেষ প্রান্তে। পকেট থেকে চাবি বার করে তালার ওপর ঝুঁকে পড়ল হপকিনস। সবিস্ময়ে বলে, তালাটা কেউ খোলার চেষ্টা করেছে।

কোনো সন্দেহই ছিল না এ-বিষয়ে। কাঠের নকশার জায়গায় জায়গায় আঁচড় পড়েছে। রঙের ওপরেও আঁচড় পড়ায় তলাকার সাদা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। জানলাটা পরীক্ষা করতে থাকে হোমস।

বলে, জানলাটাও দেখছি কেউ খুলতে চেষ্টা করেছে। যাই হোক, ঢুকতে কিন্তু পারেনি। বেজায় আনাড়ি চোর।

ইনস্পেকটর বললে, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সামান্য নয়, মি. হোমস। আমি হলফ করে বলতে পারি কাল সন্ধ্যায় এ-রকম কোনো দাগ এখানে ছিল না।

আমি বললাম, কোনো অতি উৎসাহী গ্রামবাসীর কীর্তি নয় তো?

না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা, ব্ল্যাক পিটারের এজিয়ারে পা দেওয়ার মতো সাহস কারোরই নেই। ঘরের ভেতরে মাথা গলানোর কথা তো ওঠেই না। আপনার কী মনে হয় মি. হোমস?

আমার মনে হয় ভাগ্য আমাদের ওপর খুবই সদয়।

আপনি বলতে চান, লোকটা আবার আসবে, এই তো?

ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশি। দরজা খোলা পাবে, এই আশাতেই এসেছিল লোকটা। দরজা বন্ধ দেখে পেনসিলকাটা ছোট্ট একটা ছুরির ফলা দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই ভেবে দেখ-এরপর তার কী করা উচিত?

পরের রাতেই উপযুক্ত যন্ত্র নিয়ে ফিরে আসা।

আমিও ঠিক তাই বলি। সে সময় তাকে আপ্যায়ন জানানোর জন্যে আমাদের হাজির-থাকাটা হবে চরম গাফিলতি। তার আগে চল কেবিনের ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে আসি।

খুনের চিহ্ন সব মুছে ফেলা হলেও আসবাবপত্র সরানো হয়নি। খুনের রাতে যেটি যেখানে ছিল ঘরে ঢুকে সব কিছু তেমনিভাবেই সাজানো পেলাম। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিকারি কুকুরের মতো পরীক্ষা করল হোমস। ঘরের প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসও উলটেপালটে দেখতে ছাড়ল না। তবু তার মুখ দেখে বুঝলাম সব পরিশ্রম বৃথাই গেল। রহস্যের কালো অন্ধকারে এতটুকু আলোর নিশানা দেখা গেল না। কিন্তু অসীম তার সহিষ্ণুতা। একবার শুধু থমকে গিয়ে প্রশ্ন করল হোমস, তাকের এইখানটা থেকে কিছু নিয়েছ নাকি হপকিনস?

না তো।

এই জায়গাটায় কিছু একটা সরানো হয়েছে। দেখছ না, অন্যান্য জায়গার চেয়ে এই কোণে ধুলো একটু কম জমেছে। বই হতে পারে বাক্সও হতে পারে। যাকগে, কল্পনায় এত দৌড়ে লাভ নেই-আপাতত এর বেশি আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। চলো হে ওয়াটসন, কুঞ্জবনের গন্ধবায়ু সেবন করতে করতে ফুল লতা পাতা আর পাখি দেখে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসা যাক। তোমার সঙ্গে এইখানেই পরে দেখা হবে হপকিনস। তারপর ধারেকাছে কোথাও নিশাচর ভদ্রলোকটির প্রতীক্ষায় বসে থাকা যাবেখন।

রাত এগারোটার সময় আবার আমরা জমা হই কেবিনের সামনে। হপকিনস চায় দরজা খোলা থাকুক, কিন্তু হোমসের যুক্তি-দরজা খোলা থাকলে আততায়ীর সন্দেহ জাগতে পারে। তা ছাড়া, তলাটা এমনই মামুলি যে একটা বড়ো সাইজের ছুরির মজবুত ফলা ঢুকিয়ে চাড় দিলেই তা খোলা যায় অনায়াসে। হোমসের প্রস্তাব অনুযায়ী ঘরের মধ্যে না-থেকে বাইরে ঝোপঝাড়ের মধ্যেই ওত পাতা স্থির করলাম। দূরের জানলাটা থেকেই ঝোঁপের শুরু। এখানে ওত পেতে থাকার সুবিধে হচ্ছে এই যে লোকটা যদি আলো জ্বালায়, তাহলে তার নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যটা খুব কাছ থেকে দেখা যাবে স্পষ্টভাবে।

শুরু হয় রাত জাগার পালা। সেই অসহ্য অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই। সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিনিটে মিনিটে পেরিয়ে গেল একটার পর একটা ঘণ্টা।

ছমছমে নীরবতা আবার সচকিত হয়ে ওঠে আড়াইটে বাজার মেঘমন্ড্র ঘণ্টা সংকেতে। ঠিক এমনি সময়ে ফটকের দিক থেকে মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ ক্লিক শব্দ শুনে চমকে উঠলাম সবাই। গেট পেরিয়ে কে যেন ভেতরে এসেছে। কিন্তু তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

কতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে হাল ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, নিশ্চয় অন্য কোনো শব্দ শুনে ভুল করেছি। এবার শোনা গেল পা টিপে টিপে চলার শব্দ। শব্দটা এল ঘরের এক পাশ থেকে। পর মুহূর্তেই আবার পেলাম ধাতুতে ধাতু আঁচড়ানোর আওয়াজ এবং আরও খুটখাট শব্দ। শুরু হয়েছে তালাখোলার চেষ্টা। এবারে লোকটা নিশ্চয় ভালো রকমের যন্ত্রপাতি এনেছে। একটু পরেই কড়াৎ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসে। এর পরেই শুনি ক্যাঁচ ক্যাচ আওয়াজ। আর ঠিক তারপরেই জ্বলে ওঠে একটা দেশলাইয়ের কাঠি এবং পরক্ষণেই মোমবাতির স্থির আলোয় উদ্ভাসিত হয় সারাঘরখানা। জালি পর্দার মধ্যে দিয়ে আমাদের তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি আঠার মতো লেগে থাকে ভেতরকার দৃশ্যে।

নিশাচর আগন্তকের বয়স এমন কিছু বেশি নয়।

বিশ বছরও হবে কি না সন্দেহ। রুগণ, শীর্ণ চেহারা। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কুচকুচে কালো গোঁফটার জন্যে। কোনো মানুষকে এ-রকম ভয় পেতে আমি দেখিনি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে তার। সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। বাস্তবিকই, তার অবস্থা দেখে অনুকম্পা জাগে। বেশবাস ভদ্রলোকের মতোই। কোমরের কাছে ফিতে লাগানো টিলেঢালা জ্যাকেট, হাঁটুর কাছে জড়ো করা টিলে ট্রাউজার, নিকারবোকার আর মাথার ওপর একটা কাপড়ের টুপি। ভয়াত চোখে জুল জুল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সে। তারপর মোমবাতিটাকে টেবিলের ওপর বসিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এল জাহাজের গতির হিসেব রাখার মোটা একটা বই নিয়ে। ঘরের তাকের ওপর এ-রকম বইয়ের একটা সারি দেখেছিলাম প্রথমবার ঘরে ঢুকে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুতহাতে পাতার পর

পাতা উলটে চলল, তারপর হঠাৎ থেমে যেতেই বুঝলাম ইঙ্গিত হিসেব সে পেয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে মুঠি পাকিয়ে শূন্য হাত ছুঁড়তে বুঝতে পারি বেজায় রেগে গেছে সে। দুম করে বই বন্ধ করে রেখে দেয় ঘরের কোণে। এবার নিভে যায় মোমবাতিটা। ঘর ছেড়ে সবে সে বেরোতে যাচ্ছে এমন সময়ে হপকিনসের হাত তার কলারের ওপর পড়তেই দম আটকানো আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে তার গলা দিয়ে। আবার জ্বলে ওঠে মোমবাতিটা। দেখি, ডিটেকটিভ বন্ধুর সাঁড়াশি মুষ্টিতে আটকা পড়ে বেচারার বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। হপকিনস মুঠি আলগা করতেই জাহাজি সিন্দুকের ওপর ধপ করে বসে পড়ে সে। অসহায়ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হপকিনস বলে, কী হে ছোকরা, তোমার নাম কী? বলো তো, কী করতে এসেছিলে এখানে?

ছেলেটি নিজেকে সংযত রাখার আশ্রয় চেষ্টা করে। কোনোরকমে সোজা হয়ে বসে বলে, আপনাদের গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে, তাই না? আপনাদের ধারণা ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মৃত্যুর পেছনে আমারও হাত আছে। কেমন? বিশ্বাস করুন, এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হপকিনস বলে, সেটা আমরা ভাববখন। আপাতত বলো, কী নাম তোমার?

জন হপলি নেলিগ্যান।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

লক্ষ করলাম, চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলে হোমস আর হপকিনস ।

এখানে কী করছিলে?

যা বলব তা কি কেবল আমাদের মধ্যেই সীমিত থাকবে?

নিশ্চয় না ।

তবে আমি বলব কেন?

প্রশ্নের উত্তর না-দিলে মামলা চলার সময়ে মজা টের পাবে'খন ।

চোখ মিটমিট করে উঠল তরুণটি ।

বলল, ঠিক আছে, আমি বলছি । বলবই-বা না কেন? যদিও আমি চাই না পুরানো কেলেক্সারি নতুন করে ছড়িয়ে পড়ুক, তবুও কিছু গোপন করব না আপনাদের কাছে ।
ডসন । অ্যান্ড নেলিগ্যানের নাম শুনেছেন আপনারা?

হপকিনস যে কস্মিনকালেও শোনেনি, তা ওর মুখ দেখেই বুঝলাম । হোমস কিন্তু বেশ সচকিত হয়ে উঠেছে মনে হল ।

সাগ্রহে শুধোল ও, পশ্চিম দেশের ব্যাঙ্কার ছিল ডসন অ্যান্ড নেলিগ্যান তাই না? প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড নিয়ে ফেল করল তাদের ব্যাঙ্ক। কর্নয়ালের অর্ধেক পরিবারকে পথে বসিয়ে উধাও হয়ে গেল নেলিগ্যান।

এগজ্যাক্টলি। নেলিগ্যান আমারই বাবা।

এতক্ষণে অকূলপাথারে একটা কুটোর সন্ধান পাওয়া গেল! যদিও পলাতক ব্যাঙ্কার আর দেওয়ালের সঙ্গে হারপুন দিয়ে গাঁথা ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মধ্যকার ব্যবধানটা এতই দীর্ঘ যে কোনো দিশে খুঁজে পেলাম না। তরুণ জন হপলি নেলিগ্যানের আশ্চর্য বর্ণনা কানখাড়া করে শুনতে বসলাম সবাই মিলে।

এ-ব্যাপারের মূল আমার বাবা। ডসন আগেই অবসর নিয়েছিলেন। সে সময় আমি মাত্র দশ বছরের হলেও এই ঘটনার বিভীষিকা উপলব্ধি করার মতো বয়স আমার হয়েছিল। টি টি পড়ে গেছিল চারিদিকে। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায় সকলের সামনে। প্রথম থেকেই সবাই জেনেছে, বলাবলি করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে আমার বাবাই সিকিউরিটিগুলো আত্মসাৎ করে গা-ঢাকা দেন। এ-কথা সত্য নয়। তার বিশ্বাস ছিল, যথেষ্ট সময় যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সিকিউরিটিগুলো পুনরুদ্ধার করে পাওনাদারদের পাওনাগুণ্ডা, কড়ায় ক্রান্তিতে চুকিয়ে দিতে পারতেন তিনি। গ্রেগোরি পরোয়ানা বেরোনোর একটু আগেই ছোট বজরাটা নিয়ে নরওয়ের দিকে রওনা হন তিনি। আগের রাতে মায়ের কাছে বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটা এখনও মনে আছে আমার। সিকিউরিটিগুলোর একটা তালিকা রেখে যান বাবা। যাবার সময় বলে যান মানসম্মান

উদ্ধার না-করে তিনি ফিরবেন না। যারা তাকে বিশ্বাস করেছেন, তাঁদের বিশ্বাস যাতে অটুট থাকে, সে-বন্দোবস্ত করে তবে ঘরমুখো হবেন তিনি। এরপর থেকে তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বজরা সমেত উনি যেন কপুরের মতো উবে গেলেন কোনোরকম চিহ্ন না-রেখেই। মা আর আমি ভাবলাম নিশ্চয় বজরাডুবি হয়েছে। সিকিউরিটিগুলো নিয়েই সমুদ্রের তলায় শেষ ঘুম ঘুমিয়েছেন বাবা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমাদের অনুগত এক ব্যবসায়ী বন্ধু মারফত একটা খবর শোনার পর। যাবার সময়ে যে সিকিউরিটিগুলো বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কয়েকটা কিছুদিন আগে আবার দেখা গেছে লন্ডনের বাজারে। খবরটা শোনার পর আমরা যে কী পরিমাণে হতবুদ্ধি হয়ে যাই, তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন আপনারা। মাসের পর মাস লেগে রইলাম সিকিউরিটিগুলোর অনুসন্ধানে। অনেক দুর্ভোগ, বিস্তর ঝামেলা কাটিয়ে ওঠার পর আবিষ্কার করলাম যে সিকিউরিটিগুলো বাজারে বিক্রি করেছেন এই বাড়ির মালিক ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি।

লোকটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, যে সময়ে আমার বাবা নরওয়ে রওনা হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে সুমেরু সাগর দিয়ে ফিরে আসছিল একটা তিমি শিকারের জাহাজ। ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি এই জাহাজের কমান্ডার ছিলেন। সে বছরের শরৎকালে ঝড় হয়েছে প্রচুর। প্রবল দক্ষিণে ঝড়ের উৎপাত দেখেছি একনাগাড়ে অনেক দিন ধরে। বাবার বজরা হয়তো এই ঝড়ের মুখে পড়ে ভেসে গিয়েছিল উত্তর দিকে। ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির জাহাজের সঙ্গে দেখা হয় সেইখানেই। তাই যদি হয়, তাহলে বাবা গেলেন কোথায়? পিটার ক্যারিকে সাক্ষী মেনে যদি প্রমাণ করতে পারি সিকিউরিটিগুলো বাজারে

এসেছে কীভাবে, তাহলেই প্রমাণ করা হবে যে বাবা ওগুলো বিক্রি করেননি এবং ওগুলো নেওয়ার পেছনেও তাঁর কোনো ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্য ছিল না।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম সাসেক্রে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন হলেন তিনি। তদন্তের বিবরণে তার এই কেবিনের বর্ণনাও পড়েছিলাম এবং জাহাজের হিসাব রাখার বইগুলো যে এইখানেই উনি রেখে দিয়েছেন তা জেনেছিলাম। মতলবটা মাথায় আসে তখনই। ১৮৮৩ সালের অগাস্ট মাসে সী ইউনিকর্ন জাহাজের দিনপঞ্জিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই তো জানা যায় বাবার পরিণতি রহস্য। গতরাতে বইগুলো দেখবার মতলবে এসে ব্যর্থ হয়েছি দরজা বন্ধ থাকায়। আজকে এসে দরজা খুলেছি। তারপরেই বইটা নামিয়ে পাতা উলটোতে গিয়ে দেখি আমি যা চাইছি, তা নেই। বইটা রেখে সবে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আপনারা এসে পাকড়াও করলেন আমাকে।

আর কিছু বলার আছে, না, এই-ই সব? জিজ্ঞেস করে হপকিনস।

না, আর কিছু বলবার নেই, চোখ নামিয়ে নেয় তরুণটি।

তাহলে আর কিছু বলার নেই তোমার?

আমতা আমতা করতে থাকে নেলিগ্যান, না কিছুই আর বলার নেই।

গতরাতের আগে এখানে তুমি আসনি?

না।

তাহলে এ-জিনিসটা এল কোথেকে? চিৎকার করে উঠে হপকিনস বহু ব্যবহারে জীর্ণ নোটবইটা বাড়িয়ে ধরে। রক্তের দাগ লাগা মলাটটা ওলটাতেই প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করতে থাকে বন্দি হপলি নেলিগ্যানের প্রথম অক্ষর তিনটে।

আত্মসংযমের শেষ শক্তিটুকু ব্যর্থ হয়। একেবারে ভেঙে পড়ে ছেলেটি। দু-হাতের তালুতে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু মনে হল তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহ ঘন ঘন কেঁপে উঠছে ভয়ে উত্তেজনায় শিহরনে।

গুণ্ডিয়ে উঠল নেলিগ্যান, কোথায় পেলেন আপনি? আমি জানি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তো ভেবেছিলাম হোটেলে হারিয়েছি নোটবইটা।

ইস্পাত কঠিন স্বরে হপকিনস বলে, যথেষ্ট হয়েছে। আর যা কিছু বক্তব্য তোমার আছে আদালতেই বলবে। আপাতত আমার সঙ্গে চলো পুলিশ-ডি পর্যন্ত। মি. হোমস, আপনাদের দুজনকেই আমার ধন্যবাদ জানাই এতদূর এসে আমায় সাহায্য করার জন্যে।

ওয়াটসন, গতিক বুঝছ কেমন? পরের দিন সকালে লন্ডনে ফেরার পথে হোমস জিজ্ঞাসা করে।

আমি তো দেখছি-মোটাই সম্ভব হওনি তুমি।

আরে না, না, খুবই সম্ভব হয়েছি আমি। তবে হপকিনসের পদ্ধতি-টদ্ধতিগুলো ঠিক মানতে পারছি না। হপকিনস আমায় হতাশ করেছে, ওয়াটসন। ওর কাছ থেকে আমি আরও ভালো জিনিস আশা করেছিলাম। অপরাধ সম্পর্কিত তদন্তের সর্বপ্রথম নিয়ম হচ্ছে-সবসময়ে বিকল্প সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা এবং তাকে কাজে লাগানো।

সেই বিকল্প সম্ভাবনাটা কী শুনি?

যে তদন্ত ধারা আমি নিজেই প্রথম থেকে ভেবে এসেছি-এক্ষেত্রে বিকল্প সম্ভাবনা একমাত্র সেইটাই। আমারও ভুল হতে পারে এবং তদন্ত শেষে হয়তো বৃহৎ শূন্য ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। কী হবে তা জানি না। তবু শেষ না-দেখে ছাড়ছি না আমি।

বেকার স্ট্রিটে হোমস নামে কয়েকটা চিঠি এসে পড়ে ছিল। একটা চিঠি তুলে খুলেই বিজয়োল্লাসে হোমস তার চিরকোলে নিঃশব্দ হাসি হাসতে শুরু করে দিলে।

চমৎকার, ওয়াটসন, চমৎকার। বিকল্প সম্ভাবনাই ঠিক হতে চলেছে। টেলিগ্রাম ফর্ম আছে নাকি? গোটা দুয়েক খবর বলছি, লিখে ফেল তো সামনার, শিপিং এজেন্ট ব্যাটক্রিফ হাইওয়ে। কাল সকাল দশটায় তিনজন লোককে পাঠিয়ে দিন বেসিল। ও-অঞ্চলে আমার নাম বেসিল। আরেকটা লেখ : ইনস্পেকটর স্ট্যানলি হপকিনস ৪৬ লর্ড স্ট্রিট, ব্রিস্টল।

কাল সকাল সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্টের সময়ে এসো। দরকারি। আসা সম্ভব না হলে টেলিগ্রাম পাঠাও-শার্লক হোমস।

টেলিগ্রামের সময় অনুসারে কাঁটায় কাটায় সাড়ে নটায় ইনস্পেকটর হপকিনস এসে পৌঁছোল আমাদের টেবিলে। তোফা খানা বানিয়েছেন মিসেস হাডসন। খোশমেজাজে টেবিল সরগরম করে রাখল তরুণ গোয়েন্দা। বুঝলাম, সাফল্যের আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে ওর অন্তর।

হোমস জিজ্ঞেস করে, হপকিনস, সত্যিই কি তুমি মনে কর যে তোমার সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই?

নিশ্চয় নেই, মি. হোমস। এর চাইতে নিখুঁত কেস আর দেখিনি।

আমার তা মনে হয় না। আসল সমাধানে এখনও তুমি পৌঁছোতে পারনি।

অবাক করলেন মি. হোমস। আর কী আশা করেন আপনি?

তোমার ব্যাখ্যা দিয়ে সবকটা জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া কি সম্ভব?

আলবাত সম্ভব। যেদিন ব্ল্যাক পিটার খুন হন, ঠিক সেদিন হোটеле এসে ওঠে এই নেলিগ্যান ছোকরা। আরও খবর পেয়েছি, গলফ খেলার অছিলায় এ-অঞ্চলে কার

আগমন। তার ঘরটা ছিল একতলায়, কাজেই যখন খুশি বাইরে বেরোতে পারত সে। সেই রাতেই ও উডম্যানস লী-তে গিয়ে ব্ল্যাক পিটারের সঙ্গে দেখা করে আসে। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। হারপুনটা টেনে নামিয়ে ক্যাপ্টেনকে খুন করে সে। রক্ত দেখেই কিন্তু মাথা ঘুরে যায় তার। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘর ছেড়ে পালাবার সময়ে নোটবইটা ফেলে আসে ভেতরে। সিকিউরিটি তালিকা লেখা নোটবইটা সে এনেছিল পিটার ক্যারিকে জেরা করার জন্যে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, সংখ্যার ওপর টিক চিহ্ন দেওয়া আছে, কিন্তু বেশিরভাগ সংখ্যার পাশে কোনো চিহ্ন নেই। টিক চিহ্ন দেওয়া সিকিউরিটিগুলোই লন্ডনের বাজারে পিটার ক্যারি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বাকিগুলো নিশ্চয় তার দখলে এখনও আছে, এই আশাতেই নেলিগ্যান এসেছিল তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। তার উদ্দেশ্য ছিল সিকিউরিটি পুনরুদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে বাবার পাওনাগণ্ডা যতদূর সম্ভব মিটিয়ে ফেলা। সেরাতে চম্পট দেওয়ার পর কয়েকদিন এমুখো হওয়ার সাহস তার হয়নি, তারপর ফিরে এসেছিল আরন্ধ কর্মের বাকিটুকু শেষ করতে। এর মধ্যে জটিলতাটা কোথায় বলুন, মি. হোমস? ঠিক এইরকম না হলেই বরং আশ্চর্য হতাম।

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে হোমস বলে, হপকিনস, তোমার ব্যাখ্যায় কেবল একটা অসংগতি আমার চোখে লাগছে এবং তা হচ্ছে, তুমি যা বললে, তা অসম্ভব, একদম অসম্ভব। কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ না-রেখে, বিলকুল অসম্ভব। হারপুন দিয়ে কোনো দেহ এফেঁড়-ওফেঁড় করার চেষ্টা কোনোদিন করেছ? করনি? ছিঃ ছিঃ এইসব খুঁটিনাটি জিনিসগুলো নিয়ে তোমার একটু মাথা ঘামানো উচিত। বন্ধুবর ওয়াটসনকেই জিজ্ঞেস কর না কেন পুরো একটা সকাল আমি ব্যয় করেছি হারপুন দিয়ে দেহ এফেঁড়-ওফেঁড়

করার ব্যায়ামে। ব্যায়ামটা বড়ো সহজ নয় হে হপকিনস। খুব বলিষ্ঠ আর পাকা হাত ছাড়া এ-কাজ কারো পক্ষে সম্ভব? গভীর রাতে ব্ল্যাক পিটারের খুনি এমন জোরে হারপুন চালিয়েছে যে হাতিয়ারের মাথাটা দেওয়ালের মধ্যেও গেঁথে গেছে অনেকখানি। তোমার কি মনে হয় এই রক্তহীন ছেলেটার দেহে এ-রকম আসুরিক শক্তি থাকা সম্ভব? গভীর রাতে ব্ল্যাক পিটারের সাথে এক টেবিলে রাম আর জল খাওয়ার মতো সাহস কি তার আছে? তুমি বলতে চাও দুরাত আগে জানলার পর্দায় এরই মুখের ছায়া ফুটে উঠেছিল? না, হপকিনস, না, নেলিগ্যান নয়। আমাদের উচিত আরও ভয়ংকর কোনো লোকের সন্ধান জাল ছড়ানো।

হোমসের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্রমশ ভারী হয়ে বুলে পড়ছিল গোয়েন্দাপ্রবরের চোয়ালখানা। তার হাঁ করে তাকিয়ে থাকার ধরন দেখে বাস্তবিকই বড়ো অনুকম্পা হল আমার। বেশ বুঝলাম, একটু একটু করে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে তার আশা-উচ্চাশার অনেক কষ্টে গড়ে তোলা স্বপ্নসৌধ। কিন্তু ভাঙবে, তবু মচকাবার পাত্র সে নয়। তাই আশ্রয় নেয় তর্কের।

কিন্তু সেরাতে নেলিগ্যান ছোকরা যে খুনের দৃশ্যে হাজির ছিল, তা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না, পারেন কি মি. হোমস? নোটবইটাই তার প্রমাণ। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আমার হাতে যেসব প্রমাণ এসেছে, তা জুরিদের সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। শেষ মুহূর্তে দু-একটা ছিদ্র আপনার চেষ্টায় বেরিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না তাতে। তা ছাড়া মি. হোমস, আমার থিয়োরি অনুযায়ী আসামিকে আমি পাকড়াও করেছি। কিন্তু আরও ভয়ংকর যার কথা বলছেন, সে কোথায়?

আমার তো মনে হচ্ছে সিঁড়ির ওপর তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কঠোর স্বরে বলল হোমস। ওয়াটসন, রিভলভারটা এমন জায়গায় রাখ যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। বলে, উঠে গিয়ে কয়েক পঙক্তি লেখা এক টুকরো কাগজ একটা ছোট টেবিলের ওপর রেখে ফিরে এল। সব ঠিক আছে, আমরা তৈরি।

দরজার বাইরে ককর্শ গলায় কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দরজা খুলে গেল। মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকে জানালেন তিনজন লোক ক্যাপ্টেন বেসিলের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

একে একে তাদের নিয়ে আসুন এ-ঘরে, বললে হোমস।

প্রথমে যে-লোকটা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখলে আচারের আপেলের কথা মনে পড়ে। খর্বকায়। রক্ত ফেটে-পড়া লাল লাল গালের ওপর পেঁজা তুলোর মতো ধবধবে সাদা একজোড়া জুলপি।

পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে হোমস শুধোল, কী নাম?

জেমস ল্যান্কাস্টার।

ল্যান্কাস্টার, আমি দুঃখিত। আর জায়গা নেই জাহাজে। মিছিমিছি কষ্ট দিলাম, তাই রইল এই আধ-গিনিটা। পাশের ঘরে মিনিট কয়েকের জন্যে অপেক্ষা করো।

দ্বিতীয় দর্শনপ্রার্থী একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। শরীরের মধ্যে মেদ-মাংসের বালাই নেই। শুকনো চেহারা। মাথায় অল্প অল্প চুল। তোবড়ানো গাল। লোকটার নাম হিউ প্যাটিনস। তাকেও আধ গিনি দিয়ে বরখাস্ত করে অপেক্ষা করতে বলা হল পাশের ঘরে।

তৃতীয় জনের চেহারাখানা দেখার মতো। এক কথায়, অসাধারণ মূর্তি তার। রাশি রাশি চুল আর দাড়ির ফ্রেমে আঁটা বুল-ডগের মতো ভয়ংকর মুখ। ঝোঁপের মতো পুরু, কার্নিশের মতো বেরিয়ে আসা গুচ্ছ গুচ্ছ একজোড়া ভুরুর নীচে ঘন কালো গ্রানাইটের মতো কঠিন, জ্বলন্ত চোখের দীপ্তি। স্যাঁলুট করে নাবিক-সুলভ কায়দায় দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে লাগল সে।

তোমার নাম? জিজ্ঞেস করে হোমস।

প্যাট্রিক কেয়ার্নস।

হারপুনওয়ালা?

ইয়েস, স্যার, ছাব্বিশবার পাড়ি দিয়েছি সাগরে।

ডানডি, তাই না?

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

ইয়েস, স্যার ।

অভিযান দলের জাহাজের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছ তো?

মাইনে কত?

মাসে আট পাউণ্ড ।

আমি রাজি ।

এই মুহূর্তে রওনা হতে পারবে?

আমার জিনিসপত্র পাওয়ামাত্র তৈরি হব আমি ।

কাগজপত্র এনেছ?

ইয়েস, স্যার । পকেট থেকে তেলতেলে জীর্ণ কতকগুলো ফর্ম বার করলে সে । চোখ
বুলিয়ে নিয়ে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল হোমস ।

তোমার মতো লোককেই চাইছিলাম আমি । ছোট টেবিলটার ওপর শর্তলেখা কাগজটা
আছে । তোমার সইটা হয়ে গেলে এদিককার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে যায় ।

ভারী ভারী পা ফেলে ঘরের ওদিকে গিয়ে কলমটা তুলে নিলে হারপুনওয়ালা প্যাট্রিক কেয়ার্নস ।

তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, এইখানেই সই করব তো?

হোমস তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘাড়ের দু-পাশ দিয়ে দু-হাত গলিয়ে বললে, এইতেই হবে ।

কানে ভেসে এল ইম্পাতে ইম্পাতে ঠোকাঠুকির কড়াৎ শব্দ এবং সঙ্গেসঙ্গে বাড়ি কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল যেন এক খেপা ষাঁড় । পরমুহূর্তেই হোমস আর হারপুনওয়ালা দুজনে একসাথে গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর । দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়ে লোকটাকে দানব বললেও চলে । চোখের পলক ফেলার আগেই নিপুণ হাতে তার কবজিজোড়া হাতকড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল হোমস । তবুও ওই অবস্থাতেই সে ঘায়েল করে ফেলত হোমসকে যদি-না আমি আর হপকিনস দুজনেই ছুটে যেতাম তার সাহায্যে । মাথার ওপর রিভলভারের ঠান্ডা নলচেটা ঠেসে ধরতেই লোকটা বুঝলে ধস্তাধস্তি করে কোনো লাভই হবে না । দড়ি দিয়ে তার গোড়ালি দুটো বেঁধে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়ালাম তিনজন ।

প্রসন্নস্বরে হোমস বলে, হপকিনস, আজকের অভিজ্ঞতা থেকে তুমিও একটা মস্ত জিনিস শিখলে । সেটা কী জানো? বিকল্প সিদ্ধান্তকে কখনো অবহেলা করবে না । তরুণ

নেলিগ্যানকে নিয়ে তুমি এত মেতে উঠেছিলে পিটার ক্যারির আসল হত্যাকারী প্যাট্রিক কেয়ার্নস সম্পর্কে ভাববারও অবসর পাওনি।

কথার মাঝেই হঠাৎ গমগম করে ওঠে হারপুনওয়ালা ককর্শ কণ্ঠ, এই যে, মিস্টার! আমাকে এভাবে নাজেহাল করার জন্যে কোনো অভিযোগ আমি জানাচ্ছি না। কিন্তু আপনি উলটোপালটা কথা বলছেন বলে বাধা না-দিয়ে পারলাম না। আপনি বলছেন পিটার ক্যারিকে মেরে ফেলেছি। আমি। কিন্তু আমি বলি তাকে ইচ্ছা করেই বধ করেছি আমি। তফাত শুধু এইটুকু। বিশ্বাস হওয়া-না-হওয়া আপনার অভিরুচি। কিন্তু এটুকু জেনে রাখুন আপনারা, আমি ধোঁকা দিচ্ছি না।

নিশ্চয় না, নিশ্চয় না। বলে হোমস। বল না-এ-সম্পর্কে কী বলার আছে তোমার।

বলব তো বটেই এবং ঈশ্বরের দিব্যি-একটা অক্ষরও মিথ্যা বলব না। ব্ল্যাক পিটারকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তাই যে-মুহূর্তে ছুরি বার করেছে সে, আমিও পলক ফেলার আগেই হারপুনটাকে নামিয়ে এনে চালিয়ে দিয়েছি ওর বুকের মধ্যে দিয়ে। কেননা, এক মুহূর্ত দেরি করলে আমার অবস্থা যে কী হত, তা শুধু আমিই জানি। আপনি একে এবার খুন বলতে চান তো বলুন! ব্ল্যাক পিটারের ছুরি বুকে নিয়ে মরতাম, আপনাদের পাল্লায় পড়ে না হয় গলায় ফাঁস দিয়েই মরতে হবে।

হোমস জিজ্ঞেস করে, এখানে কী করে এলে তুমি?

তাহলে প্রথম থেকেই শুনুন। একটু তুলে বসিয়ে দিন আমায় কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। এ-ঘটনাটা ঘটে ১৮৮৩ সালে, -অগাস্ট মাসে। সী ইউনিক জাহাজের কর্তা ছিলেন পিটার ক্যারি, আর আমি ছিলাম হারপুনওয়ালা। বরফের এলাকা পেরিয়ে এসে প্রবল ঝড় ঠেলে দেশে ফিরছিলাম আমরা। এমন সময় চোখে পড়ল ছোটো একটা জাহাজ। ঝড়ের দাপটে জাহাজটা ভেসে এসেছিল উত্তর দিকে। লোকজন বলতে শুধু একজনই ছিল জাহাজে তাও সে নাবিক নয়। পাইলট নাকি জাহাজডুবি হওয়ার ভয়ে সাজোপাঙ্গ নিয়ে ডিঙি করে নরওয়ে উপকূলের দিকে সটকান দিয়েছিল। সমুদ্রের যা অবস্থা তখন, আমার তো বিশ্বাস ডিঙিসমেত সবাই ডুবে মরেছে-নরওয়ে পৌঁছোননা আর হয়নি। যাই হোক, পরিত্যক্ত ক্যাপ্টেনকে আমরা সী ইউনিকর্ন-এ তুলে নিলাম। কেবিনের ভেতরে তার সঙ্গে ব্ল্যাক পিটারের অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। ক্যাপ্টেনের মালপত্রের মধ্যে একটা টিনের বাক্সও ছিল। ভদ্রলোকের কী নাম, তা আমরা জানতাম না অর্থাৎ জানানো হয়নি। তবে, পরের দিন তাকে সী ইউনিকর্ন-এ দেখা গেল না। ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল সে। শোনা গেল ভদ্রলোক হয়তো নিজেই সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, আর না হয় ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে না-পেরে রেলিং টপকে ডেক থেকে পড়ে গেছে জলে। কিন্তু একজন জানত ক্যাপ্টেনের পরিণাম। সেই লোক আমি, নিজের চোখে দেখেছিলাম গভীর রাতে ক্যাপ্টেনের গোড়ালি বেঁধে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রের বুকে। এ-কাণ্ড ঘটেছিল শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের আলো দেখতে পাওয়ার ঠিক দু-দিন আগে।

এ-খবর কিন্তু আমি কাউকেই জানালাম না। ধৈর্য ধরে রইলাম কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় দেখার জন্যে। এ-ব্যাপার নিয়ে যা একটু কানাঘুসো হয়েছিল-স্কটল্যান্ডে এসে

তাও ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হল অনায়াসেই। দুর্ঘটনায় যদি কোনো আগন্তুক মারা গিয়ে থাকে, তা নিয়ে খোঁজখবর করার কাজ আমাদের নয়। এর কিছুদিন পরেই সমুদ্রযাত্রা ছেড়ে দিল পিটার ক্যারি। তারও অনেক বছর পরে ঠিকানা পেলাম তার। আমার বিশ্বাস ওই টিনের বাক্সের মধ্যকার জিনিসের জন্যই ক্যাপ্টেনকে খুন করেছিল পিটার ক্যারি। আর আমার মুখ বন্ধ রাখার মতো পয়সার তার অভাব হবে না বলেই হঠাৎ মনে হল আমার।

ব্ল্যাক পিটারের এখানকার ঠিকানা পেয়েছিলাম একজন খালাসির কাছে। লন্ডনে দেখা হয়েছিল দুজনের। ঠিকানা অনুযায়ী এলাম তার কাছ থেকে কিছু দুয়ে নিতে। প্রথম রাতে তার কথাবার্তা শুনে আশা হয়েছিল আমাকে বাকি জীবনের মতো সমুদ্রযাত্রা যাতে আর না-করতে হয় তার জন্যে সে উপযুক্ত টাকা আমায় দেবে। স্থির হল, দুরাত পর এ-বিষয়ে পাকাঁপাকি ব্যবস্থা করা হবে। এসে দেখি সে মদে চুর হয়ে আছে। মেজাজও তিরিক্ষে। টেবিলে দুজনে বসে একসঙ্গে মদ খেলাম। পুরাননা দিনের অনেক কথা হল। কিন্তু গেলাসের পর গেলাস খালি হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ওর চোখের দৃষ্টিটা আমার ভালো লাগল না। দেওয়ালের তাকে হারপুনটাকে দেখে রাখলাম তখনই। লড়তেই যদি হয়, খালি হাতে লড়ব না। যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। আচমকা থুতু ছিটিয়ে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে মস্ত একটা ছুরি হাতে আমার দিকে তেড়ে এল ব্ল্যাক পিটার। কিন্তু খাপ থেকে ছুরিটা বার করারও সময় দিলাম না। হারপুন দিয়ে এফেঁড়-ওফোঁড় করে ফেললাম তাকে। উঃ সে কী বিকট চিৎকার। আজও ঘুমোলে লোকটার মুখ আমি ভুলতে পারি না। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে-তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ দেখে সাহস ফিরে পেলাম। এদিক-ওদিক

তাকাতেই তাকের ওপর টিনের বাক্সটা চোখে পড়ল। বাক্সটার ওপর পিটার ক্যারির অধিকার যতটা, আমারও অধিকার ততখানি। কাজেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়ার আগে তা নিতে ভুললাম না। কিন্তু আহাম্মক আমি, যাওয়ার সময়ে তামাকের থলিটা ফেলে গেলাম টেবিলের ওপর।

এবার বলি শুনুন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ঘর থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম আমি। চোরের মতো পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল একটা লোক। তারপরেই ভূত দেখলে মানুষ যেমন চিৎকার করে, তেমনি বিকট চিৎকার ছেড়ে দৌড়ে নিমেষের মধ্যে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল সে। লোকটা কে এবং কীসের জন্যে চোরের মতো ও-রকমভাবে এল, তা আমি জানি না। সেই রাতেই দশ মাইল হেঁটে লন্ডনে পৌঁছেই আমি। পরে কী হয়েছে-না-হয়েছে, আর আমি জানি না।

বাক্সটা খুলে তাজ্জব বনে গেলাম। টাকাকড়ির চিহ্ন নেই। শুধু একখানা কাগজ এবং যেসব কাগজ বিক্রি করার মতো সাহস আমার নেই। ব্ল্যাক পিটার খতম, আমার পকেটও খালি। একটা শিলিং নেই যে লন্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। এক সময়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম মোটা মাইনায় হারপুনার প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ শিপিং এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে তারা আমাকে পাঠিয়ে দিলে এখানে। এ ছাড়া আর আমি কিছু জানি না। কিন্তু আবার আমি বলছি, ব্ল্যাক পিটারকে যদি আমি বধ করে থাকি তবে আইনের কর্তাদের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া। কেননা ওর জন্যে তাদের শণের দড়ির খরচটা আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।

খাসা বিবৃতি, নিটোল রিপোর্ট উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাতে ধরাতে বললে হোমস। হপকিনস, তোমার আসামিকে চটপট নিরাপদ জায়গায় সরানোর ব্যবস্থা কর। হাজত হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই এ-ঘরের। তা ছাড়া কার্পেটের বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে রয়েছেন মি. প্যাট্রিক কেয়ার্নস।

হপকিনস বলে, মি. হোমস, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না। আপনার ভেলকি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি আমি। বুঝতেই পারছি না কী কৌশলে এমন কাণ্ড করলেন!

শুরু থেকেই ঠিক সূত্রটি ধরে এগোনোর সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই এত সহজে সমাধান করতে পারলাম এই রহস্যের। নোটবইটার সূত্র যদি আগে শুনতাম, তাহলে তোমার মতো বিপথে চালিত হত আমার চিন্তাধারা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি যেটুকু শুনেছি, সেটুকু থেকেই নির্দেশ পেয়েছি শুধু একদিকেই এগোনোর। বিপুল শক্তি, হারপুন চালানোর নৈপুণ্য, রাম আর জল, সীলমাছের চামড়া দিয়ে তৈরি তামাকের থলি আর তার ভেতর কড়া তামাক-প্রত্যেকটা পয়েন্টই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এমন একজন লোককে যার পেশা হারপুন চালানো আর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো। তামাকের থলির ভেতরে লেখা PCঅক্ষর দুটো যে পিটার ক্যারির নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গে দৈবাৎ মিলে গেছে, সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ, তার অভ্যাস ছিল না নিয়মিত ধূমপানের এবং তার কেবিনেও কোনো পাইপ পাওয়া যায়নি। তোমার মনে আছে কি একবার তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম কেবিনের মধ্যে হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি ছিল

কি না? তুমি বলেছিলে-হ্যাঁ, ছিল। হুইস্কি ব্র্যান্ডি থাকা সত্ত্বেও তা স্পর্শ না-করে রুম আর জল খাওয়ার মতো রুচি ক-জন ডাঙার অধিবাসীর আছে বলতে পার? সমুদ্রের ওপর যাদের ঘরবাড়ি, এমন নেশা থাকে শুধু তাদেরই। সেইজন্যেই লোকটা যে জাহাজি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম আমি।

কিন্তু তাকে খুঁজে বার করলেন কেমন করে?

মাই ডিয়ার স্যার, এ ক-টি তথ্য পাওয়ার পর তো খুবই সরল হয়ে এসেছিল আসল রহস্যটা। লোকটা যদি জাহাজি হয় তাহলে সে সী ইউনিকর্ন-এর খালাসি না হয়ে যায় না। সী ইউনিকর্ন ছাড়া আর কোনো জাহাজে সে সমুদ্র যাত্রা করেনি, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর ডানডীতে গত তিনদিন ধরে সমানে টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলাম। তিনদিন পর জানতে পারলাম সী ইউনিকর্ন জাহাজে ১৮৮৩ সালে যেসব লোকলশকর ছিল তাদের প্রত্যেকের নামের লিস্ট। এই লিস্টে চোখ বুলোতে গিয়ে হারপুনওয়ালা প্যাট্রিক কেয়ার্নস-এর নাম দেখেই প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল আমার গবেষণা। নিজের মনের সঙ্গেই তর্কবিতর্ক করে দেখলাম, লোকটা নিশ্চয় এখন লন্ডনেই আছে এবং এদেশ ছেড়ে পালাবার সুযোগ পেলে সে ছাড়বে না। তাই কয়েকটা দিন ইস্ট এন্ড-এ কাটিয়ে উত্তর মেরু অভিযানের একটা গল্প ছড়িয়ে দিলাম ও-অঞ্চলে। তারপর ক্যাপ্টেন বেসিলের তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্যে লোভনীয় বেতনে হারপুনওয়ালার বিজ্ঞাপন দিলাম দৈনিকে। দেখতেই তো পাচ্ছ, তার ফলাফল।

ওয়াভারফুল। সোল্লাসে চৈঁচিয়ে ওঠে হপকিনস, ওয়াভারফুল!

হোমস বলে, যত তাড়াতাড়ি পার নেলিগ্যানকে খালাস করার ব্যবস্থা করো তুমি। ছেলেটার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়াও উচিত। টিনের বাক্সও তাকে ফিরিয়ে দেবে অবিলম্বে। অবশ্য যে সিকিউরিটিগুলো ব্ল্যাক পিটারের ভোগে লেগেছে, সেগুলো আর ফিরে পাওয়ার আশা না-করাই ভালো। গাড়ি এসে গেছে, হপকিনস। লোকটাকে এবার নামানোর ব্যবস্থা করো। মামলা চলার সময়ে আমাকে দরকার হলে নরওয়েতে চিঠি লিখো আমি আর ওয়াটসন দুজনেই থাকব সেখানে পুরো ঠিকানা পাঠাব ফিরে।

টীকা

তিমি শিকারির বুক হারপুন : দি অ্যাডভেঞ্চার অব ব্ল্যাক পিটার ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যার কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায় এবং মার্চ ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ক্যাপ্টেন বেসিল : এই নাম ছাড়া শার্লক হোমসের আরও কয়েকটি ছদ্মনাম হল কল মিস্তিরি অ্যাসকট (চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন), অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিস্টার হ্যারিস (স্টক ব্রোকার্স ক্লাব), গুপ্তচর অ্যালামন্ট (হিজ লাস্ট বাও), নরউইজিয় পর্যটক সিগারসন (দ্য এম্পটি হাউস)। এ ছাড়া নামহীন বহু ছদ্মবেশ শার্লক হোমস ধারণ করেছেন অন্য অনেক কাহিনিতে।

গোটা পাঁচেক খুদে আস্তানা : কিছু গবেষক অনুমান করেন, এগুলির মধ্যে একটি হল শার্লকের দাদা মাইক্রফটের বাড়ি।

স্যন পাওলো : যেহেতু এই নামে বাস্তব কোনো দেশ বা শহর না-থাকায় আর্জেন্টিনা এবং কোস্টারিকার সঙ্গে উচ্চারিত এই নামটি ব্রজিলের শহর সাও পাওলো হওয়া সম্ভব বলে মনে করেছেন কোনো কোনো গবেষক। ১৮৮০-তে কফি চাষের উন্নতির পর থেকে এই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন বাড়তে শুরু করে।

ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে : আমেরিকার প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় রেলপথ। মন্ট্রিল থেকে ভ্যাঙ্কুভারের পোর্ট মুডি পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথের মূল লাইন নির্মাণ শেষ হয়েছিল ১৮৮৫ সালে।

নিকারোকার : হাঁটু পর্যন্ত স্কুলের ব্রিচেস জাতীয় পাতলুন। ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর গ্রন্থ আ হিস্ট্রি অব নিউইয়র্ক ফ্রম দ্য বিগিনিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড টু দ্য এন্ড অব দ্য ডাচ ডাইনেস্টি গ্রন্থের কাল্পনিক চরিত্র ডিডরিশ নিকারবোক-এর নাম থেকে এর উদ্ভব। ১৮০৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থের ইলাস্ট্রেশনের জর্জ কশ্যাক-এর আঁকা ছবিতে ডাচদের দেখা গিয়েছিল এই ধরনের পোশাক পরিহিত অবস্থায়। এক সময়ে ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত সকলকেই নিকারবোক নামে অভিহিত করা হত।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

র্যাটক্লিফ হাইওয়ে : লন্ডনে টেমস নদীর সমান্তরালে অবস্থিত, দোকানপাট, অফিস প্রভৃতিতে ভরতি ব্যস্ত রাস্তা র্যাটক্লিফ হাইওয়ের উল্লেখ শার্লক হোমস করেছিলেন আ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে ।

সমানে টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলাম : হোমস টেলিফোন করলে সময় বাঁচত, মনে করেন অনেক গবেষক । হয়তো হোমসের নিজের ফোন ছিল না, কিন্তু দ্য সাইন অব ফোর উপন্যাসে জানা যায়, বেকার স্ট্রিটের বাড়ির উলটোদিকে একটি ব্যবহারযোগ্য টেলিফোন ছিল ।

নরওয়েতে : এত জায়গা ছেড়ে হোমস হঠাৎ নরওয়েতে কেন গেলেন? নেলিগ্যানও নরওয়ে অভিমুখে রওনা হয়েছিল সেই বিষয়ে তদন্ত করতে?

নাচিয়েদের নষ্টামি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ড্যান্সিং মেন]

এই নাও একটা হেঁয়ালি। বলল দিকি এর মাথামুণ্ডু কিছু ধরতে পারছ কি না-একটা কাগজ টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে ঘুরে বসল হোমস তার রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ নিয়ে।

কাগজটার ওপর আঁকা কিন্তুতকিমাকার চিত্রাঙ্করের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

বললাম, আরে, এ তো দেখছি ছেলেমানুষের আঁকিবুকি।

ওহো, তাই বুঝি!

তা ছাড়া আর কী শুনি?

মি. হিলটন কিউবিটও তো তাই জানতে চান। মি. কিউবিট নরফোকে রিডলিং থর্প ম্যানরে থাকেন। ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনছি, ওয়াটসন। ভদ্রলোক বোধ হয় এলেন।

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক। করমর্দনের পালা সাঙ্গ হলে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে তার চোখে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা কিস্তুতকিমাকার ছবি-আঁকা কাগজের টুকরোটা।

উৎসুক কণ্ঠে শুধোন মি. কিউবিট, কীরকম বুঝলেন মি. হোমস? এ-রকম বিদঘুটে ধাঁধা আর দুটি দেখেননি, তাই না মি. হোমস?

হোমস বললে, বিদঘুটে তো বটেই। কিন্তু এই কিস্তুতকিমাকার জিনিস নিয়ে আপনি এত ভাবিত হয়ে পড়েছেন কেন, তাই তো বুঝছি না।

আমি হইনি মি. হোমস, হয়েছে আমার স্ত্রী। নিদারুণ ভয় পেয়েছে বেচারি। মুখে কিন্তু কোনো কথা নাই। তাই ভাবলাম হেঁয়ালিটার তলা পর্যন্ত না-দেখে আমি ছাড়ছি না।

সূর্যের আলোর সামনে কাগজটা তুলে ধরল হোমস। নোটবই থেকে ছেড়া একটা পাতা। মূর্তিগুলো পেনসিলে আঁকা:-

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর সযত্নে কাগজটা ভাজ করে নিজের পকেট বইয়ের মধ্যে রাখল হোমস।

মোটাসোটা গাঁটাগোটা হাত দুটো কচলাতে কচলাতে নার্ভাসভাবে বললেন মি. কিউবিট, দেখুন, আমি আবার জমিয়ে গল্প বলতে পারি না। কাজেই, বুঝতে অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস করে নেবেন। গত বছরে আমার বিয়ের সময় থেকেই শুরু করছি। তার আগে বলে রাখি, আমি ধনবান না হলেও আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করেছেন রিডলিং থর্প-এ। নরফোকে আমাদের বংশের নাম জানে না এমন কেউ নেই; গত বছর জুবিলি উপলক্ষ্যে এসেছিলাম লন্ডনে। গ্রামের যাজক পার্কার রাসেল স্কোয়ারের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল, তাই আমিও ডেরা নিলাম সেখানে। একটি আমেরিকান মেয়ে থাকতেন বোর্ডিং হাউসে। মেয়েটি সুন্দরী এবং যুবতী। নাম, প্যাট্রিক এলসি প্যাট্রিক। ক্রমে ক্রমে আমাদের মেলামেশা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছায়। আমার এক মাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই, গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম তাকে। রেজিস্ট্রি অফিসে বিনা ধুমধামে শেষ হল আমাদের বিয়ে, দু-দিন পর নরফোকে ফিরে এলাম তাকে নিয়ে শুরু হল আমাদের বিবাহিত জীবন। ভাবছেন ডাহা পাগলামি। আমার মতো বংশমর্যাদাসম্পন্ন একজন পুরুষের পক্ষে পাত্রীর অতীত অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনোরকম খবর না-নিয়েই দুম করে বিয়ে সেরে ফেলা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন মি. হোমস আর দু-দিন মেলামেশা করতেন, তাহলেই বুঝতেন কেন আমি কিছু না-জেনে, কিছু না-ভেবে সারাজীবনের সঙ্গী করে নিলাম তাকে।

এ-সম্বন্ধে এলসিও কোনো লুকোছাপা করেনি। আমার সঙ্গে কোনোরকম ছলাকলা করা দূরে থাকুক, সরল মনেই বলেছে সে আমাকে তার কথা। সুতরাং ইচ্ছে করলে বিয়ে না-করলেও পারতাম আমি। বিয়ের ঠিক আগের দিন এলসি আমায় বললে, অতীতে

কতকগুলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। সব কিছুই আমি এখন ভুলে যেতে চাই। অতীত আমার কাছে বড়ো বেদনাদায়ক, তাই সে-সম্বন্ধে আমি কোনোদিনই কোনো কথা বলব না। কিন্তু, হিলটন, আমাকে বিয়ে করলে তুমি জানবে তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাওয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তোমায়। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, সে-সম্বন্ধে কোনোরকম কৌতূহল তুমি প্রকাশ করবে না, আমাকেও কোনো কথা বলতে দেবে না। এ-শর্ত যদি খুব কঠিন বলে মনে হয়, তাহলে ফিরে যাও নরফোকে। দুঃখ কোরো না আমার জন্যে আবার শুরু হোক আমার নিঃসঙ্গ জীবন। সেদিন মেনে নিয়েছিলাম তার শর্ত এবং আজ পর্যন্ত আমার কথা আমি রেখেছি।

যাই হোক, বিয়ের পর একবছর কেটে গেছে। সুখে শান্তিতে ভরে উঠেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু মাসখানেক আগে জুন মাসের শেষাংশে সেই প্রথম চোখে পড়ল অশান্তির সূচনা। আমেরিকা থেকে একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছোল আমার স্ত্রীর নামে। আমেরিকান ডাকটিকিটগুলো চোখে পড়েছিল আমার। চিঠি পেয়েই কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল এলসির মুখ। পড়া শেষ হতেই চিঠিখানা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আগুনের চুল্লিতে। পরেও এ-সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলে না এলসি। আমিও না। কথা যখন দিয়েছি, তখন তার নড়চড় হবে না। কিন্তু লক্ষ করলাম, সেইদিন থেকেই পুরো একটা ঘণ্টাও সহজভাবে কাটাতে পারিনি বেচারি। সবসময় তার চোখে-মুখে দেখেছি আতঙ্কের ছায়া-সে-আতঙ্ক কীসের তা বুঝিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে, যেন দুরূহ দুরূহ বুকে সে প্রতীক্ষা করে চলেছে কী-এক আসন্ন বিভীষিকার। কীসের জন্যে এ সভয় পথ-চাওয়া তা জানি না। আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললে হয়তো ভালোই

করত এলসি। তার সবচেয়ে দরদি বন্ধু হিসেবে নিশ্চয় তার দিবানিদ্রার অশান্তি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম আমি। কিন্তু সে আগে না-বললে শর্ত অনুযায়ী আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। মি. হোমস, এলসির সততায় আমার কোনো সন্দেহ নেই। অতীতে যাই ঘটুক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেজন্যে তাকে দায়ী করা চলে না কোনোমতেই। নরফোকের সামান্য লোক আমি। কিন্তু বংশমর্যাদার দিক দিয়ে আমাকে টেক্সা দেওয়ার মতো মানুষ সারাইংল্যান্ডে আর দুটি নেই। এলসি তা ভালো করেই জানে এবং সব জেনে তবে বিয়ে করে আমায়। এ-বংশে কলঙ্কের কালো দাগ লাগে, এমন কিছুই যে সে করবে না-তা আমি জানি।

এবার বলছি আমার কাহিনির সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে গোলমালে অংশটা। হপ্তাখানেক আগে গত হপ্তার মঙ্গলবারে একটা জানলার চৌকাঠে আশ্চর্য কতকগুলো নাচিয়ে-মূর্তি দেখলাম। খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তিগুলো। ভাবলাম আস্তাবলের ছোকরাটার কাজ। কিন্তু সে-ছোকরা দিব্য গেলে বললে যে, এ-রকম বদখেয়াল কোনোদিনই আসেনি তার মাথায়। যে-ই করুক, মূর্তিগুলো যে রাত্রে আঁকা হয়েছিল, তা বুঝলাম। জল দিয়ে দাগগুলো মুছে ফেলে পরে স্ত্রীর কাছে গল্প করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম এই সামান্য ব্যাপারে তার বিরাট পরিবর্তন দেখে। দারুণ সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বার বার মিনতি করতে লাগল এলসি, যেন আবার এ ধরনের মূর্তি চোখে পড়লে তাকে দেখাই আমি। হপ্তাখানেকের মধ্যে নাচিয়েদের আর পাত্রা পাওয়া গেল না। তারপরেই গতকাল সকালে বাগানে সূর্যঘড়ির ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম এই কাগজটাকে। এলসিকে দেখাতেই জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তারপর থেকেই যেন তাকে ভূতে পেয়েছে, চেতনা আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। সবসময়ে আচ্ছন্নের মতো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে

স্বপ্নের মধ্যে চোখের তারায় নিঃসীম নিষ্ঠুর আতঙ্কের কালো প্রতিচ্ছবি। তখনই মরিয়া হয়ে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম আপনার কাছে মি. হোমস। এ-জিনিস নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া মানে তাদের হাসির খোরাক জোগানো। কিন্তু আপনার কাছে আমি নির্ভয়ে আসতে পারি। মি. হোমস, আমার কুলমর্যাদা থাকতে পারে, কিন্তু সে-অনুপাতে টাকা নেই। তবে আমার এলসির জীবনে সত্যিই যদি কোনো বিপদের সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে এসে থাকে এই কিছুতকিমাকার নাচিয়েরা, তাহলে আমার শেষ কপর্দকটিও তাকে বিপদমুক্ত করার জন্যে খরচ করতে প্রস্তুত আমি।

তন্ময় হয়ে শুনছিল হোমস। কাহিনি শেষ হলে পর বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাকুটিল মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

তারপর বললে, মি. কিউবিট, এ-রকম পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় না স্ত্রীর কাছে সরাসরি সব কথা জিজ্ঞেস করা উচিত? তাঁকে জানান না কেন যে তার গোপন রহস্যের ভাগীদার হতে চান আপনিও?

মস্তবড়ো মাথা দুলিয়ে বললেন মি. কিউবিট, মি. হোমস, প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। এলসির যদি সে-ইচ্ছে হয় তবে সে নিজে থেকেই বলবে! না-বললে আমি নিজে থেকে তার গোপন কথা কোনোদিনই জানতে চাইব না। তবে আপনার কাছে আসা আমার অভিরুচি, তাতে তো আর কথার খেলাপ হচ্ছে না।

বেশ তাহলে আমার আন্তরিক সাহায্য পাবেন আপনি। প্রথমেই একটি প্রশ্ন-আপনার বাড়ির আশেপাশে কোনো আগন্তুককে ঘোরাফেরা করতে কেউ দেখেছে কি?

না।

জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব নিরিবিলি। নতুন মুখ দেখলেই কথা উঠত, তাই নয় কি?

বাড়ির একেবারে কাছাকাছি হলে সে-কথা খাটে কিন্তু একটু দূরেই কয়েকটা জলসত্র আছে। বহিরাগতদের থাকার ব্যবস্থাও সেখানে রেখেছে স্থানীয় চাষিরা।

ছবি-অঙ্করগুলোকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, মি. কিউবিট। প্রত্যেকটা নাচুনের একটা-না-একটা মানে আছে। যদি এলোপাতাড়ি খেয়ালমাফিক আঁকিবুকি হয়, তাহলে অবশ্য এ-প্রহেলিকার জট ছাড়ানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। আর যদি নিয়মমাফিক হয়, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকুন। এ-ব্যাপারের শেষ না-দেখে আমরা ছাড়ছি না। কিন্তু আপনার আনা নমুনাটা এতই পুঁচকে যে এ থেকে বিশেষ কিছু আলো আমি পাচ্ছি না। তা ছাড়া, আপনার কাহিনি শুনেও বলিষ্ঠ কোনো ইঙ্গিত পেলাম না-কাজেই তদন্ত আরম্ভ করার মতো মালমশলাই নেই হাতে। এই কারণেই আমার অনুরোধ, আপনি নরফোকে ফিরে যান, মি. কিউবিট। কড়া নজর রাখুন চারিদিকে। নতুন কোনো নাচনেওয়ালার ছবি দেখলেই হুবহু কপি পাঠিয়ে দিন আমাকে। জানলার চৌকাঠে খড়ি দিয়ে আঁকা যে-মূর্তিগুলো দেখেছিলেন তার কপি না-পাওয়ার জন্যে যে কী আফশোস হচ্ছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। তন্নতন্ন করে খুঁজে

দেখবেন বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো আগন্তুকদের আগমন ঘটেছে কি না। টাটকা কোনো প্রমাণ-টমান পেলে বিনা দ্বিধায় চলে আসুন আমার কাছে। এ ছাড়া আপাতত আপনাকে আমার আর কিছু বলার নেই। পরিস্থিতি যদি গুরুতর হয়ে ওঠে, তাহলে আমাকে আপনার নরফোকের বাড়িতেই দেখতে পাবেন।

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে কটা দিন সবসময়ে গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতে দেখলাম শার্লক হোমসকে। মাঝে মাঝে পকেট বই থেকে ছবি আঁকা কাগজের টুকরোটা বার করে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে দেখলাম আশ্চর্য নাচুনেদের। কিন্তু চিন্তা ছাড়া এ-প্রসঙ্গে একটা কথাও শুনলাম না তার মুখে।

দিন পনেরো কি তারও পরে মি. কিউবিট ফের এলেন।

আর্ম-চেয়ারে অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন মি. কিউবিট, মি, হোমস, আমার নার্ভ আর সহ্য করতে পারছে না। আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পরের দিন সকালে প্রথমেই যে-জিনিসটা দেখলাম, তা আর একদল নতুন নাচিয়েদের ছবি। টুল-হাউসের কালো কাঠের দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা ছিল মূর্তিগুলো। টুল-হাউসটা লনের পাশেই, সামনের জানলা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় হাউসটা। যাই হোক, অবিকল একটা কপি তুলে এনেছি। এই নিন ছবি। বলে একটা কাগজের ভাজ খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন মি. কিউবিট। ছবি-অঙ্করগুলোর হুবহু প্রতিলিপি দিলাম পরের পাতায়:

এক্সেলেন্ট! খুশি ঝরে পড়ে হোমসের কণ্ঠে । এক্সেলেন্ট! তারপর?

কপি করে নেওয়ার পর মূর্তিগুলো মুছে ফেললাম আমি । কিন্তু ঠিক দু-দিন পরেই সকালে উঠে দেখলাম আর একদল নাচিয়েদের । এই দেখুন তার কপি ।

হাত ঘষতে ঘষতে খুশির চোটে নিঃশব্দে হাসতে থাকে হোমস ।

বলে, মালমশলাগুলো বেশ চটপট পাওয়া যাচ্ছে দেখছি ।

তিন দিন পরে সূর্যঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেওয়া আর এক সারি কাগজে আঁকা মূর্তিদের পাওয়া গেল । এই সেই কাগজ । দেখতেই পাচ্ছেন নাচের ঢংগুলো ঠিক আগের মতো । এরপর ঠিক করলাম ওত পেতে বসে থাকতে হবে । রিভলভার নিয়ে বসলাম স্টাডিতে—এখান থেকে লন আর বাগানটা পুরোপুরি দেখা যায় । রাত প্রায় দুটোর সময়ে জানলার সামনে চুপচাপ বসে আছি, বাইরে চাদের ফুটফুটে আলো ছাড়া সব অন্ধকার, এমন সময়ে ঠিক পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ড্রেসিং গাউন পরে আমার স্ত্রী । শোয়ার ঘরে ফিরে আসার জন্যে কাকুতিমিনতি করতে লাগল এলসি । আমি খোলাখুলি বললাম, যে-হতভাগা এ-জাতীয় বাঁদরামো করছে আমাদের সঙ্গে, তার শ্রীমুখটি আমার একবার দেখবার দরকার । এলসি বললে, নিছক রসিকতা ছাড়া যখন কিছুই নয়, তখন আমার এ সামান্য বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামানো উচিত নয় ।

হিলটন, সত্যিই যদি ছবিগুলোর জন্যে উত্ত্যক্ত মনে কর, তাহলে চল তুমি আর আমি বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

কী, কোথাকার এক ফাজিলের জন্যে নিজের বাড়িঘরদোর ছেড়ে পালাব? লোকে দেখলে টিটকিরি দেবে যে! বললাম আমি।

যাকগে ওসব কথা। আপাতত তো ঘুমোও, কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কী করা যায়। বলল এলসি।

কথা বলতে বলতে আচম্বিতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম। নিমেষে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল এলসির মুখ। মনে হল চাঁদের আলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখের কাছে। শক্ত মুঠিতে আমার কাঁধ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে ছিল বাইরে। টুল-হাউসের ছায়ায় কী যেন একটা নড়তে দেখলাম। গুড়িমারা কালো একটা মূর্তি। হামাগুড়ি দিয়ে মূর্তিটা কোণ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু পেতে বসল দরজার সামনে। পিস্তল বার করে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি, কিন্তু বাধা পেলাম স্ত্রীর কাছে। প্রাণপণ শক্তিতে আমাকে জাপটে ধরে আটকে রাখল এলসি। ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মরিয়া হয়ে আমাকে জাপটে ধরে রইল সে। অনেক কষ্টে ছাড়ান পাওয়ার পর দরজা খুলে টুল-হাউসে পৌঁছে আর দেখতে পেলাম না কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীটাকে। উধাও হওয়ার আগে সে তার চিহ্ন রেখে গেছিল দরজার ওপর। আগের দু-বারের মতোই দেখলাম বিভিন্ন ঢঙে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে একদল মূর্তি। তখুনি কাগজটার ছবছ কপি করে নিলাম ছবিটার। চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করেও রাসকেলটার আর টিকি দেখতে পেলাম না। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, লোকটা পালায়নি মোটেই-কোথাও-না-কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল। কেননা, পরের দিন সকালে কালো কাঠের দরজার ওপর দেখলাম আরও কয়েকটা নতুন মূর্তি আঁকা হয়েছে গত রাতে দেখা মূর্তিগুলোর নীচে।

নতুন মূর্তিগুলোও কপি করেছেন? হ্যাঁ। যদিও মাত্র কয়েকটি মূর্তি, তবুও কপি করতে ভুলিনি। এই দেখুন। আবার একটা কাগজ বার করলেন মি. কিউবিট। নতুন নাচের ধরনটা এইরকম :

হোমসের চোখ দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। কাগজটা নামিয়ে রেখে শুধোল, এ-মূর্তিগুলো প্রথম সারির মূর্তিগুলোর অংশ হিসাবে আঁকা হয়েছিল, না একেবারে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছিল, তা লক্ষ করেছিলেন কি?

দরজার অন্য পাশায় ছিল ছবিগুলি।

এক্সেলেন্ট! এতক্ষণে দারুণ একটা পয়েন্ট পাওয়া গেছে। শুনে আমার আশা জাগছে, মি. কিউবিট। তারপর? থামবেন না, আপনার রীতিমতো ইন্টারেস্টিং রিপোর্টের বাকিটুকুও বলে ফেলুন।

আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই, মি. হোমস। সে-রাতে আমি স্ত্রীর ওপর বাস্তবিকই রেগে গেছিলাম আমাকে এ-রকম বেমক্লাভাবে আটকে রেখে রাসকেলটাকে পগার পার

হতে দেওয়ার জন্যে! আমাকে ওভাবে জাপটে না-ধরলে আমি স্কাউন্ট্রেলটাকে জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দিতাম। এলসি শুধু কাঁদো কাঁদো ভাবে বললে, পাছে আমি বিপদে পড়ি, তাই আমাকে সে আটকেছে। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো। আমি নয়, এলসির ভয়, লোকটা পাছে বিপদে পড়ে। কেননা, এলসি যে নিশাচর মূর্তিটাকে চেনে আর বিদঘুটে নিশানগুলোর মানে জানে সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর স্বরে এমন এক সুর আছে, ওর চোখে এমন এক দৃষ্টি আছে যে, এ-রকম সন্দেহ মনে এলেও তা টেকে না! আমার বিশ্বাস, এলসি সত্য কথাই বলেছে। আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে ওভাবে আটকে রেখেছিল বেচারি। আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে, মি. হোমস। এখন প্রয়োজন আপনার পরামর্শের। আমার ইচ্ছে, খামারের জনা ছয়েক ছোকরাকে পাহারা বসাই। রাসকেলটাকে ধরে বেশ করে, উত্তম-মধ্যম দিলেই স্বপ্নেও আর এমুখো হবে না হতভাগা।

অত সোজা দাওয়াইয়ে এ-কেসের কোনো সুরাহা হবে না, মি. কিউবিট। বলল হোমস। কাগজগুলো রেখে যান। খুব শিগগিরই আসছি আপনার ওখানে। তখনই আপনার কৌতূহল খানিকটা মেটাতে পারব বলে মনে হয় আমার।

মি. হিলটনের চওড়া পিঠ দরজার আড়ালে যাওয়ামাত্র হোমস ছিলেছেড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে টেবিলের সামনে বসে মেলে ধরল কাগজগুলো। তারপর শুরু হল অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম গণনার পালা।

পুরো দু-ঘণ্টা ধরে রাশি রাশি অঙ্ক আর অঙ্কর নিয়ে তন্ময় হয়ে কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে চলল হোমস। তারপর খস খস করে লেখা হল সুদীর্ঘ একটা টেলিগ্রাম। আমার দিকে ফিরে বলল, ওয়াটসন, টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমার আশানুরূপ হয়, তাহলে একটা তোফা কেসের বিবরণ লেখার জন্য তৈরি থেকো।

কিন্তু দুটো দিন কেটে গেল অধীর প্রতীক্ষায় টেলিগ্রামের উত্তর এসে পৌঁছোল না। এই দু-দিন দরজায় সামান্য শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে বসে থাকত হোমস। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায়। একটা চিঠি এসে পৌঁছোল হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে। খবর সব ভালো। সেদিনই সকালে সূর্যঘড়ির নীচে মস্ত লম্বা একটা নাচিয়েদের সারি পাওয়া গেছে। কপিটা চিঠির সঙ্গেই এসেছিল :

বেশ কয়েক মিনিট আবোল-তাবোল বিদকুটে মূর্তিগুলোর ওপর ঝুঁকে রইল হোমস, তারপরেই আচম্বিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই এক চিৎকার। শুনেই বুঝলুম, যেমন অবাক হয়েছে, তেমনই হতাশ হয়েছে সে। দারুণ উদবেগে চোখ-মুখের ভাবও পালটে গেল নিমেষের মধ্যে।

ওয়াটসন, খামোখা দেরি করে অনেক দূর গড়িয়ে এনেছি ব্যাপারটাকে। আজ রাতেই নর্থ ওয়ালস্যাংয়ের দিকে কোনো ট্রেন আছে?

টাইমটেবিল উলটে দেখলাম লাস্ট ট্রেন ছেড়ে গেল এইমাত্র।

হোমস বললে, তাহলে কাল ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ছুটতে হবে স্টেশনের দিকে। যেভাবেই হোক প্রথম ট্রেন ধরে যত তাড়াতাড়ি পারি নরফোকে পৌঁছাতে হবে আমাদের, ওয়াটসন। এই তো এসে গেছে টেলিগ্রামটা। এক সেকেন্ড, মিসেস হাডসন-উত্তর থাকলে নিয়ে যাবেন। না, ঠিকই আছে দেখছি, যা ভেবেছিলাম তাই। খবরটা পাওয়ার পর উদবেগ আরও বাড়ল। আমাদের উচিত, এখন আর একটু দেরি না-করে মি. হিলটন কিউবিটকে সব জানানো। ব্যাপারটা উনি যতটা সহজ ভেবেছেন ততটা সহজ নয়। অত্যন্ত সাংঘাতিক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

নর্থ ওয়ালসামে সবে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ করছি আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে, এমন সময়ে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে শুধোলেন স্টেশন মাস্টার আপনারা নিশ্চয় ডিটেকটিভ? লন্ডন থেকে আসছেন, তাই না?

বিরক্তির ছায়া ভেসে যায় হোমসের মুখের ওপর দিয়ে।

এ-রকম ধারণা কী করে হল আপনার?

কেননা, নরউইচ থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছোলেন ইনস্পেকটর মার্টিন। আপনারা সার্জনও হতে পারেন। মেয়েটি মরেনি-মানে, একটু আগে পর্যন্ত শুনলাম সে বেঁচে আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো প্রাণটা রক্ষা পাবে। কিন্তু তাতে লাভই-বা কী-শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে তো ঝুলতে হবেই।

উদ্বেগে কালো হয়ে উঠল হোমসের মুখ।

আমরা রিডলিং থর্প ম্যানরে যাব বলেই এসেছি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি?

ব্যাপার শুধু সিরিয়াস নয়, অতি ভয়ানক। একই রিভলভার দিয়ে পর পর গুলি করা হয়েছে দুজনকে। গুলি চালিয়েছেন মিসেস কিউবিট নিজে। প্রথমে স্বামীর ওপর, পরে নিজের ওপর। মি. কিউবিট মারা গেছেন। মিসেসের অবস্থা খুবই খারাপ! কী সর্বনাশ। নরফোকের এত বড়ো একটা নামকরা বনেদি বংশের এ কী হাল হল!

আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ না-করে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বসল হোমস। দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবারও মুখ খুলতে দেখলাম না তাকে। অনেকক্ষণ পর জেগে উঠল নরফোক উপকূলের সবুজ কিনারার ওপর জার্মান সমুদ্রের বেগুনি বলয়-রেখা। একধারে গাছপালার মাথার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল পুরোনো আমলের ইটকাঠে তৈরি দুটো বড়ো বড়ো খিলেন। চাবুক তুলে খিলেন দুটি দেখিয়ে হেঁকে উঠল গাড়োয়ান, রিডলিং থর্প ম্যানর—।

গাড়িবারান্দার দিকে যেতে টেনিস-লনের পাশে লক্ষ করলাম অদ্ভুত এই কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত কালো রঙের টুল-হাউস আর বেদিওলা সূর্যঘড়িটা! দু-চাকার একটা উঁচু ঘোড়ার গাড়ি থেকে সবেমাত্র চালাকচতুর চেহারার চটপটে খর্বকায় একটি পুরুষ নেমে

দাঁড়িয়েছিলেন। মোম দিয়ে পাকানো গোপ নেড়ে নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক—
নরফোক কপ্‌ট্যাবুলারির ইনস্পেকটর মার্টিন। বন্ধুবরের নাম শুনে কিন্তু রীতিমতো
আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইনস্পেকটর?

অবাক কাণ্ড দেখছি! খুনটা হয়েছে রাত প্রায় তিনটের সময়ে। কিন্তু লন্ডনে বসে এত
তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে আমার সঙ্গেসঙ্গেই এসে পৌঁছোলেন কেমন করে, তা বুঝলাম না
তো মি. হোমস?

আমি আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম খুন-জখম যা হয় একটা কিছু হবে। এবং তা
রোধ করতেই আমার নরফোকে আসা।

তাহলে আমার চাইতে অনেক খবরই রাখেন আপনি। আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না
কী করে শুরু করা যায় তদন্ত-মি. এবং মিসেস কিউবিটের দাম্পত্য-প্রেমের কথা কে-না
জানে বলুন?

হোমস বললে, প্রমাণ শুধু একটাই পেয়েছি আমি এবং তা হচ্ছে নাচিয়েদের মূর্তি। সব
কথা আমি পরে খুলে বলবখন।

ইনস্পেকটর মার্টিন বুদ্ধিমান পুরুষ। হোমসকে তার খুশিমতো কাজ করতে দিয়ে নিজে
শুধু ফলাফলগুলো সযত্নে নোট করে নিতে লাগলেন। মিসেস হিলটন কিউবিটের ঘর
থেকে একজন সাদা চুল প্রবীণ ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন, ভদ্রমহিলার আঘাত

সিরিয়াস তো বটেই, কিন্তু মারাত্মক নয়। শুনলাম, ভদ্রলোক এ-অঞ্চলের সার্জন। আরও বললেন, বুলেটটা গেছে মগজের সামনের দিক দিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। মিসেস কিউবিট নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন, না, অন্য কেউ তাকে গুলি করেছে এ-প্রশ্নের উত্তরে কোনো মতামত প্রকাশ করতে রাজি হলেন না ভদ্রলোক। বুলেটটি অবশ্য ছোড়া হয়েছে খুবই কাছ থেকে। ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে শুধু একটা পিস্তল-দুটো ব্যারেল তার খালি। মি. হিলটন কিউবিটের হৃৎপিণ্ড এফেঁড়-ওফোড় হয়ে গেছে গুলিতে। এমনও হতে পারে যে, আগে মি. কিউবিট মিসেসকে গুলি করার পর আত্মহত্যা করেছেন। অথবা, মিসেস কিউবিট স্বামীকে খুন করার পর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন। রিভলভারটা দুজনের মাঝখানেই মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে তাই সন্দেহ দুজনের ওপরেই পড়েছে।

আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পুরুষ ডক্টর। আপনাকে খবর পাঠিয়েছিল কে? শুধোল হোমস।

সন্ডার্স-এ-বাড়ির ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করে সে।

সে-ই কি সবাইকে ডেকে তোলে?

সে আর রাঁধুনি-মিসেস কিং।

কোথায় তারা?

খুব সম্ভব রান্নাঘরে ।

তাহলে এখনি তাদের ডেকে আনা যাক । আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা ওদের মুখেই শুনতে চাই আমি ।

জেরার উত্তরে দুজন স্ত্রীলোকই একই কথা বলে গেল গড়গড় করে । ফায়ারিংয়ের দারুণ শব্দে একই সাথে ঘুম ভেঙে যায় দুজনের এবং এক মিনিট যেতে-না-যেতেই শোনা যায় আর একবার গুলি ছোড়ার আওয়াজ । পাশাপাশি ঘরে ঘুমোয় দুজন । তাই ঘুম ভাঙতেই আগে মিসেস কিং ছুটে যায় সন্ডার্সের ঘরে । তারপর দুজন মিলে দুড় দুড় করে নীচে নেমে এসে দেখে দু-হাট করে খোলা স্টাডির দরজা; আর টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি । ঘরের মাঝখানে মুখ খুবড়ে পড়ে ছিলেন মি. কিউবিট ।

খুব সম্ভব দেহে তখন প্রাণ ছিল না । জানলার সামনের দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে গুড়ি দিচ্ছিলেন মিসেস কিউবিট । বীভৎসভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি; কেননা মুখের একটা পাশ রক্তে একেবারে ভেসে গেছিল । জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন উনি, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা তার ছিল না । জানলার ছিটকিনি তোলা ছিল ভেতর থেকে । এ-বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল না । দেরি না-করে তখনি দুজনে ডাক্তার আর কনস্টেবল ডাকতে লোক পাঠায় । তারপর, সহিস আর আস্তাবলের ছোকরাটাকে ডেকে এনে ধরাধরি করে মিসেস কিউবিটকে তুলে নিয়ে যায় তার শোবার ঘরে । কা-গিনি দুজনেই শুয়ে ছিলেন শয়্যায়ে । সাধারণ পোশাক পরেছিলেন মিসেস, কিন্তু মিস্টার কিউবিট রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিয়েছিলেন । স্টাডির আর কোনো

কিছুতেই হাত দেওয়া হয়নি। যতদূর তারা জানে, স্বামী-স্ত্রীতে কোনোদিন ঝগড়া করতে দেখা যায়নি। দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং বাস্তবিকই বড়ো সুখী দম্পতি ছিলেন।

চাকরবাকরদের জেরা করার ফলে প্রধান পয়েন্ট পাওয়া গেল এই ক-টাই। ইনস্পেকটর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল প্রত্যেকটা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় কারো পক্ষেই বাড়ি থেকে সরে পড়া সম্ভব নয়। হোমসের প্রশ্নের জবাবে বললে, ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনে ওপরের তলার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবামাত্র বারুদের বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে দুইজনের নাকেই। শুনে হোমস ইনস্পেকটর মার্টিনকে বললে, এ-পয়েন্টটা একটু ভালো করে ভেবে দেখবেন ইনস্পেকটর। আচ্ছা, এবার তো মনে হয় অনায়াসেই আমরা ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

স্টাডি-রুমটা বিশেষ বড়ো নয়। তিনদিকে সাজানো বই, আর বাগানের দিকে মুখ করা সাদাসিদে জানলার সামনে লেখবার টেবিল। ঘরের মাঝেই লম্বা হয়ে পড়ে ছিল হতভাগ্য মি. কিউবিটের বিশাল দেহ। প্রথমেই আমরা ঝুঁকে পড়লাম তার ওপর। বিশ্বস্ত জামাকাপড় দেখে মনে হল ঘুম ভাঙতেই খুব চটপট বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। গুলিটা ছোড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে এবং হুৎপিণ্ড এফেঁড়-ওফোঁড় করেও তখনও দেহের মধ্যে থেকে গেছে বুলেটটা। মৃত্যু খুবই আকস্মিক এবং যন্ত্রণাবিহীন। হাতে অথবা ড্রেসিং গাউনে বারুদের কোনো দাগ দেখা গেল না। ডাক্তার বললেন, মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের চিহ্ন পাওয়া গেছে কিন্তু দুটো হাতই একদম পরিষ্কার।

হোমস বললে, হাতে বারুদের দাগ নেই অর্থাৎ কোনো ঘোরপ্যাঁচ মানেও নেই। থাকলেই কিন্তু যত গোলমালে সম্ভাবনার কথা এসে পড়ে। খারাপভাবে লাগানো কার্তুজ থেকে পেছন দিকে বারুদ না-ছিটকোলে হাতে কোনো দাগ না-ফেলে এস্তার ফায়ার করা চলে। তাহলে, ইনস্পেকটর, এবার মি. কিউবিটের লাশ সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভালো কথা, ডক্টর, মিসেস কিউবিটের দেহ থেকে বুলেটটা বার করেছেন নাকি?

বুলেট বার করতে গেলে এখন বড়ো রকমের অপারেশনের দরকার। কিন্তু রিভলভারে তো এখনও চারটে কার্তুজ রয়েছে দেখছি। ছোড়া হয়েছে মাত্র দুটো এবং হতাহতের সংখ্যাও দুজন। সুতরাং—

সেইরকমই মনে হয় বটে। জানলার ধারে যে-বুলেটটা লেগেছিল, আমার তো মনে হয় তার হিসেবটাও আপনি দিয়ে দিতে পারবেন।

বলেই, আচম্বিতে সবাইকে চমকে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হোমস। দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল তুলে দেখাল জানলার পাশে নীচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে একটা পরিষ্কার ফুটো।

বাই জর্জ! এ-জিনিস আপনার চোখে পড়ল কী করে? সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন ইনস্পেকটর মার্টিন!

কেননা, আমি এ-ঘরে ঢুকে খুঁজছিলাম ফুটোটাকে।

ওয়াভারফুল । এবার ডাক্তারের উচ্ছ্বসিত হওয়ার পালা । আপনার অনুমান নির্ভুল, স্যার । দুবার নয়, ফায়ার করা হয়েছে মোট তিনবার এবং দুজন নয়, সবসুদ্ধ তিনজন হাজির ছিল খুনের দৃশ্যে । কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি? আর কী করেই-বা উধাও হল দরজা-জানলা বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে?

সেই সমস্যাই এবার আমাদের সমাধান করতে হবে, বললে শার্লক হোমস! ইনস্পেকটর মার্টিন, আপনাকে একটা পয়েন্ট বিশেষ করে স্মরণে রাখতে বলেছিলাম, আশা করি তা ভুলে যাননি । মনে পড়ছে না? চাকরবাকদের জবানবন্দিতে শুনলেন না, ওপরতলার ঘর থেকে বেরোনোমাত্র বারুদের গন্ধ ভেসে এসেছিল তাদের নাকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু, স্যার, বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি-এ-পয়েন্ট মনে রেখে আমার লাভটা কী, তা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না ।

আশা করি এবার পারবেন । ওপরতলায় বারুদের গন্ধ পাওয়ার অর্থ শুধু একটাই-গুলি ছোড়ার সময়ে ঘরের দরজা জানলা দুটোই ভোলা ছিল । তা না-হলে পোড়া বারুদের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে পারত না । দমকা হাওয়ার ঝাঁপটা থাকায় ধোঁয়া একেবারে ওপরতলা পর্যন্ত উঠে গেছে । অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যই ভোলা ছিল দরজা জানলা দুটো ।

এ-ধারণার প্রমাণ?

তা না-হলে মোমবাতিটা নিভে যেত ।

ক্যাপিটাল? রীতিমতো চাঁচিয়ে ওঠেন ইনস্পেকটর । ক্যাপিটাল!

খুনের সময়ে জানলা খোলা ছিল । এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ভাবলাম তাহলে নিশ্চয় কোনো তৃতীয় ব্যক্তি হাজির ছিল সে সময়ে । খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছে সে-ই । কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে তার ওপর গুলি চালালে জানলার পাশ্চাত্য তা লাগলেও লাগতে পারে । তাই খুঁজছিলাম যদি কোনো ফুটো-টুটো পাই এবং দেখতেই তো পাচ্ছেন-আমার খোজা বৃথা যায়নি-এই সেই বুলেটের দাগ!

কিন্তু জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধই-বা হল কি কেমন করে, ছিটকিনিই-বা পড়ল কেমন করে?

গুলি ছোড়াছুড়ির সঙ্গেসঙ্গে ছুটে এসে জানলা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়াই তো মিসেস কিউবিটের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই নয় কি? আরে, এ কী দেখছি?

জিনিসটা একটা লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ । কুমিরের চামড়ার ওপর রূপোর কারুকার্য করা রুচি-সুন্দর ছোট ব্যাগটা পড়ে ছিল স্টাডির টেবিলের ওপর । হোমস ব্যাগটা উপুড় করে ধরলে টেবিলের ওপর; রবার ব্যান্ড লাগানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ব্যাল অফ ইংলন্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না ভেতর থেকে ।

নোট সমেত ব্যাগটা ইনস্পেকটরের হাতে তুলে দিয়ে হোমস বললে, জিনিসটা সাবধানে রেখে দিন-মোকদ্দমা চলার সময়ে কাজে আসবে। এবার তিন নম্বর বুলেটের রহস্য নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। কাঠের টুকরোটা যেভাবে উড়ে গেছে আর চোচগুলো যদিকে মুখ করে রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুলিটা ছোড়া হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। এ-সম্পর্কে মিসেস কিংয়ের সঙ্গে আর এক প্রস্থ আলোচনা দরকার।... এই যে মিসেস কিং, তখন বলছিলে ফায়ারিংয়ের দারুণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছিল তোমার? এ-কথা বলার মানে কী? তোমার কি মনে হয়, দ্বিতীয় শব্দের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছিল প্রথমটা?

শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছিল ঠিকই, কিন্তু কোন আওয়াজটা বেশি আর কোনটা কম, তা বলা কঠিন। তবে স্যার, আওয়াজটা খুব জোরে বলেই মনে হয়েছিল।

দুটো রিভলভার থেকে একসঙ্গে গুলি ছোড়া হয়েছিল মনে হয়?

আজ্ঞে, তা তো বলা মুশকিল।

হ্যাঁ, তাই হয়েছিল। এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইনস্পেকটর মার্টিন, আমার তো মনে হচ্ছে-এ-ঘরে আর কিছু করার নেই আমাদের। এবার চলুন, বাগানটা ঘুরে দেখা যাক যদি নতুন কিছু প্রমাণ-টমান পাওয়া যায়।

স্টাডির জানলার ঠিক নীচেই ফুলের চওড়া ঝোপটার কাছাকাছি এসেই আমরা প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠলাম মহা উল্লাসে। ঝরাফুলগুলোকে কে যেন নির্দয়ভাবে মাড়িয়েছে, নরম মাটির ওপর তারই অগুনতি পায়ের ছাপ। ছাপগুলো পুরুষের পায়ের। অদ্ভুত রকমের লম্বা, আঙুলগুলো ছুঁচলো। ঘাসপাতা নেড়ে উলটে ফুঁ দিয়ে এমন কাণ্ড জুড়ে দিলে হোমস যেন মুখ দিয়ে লাল ঝরিয়ে শিকারি কুকুর হয়ে খুঁজছে গুলি-খাওয়া পাখিকে। তারপরেই দারুণ খুশির চিৎকার ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল সে-হাতে তার পেতলের তৈরি ছোট্ট একটা সিলিন্ডার।

যা ভেবেছিলাম, তাই। রিভলভারটায় ইজেক্টর ছিল, তাই খালি খোলটা ছিটকে পড়েছে এখানে। ইনস্পেকটর মার্টিন, এই হল আপনার তিন নম্বর কার্তুজ এবং আমার কেসও প্রায় সম্পূর্ণ।

হোমসের তদন্ত ধারার দ্রুত কর্তৃত্বময় অথচ নির্ভুল কার্যপরম্পরা দেখে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছিলেন বেচারি ইনস্পেকটর মার্টিন। প্রথম প্রথম দু-একটা কথা বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখন এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে বাঙনিম্পত্তি না-করে হোমসের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বোধ হয় বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলে মনে করলেন তিনি।

শুধোলেন, কাকে সন্দেহ হয় আপনার?

সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রথম থেকেই তো কেসটার অনেক পয়েন্ট অপরিষ্কার থেকে গেছে আপনার কাছে, এটাও না হয় থাকুক। পরে একসাথে সব কিছু খোলসা করা যাবে, কি বলেন?

যা অভিরুচি আপনার। আমার শুধু খুনিটাকে পেলেই হল।

মিছিমিছি সাসপেন্স বানাবার কোনো অভিলাষ আমার নেই, ইনস্পেকটর মার্টিন! কিন্তু এই মুহূর্তে লম্বা-চওড়া জটিল বক্তৃতা দিয়ে রহস্য কী করে সমাধান করলাম, তা বলবার সময়ও নেই। এ-ব্যাপারের সবকিছু গুটি আমার হাতে। এখন যদি মিসেস কিউবিটের জ্ঞান নাও ফিরে আসে, তাহলেও জানবেন, গত রাতে এ-বাড়িতে যেসব কাণ্ড ঘটেছে, তার প্রতিটি আপনাদের শোনার মতো ক্ষমতা আমার আছে। আমার লক্ষ্য শুধু একটি এবং তা যেনতেনপ্রকারে অপরাধীর সমুচিত শাস্তি-বিধান। প্রথমেই আমি জানতে চাই, এ-অঞ্চলে এলরিজি নামে কোনো সরাইখানা আছে কি না?

চাকরবাকরেরা সবাই একবাক্যে জানালে যে এ-নামের কোনো সরাইখানা ধারেকাছে কোথাও আছে বলে তাদের জানা নেই। তবে আস্তাবলের ছোকরাটা একটু কিন্তু কিন্তু করে বললে, সরাইখানা নেই বটে, তবে এলরিজি নামে এক চাষা মাইল কয়েক দূরে ইস্ট রাস্টনের দিকে থাকে।

খামারবাড়িটা খুব নিরালা নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দারুণ নিরালা ।

এ-বাড়িতে রাতে যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে, নিশ্চয় এখনও পর্যন্ত সেসব খবর ওদের কানে পৌঁছোয়নি ।

আজ্ঞে, খুব সম্ভব না ।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চিন্তা করল হোমস, তারপর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি ।

বললে, চটপট একটা ঘোড়ার জিন চাপিয়ে তৈরি হয়ে নাও । একটা চিঠি দিচ্ছি-এক্ষুনি দিয়ে এসো এলরিজির খামারবাড়িতে ।

পকেট থেকে নাচিয়েদের ছবি আঁকা কাগজের টুকরোগুলো বার করল হোমস । তারপর স্টাডির টেবিলে বসে, কাগজগুলো সামনে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রইল । ইতিমধ্যে ছোকরাটা তৈরি হয়ে আসতে ছোট্ট একটা চিরকুট তার হাতে দিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে দিলে হোমস, ওপরে যার নাম লেখা, শুধু তারই হাতে চিরকুটটা দিয়ে এবং কোনো প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে যেন সিধে ফিরে আসে সে এখানে । হোমসের হাতের লেখা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মুক্তোর মতো গোটা গোটা । কিন্তু চিরকুটের ওপর দেখলাম আঁকাবাঁকা হোঁচট-খাওয়া কায়দায় লেখা : মি. অ্যাবি স্ল্যানে, এলরিজির খামারবাড়ি, ইস্ট, নরফোক ।

ইনস্পেকটর মার্টিনকে হোমস বললে, আমার অনুমানই যদি সত্য হয়, আমার গণনা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা লোককে আপনাকে হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং, আমার মনে হয় আপনি এখনই একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন আরও পাহারাদারের জন্যে। এই ছোকরাই আগে টেলিগ্রামটা পৌঁছে দিয়ে তারপর চিঠি নিয়ে রওনা হবে এলরিজির খামারবাড়িতে। ওয়াটসন, বিকেলের দিকে লন্ডনের কোনো ট্রেন থাকলে আমরা তাতেই ফিরে যাব। কেননা, এখানকার ঝামেলা তো প্রায় চুকে গেল। তা ছাড়া, আমাকে আবার একটা ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল অ্যানালিসিস আজকেই শেষ করতে হবে।

চিরকুট নিয়ে ছোকরাটা রওনা হয়ে যাওয়ার পর, হোমস চাকরবাকরদের ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিলে, যদি আগন্তুক এসে মিসেস কিউবিট-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খবর না-জানিয়ে যেন সিধে নিয়ে আসা হয় ড্রয়িং রুমে। বার বার এই ক-টা পয়েন্টেই এমনভাবে জোর দিয়ে বোঝাতে লাগল হোমস যে, দেখে শুনে মনে হল অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর উপর। তালিম দেওয়া শেষ হলে পর হোমস এবার পড়ল আমাদের নিয়ে। হাতের তির যতক্ষণ-না লক্ষ্যে গিয়ে বিধছে ততক্ষণ ড্রয়িং রুমে বসে নির্ভেজাল গুলতানি দেওয়া যাক-এই বলে সবাইকে নিয়ে এসে বসল বসবার ঘরে। রোগী দেখার দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে আগেই ডাক্তার বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই আসর জমিয়ে বসলাম আমি, হোমস আর ইনস্পেকটর মার্টিন।

টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পকেট হাতড়ে নাচুনেদের বিদঘুটে মূর্তি আঁকা কাগজগুলো বার করল হোমস। তারপর, টেবিলের ওপর মেলে ধরে বললে, ঘণ্টাখানেক সময় যাতে ভালোভাবেই কাটে, সে-ব্যবস্থা করছি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ-জাতীয় হেঁয়ালি আমার কাছে একেবারে নতুন। এ-পদ্ধতির আবিষ্কর্তা যে-ই হোক না, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূর্তিগুলো যে আসলে ছদ্মবেশী অক্ষর, তা যেন কেউ ধরতে না-পারে এবং বাচ্চাকাচ্চার এলোপাতাড়ি নকশা ভেবে উড়িয়ে দেয়।

মূর্তিগুলো যে আসলে অক্ষরের প্রতীক, তা জানার পর সব সাংকেতিক লিপির মূল নিয়মটি খাটাতেই জলের মতো সরল হয়ে এল হেঁয়ালির অর্থ। প্রথম বার্তাটি আমার হাতে আসার পর দেখলাম খবরটা অত্যন্ত ছোটো। যদিও এত ছোটো খবর থেকে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব নয়। তবুও ওদের মধ্যে একটা প্রতীকের অর্থ যে E, সে-সম্বন্ধে আমার খুব বেশি সন্দেহ ছিল না। জানেন তো, ইংলিশ বর্ণমালার E-র ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এমনকী একটা ছোটো বাক্যের মধ্যেও বেশ কয়েকবার দেখতে হয় E-র শ্রীমুখ। প্রথম খবরটায় পনেরোটা প্রতীকের মধ্যে চারটে প্রতীক হুবহু এক। সুতরাং এ-প্রতীকের অর্থ যে E, তা ধরে নিলে খুব বেশি অযৌক্তিক হয় না। অবশ্য মাঝে মাঝে প্রতীকটার হাতে নিশান দেখা গেছে। কিন্তু নিশানওলা মূর্তিগুলো পাশাপাশি নেই-ছড়িয়ে আছে সমস্ত খবরটার মধ্যে। সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি, নিশানমূর্তি দিয়ে আসলে এক একটা বাক্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে না। মাথায় অনুমানটা আসার পরেই দেখলাম, E অক্ষরের প্রতীক হল এই মূর্তিটা।

এ পর্যন্ত হল বেশ। কিন্তু আসল ঝামেলা শুরু হল এর পরেই। E-র পরেই কোন ইংলিশ অক্ষরটির জোর বেশি এ-সম্বন্ধে কেউই কোনো পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আপনি হয়তো দেখলেন, একটা পাতার মধ্যে E-র পরেই অমুক অক্ষর গড়ে সবচেয়ে শক্তিশালী। তারপরেই আবার দেখলেন, একটা ছোটো বাক্যের মধ্যেই সে-অক্ষরটিকে দাবিয়ে দিয়েছে আরও কয়েকটা অক্ষর ঘন ঘন তাদের শ্রীমুখ দেখিয়ে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে T, A, O, I, N, S, H, R, D আর L-কে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে এইভাবে পর পর সাজানো যায়। এদের মধ্যে আবার T, A, O আর I এত ঘেঁষাঘেঁষি যে কে বেশি পাওয়ারফুল তা বলা বড়ো মুশকিল। তাই নতুন খবরের অপেক্ষায় রইলাম। মি. হিলটন কিউবিটের সাথে আমার দ্বিতীয়বার মোলাকাত হওয়ার পর পেলাম দুটো ছোটো সেনটেন্স আর একটা খবর। খবরটায় কোনো নিশান না-থাকায় একটা গোটা শব্দ বলেই মনে হল। এই দেখুন প্রতীকগুলো। যেটাকে একটা শব্দ বলে মনে হয়েছে, তার মধ্যে E এসেছে দু-বার দ্বিতীয় স্থানে আর চতুর্থ স্থানে শব্দটার মোট অক্ষর সংখ্যা পাঁচ। ফলে SEVER, LEVER অথবা NEVER শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে কোনো কাকুতিমিনতির উত্তরে। এবং এক্ষেত্রে এই অনুমানটাই স্বাভাবিক এই কারণে, এর আগে মি. কিউবিটের মুখে যা সব শুনেছি, তাতে মনে হয়, মিসেস কিউবিটের কোনো চিঠির উত্তরে NEVER শব্দটা লিখে গেছে আততায়ী। ধরে নিলাম এইটাই ঠিক, তাহলে N, V আর R প্রতীক দাঁড়াচ্ছে, যথাক্রমে :

তখনও কিন্তু আমার মুশকিল আসান হয়নি, কাটেনি অন্ধকারের ঘোর। ঠিক এমনি সময় একটা কথা মাথায় আসতেই খানিকটা আলোর মুখ দেখলাম। হাতে তখন বেশ কয়েকটা

চিঠি রয়েছে। ভাবলাম, আততায়ী যদি মিসেস কিউবিটের পূর্বপরিচিত হয় এবং অতীত-জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে, তাহলে যে পাঁচ অক্ষরওলা শব্দের মধ্যে দুটো অক্ষরই E, সেগুলো দিয়ে নিশ্চয় লেখা হয়েছে ELS।E নামটাকে। পরীক্ষা করে দেখলাম, তিন তিনবার খবরের উপসংহারে এমন প্রতীক-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই, খবরগুলো যে ELS।E-র উদ্দেশ্যে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ না-থাকাই ভালো। এমনি করে পেলাম L, S আর।-কে। কিন্তু এ কী ধরনের খবর? এ কি আকুতি, না শুধুই আদেশ? ELS।E-র ঠিক আগেই চার অক্ষরওলা শব্দটার শেষে দেখলাম E। মনে হল, শব্দটা COME হওয়াই উচিত। যতগুলো চার-অক্ষরওলা শব্দের শেষে E আছে, সবকটাতেই চোখ বুলোলাম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। কাজেই, C, O, M হাতের মুঠোয় আসায় আবার পড়লাম প্রথম খবরটাকে নিয়ে। ছোটো ছোটো শব্দে ভাগ করে ফেললাম খবরটাকে, যে যে অক্ষর বুঝিনি, তাদের জায়গায় ফুটকি বসালাম। এইভাবে পেলাম :

. M. ERF. .ESL. NE.

এখন প্রথম অক্ষরটা A না-হয়ে যায় না, এইটুকু বাক্যের মধ্যেই তিন তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে একই প্রতীককে। দ্বিতীয় শব্দে H-কে অনুমান করে নেওয়া চলে। তাহলে বাক্যটা দাঁড়াল এই রকম :

AM HERE A. E SLANE

নামের ফাঁকটায় Y বসাই স্বাভাবিক। তাহলে পাচ্ছি-

AM HERE A. E SLANEY

হাতে অনেকগুলো অক্ষর এসে যাওয়ায় অকুতোভয়ে এবার পড়লাম দু-নম্বর খবরটাকে নিয়ে। প্রতীক-ছদ্মবেশে খসিয়ে দেখা গেল খবরটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম :

A ELR I, ES.

ভেবেচিন্তে দেখলাম, ফাঁকগুলোয় T আর G বসানো যায়, তাহলেই মোটামুটি একটা মানে পাওয়া যায় খবরটার। ELR IGES নামটা নিশ্চয় কোনো বাড়ি বা সরাইখানার নাম লোকটা আস্তানা গেড়েছে এইখানেই।

প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে গুনছিলাম বন্ধুবর হোমসের হেঁয়ালি উদ্ধারের তাক লাগানো গল্প। জলের মতো পরিষ্কার করে এতবড়ো কঠিন সমস্যাকে বুঝিয়ে দিলে হোমস। সামান্য কতকগুলি নাচুনে মূর্তি, কিন্তু তাদের অঙ্গভঙ্গিরও এত অর্থ?

তারপর, স্যার, কী করলেন তাই বলুন। বললেন ইনস্পেকটর।

ABE SLANEY যে আমেরিকান সে-সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল না দুটি কারণে। প্রথমত ABE নামটার চলন আমেরিকাতেই আছে। দ্বিতীয়ত আমেরিকা থেকে আসা একটা চিঠি মিসেস কিউবিটের হাতে পড়তেই যত গোলমালের সূত্রপাত। তা ছাড়া এ-

ব্যাপারে গোপন-রহস্যটাও যে আইনানুগ নয় এবং অপরাধ-সংক্রান্ত, আমার এমন বিশ্বাস হওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল। অতীতের উল্লেখ এবং স্বামীর কাছে সব কথা চেপে যাওয়া শুধু এই দুটো প্রমাণই কি এজন্যে যথেষ্ট নয়? কাজেই টেলিগ্রাম পাঠালাম উইলসন হারগ্রিয়েভকে। উইলসন আমার বন্ধু। নিউইয়র্ক পুলিশ ব্যুরোর একজন হোমরাচোমরা। লন্ডনের অপরাধজীবন সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানকে বহুবার উইলসন কাজে লাগিয়েছে। উইলসনকে জিজ্ঞেস করলাম, অ্যাবি স্ল্যানি নামটা ওর চেনা কি না। উত্তরে উইলসন লিখেছে : শিকাগোর সবচেয়ে বিপজ্জনক খুনে বদমাশ। এ-খবর যেদিন পেলাম, সেদিন সন্ধ্যায় হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে পেলাম তার শেষ বার্তা। অক্ষর-পরিচয় আগেই ঘটেছে, তাই ধাঁধার জট ছাড়াতেই খবরটা দাঁড়াল এইরকম :

ELS I E. RE. ARE. TO MEET THY CO.

P আর D বসাতেই সম্পূর্ণ হল খবরটা। পড়ে আঁতকে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমত, এইটুকু বুঝলাম যে কাকুতিমিনতি ছেড়ে ভয় দেখানো শুরু করেছে আমাদের নিশাচর আততায়ী। দ্বিতীয়ত শিকাগোর নীচুতলায় জাঁহাজদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি একটু আধটু খবর রাখি। তাই, লোকটা যে আর অনর্থক দেরি না-করে চটপট কথামতো কাজ শুরু করে দেবে-তা বুঝলাম। তৎক্ষণাৎ সহকর্মী-বন্ধু ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলাম নরফোকে। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা করতে পারলাম না-প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই গুনলাম যা হবার তা হয়ে গেছে গত রাতেই।

জানলা দিয়ে দেখলাম, লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে আসছেন এক দীর্ঘকায় পুরুষ । গায়ের রং ময়লা হলেও ভদ্রলোক সুদর্শন, পরনে ধোঁয়াটে ফ্লানেলের সুট, মাথায় পানামা হ্যাট । মস্তবড়ো উদ্ধত নাকটা সামনের দিকে একটু বেঁকানো, গালে-চিবুকে চাপদাড়ি, হাতে চকচকে ছড়ি । স্বচ্ছন্দভাবে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে তার হাঁটার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন এ-বাড়ির মালিক সে-ই । তারপরেই শুনলাম জোর ঘণ্টাধ্বনি-যেন এক মুহূর্তও আর দেরি সহিছে না তার ।

শান্তভাবে বলল হোমস, এবার আমাদের দরজার পেছনে দাঁড়াবার সময় হয়েছে । এই ধরনের বিপজ্জনক লোককে বাগে আনতে হলে একটু সাবধান হওয়া ভালো । ইনস্পেকটর হাতকড়া বার করে রাখুন । কথা যা বলার আমিই বলব ।

পুরো একটা মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনজনে । তুচ্ছ একটা মিনিট, কিন্তু তবুও তো কোনোদিনই ভোলা যায় না । তারপরেই খুলে গেল দরজা-ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙা লোকটা । পলকের মধ্যে হোমস পিস্তল ঠেকালে তার মাথায় । আর মার্টিন কবজিতে এঁটে দিলেন হাতকড়া । সমস্ত জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি, এত নিপুণভাবে শেষ হয়ে গেল যে, আশ্চর্য হয়েছিল এ-কথা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল তার অবস্থা । জ্বলন্ত কালো চোখে একে একে আমাদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে সে । তারপরেই এক অটুহাসি । তিক্ত হাসিতে ব্যর্থতার জ্বালা ।

শাবাশ, জেন্টলমেন । এবার দেখছি আপনারাই একহাত নিলেন আমার ওপর । বড়ো কঠিন ঠাঁই মনে হচ্ছে । যাইহোক, মিসেস হিলটন কিউবিটের একটা চিঠি পেয়ে আমি

এসেছি। উনি বাড়ি নেই, এ-কথা যেন আবার বলে বসবেন না। ফাঁদটা যে তারই পাতা, এ-খবরও নিশ্চয় শুনতে হবে না আপনাদের কাছে।

মিসেস হিলটন কিউবিট মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন, বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ভাঙা গলায় বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা-সমস্ত বাড়ি গম গম করে উঠল সে চিকারে!

কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি। তীব্রস্বরে চোঁচিয়ে ওঠে সে। ওর গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগেনি-লেগেছে ওই লোকটার বুক। এলসিকে কেন জখম করতে যাব আমি? ভয় দেখাতে পারি। কিন্তু ওর ওই রেশম-হালকা চুলের একটা গাছিও স্পর্শ করার দুঃসাহস আমার নেই। ফিরিয়ে নিন ফিরিয়ে নিন এসব বাজে কথা। বলুন তার কোনো আঘাত লাগেনি।

মৃত স্বামীর পাশে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় দেখা গেছে মিসেস কিউবিটকে।

গুণ্ডিয়ে উঠে হাতকড়া লাগানো দু-হাতে মুখ ঢেকে সেটির ওপর এলিয়ে পড়ল সে। পুরো পাঁচ মিনিট সব চুপ। এতটুকু স্পন্দন শব্দ শুনতে পেলাম না তার দিক থেকে। তারপর, মুখ থেকে হাত নামিয়ে চোখ তুলল সে। মুখ দেখে মনে হল যেন চকিতে কোনো অমিতবিক্রমশালী প্রভঞ্নের বিপুল ফুৎকারে নিমেষে নিভে গেছে তার যত কিছু সাহস, শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের দীপশিখা, হারিয়ে গেছে নিচ্ছিন্ন নিরাশার তমিস্রায়।

নিরুত্তাপ স্বরে কথা বলল সে, জেন্টলমেন, কিছুই আর লুকোব না। আমি যদি তাকে গুলি করে থাকি, তবে সে-ও পালটা গুলি করেছিল আমাকে। সুতরাং এতে খুন-টুন কিছু নেই। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন এলসিকেও জখম করেছি আমি, তাহলে বলব আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না আপনারা। এ-দুনিয়ায় আমার চাইতে তাকে বেশি ভালোবেসেছে, এমন কোনো পুরুষ কোনোদিনই ছিল না, এখনও নেই। তার ওপর আমার দাবি অসীম। অনেক বছর আগে আমার বাগদত্তা হয়েছিল সে। আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্যে এই ইংলিশম্যানটার আসার কি অধিকার আছে? আবার বলছি, সে আমার। আমি এসেছিলাম আমার সেই দাবিকেই আবার তুলতে।

আপনার স্বরূপ প্রকাশ পেতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন আপনার বাগদত্তা, কঠিন কণ্ঠে বললে হোমস। আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই আমেরিকা থেকে পালিয়ে ইংলন্ডে এসে একজন অনারেবল ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন তিনি। আপনার সঙ্গে উধাও হতে রাজি হননি তিনি-তাই শেষ পর্যন্ত হিলটন কিউবিটের মতো অভিজাত পুরুষকে বিদায় নিতে হয়েছে এ-দুনিয়া থেকে। আর স্ত্রীকে করতে হয়েছে আত্মহত্যা। মি. অ্যাবি স্ল্যানি, আপনার হাত এসব কিছুর পেছনেই আছে এবং এ-রেকর্ডের উত্তর আপনাকে দিতে হবে আইনের কর্তাদের কাছে।

এলসি যদি মারা যায়, আমি জাহান্নামে যেতেও আর পরোয়া করি না, হাতের মুঠোয় দলা পাকানো একটা চিরকুটে চোখ পড়তেই বাঘের মতো ধারালো চোখে সন্দেহের ঝিলিক হেনে বললে অ্যাবি স্ল্যানি-মিস্টার, এ-সম্পর্কেও গালগল্প ছাড়বেন নাকি? এদিকে তো

বলছেন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এলসি, তাই যদি হয় তবে এ-চিরকুট কার লেখা শুনি? কাগজের দলাটাকে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

আপনাকে আনার জন্যে আমিই লিখেছি।

আপনি লিখেছেন? জয়েন্টের বাইরে তামাম আশমান দুনিয়ার আর কারো পক্ষেই নাচিয়ে মূর্তিদের রহস্য জানা সম্ভব নয়। আপনি লিখলেন কী করে?

হোমস বললে, আজকের যা প্রথম আবিষ্কার কালকে তা পুনরাবিষ্কার-পৃথিবীর ইতিহাসে এনজিরের তো অভাব নেই, মি. স্ল্যানি। যাই হোক, আপনার এখন করণীয় শুধু একটি। সারা দুনিয়াকে আপনি জানিয়ে দিন যে কোনোমতেই কোনো দিক দিয়েই কিউবিট পরিবারের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে মিসেস হিলটন কিউবিটকে দায়ী করা চলে না।

খুব ভালো কথা বলেছেন। আমার এখন উচিত বিনা দ্বিধায় নগ্ন সত্যকে স্বীকার করা এবং আপনি নিশ্চিত থাকুন মিস্টার, আমি তা করব।

হুঁশিয়ার কিন্তু, আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার প্রতিটি কথা আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করব আমরা। ঝটিতি চেষ্টিয়ে ওঠেন ইনস্পেকটর মার্টিন। ব্রিটিশ ক্রিমিন্যাল ল-র চমকদার সরলতার যেন একটি মূর্ত প্রতীক।

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে স্ল্যানি, সেটুকু ঝাঁকি না হয় নিলামই! জেন্টলম্যান, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, এলসি যখন শিশু, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। শিকাগোর একটা দলে সবসুদ্ধ সাতজন ছিলাম আমরা। এলসির বাবা ছিল জয়েন্ট-এর মাথা। ধুরন্ধর লোক এই বুড়ো প্যাট্রিক। নাচিয়েদের বিদঘুটে মূর্তি দিয়ে চিঠি লেখার কায়দা আবিষ্কার করে সে-ই! হেঁয়ালির চাবিকাঠিটা জানা না-থাকলে ছেলেমানুষি আঁকিবুকি বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক এবং এতদিন তাই হয়েছেও। যাক, এলসি আমাদের কাজকর্ম কিছু কিছু শিখে নিয়েছিল। কিন্তু এসব সহ্য না-হওয়ায় নিজের সঞ্চিতে কিছু টাকা নিয়ে একদিন সে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল লন্ডনে। এলসি আমার বাগদত্তা : যদি এ-পেশা ছেড়ে সৎপথে রোজগার করতাম, তাহলে নিশ্চয় সে বিয়ে করত আমায়। ইংলিশম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার ঠিকানা পৌঁছোল আমার হাতে। চিঠি লিখলাম কিন্তু উত্তর এল না। বাধ্য হয়ে আসতে হল নিজেকে। চিঠি লিখে কোনো ফল হত না-তাই যাতে তার চোখে পড়ে এমনি জায়গায় সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাতে শুরু করলাম।

প্রায় মাসখানেক হল এসেছি এখানে। এলরিজির খামারবাড়িতে ডেরা নিয়েছিলাম প্রথম থেকেই। নীচের ঘরে থাকতাম, রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে যখন খুশি বেরোতাম-কাকপক্ষীও কোনোদিন টের পায়নি। এলসিকে বার করে আনার সবরকম চেষ্টাই করেছিলাম আমি। খবরগুলো যে তার নজর এড়াচ্ছে না, তা বুঝলাম একদিন যেদিন আমার খবরের নীচেই দেখলাম তার হাতে লেখা একটা লাইন। তখনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার শুরু হল ভয় দেখানোর পালা। এবার একটা চিঠি পেলাম ওর কাছ থেকে। চিঠিতে এলসি কাকুতিমিনতি করে তার আশা ছেড়ে আমায় চলে যেতে বলেছে।

কেননা, স্বামীর মানসসম্মানের হানিকর এমন কোনো কেলেক্সারি ঘটলে লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতী হতে হবে তাকে। আরও লিখলে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে রাত তিনটের সময়ে জানলার কাছে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে সে। কিন্তু শর্ত রইল-তারপর আর অশান্তি না-করে এদেশ ছেড়ে চলে যাব আমি অনেক টাকা নিয়ে। নেমে এল এলসি ঘুস দিয়ে চেষ্টা করলে হটিয়ে দেওয়ার! এইতেই খেপে গেলাম আমি। খপ করে হাত ধরে এক হ্যাচকা টানে জানলা দিয়ে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করতেই হাতে রিভলভার নিয়ে তিরবেগে ঘরে ঢুকল তার স্বামী। এলসি মেঝেতে বসে পড়েছিল-মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে। আমার উদ্দেশ্য ছিল রিভলভার বার করে ভয় দেখিয়ে সরে পড়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে গুলি চালান লোকটা, আমিও পলক ফেলার আগেই ঘোড়া টিপে পেড়ে ফেললাম তাকে মেঝেতে। বাগানের ওপর দিয়ে সরে পড়ার সময় পেছন থেকে জানলা বন্ধ করার শব্দ শুনলাম। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি জেন্টলমেন, যা বললাম, তার প্রতিটি অক্ষর সত্য। ছোকরাটার হাতে চিরকুটটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি। খুশিতে ডগমগ হয়ে এসেছিলাম এলসির সাথে দেখা করতে। কিন্তু বদলে পেলাম আপনাদের, আর একজোড়া হাতকড়া।

জানলায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়টাকে কয়েদিসহ টগবগিয়ে চোখের আড়ালে উধাও হয়ে যেতে দেখলাম। তারপর, ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টেবিলে রাখা তালগোল পাকানো চিরকুটটাকে। সামান্য এই কাগজটা দিয়ে হোমস অতবড়ো দুর্ধর্ষ লোকটাকে ভুলিয়ে এনেছে। নিজের খপ্পরে।

মুচকে হেসে হোমস বললে, দেখ হে ওয়াটসন, যদি পক্ষোদ্ধার করতে পার লেখাটার ।
বিচিত্র চিঠি । অক্ষরের বালাই নেই, শুধু নেচে-কুঁদে এগিয়ে যাওয়া এক সারি মূর্তি :

হোমস বললে, এইমাত্র যে-পদ্ধতি বোঝালাম, তাই দিয়ে চিঠিটার সাদা অর্থ দাঁড়ায় এই
এখুনি চলে এস । আমি জানতাম, এ-আমন্ত্রণ এড়ানোর সাধ্য তার নেই, কেননা এ-
সাংকেতিক লিপি যে মিসেস কিউবিট ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসতে পারে, তা
সে কল্পনাতেও আনতে পারবে না । এতদিন ধরে যে নাচিয়েদের ছবি অশুভ বার্তাই বহন
করে এনেছে, নতুন অপরাধ সৃষ্টি করেছে, নির্মম পরিণতির সূচনা করেছে-এই প্রথম
সেই নাচিয়েদের শুভ কাজে লাগলাম আমি, কল্যাণ এবং মঙ্গলময় পরিণতির মধ্য দিয়ে
মহা কেলেক্কারির সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে আনলাম পতিব্রতা মিসেস হিলটন
কিউবিটের নামকে । আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম, নতুন লেখার চাঞ্চল্যের উপকরণ
দেব । সে-প্রতিশ্রুতিও রইল ।

টীকা

নাচিয়েদের নষ্টামি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডাব্লিং মেন ডিসেম্বর ১৯০৩ সংখ্যার স্ট্যান্ড
ম্যাগাজিনে ইংলন্ডে এবং ৫ ডিসেম্বর ১৯০৩-এর কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকায়
আমেরিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ।

রিডলিং থর্প ম্যানর : স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পে নাম ছিল রিডিং বা রাইডিং (Reading) থর্প ম্যানর । বিশেষজ্ঞরা এটিকে বানান ভুল মনে করেন ।

গত বছর জুবিলি উপলক্ষ্যে : রানি ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৮৩৭-এ । ১৮৮৭ তার রানি হওয়ার স্বর্ণজয়ন্তী বা গোল্ডেন জুবিলি এবং ১৮৯৭-এ হীরক জয়ন্তী বা ডায়মন্ড জুবিলি উৎসব পালিত হয় । জানা যায়, ওই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রানির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে পঞ্চাশ হাজার গোখা, ক্যানাডিয়ান এবং জ্যামাইকান সৈনিক কুচকাওয়াজ করে । তা ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয় ।

সূর্যঘড়ি : প্রথম খণ্ডের টীকা দ্রষ্টব্য ।

জার্মান সমুদ্র : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নর্থ সি বা উত্তর সাগরকে জার্মান সমুদ্রও বলা হত ।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ ব্যুরো : সঠিক নাম নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কিংবা নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিটেকটিভ ব্যুরো ।

হোমরাচোমরা : কাছাকাছি সময়ে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন টমাস বায়ার্নস । ১৮৮২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত তিনি ওই পদে কাজ করেন । কিন্তু তারপর দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি ছাড়তে হয় । অবশ্য তার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো

অভিযোগ কেউ তোলেনি। পুলিশ চাকরি চলে যেতে একটি বিমা কোম্পানির চাকরিতে যোগ দেন বায়ার্নস।

শিকাগো : গুন্ডামি এবং নানা অসামাজিক কাজে শিকাগোর বদনামের জন্য আল কাপোনেকে দায়ী করা হলেও, কাপোনের সংঘবদ্ধ অপরাধ শুরুর দুই দশক আগে থাকতেই এই শিল্প শহর অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করে।

অনেক টাকা : এলসির ব্যাগে পঞ্চাশ পাউন্ডের কুড়িখানা নোট পাওয়া গিয়েছিল। এই হাজার পাউন্ড সে কোথা থেকে পেল, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

জানলা বন্ধ করার শব্দ : এলসি আত্মহত্যা করার আগে জানলা বন্ধ করতে গেল কেন? তার কোনো দরকার ছিল না।

যে-পদ্ধতি বোঝালাম : বিখ্যাত হোমস-গবেষক উইলিয়াম এস, বেরিং গোল্ড দেখিয়েছেন যে সংকেতে লেখা NEVER-এর V এবং PREPARE-এর P-তে একই মূর্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আবার হোমসের সংকেতের C এবং অন্য লেখার M-ও একইভাবে লেখা হয়েছে। অবশ্য এই ভুল ওয়াটসনের কপি করার সময়ে হয়েছে নাকি নিছক ছাপাখানার ভুল সে-সম্পর্কে মন্তব্য করেননি বেরিং-গোল্ড।

প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রবেশ

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাঁসনে]

১৮৯৪ সাল। বিচার করে দেখতে গেলে আমার মনে হয়, ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের উপসংহারের মতো কোনো কেসটিতেই এতগুলি অসাধারণ পয়েন্টের একত্র সমাবেশ ঘটেনি। এই কেসেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে তরুণ উইলোবি স্মিথ। শুধু তাই নয়, এরপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা থেকেই প্রকাশ পায় খুনের কারণ। সে-তথ্য যেমন বিচিত্র তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক।

নভেম্বরের শেষাংশে সেরাতে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। সন্কে থেকেই চুপচাপ বসে ছিলাম আমি আর হোমস। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের প্রান্ত থেকে জল ছিটিয়ে পথ করে নিচ্ছিল একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি।

বাতাসের গোঙানির মধ্যে থেকেই ভেসে এল খটাখট খটাখট অশ্বখুরধ্বনি এবং পাথুরে রাস্তার ওপর গড়ানো চাকার একটানা কর্কশ ঘড় ঘড় শব্দ। যে-গাড়িটা আমি দেখেছিলাম দূরে, সেইটাই এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সরকারি গোয়েন্দা স্ট্যানলি হপকিনস। চকচকে বর্ষাতি জ্বলজ্বল করতে লাগল বাতির আলোয়। ভিজে বর্ষাতিটা খুলে ফেলতে সাহায্য করলাম আমি। হোমস চুল্লি খুঁচিয়ে গনগনে করে তুলল আগুনটাকে।

তারপর বললে, মাই ডিয়ার হপকিনস, এবার জুতো-টুতো খুলে ফেলে পায়ের আঙুলগুলো গরম করে নাও। এই নাও একটা সিগার। এ-রকম রাতে ডাক্তারের একটা প্রেসক্রিপশন আছে-গরম জলের সঙ্গে লেবুর রস। খুবই কাজ দেয় ওষুধটা এ ধরনের আবহাওয়ায়। এই ঝড়-তুফান মাথায় করে যখন এসেছ, তখন কাজটা দরকারি না হয়ে যায় না, কি বল?

বাস্তবিকই তাই মি. হোমস। সারাবিকেলটা দম ফেলবার ফুরসত পাইনি। যেকোনো দৈনিকের শেষ সংস্করণে ইয়ক্সলে কেস সম্পর্কে কিছু দেখেছেন?

পঞ্চদশ শতাব্দীর পরের কিছুই আজ আমি দেখিনি।

খুব ছোটো খবর একটা মাত্র প্যারাগ্রাফ। তাও আগাগোড়াই ভুল-কাজেই চোখ এড়ায়নি আপনার। আমিও উঠেপড়ে লেগেছি এ-ব্যাপার নিয়ে, কাজে ফাঁক রাখিনি কোথাও। ঘটনাটা ঘটেছে কেন্টে, চ্যাথাম থেকে সাত মাইল দূরে আর রেল স্টেশন থেকে তিন মাইল ভেতরে একটা জায়গায়। সওয়া তিনটেতে টেলিগ্রাম পাই আমি। পাঁচটায় পৌঁছেই ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসে। সরেজমিন তদন্ত শেষ করে শেষ ট্রেন ধরে ফিরে আসি শেরিং ক্রসে। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে সিধে আসছি আপনার কাছে।

তার মানে, আমার বিশ্বাস, কেসটা সম্বন্ধে তোমার ধারণা এখনও পরিষ্কার হয়নি?

ব্যাপারটার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি আমি। দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে, এ ধরনের বিদকুটে জটিল কেস নিয়ে কোনোদিনই আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন, প্রথমে কেসটাকে দারুণ সহজ মনে হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম, এত সোজা ব্যাপারে কেউই ভুল করতে পারে না। মি. হোমস, মোটিভের নামগন্ধ নেই এ-কেসে। কিন্তু অনেক ভেবেও তো আমি দিশে পাচ্ছি না যে লোকটার ক্ষতি করবার চেষ্টাই-বা কেউ করবে কেন?

সিগারটা ধরিয়ে নিলে হোমস। তারপর, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললে, ব্যাপারটা শোনাও দিকি।

জলের মতোই পরিষ্কার ঘটনাগুলো, বললে স্ট্যানলি হপকিনস। এখন শুধু জানতে চাই যে এসবের আসল মানেরটা কী। গল্পটা যতদূর খাড়া করতে পেরেছি, তা এই। কয়েক বছর আগে পল্লি অঞ্চলের এই বাড়িটা কেনেন এক ভদ্রলোক। বাড়িটার নাম ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেস। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। বাড়ি কেনার সময়ে তার নাম বলেন, প্রফেসর কোরাম। প্রফেসর কোরাম রুগ্ম এবং চলাফেরার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্ধেক সময় থাকেন শয্যায়। বাকি সময়টা হয় বাড়িময় পা টেনে টেনে লাঠি ঠুক ঠুক করে বেড়ান, আর না হয়, বাথ-চেয়ারে বসে হাওয়া খান বাড়ির সামনের জমিতে। চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাগানের মালী। প্রতিবেশীদের কয়েকজন খুবই পছন্দ করত তাকে এবং কয়েকবার দেখাও করে গিয়েছিল তার সঙ্গে। মস্ত পণ্ডিত হিসেবে ও-অঞ্চলে তার খুব সুনামও আছে। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্যে সংসারে আছে মিসেস মার্কার আর সুসান টার্লটন নামে এক পরিচারিকা। উনি এখানে এসে পোঁছানোর

পর থেকেই এই দুজনে রয়েছে তার সঙ্গে। দুজনের স্বভাবচরিত্র অতি চমৎকার। পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটা গ্রন্থ লিখেছেন প্রফেসর। তাই বছরখানেক আগে তার একজন সেক্রেটারির দরকার হয়। প্রথম দুজনকে নিয়ে সুবিধে করে উঠতে পারেননি প্রফেসর। কিন্তু তৃতীয় জন আসার পর যারপরনাই খুশি হলেন উনি। মি. উইলোবি স্মিথ বয়সে একদম তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সিধে আসে প্রফেসরের চাকরিতে। কাজকর্ম দেখিয়েদু-দিনেই কর্মকর্তার মনোমতো হয়ে উঠল সে। সারাসকাল প্রফেসরের ডিকটেশন নেওয়াই তার কাজ। রেফারেন্স আর উদ্ধৃতির জন্যে কেতাব হাতড়াতেই কেটে যেত সন্কেটা। পরের দিন সকালে দরকার হত এইসব তথ্য। ছেলেবেলায় আপিংহ্যামে থাকার সময়ে বা যৌবনে কেম্ব্রিজে পড়বার সময়ে কোনোদিনই কোনো সময়েই প্রফেসর কোরামের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগেনি উইলোবি স্মিথের এবং তার বিরুদ্ধে তার কোনো বিদ্বেষও নেই। আমি তার সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম, প্রথম থেকেই ভদ্র শান্তশিষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে সুনাম কিনেছে সে। কোনোরকম দুর্বলতা দেখা যায়নি তার চরিত্রে। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আজ সকালে এই ছেলেটিই মারা গেছে প্রফেসরের পড়ার ঘরে—মারা গেছে এমন পরিস্থিতির মধ্যে যে যার ফলে এ-মৃত্যুকে খুন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

গোঁ গোঁ করে গজরে উঠল বাতাস—ককিয়ে কেঁদে উঠল জানলায় জানলায়। আগুনের কাছে সরে বসলাম আমি আর হোমস। আর, একটির পর একটি পয়েন্ট তুলে ধরে ধীরেসুস্থে এই অতি আশ্চর্য কাহিনি বলে চলল তরুণ ইনস্পেকটর হপকিনস।

সারাইংলন্ড তন্নতন্ন করে তল্লাশ করলেও এর চাইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা বাইরের প্রভাব-বিমুক্ত বাড়ি আর পাবেন না আপনি। সারাহাটা কেটে গেলেও অতগুলি লোকের মধ্যে একজনও বাগানের ফটক পেরোয় না। প্রফেসর তো নিজের কাজেই ডুবে থাকেন এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ রাখেন না। প্রতিবেশীদের কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না স্মিথ ছেলেটির। কাজেই, প্রফেসরের মতোই জীবনযাপন করতে হত তাকে। কোনোমতেই বাড়ির বাইরে আনা যেত না স্ত্রীলোক দুজনকে। মালীর নাম মর্টিমার। মর্টিমারই বাথ চেয়ার ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আগে আর্মিতে ছিল, এখন পেনশন ভোগ করছে। মর্টিমারের বয়স হয়েছে। ক্রিমিয়া তার মাতৃভূমি এবং স্বভাব চমৎকার। বাড়ির মধ্যে সে থাকে না; থাকে বাগানের একদম শেষে তিন ঘরওয়ালা একটা কটেজে। ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসের চৌহদ্দির মধ্যে মানুষ বলতে শুধু এই ক-জনকেই আপনি পাবেন। আরও একটা কথা। বাগানের গেট থেকে মাত্র এক-শো গজ দূরেই আছে লন্ডন থেকে চ্যাথাম যাওয়ার প্রধান সড়কটা। ছোটো ছড়কো দিয়ে আটকানো থাকে ফটকটা। কাজেই, যেকোনো বহিরাগতই ভেতরে আসতে পারে বিনা বাধায়।

এবার শুনুন সুসান টার্লটনের সাক্ষ্য। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো খবর যদি দিতে কেউ পারে, তবে সে এই সুসান টার্লটন। ঘটনাটা ঘটে দুপুরের আগে, এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। ওপরের তলায় সামনের শোবার ঘরে-কতকগুলো পর্দা টাঙানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল সুসান। প্রফেসর কোরাম বিছানা ছেড়ে ওঠেননি তখনও। আবহাওয়া খারাপ থাকলে কচিং বারোটার আগে শয্যা ত্যাগ করেন উনি। বাড়ির পেছনদিকে কতকগুলো কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল মিসেস মার্কার। উইলোবি স্মিথ ছিল তার শোবার ঘরে। শোবার ঘরটাই সে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করত। সুসান যে-ঘরে ছিল, পড়ার ঘরটা ঠিক

তার নীচেই। ঠিক সেই মুহূর্তে সুসান শুনতে পেল প্যাসেজ বরাবর গিয়ে নীচের পড়ার ঘরে নেমে গেল স্মিথ। স্মিথকে সে দেখেনি বটে, তবে ও-রকম চটপটে জোরালো পায়ে চলার শব্দ শুনে নাকি কিছুতেই ভুল হতে পারে না তার। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দও সে শোনেনি। তবে মিনিটখানেক পরেই একটা ভয়াবহ। চিৎকার ভেসে আসে নীচের ঘর থেকে। ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার এমনই বিকট, অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক যে চোঁচানিটা পুরুষের কি স্ত্রীলোকের, তা বোঝা মুশকিল। সঙ্গেসঙ্গে শোনা যায় ধপ করে একটা গুরুভার বস্তু পতনের শব্দ-সমস্ত বাড়ি কেঁপে ওঠে তাতে। তারপরেই, সব নিস্তব্ধ। মুহূর্তের জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুসান। পরক্ষণেই, সাহস ফিরে আসে তার। এক দৌড়ে নেমে আসে সে নীচে। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল-সুসানই গিয়ে তা খোলে। ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর পড়ে ছিল তরুণ মি. উইলোবি স্মিথের দেহ। প্রথমে সুসান আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি। কিন্তু দেহটা তুলতে গিয়েই সে দেখতে পায় ঘাড়ের নীচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দরদর করে। সামান্য একটু চোট লাগলেও ক্ষতস্থান খুবই গভীর এবং ওই এক আঘাতেই দু-টুকরো হয়ে গেছিল ক্যারোটিড ধমনী। যে হাতিয়ারে এ-আঘাতের সৃষ্টি, তা পড়ে ছিল তার পাশেই কার্পেটের ওপর। হাতিয়ারটা গালা সিলমোহর করার একটা ছোট ছুরি। পুরোনো কায়দায় সাজানো লেখবার টেবিলে এ ধরনের ছুরি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। ছুরির হাতলটা হাতির দাঁতের এবং ফলাটা বেশ শক্ত। প্রফেসরের নিজের টেবিলেই অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে এ-ছুরিটাও ছিল।

প্রথমে সুসান ভেবেছিল, স্মিথ বুঝি মারা গেছে। কিন্তু কাচের জলপাত্র ক্যারোফে থেকে জল নিয়ে কপালে ছিটিয়ে দিতেই মুহূর্তের জন্য চোখ খুললে ও। বিড়বিড় করে বললে,

প্রফেসর-সেই মেয়েটা। সুসান তত দিব্যি করে বলতে রাজি আছে যে ঠিক এই শব্দ ক-টাই উচ্চারণ করেছিল স্মিথ। প্রাণপণে আরও কিছু বলার চেষ্টা করেছিল ও ডান হাতটা শূন্যেও তুলেছিল। তারপরেই, নিষ্পন্দ হয়ে যায় তার প্রাণহীন দেহ।

ইতিমধ্যে মিসেস মার্কোরও পৌঁছেছিল ঘরে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় ছেলেটির অন্তিম কথা আর শুনতে পায়নি। সুসানকে মৃতদেহের পাশে রেখে ও দৌড়ে যায় প্রফেসরের ঘরে। বিছানায় উঠে বসেছিলেন উনি। নিদারুণ আতঙ্ক আর উত্তেজনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। রক্ত জমানো ওই চিৎকার শুনেই বোধ হয় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে, ভয়াবহ একটা কিছু ঘটেছে। মিসেস মার্কোরের বেশ মনে আছে, তখনও রাত্রিবাস ছিল প্রফেসরের পরনে। বাস্তবিকই, মর্টিমারের সাহায্য ছাড়া তো পোশাক পরিবর্তন করা সম্ভবও নয় তাঁর পক্ষে। মর্টিমারের ওপর আদেশ ছিল দুপুর বারোটার সময়ে আসার। প্রফেসর বলছেন, দূর থেকে ভেসে আসে একটা চিৎকার। উনি শুনেছেন বটে কিন্তু তার বেশি আর কিছুই উনি জানেন না। স্মিথ ছেলেটির শেষ কথা ক-টিরও কোনো অর্থ উনি বলতে পারলেন না। তাঁর মতে প্রফেসর সেই মেয়েটা কথাটা আসলে নিছক প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর বিশ্বাস, দুনিয়ায় কোনো শত্রু নেই উইলোবি স্মিথের এবং হত্যার কোনো কারণ দর্শানোও সম্ভব নয় তার পক্ষে। প্রথমেই উনি মালী মর্টিমারকে পাঠিয়েছিলেন স্থানীয় পুলিশ ডেকে আনতে। একটু পরেই প্রধান কনস্টেবল খবর পাঠায় আমাকে। আমি না-যাওয়া পর্যন্ত কোনো জিনিসের নড়চড় হয়নি এবং কড়া হুকুম জারি করা ছিল যেন কেউ ফটক থেকে বাড়িতে আসার পথটার ওপর চলাফেরা না-করে। মি. শার্লক হোমস, আপনার থিয়োরি কাজে লাগার এই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিছুই অভাব ছিল না অকুস্থানে।

কেবল মি. শার্লক হোমস ছাড়া। তিষ্ঠ হেসে বললে আমার বন্ধুটি। যাক, অকুস্থানে পৌঁছে কাজকর্ম কীরকম করলে তাই এবার শোনা যাক।

মি হোমস, প্রথমেই আপনাকে নকশাটা দেখতে বলি। নকশাটা মোটামুটি হলেও প্রফেসরের পড়ার ঘরের অবস্থান এবং এ-কেসের অন্যান্য পয়েন্টগুলো সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আপনি পাবেন এ থেকে। তাতে আমার তদন্তধারা বুঝতে সুবিধে হবে আপনার।

চার্টটা ভাজ খুলে মেলে ধরল হপকিনস। নকশাটার অবিকল প্রতিলিপি দিলাম নীচে। হোমসের হাঁটুর ওপর কাগজটা বিছিয়ে দিল হপকিনস। আমি উঠে গিয়ে হোমসের পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম ছকটা।

নকশাটা অবশ্য খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। যে-পয়েন্টগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমার কাছে, শুধু সেইগুলোই ধরে রেখেছি নকশাটায়। বাকি যা কিছু, তা নিজের চোখেই পরে দেখবেনখন। আচ্ছা, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। যদি ধরে নিই হত্যাকারী বাইরে থেকে এসেছিল বাড়ির মধ্যে, তাহলে প্রশ্ন উঠছে কীভাবে সে ঢুকল ভেতরে? সে বলতে আমি কিন্তু পুরুষ অথবা নারী উভয়কেই বোঝাচ্ছি। নিঃসন্দেহে সে ঢুকেছে পেছনকার দরজা আর বাগানের পথ দিয়ে। কেননা, এই দিক দিয়েই সোজাসুজি আসা যায় পড়ার ঘরে। অন্য কোনো পথ দিয়ে আসা মানে জটিলতা রীতিমতো বৃদ্ধি পাওয়া-কেননা সেক্ষেত্রে অনেক ঘুরে তবে তাকে আসতে হত। খুনিকে পালাতেও

হয়েছে নিশ্চয় ওই পথ দিয়ে। কেননা, ঘর থেকে বেরোবার আর দুটি পথের একটি বন্ধ করেছিল সুসান সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে। আর একটি পথ তো গেছে সিধে প্রফেসরের শোবার ঘরে। কাজে কাজেই সময় নষ্ট না-করে ক্ষণাৎ আমি বাগানের পথটা নিয়ে পড়লাম। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় জলে প্যাঁচপেচে হয়ে ছিল পথটা। সুতরাং সেখানে পায়ের ছাপ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

পরীক্ষাশেষে দেখলাম, খুব হুঁশিয়ার আর পাকা ক্রিমিনালের সঙ্গেই কাজে নামতে হয়েছে। আমায়। পথের ওপর কোনোরকম পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। রাস্তার ধারে ধারে ঘাসের বর্ডারের ওপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেছে, সে-বিষয়ে অবশ্য কোনোরকম সংশয় আমার নেই। পাছে পায়ের ছাপ থেকে যায়, তাই তার এত সতর্কতা। সুস্পষ্ট ছাপ বা ওই জাতীয় কিছুই আমি পাইনি। না-পেলেও মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসগুলোর অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম কেউ-না-কেউ হেঁটে গেছে সেখান দিয়ে। সেই যে হত্যাকারী তা বুঝলাম এই কারণে যে, বৃষ্টি হয়েছে রাতে। আর সকালে মালী বা অন্য কেউ হেঁটে যায়নি ও-পথ দিয়ে।

এক সেকেন্ড, বলে হোমস। বাগানের ও-পথটা গেছে কোথায়?

বড়োরাস্তায়।

কত লম্বা এই পথটা?

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোনান ডয়েল । শার্লক হোমস

শ-খানেক গজের মতো ।

পথটা যেখানে ফটকের মাঝ দিয়ে গেছে, সেখানেই তো পায়ের ছাপ পেতে?

দুর্ভাগ্যবশত পথের ঠিক ওই জায়গাটাই বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে টালি দিয়ে ।

বড়োরাস্তায়?

না । জলে কাদায় জলাভূমি তৈরি হয়ে গেছে যেখানে ।

কী বিপদ! আচ্ছা, ঘাসের ওপর ছাপটা দেখে কী মনে হল? লোকটা বাড়ির দিকে আসছিল, বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল?

তা বলা মুশকিল । পরিষ্কার ছাপ কোথাও পাইনি ।

বড়ো পা না ছোটো পা?

সে-পার্থক্য আপনিও ধরতে পারবেন না ।

অধীরভাবে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল হোমস । তারপর থেকেই তো মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে আর হ্যারিকেনের মতো তুমুল ঝড় বইতে শুরু হয়েছে । পার্চমেন্টের ওই

পাণ্ডুলিপির চাইতেও এখন কঠিন হবে ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের প্রভেদ বার করা। যাক, কী আর করা যায়। তারপর, হপকিনস, তুমি যে কিছুই করতে পারনি, এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কী করলে শুনি?

আমার তো মনে হয়ে নিশ্চিতভাবে অনেক কিছুই আমি করেছি মি. হোমস। বাইরে থেকে কেউ অতি সাবধানে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে, তা আমি জেনেছি। এরপর, করিডোরটা পরীক্ষা করলাম। নারকেল দড়ির মাদুর বিছানো সেখানে এবং কোনোরকম ছাপ তার ওপর পড়েনি। এখান থেকেই এসে পড়লাম ঘরে। অল্প কয়েকটি আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর। প্রধান সামগ্রী হল একটা মস্তবড়ো খেলবার টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা বিউরো। বিউরোর দু-পাশে দু-সারি ড্রয়ার মাঝখানে একটা ছোট কাবার্ড। ড্রয়ারগুলো খোলা ছিল বটে, কিন্তু তালাচাবি দেওয়া ছিল কাবার্ডে। দেখে মনে হল ড্রয়ারগুলো সবসময়েই খোলা থাকে ওইভাবে এবং মূল্যবান কাগজপত্র রাখা হয় না সেখানে। কাবার্ডের মধ্যে কতকগুলো দরকারি কাগজপত্র আছে বটে, তার এমন কোনো চিহ্ন দেখলাম না যা থেকে অনুমান করা যায় যে, কেউ কাবার্ডটা খোলার চেষ্টা করেছিল। প্রফেসরও জানালেন যে কিছুই চুরি যায়নি। কাজেই, চুরিচামারি যে একেবারেই হয়নি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আচ্ছা, এবার আসা যাক ছেলেটির দেহ-প্রসঙ্গে। লাশটা পাওয়া গেছিল বিউরোর কাছেই, একটু বাঁ-দিকে চাটে যেখানে দাগ দিয়েছি, ঠিক ওই জায়গায়। ছুরি-মারা হয়েছে ঘাড়ের ডান দিকে। এবং পেছন থেকে সামনের দিকে। কাজেই, সে যে নিজেই নিজেকে ছুরি মারেনি, সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকছে না।

ছুরির ওপরে তো পড়েও যেতে পারে, বলল হোমস।

এগজ্যাক্টলি। এ-ধারণা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু ছুরিটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম দেহের কাছ থেকে বেশ কয়েকফুট দূরে। সুতরাং ও-ধারণা একেবারেই অসম্ভব। তারপরেও ধরুন, ছেলেটির অন্তিম কথাটা। এবং সবশেষে রয়েছে মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুঠিতে পাওয়া এই অত্যন্ত দরকারি প্রমাণটা।

পকেট থেকে একটা কাগজের ছোটো প্যাকেট বার করল স্ট্যানলি হপকিনস। প্যাকেটটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা সোনার পাসনে চশমা। কালো সিল্কের ছেড়া সুতোটা ঝুলছিল চশমার দু-পাশ থেকে। তারপর বললে, উইলোবি স্মিথের দৃষ্টিশক্তি বরাবরই খুব ভালো। কাজেই এ-জিনিসটি যে খুনির চোখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।

চশমাটা নিজের হাতে তুলে নিলে শার্লক হোমস। তারপর অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে তন্ময় হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাকের ওপর লাগিয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করল ও। তারপর উঠে গেল জানলার কাছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। ফিরে এসে বাতির নীচে জোরালো একটা আলোয় উলটেপালটে অতি সূক্ষ্মভাবে কী যেন দেখল। সবশেষে, নিঃশব্দে একচোট হেসে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ে একটা কাগজে খসখস করে কয়েকটা লাইন লিখে টোকা মেরে কাগজটা এগিয়ে দিলে স্ট্যানলি হপকিনসের পানে।

বললে, তোমার জন্যে এর বেশি আর কিছু করতে পারছি না আমি। কাগজটা তোমার কাজে লাগতে পারে।

কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিল গোয়েন্দাপ্রবর। এখন কাগজটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলে। এই কথাগুলো লেখা ছিল কাগজটায় :

অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের একজন স্ত্রীলোককে আমাদের প্রয়োজন। তার বেশভূষা ভদ্রমহিলার মততা, নাক অসাধারণ রকমের মোটা এবং নাকের দু-পাশের দুই চোখ খুবই ঘেঁষাঘেঁষি। তার কপাল কুঁচকোনো, চোখ কুঁচকে তাকানোর অভ্যাস আছে এবং সম্ভবত কাঁধ দুটোও গোল। দেখা যাচ্ছে গত কয়েক মাসের মধ্যে অন্ততপক্ষে দুবার চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে তাকে যেতে হয়েছে। যেহেতু তার চশমার লেন্সের শক্তি খুবই বেশি এবং যেহেতু চক্ষু-পরীক্ষকের সংখ্যা খুব বেশি নেই, সুতরাং তাকে খুঁজে বার করা বিশেষ কঠিন হবে না।

হপকিনসের অবাক চাহনি দেখে মুচকে হেসে ওঠে হোমস। আমারও চোখে-মুখে নিশ্চয় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দাপ্রবরের বিস্ময়।

আরে খুবই সোজা আমার অনুমান-সিদ্ধান্ত, বলে হোমস। চশমা ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা থেকে এত ভূরি ভূরি অথচ নিখুঁত সিদ্ধান্ত আদায় করা যায়। এমন কোনো বস্তুর নাম করাই কঠিন হবে তোমার পক্ষে। এ-চশমাটা তো দেখছি আরও অসাধারণ। প্যাঁসনেটা যে স্ত্রীলোকের তা বুঝেছি এর হালকা আর সূক্ষ্ম গড়ন দেখে এবং বিশেষ

করে, মরবার আগে স্থিতির শেষ ক-টি শব্দ থেকে। তার স্বভাব মার্জিত কিনা এবং বেশভূষা ভদ্রোচিত কিনা, তা বুঝেছি সোনার চশমা দেখে। চশমাটা নিরেট সোনার এবং সুন্দরভাবে বাঁধানো। এমন রুচিসুন্দর প্যাঁসনে যিনি চোখে লাগান, তিনি যে অন্যান্য দিক দিয়ে অপরিচ্ছন্ন হবেন, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। চশমাটা চোখে লাগালেই দেখবে, ক্লিপটা তোমার নাকের পক্ষে খুবই চওড়া। তার মানে এই ভদ্রমহিলার নাকটি গোড়ার দিকে খুবই মোটা। এ ধরনের নাক সাধারণত ছোটো আর পুরু হয়। কিন্তু এর অনেক ব্যতিক্রম আছে বলেই বর্ণনার এ-পয়েন্ট নিয়ে জোর দিইনি অথবা আমার অনুমানই যে নির্ভুল, এমন কথাও বলিনি। আমার নিজের মুখ সরু। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাকের ওপর চশমা লাগালে কিছুতেই দুই চোখের তারাকে কাচ দুটোর মাঝামাঝি বা তার কাছাকাছি আনতে পারছি না। সুতরাং ভদ্রমহিলার চোখ দুটি যে নাকের একদম গা ঘেঁষে তা বুঝতে দেরি হল না। ওয়াটসন, প্যাঁসনেটা হাতে নিলেই বুঝবে, কাচ দুটো কনকেভ অর্থাৎ অবতল এবং তার পাওয়ারও অস্বাভাবিক রকমের বেশি। সারাজীবন ধরে যে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি এতখানি সংকুচিত, তার দেহতেও যে এমন চাহনির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কী! কপাল, চোখের পাতা আর কাঁধ-এই তিন জায়গাতেই দেখা যায় কুঁচকে তাকানোর এইসব চিহ্ন।

আমি বললাম, তোমার যুক্তিতর্ক সবই বুঝলাম। কিন্তু ভাই, একটা জিনিস তো বুঝলাম না। চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে গত কয়েক মাসের মধ্যে ভদ্রমহিলাকে দুবার যেতে হয়েছে—এ-কথাটি কী করে আবিষ্কার করলে, তা তো বোধগম্য হল না।

চশমাটা তুলে নিলে হোমস।

বললে, হাত দিলেই বুঝবে ক্লিপের ওপর খুদে খুদে শোলার ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাকের ওপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে। একটা ফিতের রং জ্বলে গেছে। ব্যবহারের ফলে একটু ক্ষয়েও গেছে। অপরদিকটা আনকোরা। কাজেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটা ফিতে পড়ে যাচ্ছে, একটা ফিতে পড়ে যাওয়ার পর নতুন করে লাগানো হয়েছে এই ফিতেটাকে। পুরোনো শোলাটাকে কিন্তু লাগানো হয়েছে মাস কয়েকের মধ্যেই। দুটো ফিতে দেখতে হুবহু একরকম। তাই বললাম, একই দোকানে দু-দুবার যেতে হয়েছে ভদ্রমহিলাকে।

শাবাশ! তাক লাগিয়ে দিলেন দেখছি! প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে হপকিনস। ভাবুন তো একবার সবকটা প্রমাণ হাতের মুঠোয় নিয়েও এত খবরের ছিটেফোঁটাও জানতে পারিনি আমি। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল লন্ডন শহরের সবগুলো চোখের ডাক্তারখানায় একবার করে চুঁ মেরে আসি।

তা তো করবেই। ইতিমধ্যে কেসটা সম্পর্কে আমাদের আর কিছু বলার আছে তোমায়?

আর কিছুই নেই মি. হোমস। আমার তো মনে হয়, আমি যা জানি, আপনিও তা জানেন-হয়তো বেশি জানেন। গ্রামের পথে রেলস্টেশনে কোনো আগন্তুককে দেখা গেছিল কি না এ-সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম। কাউকে দেখা গেছে বলে কোনো খবর এখনও শুনিনি। খুনটার পেছনে কোনো রকমের উদ্দেশ্যের নামগন্ধ নেই এবং এই না-

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

থাকাটাই বার বার ঘুলিয়ে দিচ্ছে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি। যা হয় একটা মোটিভের ছায়াটুকু পর্যন্ত কেউ ধরে উঠতে পারল না?

আ! এদিক দিয়ে অবশ্য তোমায় সাহায্য করতে পারব না আমি। তুমি কি চাও আমরা কালকে আসি তোমার সঙ্গে?

চাওয়াটা যদি আমার পক্ষে অতিরিক্ত না হয়, মি. হোমস, তাহলে সত্যিই খুব খুশি হই আপনি এলে।

পরের দিন পৌঁছোলাম ইয়ক্সলে ওল্ড প্লেসে। বাগানের ফটকে দেখা হল একজন কনস্টেবলের সাথে।

কিছু খবর আছে, উইলসন?

না, স্যার, কিছুই নেই।

কোনো আগন্তুককে দেখা গেছে এ-অঞ্চলে?

না, স্যার, স্টেশনের কাছে প্রত্যেকেই জোর গলায় বলছে, গতকাল কোনো অচেনা লোকই আসেনি বা যায়নি ও-পথ দিয়ে।

সরাইখানা আর হোটেলগুলোয় খোঁজ নিয়েছিলে? হ্যাঁ, স্যার। তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।

এখান থেকে তো হেঁটেই যাওয়া যায় চ্যাথাম। যেকোনো লোকের পক্ষেই ওখানে থাকা বা সবার অগোচরে ট্রেনে চড়া সম্ভব। মি. হোমস এই সেই বাগানের পথ। আবার আমি বলছি, গতকাল কোনো চিহ্ন এখানে ছিল না।

দাগগুলো কোন দিকের ঘাসের ওপর দেখেছিলে?

এইদিকে, স্যার। ফুলের ঝোপ আর রাস্তার মাঝে এই সরু ঘাসের বর্ডারের ওপর। দাগগুলো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু গতকাল বেশ পরিষ্কার ছিল চিহ্নগুলো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখান দিয়ে কেউ-না-কেউ গেছে। ঘাসের বর্ডারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল হোমস। খুবই হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। কেননা, বেসামাল হলেই পায়ে ছাপ থেকে যেত একদিকে রাস্তার ওপর। অপর দিকে পায়ে ছাপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত ফুলের ঝোঁপের নরম মাটির ওপর।

হ্যাঁ, স্যার, মেয়েটির মাথা খুবই ঠান্ডা।

অভিসন্ধি-লুকোনো চকিত চাহনি ভেসে যেতে দেখলাম হোমসের ওপর দিয়ে।

ভদ্রমহিলা এই পথ দিয়ে এসেছেন বলছিলে, না?

হ্যাঁ, স্যার। আর কোনো পথ ছিল না।

ঘাসের এই বর্ডারটার ওপর দিয়ে?

নিশ্চয় তাই, মি. হোমস!

হুম! কাজটা খুবই অসাধারণ হে খুবই অসাধারণ। বেশ, বেশ, আমার তো মনে হয়, পথ দেখা সাঙ্গ হয়েছে। এবার চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক। বাগানের এই ফটকটা সাধারণত খোলা হয়, তাই না? তাহলে গটগট করে ঢুকে পড়া মেয়েটিকে আর কিছুই করতে হয়নি দেখছি। খুন করার অভিপ্রায় তার মনে ছিল না। থাকলে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়েই আসতেন তিনি। লেখবার টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিতেন না নিশ্চয়। এই করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। নারকেল দড়ির মাদুরের ওপর কোনো ছাপই রেখে যাননি। তারপরই এসে পড়লেন পড়ার ঘরে। এখানে কতক্ষণ ছিলেন তিনি? তা ধরবার কোনো উপায় আমাদের নেই।

কয়েক মিনিটের বেশি নয়, স্যার। আপনাকে বলতে ভুলে গেছিলাম, ওই কাণ্ডের একটু আগেই ঘর পরিষ্কার করার জন্যে মিসেস মার্কান এসেছিল। মিনিট পনেরো ছিল সে এ-ঘরে।

বেশ, তাহলে খানিকটা দিশে পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলা এ-ঘরে ঢুকে পড়লেন, তারপর করলেন কী? না, এগিয়ে গেলেন লেখবার টেবিলের কাছে। কী জন্যে? ড্রয়ারে রাখা কিছু জন্মে নয়। তার নেওয়ার মতো যদি কিছু থাকে এ-ঘরে, তবে তা তালাচাবি দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক। না হে, না, কাঠের ওই বিউরোটোর মধ্যেই ছিল কিছু। হুররে! বিউরোর সামনের দিকে এ-আঁচড়টা কীসের হে? দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে ধরো তো, ওয়াটসন। এ-আঁচড়ের কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন হপকিনস?

যে-দাগ নিয়ে তার এত অভিনিবেশ, তা শুরু হয়েছে চাবির গর্তের ডান দিকে আমার পাতের ওপর। প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা আঁচড়টা কাঠের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে বার্নিশটাও তুলে ফেলেছে।

আমিও ওটা দেখেছি, মি. হোমস। কিন্তু চাবির গর্তের আশপাশে এ ধরনের আঁচড় তো হামেশাই দেখা যায়।

কিন্তু এ-দাগটা যে আনকোরা-একদম নতুন। দেখছ না, কাটার জায়গায় তামাটা কীরকম চকচক করছে। আঁচড়টা পুরোনো হলেও সমস্ত আমার পাতটার যা রং, আঁচড়টার রংও হত তাই। আমার লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখো। পরিখার দু-পাশে যেমন মাটি জমে থাকে উঁচু হয়ে, ঠিক তেমনি জমে আছে আঁচড়টার দু-পাশে। মিসেস মার্কোর আছে নাকি?

ঘরে ঢুকল একজন বিষণ্ণ বদন বৃদ্ধা।

আজ সকালে এই বিউরোর ধুলো ঝেড়েছিলে তুমি?

হ্যাঁ, স্যার ।

এই আঁচড়টা লক্ষ করেছিলে?

না, স্যার করিনি ।

আমারও তাই বিশ্বাস, তুমি করনি । কেননা ধুলো ঝাড়ার পর বার্নিশের এই কুচোগুলো নিশ্চয় এখানে থাকত না । এ বিউবোর চাবি কার কাছে থাকে?

সাধারণ চাবি?

না, স্যার । চাব কোম্পানির চাবি ।

বেশ, বেশ । মিসেস মার্কীর তুমি এবার আসতে পার । একটু এগোতে পেরেছি আমরা । ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, বিউরোর কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর হয় খুলে ফেললেন কাবার্ডটা, অথবা খোলবার চেষ্টা করলেন । এই নিয়ে যখন ব্যস্ত উনি, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল উইলোবি স্মিথ । তাড়াহুড়ো করে চাবিটা বার করতে গিয়ে পাল্লার খানিকটা আঁচড়ে ফেললেন চাবি দিয়ে । উইলোবি স্মিথ চেপে ধরল তাঁকে । মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যা

পেলেন, তাই তুলে নিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে, হাতে উঠে এল এই ছুরিটা এবং সঙ্গেসঙ্গে তাই দিয়ে আঘাত হানলেন তিনি স্মিথের ওপর উদ্দেশ্য ছিল কোনোমতে ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। মারাত্মক সে-আঘাত। পড়ে গেল স্মিথ। আর, সটকান দিলেন ভদ্রমহিলা। যা নিতে তার আগমন, যাবার সময়ে তা নিয়েও যেতে পারেন, নাও নিয়ে যেতে পারেন। সুসান আছে নাকি? আচ্ছা সুসান, চিৎকারটা শোনার পর ওই দরজা দিয়ে কারো পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি?

না, স্যার। তা অসম্ভব! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই প্যাসেজে তাহলে কাউকে-না-কাউকে দেখতে পেতাম আমি। তা ছাড়া, দরজাটা তো একেবারেই খোলেনি। খুললে শব্দ শুনতে পেতাম।

তাহলে পলায়ন-পথ সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। যে-পথে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা, সেই পথেই প্রস্থান করেছিলেন তিনি। এ-সম্বন্ধে তাহলে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আচ্ছা এই দ্বিতীয় প্যাসেজটা প্রফেসরের ঘরে গেছে, তাই না? এদিক দিয়ে বেরোবার পথ আছে নাকি?

না, স্যার।

আমরা বরং প্রফেসরের ঘরে গিয়ে আলাপ করে আসি তার সঙ্গে। আরে, আরে, হপকিনস! দারুণ দরকারি এই পয়েন্টটা। প্রফেসরের করিডোরেও দেখছি নারকেল দড়ির মাদূর বিছোনো।

কিন্তু স্যার, তাতে হয়েছে কী?

কেসটার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছ না? বেশ, বেশ, এর ওপর জোর দিতে চাই না আমি। নিঃসন্দেহে, আমারই ভুল। তবুও কিন্তু পয়েন্টটা খুবই ইঙ্গিতময়। চলে এসো

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও প্রফেসরের সঙ্গে।

প্যাসেজ বরাবর এগিয়ে গেলাম আমরা। বাগানের পথের দিকে যে-প্যাসেজটা গেছে, তার যা দৈর্ঘ্য, এটারও তাই। করিডোরের প্রান্তে এক সারি সিঁড়ি উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে। পথপ্রদর্শক হপকিনস টোকা দিলে দরজায়। তারপর আমাদের নিয়ে ঢুকল প্রফেসরের শোবার ঘরে।

ঘরটা বেজায় বড়ো। চারিদিকে অগণিত কেতাবের সারি। শেলফ উপচে বইয়ের পাহাড় জমে উঠেছে ঘরের কোণে কোণে এবং আলমারিগুলোর পায়ার কাছে মেঝের ওপর। বিছানাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে। চারিদিকে বালিশ সাজিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে বসে ছিলেন বাড়ির মালিক। এ-রকম ধরনের অসাধারণ চেহারার লোক আমি কদাচিৎ দেখেছি। হাড়সর্বস্ব রোগা মুখ, টিয়াপাখির মতো বাঁকানো নাক। গুচ্ছ গুচ্ছ ঝোঁপের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুরুর নীচে গভীর গহ্বরের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল একজোড়া কুচকুচে কালো চোখ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে আমাদের পানে তাকিয়ে ছিলেন প্রফেসর।

ভদ্রলোকের চুল দাড়ি সবই ধবধবে সাদা। কিন্তু মুখের চারপাশের দাড়িতে হলদে রঙের ছোপ লেগেছিল অদ্ভুতভাবে! সাদা চুলের ঝোঁপের মধ্যে জ্বলছিল একটা সিগারেটের আগুন। বাসি তামাকের ধোঁয়ার দুর্গন্ধ ভাসছিল ঘরের বাতাসে। হোমসের পানে ভদ্রলোককে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখলাম, নিকোটিনের হলদে রঙের ছোপ তার হাতেও লেগেছে।

ধূমপান করেন, মি. হোমস? বাছাই করা ইংলিশ বলেন প্রফেসর, কিন্তু উচ্চারণটা অদ্ভুত।

হোমস একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মসৃণ দৃষ্টি-শর নিষ্ক্ষেপ করে চলেছিল ঘরের সব কিছুর ওপর।

তামাক আর আমার কাজ, কিন্তু এখন শুধু তামাক, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। খাসা ছেলেটি! আরে মশাই, আর কয়েক মাস ট্রেনিং দিলেই চমৎকার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারত সে! কেসটা সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয় মি. হোমস?

এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি।

আমরা তো প্রত্যেকে এখনও অন্ধকারে রয়েছি। এ-অন্ধকারের মধ্যে যদি কিছু আলো নিষ্ক্ষেপ করতে পারেন, তাহলে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

বৃদ্ধ প্রফেসরের কথা শুনতে শুনতে ঘরের একদিকে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমাগত পায়চারি করছিল হোমস। লক্ষ করলাম, অসাধারণ দ্রুতবেগে ধূমপান করে চলেছে ও। দেখেই বোঝা যায়, আলেকজান্দ্রিয়ান সিগারেটের প্রতি গৃহস্বামীর অনুরাগে ভাগ বসচ্ছে হোমস নিজেও।

বৃদ্ধ বললেন, এমনিতেই আমি রুগণ, স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল, তার ওপর আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকেও সরিয়ে নেওয়া হল কাছ থেকে। কাজেই জানি না এত কাজ আমি সমাপ্ত করতে পারব কি না। আরে, মি. হোমস! আপনি তো দেখছি আমার চাইতেও তাড়াতাড়ি ধূমপান করেন।

মৃদু হাসল হোমস।

এ-বিষয়ে আমি বিজ্ঞ পরীক্ষক, বলতে বলতে সে আর একটি সিগারেট তুলে নিল বাক্স থেকে-এই তার চতুর্থ তার সদ্য-শেষ-হওয়া সিগারেটের অংশ দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে বললে, সুদীর্ঘ সওয়াল-জবাবের ঝামেলায় ফেলে আপনাকে আর বিব্রত করব না, প্রফেসর কোরাম। কেননা, আমি আগেই শুনেছি খুনের সময় আপনি শয্যায় ছিলেন এবং এ-সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। বেচারী ছেলেটি মরবার সময় বলে গেছিল, প্রফেসর সেই মেয়েটা-এ-সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন কি?

মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

বললেন, সুসান পল্লি-অঞ্চলের মেয়ে। এ-শ্রেণির মেয়েদের অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতার কথা তো আপনার জানা নয়। আমার মনে হয়, অন্তিম সময়ে বেচারা স্মিথ প্রলাপের ঘোরে বিড়বিড় করে অবোধ্য অস্পষ্ট কিছু বলে গেছে আর এই মেয়েটা তাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে

একটা অর্থহীন খবর তৈরি করে নিয়েছে।

বটে। ট্রাজেডিটা সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনো ব্যাখ্যা?

খুব সম্ভব দুর্ঘটনা। সম্ভবত শুধু নিজেদের মধ্যেই বলতে সাহস পাচ্ছি-আত্মহত্যা। অনেকরকম লুকোনো কষ্ট থাকে তো তরুণদের মনে, হৃদয়সম্পর্কিত অনেক ব্যাপার, কোনোদিনই সেসব আমরা জানতে পারিনি। খুনের চাইতে বরং এ-ধারণাটার খানিকটা মানে আছে।

কিন্তু প্যাঁসনে চশমাটা?

আ! নেহাতই ছাত্র আমি শুধু স্বপ্নই দেখি। বাস্তব জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু তবুও, মাই ফ্রেন্ড, আমরা জানি, ভালোবাসার পরিণতি মাঝে মাঝে বড়ো বিচিত্র আকার ধারণ করে। সে যাই হোক, আর একটা সিগারেট নিন। এ-জিনিস এ-রকম সমাদর পাচ্ছে দেখলেও আনন্দ। হাতপাখা, দস্তানা, চশমা-জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়ার সময়ে প্রতীক হিসেবে বা সম্পদ হিসেবে কে যে কোন জিনিসটা নিয়ে

যাবে, তা কি কেউ বলতে পারে? এই ভদ্রলোক ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের কথা বলছিলেন। কিন্তু যাই বলুন, ও-বিষয়ে ভুল হওয়াটাই খুব সহজ! আর ছুরিটা? পড়ে যাওয়ার সময়ে অনায়াসেই তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে হতভাগা স্মিথ। খুব সম্ভব, ছেলেমানুষের মতো কথা বলছি আমি। কিন্তু আমার মতে নিজের হাতেই নিয়তির বিধান মেনে নিয়েছে উইলোবি স্মিথ।

থিয়োরিটা হোমসের মনে ধরেছে মনে হল। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে চিন্তামগ্ন মুখে তন্ময় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল ও।

তারপর বললে, প্রফেসর কোরাম, বিউরোর মধ্যে কাবার্ডে কী ছিল বলুন তো?

চোরের উপকারে আসার মতো কিছু ছিল না। পারিবারিক কাগজপত্র, স্ত্রীর চিঠি, ইউনিভার্সিটির দেওয়া সম্মানপত্র, ডিপ্লোমার গাদা-এইসব। এই নিন চাবি। নিজেই দেখে আসুন।

চাবিটা তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে একবার দেখে নিলে হোমস। তারপরেই ফেরত দিয়ে দিলে প্রফেসরের হাতে।

না। বিউরো ঘেঁটে কিছু কাজ হবে বলে মনে হয় না আমার। আমি বরং বাগানে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ধীরেসুস্থে ভেবে দেখি সমস্ত ব্যাপারটা। আপনার ওই আত্মহত্যা-থিয়োরি

নিয়ে কিছু বলা দরকার । অনেক উৎপাত করে গেলাম, ক্ষমা করবেন, প্রফেসর কোরাম । লাঞ্ছের আগে আর বিরক্ত করব না আপনাকে । ঠিক দুটোর সময়ে আবার আসব আমি । ইতিমধ্যে যদি কিছু ঘটে তো রিপোর্ট দিয়ে যাব ।

আশ্চর্যরকম অন্যমনস্ক দেখলাম হোমসকে । বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা পায়চারি করতে লাগলাম বাগানের পথের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত ।

অবশেষে আমি শুধাই, সূত্র পেয়েছ নাকি?

তা নির্ভর করছে আমি যে-সিগারেটগুলো খেয়ে এলাম তার ওপর । এমনও হতে পারে যে আগাগোড়াই ভুল করছি আমি । ওই সিগারেটগুলোই আমায় তা দেখিয়ে দেবে ।

বিস্ময়ে চোঁচিয়ে উঠি আমি, মাই ডিয়ার হোমস, তুমি জানছ কী করে যে—

বেশ, বেশ, নিজের চোখেই দেখবে সব । না হলে, কোনো ক্ষতি নেই । চোখের ডাক্তারের কু তো হাতেই রয়েছে, ফিরে এসে তাই নিয়ে কাজ চালানো যাবেখন । কিন্তু সোজা পথ যখন দেখতে পেয়েছি, তখন তার সুযোগ আমি নেবই । এই যে মিসেস মার্কোর! চলো হে, মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা বলে খবরটবর কিছু জানা যাক ওর কাছ থেকে ।

এর আগে আমি হয়তো বলে থাকতে পারি যে ইচ্ছে করলে, আশ্চর্য উপায়ে মেয়েদের চিত্ত জয় করতে পারত হোমস এবং অনায়াসে অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাদের

আস্থাভাজন হয়ে উঠত সে। এক্ষেত্রেও, পাঁচ মিনিট বললেও দেখলাম তার অর্ধেক সময়ের মধ্যে মিসেস মার্কারের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে ও এবং এমনভাবে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে যেন কত বছর ধরেই তার সঙ্গে পরিচয় হোমসের।

হ্যাঁ, মি. হোমস, আপনি যা বললেন, তা সত্যি। দারুণ সিগারেট খান উনি। সারাদিন তো বটেই। এমনকী কখনো কখনো রাত্রেও। একদিন সকালে ওঁর ঘরটা আমি দেখেছিলাম, স্যার। কী বলব, দেখলে পরে আপনার মনে হত যেন লন্ডনের কুয়াশা দেখছেন। বেচারি মি. স্মিথও সিগারেট খেতেন। তবে প্রফেসরের মতো একটা খারাপ স্মোকার ছিলেন না উনি। ওঁর স্বাস্থ্য-এত সিগারেট খেয়ে জানি না ওঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কি অবনতি হয়েছে।

আ! বলে হোমস। কিন্তু এতে খিদে নষ্ট হয়ে যায় যে।

তা হবে, আমি অবশ্য কিছু বুঝি না, স্যার।

আমার তো মনে হয়, খাওয়ার সময়ে নামমাত্র খান প্রফেসর, তাই নয় কি?

ঠিক নেই, কখনো বেশি, কখনো কম। ওঁর হয়েই বলছি আমি।

আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাননি উনি! তা ছাড়া, যে পরিমাণে সিগারেট খেতে দেখলাম, ওর পরে লাঞ্চও ছোঁবেন না।

উঁহু, সবই ভুল বললেন, স্যার। আজ সকালেই তো আশ্চর্যরকমের বেশি ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন উনি। এ-রকম খাওয়া খেতে আগে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লাঞ্চার জন্যে একটা পুরো ডিশ ভরতি কাটলেটের অর্ডারও দিয়েছেন উনি। আমি তো নিজেই অবাক হয়ে গেছি ওঁর খাওয়া দেখে। গতকাল এ-ঘরে এসে মেঝের ওপর মি. স্মিথের দেহ দেখার পর থেকে খাবারের দিকে তাকাতেও পারছি না আমি। যাকগে, সবরকম মিশিয়েই তো এই সংসার। তাই বুঝি এত কাণ্ডের পরেও খিদে মরতে দেননি প্রফেসর।

সারাসকালটা বাগানে হাওয়া খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। স্ট্যানলি হপকিনস গ্রামে গেছিল। আগের দিন সকালে চ্যাথাম রোডে একজন অজ্ঞাত স্ত্রীলোককে কয়েকজন ছেলে-মেয়ে দেখেছিল-এমনি একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় খোঁজ করতে গেছিল ও। আর, আমার বন্ধুটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনাই এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেছে শূন্যে। এ-রকমভাবে মনমরা হয়ে কোনো কেস নাড়াচাড়া করতে ওকে আমি দেখিনি। এমনকী হপকিনস এসে যখন খবর দিলে যে, হোমসের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এমনি একজন চশমাপরা বা প্যাঁসনে চোখে স্ত্রীলোককে আগের দিন সকালে বাচ্চারা সত্যি সত্যিই দেখেছে চ্যাথাম রোডে তখনও তার মনে কোনোরকম নিবিড় আত্মহের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তার অধিকতর মনোযোগ দেখা গেল সুসানের আনা খবরে। লাঞ্চার সময়ে সুসানই পরিবেশন করছিল আমাদের। নিজে থেকেই খবরটা দিল সে। গতকাল মি. স্মিথ বোধ হয় বেরিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। খুন হওয়ার আধ ঘন্টাটাক আগে ফিরে আসে সে। এ-খবরের সঙ্গে আসল ঘটনার কী সম্পর্ক, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বেশ বুঝলাম আগে থেকেই মস্তিকের মধ্যে

গড়ে নেওয়া অসাধারণ ছকের মধ্যে এ-খবরটাকেও বেমালুম জোড়া লাগিয়ে দিলে হোমস। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে তাকালে ও জেন্টলমেন, দুটো বাজে। এবার ওপরে গিয়ে আমাদের প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে বসে এ-ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলা যাক।

সবে লাঞ্চ শেষ করেছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। খালি ডিশগুলো দেখেই বুঝলাম মিসেস মার্কোর তার চমৎকার ক্ষুধা সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন তা সত্য। ধবধবে সাদা কেশর দুলিয়ে ঝকঝকে চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমাদের ওপর রাখতেই তাকে দেখে মনে হল যেন বাস্তবিকই কোনো ঐন্দ্রজালিকের মূর্তি দেখছি। চিরন্তন সিগারেটটা তখনও ধূমোদগিরণ করছিল তাঁর মুখে। পোশাক পরিবর্তন করে আগুনের পাশে হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসে ছিলেন উনি।

তারপর, মি. হোমস, রহস্যের সমাধান করতে পারলেন? বলে পাশের টেবিলে রাখা সিগারেটের মন্ত বড়ো টিনটা এগিয়ে দিলেন হোমসের পানে। সঙ্গেসঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলে হোমস এবং হাতে ঠোকাঠুকি লেগে টেবিলের কিনারায় উলটে গেল বাক্সটা। মিনিটখানেককি দুয়েকের জন্য প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিতে লাগলাম কার্পেটের ওপর এবং ছড়ানো সিগারেটগুলো উদ্ধার করে আনতে লাগলাম অসম্ভব সব কোণ থেকে। উঠে দেখলাম চকচক করছে হোমসের দুই চোখ এবং রঙের ছোঁয়া লেগেছে গালে। একমাত্র সংকটকালেই উড়তে দেখেছি লড়াইয়ের এসব নিশানদিহি।

হ্যাঁ, বললে হোমস। এ-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করেছি আমি।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমি আর স্ট্যানলি হপকিনস । জিঘাংসা নিষ্ঠুর দাঁতখিচুনির মতোই একটা ছায়া দুলে উঠল বৃদ্ধ প্রফেসরের রুণ মুখের রেখায় রেখায় ।

সত্যি! বাগানের মধ্যে নাকি?

না, এখানে ।

এখানে! কখন?

এই মুহূর্তে ।

নিশ্চয় তামাশা করছেন, মি. শার্লক হোমস । বলতে বাধ্য করলেন আমায় এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এভাবে কথা বলা শোভা পায় না ।

আমার যুক্তি-শৃঙ্খলের প্রতিটি অংশ আমি নিজে জোড়া লাগিয়েছি এবং প্রতিটি জোড় আমি পরখ করে দেখেছি । প্রফেসর কোরাম, আমার হিসেব নির্ভুল । আপনার মোটিভ কী, অথবা এই । অদ্ভুত ব্যাপারে কী কী চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন, তা এখনও বলতে পারছি না আমি । খুব সম্ভব মিনিট কয়েকের মধ্যে আপনার মুখেই তা শুনতে পাব । ইতিমধ্যে অতীতের ঘটনাগুলোই জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করছি আপনার সামনে

এবং করছি আপনারই ভালোর জন্যে। সব শোনার পর ধরতে পারবেন কোন কোন তথ্যগুলো এখনও আমার দরকার।

গতকাল আপনার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এক ভদ্রমহিলা। আপনার বিউরোতে রাখা বিশেষ কতকগুলো দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করার অভিপ্রায় নিয়েই এসেছিলেন তিনি। সঙ্গে এনেছিলেন তার নিজের চাবি। আপনার চাবি পরীক্ষা করে দেখলাম বার্নিশের ওপর আঁচড় কাটার যে সামান্য বিবর্ণতা ফুটে ওঠা উচিত, আপনার চাবিতে তা নেই। কাজেই, এ-কাজে আপনি কোনো সাহায্য করেননি। প্রমাণ যা পাচ্ছি, দেখে বুঝছি উনি এসেছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার কোনো জিনিস সরিয়ে নিয়ে যেতে।

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়লেন প্রফেসর।

বললেন, ভারি ইন্টারেস্টিং আর শিক্ষামূলক তো! আর কিছু বলার নেই আপনার? ভদ্রমহিলার অস্তিত্ব যখন আবিষ্কার করেছেন, তখন তিনি গেলেন কোথায়, তাও নিশ্চয় বলতে পারবেন?

চেষ্টা করব। প্রথমেই বলি আপনার সেক্রেটারি তাকে পাকড়াও করে। করতেই উনি তার কবলমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছুরি মারেন তাকে। এ-বিপর্যয়কে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নই আমি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-রকম মারাত্মক চোট দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে ছুরি চালাননি ভদ্রমহিলা। গুপ্তহত্যা যে করতে আসে, সে কখনো নিরস্ত্র হয়ে আসে না। খুনখারাপি দেখেই দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েন

উনি। ক্ষিপ্তের মতো এই শোচনীয় দৃশ্যস্থল ছেড়ে তিরবেগে বেরিয়ে যান বাইরে। দুর্ভাগ্যবশত ঝটাপটি করার সময়ে ওঁর পাঁসনেটা খোয়া যায়। দৃষ্টিশক্তি তার অতি ক্ষীণ এবং দূরের জিনিস একেবারেই দেখতে পান না বললেই চলে। কাজেই চশমা হারিয়ে সত্যি সত্যিই অসহায় হয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা। করিডোর দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন উনি। ভেবেছিলেন, এই পথ দিয়েই ঘরে ঢুকেছিলেন আসবার সময়ে। একইরকম দেখতে নারকেল দড়ির মাদুর বিছানো ছিল দুটো করিডোরেই। যখন বুঝলেন যে ভুলপথে এসেছেন, তখন খুবই দেরি হয়ে গেছে এবং পিছিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ। এ-রকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তার? যে-পথে এসেছিলেন, সে-পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। এগিয়ে যেতে হবে-যা-ই থাকুক সামনে। এগিয়ে গেলেন উনি! কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে একটা দরজা ঠেলে খুলে ফেলতেই এসে পড়লেন আপনার ঘরে।

হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে বিহ্বলভাবে হোমসের পানে তাকিয়ে ছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। বিস্ময় আর ভয় যেন পাশাপাশি কেটে বসে গেছিল তাঁর ভাবব্যঞ্জক মুখের রেখায়। হোমসের কথা ফুরোতেই জোর করে দুই কাঁধ ঝুঁকিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়লেন উনি।

চমৎকার মি. হোমস, আগাগোড়া সুন্দর বলে গেলেন। কিন্তু আপনার এই অতি আশ্চর্য থিয়োরিতে ছোট্ট একটা কাটা থেকে গেছে। আমি নিজে হাজির ছিলাম এ-ঘরে। সারাদিনের মধ্যে একবারও বাইরে যাইনি।

আমার তা অজানা নয়, প্রফেসর কোরাম।

তাই বুঝি আপনি বলতে চান যে বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘরে একটা স্ত্রীলোক ঢুকেছিল কি , আমি জানতে পারিনি?

আমি কখনো তা বলিনি। আপনি জানতেন, তিনি ঘরে ঢুকেছেন। তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাকে গা-ঢাকা দিতে সাহায্য করেছিলেন।

আবার উচ্চ-গ্রামে অটহাস্য করে উঠলেন প্রফেসর। শয্যা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন উনি। অঙ্গারের মতো জ্বলছিল তাঁর দু-চোখ।

আপনি উন্মাদ। চিৎকার করে ওঠেন তিনি, বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মতো কথা বলছেন আপনি। আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছি? কোথায় তিনি?

ওইখানে, বলে ঘরের কোণে একটা উঁচু বুককেসের দিকে আঙুল তুলে দেখালে হোমস।

ভয়াবহ একটা আকুঞ্চন ভেসে গেল প্রফেসরের ভয়ংকর মুখের ওপর দিয়ে। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে ধপ করে উনি বসে পড়লেন চেয়ারে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁ করে একটা কবজার ওপর ঘুরে গেল বুককেসটা এবং তিরবেগে ঘরে ঢুকে পড়লেন একজন স্ত্রীলোক।

আপনি ঠিক বলেছেন। অদ্ভুত বিদেশি গলায় চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। আপনি ঠিক বলেছেন! এই যে আমি।

ধুলোয় বাদামি হয়ে উঠেছিলেন উনি। গোপন-স্থানের দেওয়ালের মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল আপাদমস্তক। কালিঝুলির ছাপ তার মুখেও লেগেছিল। কোনোমতেই সুশ্রী বলা চলে না তাকে। হোমস যে রকমটি বর্ণনা দিয়েছিল তার চেহারার, হুবহু সেসব বৈশিষ্ট্য দেখলাম তার দেহে-চোখে-মুখে। বাড়তির মধ্যে ছিল আরও একটি বৈশিষ্ট্য—দীর্ঘ আর জেদি থুতনি। খানিকটা স্বাভাবিক প্রায়-অন্ধতার জন্যে আর খানিকটা অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার জন্যে চোখ মিটমিট করে আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন উনি। দেখতে চেষ্টা করছিলেন, আমরা কে এবং কোথায় রয়েছি। এসব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু একটা বনেদিয়ানার ছাপ ফুটে উঠেছিল ভদ্রমহিলার চেহারায়, উদ্ধত চিবুকের সাহসিকতায় আর উন্নত শিরে। দেখলেই সমবোধ জাগে। যেন বাধ্য করে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে। স্ট্যানলি হপকিনস তার বাহুর ওপর হাত রেখে বন্দি হিসেবে দাবি করল তাকে। কিন্তু আলতোভাবে ওকে সরিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। এমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক মর্যাদার সঙ্গে সরিয়ে দিলেন যে অবাধ্য হতে সাহস করল না হপকিনস। চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর। দারুণ আক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল, আকুঞ্চিত হয়ে উঠছিল তার মুখের প্রতিটি মাংসপেশি। উদবিগ্ন চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন উনি ভদ্রমহিলার পানে।

হ্যাঁ, স্যার, আমি আপনার বন্দি, বললেন ভদ্রমহিলা। ঘূপসির মধ্যে থেকে সব শুনেছি। আপনারা যা জেনেছেন, তা সত্য। সব স্বীকার করছি আমি। আমিই মেরে ফেলেছি

যুবকটিকে। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি বললেন, এ-হত্যা নিছক দুর্ঘটনা, তাঁর ভুল হয়নি। আমি জানতামও না, যে-জিনিসটা বাগিয়ে ধরেছিলাম আমি তা একটা ছুরি, মরিয়া হয়ে টেবিলের উপর থেকে যা হয় একটা তুলে নিয়ে ছেলেটিকে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি। যা বললাম, তা সত্যি।

হোমস বললে, ম্যাডাম, জানি আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনাকে কিন্তু মোটেই সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না আমার।

বীভৎস হয়ে উঠেছিল ভদ্রমহিলার মুখের রং। মুখের কালো ধুলোর স্তরের চেয়েও ভয়াবহ

সে-বর্ণ। শয্যার একপাশে বসে পড়ে বলে চললেন উনি।

বেশিক্ষণ এখানে আমি থাকছি না। কিন্তু পুরো সত্যটা আপনাদের জানাতে চাই আমি। আমি এই লোকটার স্ত্রী। এ কিন্তু ইংরেজ নয়। রাশিয়ান। ওর নাম আমি বলব না।

এই প্রথম নড়ে উঠলেন বৃদ্ধ। ভগবান তোমার ভালো করবেন, আন। ভগবান তোমার ভালো করবেন!

দুই চোখে গভীর অবজ্ঞা নিয়ে প্রফেসরের পানে তাকালেন ভদ্রমহিলা। সারজিয়াস, তোমার এই জঘন্য ঘৃণিত জীবনটাকে কেন এমনভাবে আঁকড়ে ধরতে চাও বল তো? এ-

জীবনে ক্ষতি করেছ অনেকের, কিন্তু ভালো করনি কারোরই-এমনকী তোমার নিজেরও নয়। যাই হোক, বিধাতার নির্ধারিত সময়ের আগে তোমার ওই অপলকা জীবনসূত্র ছিঁড়ে দেওয়ার কারণ হতে চাই না আমি। অভিশপ্ত এই বাড়ির চৌকাঠ পেরোনোর পর থেকে যথেষ্ট নির্যাতন গেছে আমার আত্মার ওপর। কিন্তু তবুও আমায় সব বলতে হবে, তা না হলে দেরি হয়ে যাবে খুবই।

জেন্টলমেন, আমি তো বললামই, এ-লোকটার স্ত্রী আমি। ওর বয়স তখনও পঞ্চাশ। আর আমি ছিলাম কুড়ি বছরের একটা মূখ মেয়ে। তখনই বিয়ে হয় আমাদের। রাশিয়ার একটা শহরে, একটা ইউনিভার্সিটিতে জায়গাটার নাম আমি বলব না।

ঈশ্বর তোমর মঙ্গল করুন, অ্যানা! আবার বিড়বিড় করে ওঠেন বৃদ্ধ।

আমরা ছিলাম সংস্কারক-বিপ্লবী-নিহিলিস্ট। ও ছিল, আমি ছিলাম, আরও অনেকে ছিল। তারপর একটা সময় এল যখন আমরা প্রত্যেকেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। একজন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছিল। গ্রেপ্তার হল অনেকে। সাক্ষীসাবুদের দরকার হয়ে পড়ল। তখনই নিজের নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে এবং বিস্তর পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী তার নিজের স্ত্রী এবং সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। হ্যাঁ, ওরই স্বীকারোক্তির পর আমরা সবাই গ্রেপ্তার হলাম। কয়েকজন উঠল ফাঁসিকাঠের মঞ্চে, আর কয়েকজন গেল সাইবেরিয়ায়। শেষের দলে আমি ছিলাম। কিন্তু যাবজ্জীবন মেয়াদ ছিল না আমার। ননাংরা পথে পাওয়া সমস্ত অর্থ নিয়ে ইংলন্ডে চলে এল আমার স্বামী। সেই থেকেই পরম শান্তিতে এখানে আছে সে। ও অবশ্য ভালো করে জানে, যেদিন ব্রাদারহুড জানতে

পারবে তার ঠিকানা, সেদিন থেকে সাতটা দিনও যাবে না ন্যায়বিচারের দণ্ড ওর শিরে নেমে আসতে ।

কাঁপা হাত বাড়িয়ে কোনোমতে একটা সিগারেট তুলে নিলেন বৃদ্ধ । বললেন, আমি তোমার হাতের মুঠোয়, অ্যানা । আর, চিরকালই আমার ভালো বই খারাপ করনি তুমি ।

এখনও কিন্তু ওর শয়তানির চূড়ান্ত দিকটা আপনাদের আমি বলিনি! অর্ডারের কমরেডদের মধ্যে একজন ছিল আমার প্রাণের বন্ধু! মহান, নিঃস্বার্থ আর প্রেমময় তার চরিত্র-এর কোনোটিই কিন্তু অ্যানার স্বামীর নেই। জোরজবরদস্তি জুলুমবাজিকে ঘৃণা করত সে, ভালোবাসত অহিংসাকে। অপরাধী ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই অবশ্য যদি একে অপরাধ বলা যায় কিন্তু সে নয়। এ-পথ থেকে ফেরানোর জন্যে চিঠি লিখত সে আমায়। এই চিঠিগুলোই বাঁচাতে পারত ওকে। আর পারত আমার ডায়েরিটা। তার প্রতি আমার মনোভাব, আমার আবেগ অনুভূতি প্রতিদিন লিখে রাখতাম এই ডায়েরিতে। আর লিখতাম আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত। ডায়েরি আর চিঠির তাড়া-দুটোই খুঁজে বার করে নিজের কাছে রেখে দেয় আমার পতিদেবতা। শুধু রেখে দেওয়া নয়, একদম লুকিয়ে ফেলে এই দুটি জিনিস এবং আশ্রয় চেষ্টা করে ওই যুবাপুরুষটির জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে। প্রাণে বেঁচে গেলেও মুক্তি পেল না অ্যালেক্সিস। তাকে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায়। সেইখানেই এখনও, এই মুহূর্তে, সে কাজ করে চলেছে একটা নুনের খনিতে। ভাববা দিকি তার অবস্থাটা, শয়তান কোথাকার! এখন, এই মুহূর্তে-যার নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতাও তোমার নেই, সেই অ্যালেক্সিস

ক্রীতদাসের মতো গতর খাঁটিয়ে কোনোরকমে রয়েছে বেঁচে। আর তবুও কিনা তোমার জীবন আমার হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও তোমায় রেহাই দিচ্ছি আমি!

সিগারেটে টান মেরে বললেন বৃদ্ধ, তুমি তো চিরকালই এমনই মহীয়সী, অ্যানা।

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রমহিলা! কিন্তু পরক্ষণেই যাতনাকরণ ছোট্ট চিকার জেগে ওঠে ওর কণ্ঠে ধপ করে আবার বসে পড়েন শয্যায়।

বলেন, শেষ আমায় করতেই হবে। আমার মেয়াদ ফুরোলে উঠে পড়ে লাগলাম ডায়েরি আর চিঠিগুলো উদ্ধারের কাজে। রাশিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে এ দুটো জিনিস পাঠালেই হল, তাহলেই খালাস পাবে আমার বন্ধুটি। আমার স্বামী যে ইংলন্ডে এসেছে, তা জানতাম। মাসের পর মাস তল্লাশি চাললাম-শেষকালে আবিষ্কার করলাম তার ঠিকানা। ডায়েরিটা যে এখনও তার কাছে আছে, তা জেনেছিলাম সাইবেরিয়াতে থাকার সময়ে ওর একটা চিঠি পেয়ে। ডায়েরির পাতা থেকে কয়েকটা অংশ তুলে তিরস্কার করে চিঠিটা লিখেছিল আমায়। কিন্তু প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রবৃত্তি যার এতখানি, সে যে নিজে থেকেই সুড়সুড় করে কোনোদিনই ডায়েরিটা আমার হাতে তুলে দেবে না, তা আমি জানতাম। নিজেকেই তৎপর হয়ে সংগ্রহ করতে হবে তা। এই উদ্দেশ্যেই একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান থেকে একজন এজেন্টকে নিযুক্ত করেছিলাম এ-কাজের জন্যে। সেক্রেটারি হয়ে সে এল আমার স্বামীর বাড়িতে। সারজিয়াস, সে হল তোমার দ্বিতীয় সেক্রেটারি। খুব তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিয়েছিল সে। কাগজপত্র যে-কাবার্ডে থাকে এ-খবর সে সংগ্রহ করলে এবং চাবিটারও একটা ছাপ এনে দিলে আমায়। এর বেশি এক

পা-ও যেতে রাজি হল না সে। বাড়ির একটা নকশাও আমায় দিয়েছিল। আর বলেছিল, দুপুরের আগে সবসময়ে ফাঁকা থাকে পড়ার ঘরটা। সে সময়ে সেক্রেটারি ব্যস্ত থাকে ওপরে। তাই শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে নিজেই এসেছিলাম কাগজগুলো উদ্ধার করতে। সফলও হয়েছি, কিন্তু হায়-রে, কী চরম মূল্যই দিতে হল তার প্রতিদানে!

কাগজগুলো সব নিয়েছি, চাবি ঘুরিয়ে কাবার্ডটা বন্ধ করছি, এমন সময়ে ছেলটি এসে চেপে ধরলে আমায়। সেদিন সকালেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রফেসর কোরাম থাকেন কোথায়। তখন জানতাম না যে এ-বাড়িরই কর্মচারী সে।

এগজ্যাক্টলি! এগজ্যাক্টলি! বলে ওঠে হোমস। বাড়ি ফিরে এসে সেক্রেটারি প্রফেসর কোরামকে জানালে রাস্তায় দেখা স্ত্রীলোকটার কথা। তারপর, শেষ নিশ্বাস ফেলার সময়ে এই খবরটি পাঠাতে চেয়েছিল তাকে যে এই সেই মেয়েটি যে-মেয়েটির কথা, এইমাত্র সে আলোচনা করে এসেছে তার সঙ্গে।

আমাকে কথা বলতে দিন, আদেশের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে ভদ্রমহিলার কণ্ঠে। যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে তার মুখ।ও পড়ে যেতেই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ভুল দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমার স্বামীর ঘরে। ও চেয়েছিল আমাকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ও-কাজটি করতে যাওয়ার আগে তার মনে রাখা উচিত যে তারও জীবন আমার হাতে। আমাকে আইনের খপ্পরে দিলে, আমিও তাকে সঁপে দেব ব্রাদারহুডের কবলে। আমি যে শুধু আমার জীবনের জন্যেই বাঁচতে চেয়েছিলাম, তা নয়।

আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। ও বুঝল, আমার যে কথা, সেই কাজ-
বুঝল যে, ওর অদৃষ্টও নির্ভর করছে আমার অদৃষ্টের ওপর। শুধু এই কারণেই আমায়
আড়াল করতে চেয়েছিল ও-আর কোনো কারণের জন্যে নয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা
লুকোনের জায়গায় আমাকেও ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। পুরোনো যুগের চিহ্ন এই ঘুপসি
জায়গাটার হদিশ জানত শুধু সে নিজে। নিজের ঘরে খাবার আনিয়ে খেত ও। তাই, ওর
খাবারের অংশ আমাকেও দিতে পেরেছিল ও। ঠিক ছিল যে পুলিশ বাড়ি ছেড়ে বিদায়
হলে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেব আমি এবং আর কোনোদিন ফিরে আসব না এ-
অঞ্চলে। কিন্তু কেন জানি না আমাদের প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেল আপনার কাছে।
পোশাকের। ভেতর থেকে বুকের কাছে লুকোনো ছোটো একটা প্যাকেট টেনে বার
করলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, এই আমার শেষ কথা। এই প্যাকেটের বিনিময়ে মুক্তি
পাবে অ্যালেক্সিস। ন্যায়বিচারের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আর অনুরাগের বিশ্বাসেই এ-জিনিস
গচ্ছিত রাখলাম আপনার হাতে। নিন! রাশিয়ান এমবাসিতে আপনি পৌঁছে দেবেন এই
প্যাকেটটা। আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে আর

থামাও ওঁকে! চেষ্টা করে উঠল হোমস। ঝড়ের মতো ঘরের মাঝ দিয়ে ছুটে গিয়ে
ভদ্রমহিলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে ছোটো একটা শিশি।

বড়ো দেরি হয়ে গেছে! শয্যার ওপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললেন উনি। বড়ো দেরি
হয়ে গেছে! গোপন স্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেই বিষ খেয়েছি আমি। মাথা ঘুরছে।
চললাম! প্যাকেটটার কথা স্মরণে রাখবেন স্যার-এ-দায়িত্ব আপনার।

শহরে ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে বলল হোমস, খুবই সোজা কেসটা। কিন্তু কয়েক দিক দিয়ে বেশ শিক্ষামূলক। প্রথম থেকেই পুরোপুরিভাবে কেসটা নির্ভর করছিল ওই প্যাঁসনেটার ওপর। কপাল ভালো তাই মরার আগে চশমাটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল স্মিথ। তা না হলে এ-রহস্যের মর্মোঘাটন কোনোদিন সম্ভব হত বলে মনে হয় না আমার। কাচ দুটোর শক্তি লক্ষ করেই বুঝেছিলাম, এ-চশমা যিনি ব্যবহার করেন, তাঁকে প্রায় অন্ধ বললেই চলে এবং চশমা-বিনা তিনি নিতান্তই অসহায়। তাই তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস করতে বললে যে আততায়ী সরু একফালি ঘাসের ওপর দিয়ে গেছে অথচ একবারও ভুল পা ফেলেনি, তোমার মনে থাকতে পারে, তখন আমি বলেছিলাম কাজটা বাস্তবিকই বড়ো অসাধারণ। মনে মনে কিন্তু আমি নিশ্চিত জানতাম, এ-কাজ একেবারে অসম্ভব। তার আর একটা চশমা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কাজেই ভদ্রমহিলা যে বাড়ির মধ্যেই আছেন এমন একটা প্রকল্প বা hypothesis বেশ গুরুত্ব নিয়ে ভাবতে বাধ্য হলাম আমি। দুটো করিডোরে একই রকমের দেখতে নারিকেল দড়ির মাদুর পাতা দেখে বুঝলাম, পথ ভুল করা খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। সেক্ষেত্রে তিনি যে প্রফেসরের ঘরে ঢুকেছেন, তা আর না-বললেও চলে। তাই প্রথম থেকেই রীতিমতো সজাগ হয়ে রইলাম। আমার ধারণা যাতে সত্য প্রমাণিত হয়, এমনি কোনো কিছু যাতে চোখ না-এড়ায়, সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে চোখে দেখতে লাগলাম সব কিছু। তন্নতন্ন করে ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম লুকোবার মতো কোনো জায়গা দেখার আশায়। কার্পেটটা একটানা পাতা এবং মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা। তাই, মেঝের ওপর চোরা-দরজার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলাম। বইগুলোর পেছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থাকতে পারে। জানেন তো, সেকলে লাইব্রেরিতে এ ধরনের কায়দা হামেশাই দেখা যায়। লক্ষ করলাম, মেঝের সর্বত্র পর্বতপ্রমাণ বই, কিন্তু

একটা বুককেসের সামনেটা একদম ফাঁকা। গোপন-স্থানের দরজা হয়তো এইটাই। কিন্তু আমার সাহায্য হতে পারে, এমনি কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। তবে কার্পেটটার রং ম্যাটমেটে ধূসর বাদামি-এ-রকম রঙের কার্পেট পরীক্ষা করা খুব সহজ। তাই, অমন চিৎকার সিগারেটগুলোর অনেকগুলো শেষ করে ফেললাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। আর ছাই ফেলতে লাগলাম সন্দেহজনক বুককেসটার সামনে সমস্ত জায়গাটার ওপর। কৌশলটা ভারি সহজ কিন্তু দারুণ কাজে লাগে। তারপর নীচে নেমে গেলাম। ওয়াটসন, তোমার সামনেই তো প্রমাণ করলাম, আমার ধারণা সত্য। প্রমাণ করলাম যে প্রফেসর কোরামের খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, তাই নয় কি? তুমি অবশ্য আমার কথার এলোমেলো ধরন থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারনি। আবার গেলাম ওপরতলায়। সিগারেটের বাক্স উলটে দিয়ে খুব কাছ থেকে ভালো করে দেখে নিলাম মেঝের অবস্থাটা। সিগারেটের ছাইয়ের চিহ্ন থেকে বেশ পরিষ্কার বুঝলাম, আমাদের অবর্তমানে গোপন-স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। ওহে হপকিনস, শেরিং ক্রস তো এসে গেল। কেসটার এ-রকম সার্থক সমাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানাই তোমায়। নিশ্চয় এখন হেড কোয়ার্টারে চলেছ তুমি। ওয়াটসন, একটা গাড়ি নিয়ে চলো তুমি, আর আমি যাই রাশিয়ান এমবাসিতে।

টীকা

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

প্যাঁসনের প্যাঁচে প্রফেসর : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাঁসনে ইংলন্ডে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের জুলাই ১৯০৪ সংখ্যায় এবং আমেরিকায় কলিয়ার্স উইকলির ২৯ অক্টোবর ১৯০৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

বাথ চেয়ার : ছইল চেয়ার আনুমানিক ১৭৫০-এ বাথ শহরে এই ধরনের চেয়ার প্রথম নির্মাণ করেন জেমস হিথ। সেই সময়ে, বা পরেও, চাকা লাগানো এই চেয়ারের প্রচলিত নাম ছিল বাথ চেয়ার।

আলেকজান্দ্রিয়ান সিগারেট : মিশরীয়দের ছকায় ধূমপানের জন্য গুড় দিয়ে মিষ্টি করা বিশেষ জাতের তামাকে তৈরি সিগারেটের কথা বলা হয়ে থাকা সম্ভব।

বিপ্লবী-নিহিলিস্ট : দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়নস গল্লেসের টীকা দ্রষ্টব্য। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ১৮৮১ সালে হত্যা করে নিহিলিস্টরা। তার ফল হিসেবে কয়েকশো নিহিলিস্টকে মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন দেওয়া হয়।

প্রশ্নপত্রের পলায়ন

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি স্টুডেন্টস]

১৮৯৫ সাল। একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনার চাপে পড়ে মি. শার্লক হোমস এবং আমাকে কয়েক হপ্তা একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে থাকতে হয়েছিল। এইখানেই এক সন্ধ্যায় এক পরিচিত ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন আমাদের সঙ্গে। ভদ্রলোকের নাম মি. হিলটন সোমস, কলেজ অফ সেন্ট লিউকস-এর শিক্ষক এবং লেকচারার। রোগাটে লম্বা। নার্ভাস প্রকৃতির এবং একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেদিন তার মধ্যে এমনই অদম্য উত্তেজনার লক্ষণ দেখলাম যে, বুঝতে অসুবিধে হল না বেজায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে।

মি. হোমস, আমার বিশ্বাস আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েকটি ঘণ্টা আমার জন্য ব্যয় করবেন। সেন্ট লিউকস-এ একটা বড়ো বিশ্রী কাণ্ড ঘটেছে। সৌভাগ্যক্রমে এ-শহরে আপনি এখন উপস্থিত রয়েছেন। তা না হলে আমি তো ভেবেই পেতাম না যে, এ-পরিস্থিতিতে কী করা উচিত আমার।

আগেই একটা জিনিস খোলসা করে রাখি আপনার কাছে। আগামীকালই ফর্টেক্স স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রথম দিন। পরীক্ষকদের মধ্যে আমিও আছি। আমার বিষয় গ্রিক। ফাস্ট পেপারে ছাত্রদের অদেখা একটি মস্তবড়ো প্যাসেজ থাকে গ্রিক থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য। পরীক্ষার খাতাতেই ছাপা থাকে এই প্যাসেজটা। কাজেই কোনো

পরীক্ষার্থী যদি আগে থেকেই প্যাসেজটা তৈরি করে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে স্বভাবতই বিলম্ব সুবিধে হয় তার। এই কারণেই কাগজটাকে গোপন রাখার জন্য দারুণ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

আজকে প্রায় তিনটের সময়ে কাগজটার প্রফ এসে পৌঁছোয় ছাপাখানা থেকে। থিউসিডাইডিজ-এর আধখানা পরিচ্ছেদ তুলে দেওয়া হয়েছে তরজমার জন্যে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্যাসেজটা পড়তে হয় আমায়, কেননা তা অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল থাকা দরকার। সাড়ে চারটার সময়েও শেষ হল না আমার কাজ। এক বন্ধুর বাড়িতে চা-পানের কথা ছিল। তাই প্রফটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেলাম। আমি। ঘন্টাখানেকেরও বেশি হবে বাইরে ছিলাম। আপনি তো জানেন, মি. হোমস, আমাদের কলেজের দরজাগুলো ভেতর বাইরে দু-রকম হয়। ভেতর দিকে থাকে সবুজ রঙের পুরু পশমি কাপড়ের আবরণ। আর বাইরের দিকে ভারী ওক কাঠের পাশ্লা। বাইরের দরজার দিকে এগুতেই অবাক হয়ে গেলাম চাবির গর্ত থেকে একটা চাবি ঝুলতে দেখে। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তোবা ভুলে ফেলে গেছি আমি। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখি, তা তো নয়। যতদূর আমি জানি, ঘরের দোসরা চাবি থাকে শুধু একজনের কাছেই এবং সে আমার পরিচারক ব্যানিস্টার। আজ দশ বছর হল ব্যানিস্টার আমার সব কিছু দেখাশুনা করে আসছে এবং তার সততা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার জাগে না। দেখলাম, চাবিটা তারই বটে। আমি চা পান করব কি না, তা জিজ্ঞেস করার জন্যেই ঘরে ঢুকেছিল ও। তারপর বেরিয়ে আসার সময়ে ভুল করে চাবিটা রেখে এসেছে দরজায়। অত্যন্ত অসাবধানীর মতো কাজ। আমি বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চয় এসেছিল ও ঘরের মধ্যে। চাবি সম্বন্ধে ওর এতটা ভুল হওয়াটা অন্য সময় হলে কোনোরকম ক্ষতিকর ছিল

এবং তাতে এমন কিছু যেত আসত না। কিন্তু আজকের দিনে এই সামান্য ভুলের পরিণাম কী নিদারুণ শোচনীয়, তা কহতব্য নয়।

টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই বুঝলাম কে যেন আমার কাগজপত্র হাতড়ে গেছে তাড়াহুড়ো করে। লম্বা লম্বা তিনটে স্লিপ কাগজে প্রফটা এসেছিল। তিনটে কাগজই একসঙ্গে রেখে গেছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখলাম, একটা কাগজ পড়ে মেঝের ওপর, একটা জানলার পাশে রাখা সাইড-টেবিলের ওপর, আর তৃতীয়টা আমি যেখানে রেখে গেছিলাম ঠিক সেখানেই!

এই প্রথম নড়েচড়ে বসল হোমস।

প্রথম পাতাটা মেঝের ওপর, দ্বিতীয়টা জানলার কাছে, আর তৃতীয়টা যেখানে রেখে গেছিলেন সেখানেই? বলল সে।

এগজ্যাক্টলি, মি. হোমস। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি কী করে জানলেন?

দয়া করে আপনার রীতিমতো ইন্টারেস্টিং কাহিনির বাকিটুকু বলে ফেলুন।

ক্ষণিকের জন্য ভেবেছিলাম, বুঝি-বা ব্যানিস্টারই এই ক্ষমাহীন অপরাধটি করেছে। আমার অবর্তমানে খুশিমতো নাড়াচাড়া করে দেখেছে আমার কাগজপত্র। কিন্তু সে তা

অস্বীকার করলে। তার সুগভীর ঐকান্তিকতা দেখে বুঝলাম, সত্য বই মিথ্যে বলেনি সে। তাহলে বিকল্প অনুমান দাঁড়াচ্ছে এই এদিক দিয়ে কেউ যেতে যেতে দরজায় চাবি ঝুলতে দেখেছিল। সে জানত আমি ঘরে নেই। তাই ভেতরে ঢুকেছিল আমার কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিতে। বিপুল অঙ্কের অর্থ জলে যেতে বসেছে মি. হোমস। স্কলারশিপটা বাস্তবিকই ভারি মূল্যবান। কাজে কাজেই, ন্যায় অন্যায় যে বোঝে না, অধর্ম-ভয়ে যে ঘাবড়ায় না, সে যদি অন্যান্য ছাত্রদের ওপর টেক্সা মারার বদ মতলবে এ-ঝুঁকি নেয় তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এ-ঘটনায় দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছে ব্যানিস্টার। যখন দেখলাম সত্যি সত্যিই আমার কাগজপত্র সে ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে এবং এ-সম্বন্ধে যখন কোনো সন্দেহই আর রইল না, তখন তো ব্যানিস্টার প্রায় অজ্ঞান হয় হয় এমনি অবস্থা। খানিকটা ব্র্যান্ডি দিলাম ওকে। আধমরার মতো ও জবুথবু হয়ে বসে রইল একটা চেয়ারে। আর আমি আবার বেশ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করলাম ঘরটাকে। তখনই দেখলাম, এদিকে সেদিকে ছড়ানো কাগজ ছাড়াও আগন্তুক তার অনধিকার প্রবেশের আরও কিছু চিহ্ন রেখে গেছে ঘরের মধ্যে। জানলার কাছে টেবিলের ওপর পেনসিলের কাটা কাঠের কুটো দেখে বুঝলাম একটা পেনসিল ছুঁচোলো করা হয়েছিল সেখানে। একটা ভাঙা শিসও পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। অর্থাৎ, রাসকেলটা বেজায় তাড়াহুড়ো করে কাগজটাকে নকল করতে গিয়ে পেনসিলের শিস ভেঙে ফেলে। কাজেই বাধ্য হয়ে পেনসিল ছুঁলে আবার নতুন শিস বার করে নিতে হয় তাকে।

এক্সেলেন্ট। বলে ওঠে হোমস। কেসটার বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে যতই তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল ও, ততই শরীফ হয়ে উঠেছিল বিগড়োনো মেজাজ। ভাগ্য আপনার সহায়।

এই সব নয়, মি. হোমস, আরও আছে। আমার লেখার টেবিলটা নতুন। পাতলা মসৃণ লাল চামড়া দিয়ে ঢাকা ওপরটা। শুধু আমি নয়। ব্যানিস্টারও আমার সুরে সুর মিলিয়ে শপথ করে বলতে রাজি আছে যে মোলায়েম চামড়ার ওপরে এতটুকু আঁচড় বা দাগ কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এখনও দেখলাম, প্রায় ইঞ্চি তিনেকের মতো লম্বা একটা পরিষ্কার কাটা। নিছক আঁচড়ের দাগ নয়, সত্যিকারের কাটা। শুধু তাই নয়। টেবিলের ওপর কাদা মাটি, খমির বা অন্য কোনো নরম পদার্থের একটা ছোট বলও পেলাম। বলটার গায়ে ফুটকি দাগ দেখে করাতচেরা কাঠের গুঁড়ো বলে মনে হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-লোকটা আমার কাগজপত্র ঘেঁটে গেছে, এসব চিহ্ন তারই। পায়ের ছাপ বা লোকটাকে শনাক্তকরণের অন্য কোনো প্রমাণাদি পেলাম না ঘরে। দেখে শুনে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি তত বেবাক গুলিয়ে গেল। কিন্তু আপনি যে এই শহরেই এখন রয়েছেন, তা আচমকা মনে পড়তেই আশার আলো দেখলাম। তাই সিধে চলে এসেছি এ-কেস আপনার হাতে তুলে দিতে।

দাঁড়িয়ে উঠে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে হোমস বললে, এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলে সত্যিই খুশি হব আমি। আমার সাধ্যমতো পরামর্শও আমি দেব আপনাকে। কেসটা একেবারেই নিরেস নয়। ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কিছু আছে। পেপারগুলো আপনার হাতে আসার পর আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আপনার ঘরে কেউ এসেছিল কি?

হ্যাঁ, এসেছিল। ওই একই তলায় তরুণ ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম থাকে। পরীক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি খুঁটিনাটি খবরাখবর জানতে এসেছিল ও।

পরীক্ষায় সে-ও বসছে?

হ্যাঁ।

পেপারগুলো টেবিলের ওপরেই ছিল, তাই না?

আমার যতদূর বিশ্বাস, গোল করে পাকানো ছিল কাগজগুলো।

কিন্তু প্রফ বলে চেনা তো যেত?

খুব সম্ভব।

আর কেউ আসেনি?

না।

আর কেউ জানত কি যে আপনার ঘরে প্রফগুলো আসবে?

ছাপাখানার লোক ছাড়া আর কেউ না ।

ব্যানিস্টার জানত কি?

না, না, নিশ্চয় না । কেউ জানত না । বেচারি! খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ার পর ওই অবস্থাতেই তাকে রেখে পড়ি কি মরি করে ছুটে এসেছি আপনার কাছে ।

দরজা খোলা রেখে এসেছেন?

পেপারগুলো আগে তালাচাবি দিয়ে রেখেছি ভেতরে ।

তাহলে মি. হোমস ব্যাপারটা মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এই-ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম যদি পাকানো কাগজগুলোকে প্রফ বলে চিনে না-থাকে, তাহলে যে-লোকটা কাগজগুলো ঘেঁটেছে সে কিন্তু কাগজগুলো যে ওখানে আছে তা না-জেনেই দৈবাৎ ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর ।

আমারও তাই মনে হয় ।

প্রহেলিকা-আবিল দুর্বোধ্য হাসি হাসল হোমস ।

বলল, চলুন, ঘুরে আসা যাক এক চক্রর। এ কিন্তু তোমার কেস নয়, ওয়াটসন-মানসিক ব্যাপার, শরীর ঘটিত নয়। বেশ, বেশ, ইচ্ছে হলে চলে এসো। মি. সোমস-আমরা প্রস্তুত!

আমাদের মক্কেল ভদ্রলোকের বসার ঘরের লম্বা, কিন্তু নীচু জাফরিকাটা জানলার পরেই প্রবীণ কলেজের গাছ-শ্যাওলার ছোপ ছোপ দাগ কলঙ্কিত সুপ্রাচীন প্রাঙ্গণটা। গথিক প্যাটার্নের খিলানওলা দরজার পরেই ক্ষয়ে আসা পাথরের সিঁড়ির সারি। একতলায় মি. সোমসের ঘর। আর ওপরের তিনতলায় এক এক তলায় এক একজন ছাত্রের ঘর। এহেন হেঁয়ালি-দৃশ্যে যখন পৌঁছোলাম, তখন গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধরিত্রীর বুকে। তারপর আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সারস পাখির মতো গলা লম্বা করে তাকাল ঘরের ভেতর।

আমাদের পণ্ডিত পথপ্রদর্শক ভদ্রলোক বললেন, নিশ্চয় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল লোকটা। কেননা কাচের শার্সিতে একটিমাত্র কাচ, তা ছাড়া আর প্রবেশপথ নেই।

কী বিপদ? বলে ওঠে হোমস। তারপর মি. সোমসের পানে তাকিয়ে কীরকম যেন আশ্চর্যভাবে হেসে ওঠে। বেশ, বেশ, এখানে যদি কিছু না পাওয়া যায় তো চলুন, আমরা বরং ভেতরে যাই।

চাবি ঘুরিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে ফেললেন লেকচারার, তারপর সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ভেতরে। প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা। আর কার্পেটটা পরীক্ষা করতে শুরু করলে হোমস।

বললে, উঁহু, এখানে কোনো চিহ্ন দেখছি না। এ-রকম শুকনো খটখটে দিনে আশা করাও অন্যায্য। আপনার পরিচারক মনে হচ্ছে বেশ সামলে নিয়েছে। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বললেন। কোন চেয়ারটা বলুন তো?

জানলার পাশেরটা।

বটে। ছোট্ট এই টেবিলের কাছে, এখন ভেতরে আসতে পারেন আপনারা। কার্পেট দেখা সাজ হয়েছে আমার। এবার সবার আগে এই ছোট্ট টেবিলটা নিয়ে পড়া যাক। ঘটনা পরম্পরাগুলো কিন্তু জলের মতোই দিব্যি পরিষ্কার। লোকটা ঘরে ঢুকে মাঝখানের টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নেয়। একেবারেই সবগুলো নয়-প্রতিবারে একটি তাড়া। কাগজগুলো নিয়ে যায় সে জানলার ধারে টেবিলটার কাছে এই উদ্দেশ্যে যে, উঠোনের মাঝ দিয়ে আপনাকে আসতে দেখলেই সে সটকান দিতে পারবে অনায়াসে।

সোমস বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে তা পারত না। কেননা, আমি পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম।

আ, তা বেশ! সে যাই হোক, এই অভিসন্ধিই ছিল তার মনে। এবার দেখা যাক স্লিপ কাগজগুলো। আঙুলের ছাপ নেই—নাঃ! আচ্ছা, এইটাই সে প্রথমে নিয়ে যায় জানলার কাছে, নকলও করে ফেলে। সবরকমের সম্ভাবনা অল্পীকরণ পন্থা কাজে লাগিয়েও এটা কপি করতে তার কতক্ষণ লাগা উচিত? মিনিট পনেরো তো বটেই, তার কম নয় কিছুতেই। প্রথমটা হয়ে যেতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুলে নিলে পরেরটা। এই নিয়েই যখন সে ব্যস্ত, ঠিক তখনই এসে পড়লেন আপনি। বেজায় ত্বরিতগতিতে বিদ্যুতের মতো গা ঢাকা দিতে হল তাকে। মনে রাখবেন, খুব তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুতবেগে তাকে অন্তর্হিত হতে হয়েছে। কেননা, কাগজগুলো ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকা মানেই যে তার উপস্থিতি আপনাকে জানিয়ে দেওয়া—তা সত্ত্বেও সে পেপারগুলো টেবিলের ওপর যথাস্থানে রেখে যেতে পারেনি, রাখার সময় পায়নি। দরজার সামনে পৌঁছে সিঁড়ির ওপর খুব দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?

না। এ-বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলাম না আমি।

যাই হোক, ঝড়ের মতো লিখতে গিয়ে পেনসিলের শিস ভেঙে ফেলে সে। আপনি তো লক্ষ করেছেন, আবার পেনসিল ছুঁলে ছুঁচোলো করতে হয়েছে তাকে। পয়েন্টটা কিন্তু ভারি চিত্তাকর্ষক, ওয়াটসন। পেনসিলটা সাধারণ পেনসিল নয়। আর পাঁচটা পেনসিলের মতোই এর সাইজ। নরম শিস। বাইরের রংটা গাঢ় নীল। রূপোলি অক্ষরে লেখা নির্মাতার নাম। অনেক ব্যবহারের পর, তার এখনকার দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে দেড় ইঞ্চি। মি. সোমস, এইরকম একটা পেনসিলের সন্ধানে থাকুন, তাহলেই যাকে খুঁজছেন তার হদিশ

আপনি পেয়ে যাবেন। এইসঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিই-বড়ো সাইজের বেজায় ভোতা, একটা ছুরিও পাবেন লোকটার কাছে। আপনার আরও সুবিধে হয়ে গেল, মি. সোমস।

মি. সোমস তখন তথ্যের এহেন বন্যায় বেশ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য পয়েন্টগুলো না হয় বুঝলাম। কিন্তু দৈর্ঘ্য সম্পর্কে যা বললেন—

ছোট একটা কুচো তুলে নিলে হোমস। কুচোটর ওপর NN অক্ষর দুটি লেখা এবং তারপরে খানিকটা কাঠ একদম ফাঁকা।

দেখছেন তো?

না, দেখছি না, এখনও আমি বুঝতে পারছি না—

ওয়াটসন, চিরকালই তোমার ওপর অবিচার করে এসেছি আমি। এদিক দিয়ে তুমি একলা নও, আরও অনেকে আছেন। এই NN অক্ষর দুটো কী হতে পারে বলো তো? একটা শব্দের শেষের দুটো অক্ষর। তুমি তো জান JOHANN FABER হচ্ছে সবচেয়ে নামকরা পেনসিলনির্মাতার নাম। JOHANN শব্দটার পর সাধারণত পেনসিলের কতখানি অংশ অবশিষ্ট থাকে, তা অনুমান করা কি খুব কঠিন? ছোটো টেবিলটাকে কাত করে বৈদ্যুতিক বাতির দিকে ফিরিয়ে ধরলে হোমস। ভেবেছিলাম, যে-কাগজে সে লিখেছে, তা যদি পাতলা হত, তাহলে পেনসিলের চাপে কিছু কিছু চিহ্ন ফুটে উঠত পালিশ করা চকচকে টেবিলের ওপর। নাঃ, তেমন কিছুই দেখছি না। এখানে আর কিছু জানা যাবে

বলে তো মনে হয় না আমার। এবারে মাঝখানের টেবিলটা। কাদামাটি বা নরম পদার্থের এই ছিটে গুলির মতো বলটার কথাই আপনি বলছিলেন, তাই না? আকারে মোটামুটি পিরামিডের মতো। হুঁ, ভেতরটা প্রায় পা। ঠিকই বলছেন, মি. সোমস, করাত চেরা কাঠের গুঁড়োর মতোই কয়েকটা কণা দেখা যাচ্ছে বটে। সর্বনাশ এ তো দেখছি দারুণ ইন্টারেস্টিং জিনিস। আর এই কাটাটা-বটে, দেখছি সত্যি সত্যিই ছিঁড়ে দু-ভাগ হয়ে গেছে চামড়াটা। শুরু হয়েছে পাতলা আঁচড় দিয়ে, শেষ হয়েছে খাঁজকাটা গর্তে। এ-কैसे আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, মি. সোমস। এ-দরজা দিয়ে যাওয়া যায় কোথায়?

আমার শোবার ঘরে।

আপনার অ্যাডভেঞ্চারের পর ও-ঘরে আর গিয়েছিলেন?

না। সিধে চলে গেছি আপনার কাছে।

ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। বাঃ, ভারি সুন্দর ঘর তো! দিব্যি সেকেলে কায়দায় সাজানো! মেঝে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিনিটখানেকের জন্যে সবুর করবেন নিশ্চয়। এ-পর্দাটা কীসের? পেছনে পোশাক-টোশাক বুঝি? এ-ঘরে যদি কেউ লুকোতে চায়, তাহলে তার আদর্শ স্থান হল এইখানটা। কেননা বিছানাটা দারুণ নীচু, পোশাক রাখার আলমারিটাও বেজায় পাতলা। কেউ নেই বলেই তো মনে হয়, তাই না?

পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলে হোমস। আমি কিন্তু ওর সামান্য শক্ত হয়ে ওঠা আর ভাবভঙ্গির সজাগ সতর্কতা দেখেই বুঝেছিলাম আচমকা কারো বেরিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তবে পর্দায় হাত দিয়েছে ও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পর্দা সরানোর পর আলনা থেকে ঝোলানো তিন-চারটে সুট ছাড়া আর কারো টিকিটিও দেখা গেল না ওই স্বল্প পরিসরের মধ্যে। ঘুরে দাঁড়াল হোমস। তার পরেই হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর। আরে! আরে! এটা কী? বলে ওঠে ও।

জিনিসটা একটা ছোট পিরামিড। কালো রঙের পুটিন জাতীয় উপাদানে তৈরি। পড়াশুনা করার ঘরে টেবিলের ওপর যে পিরামিডটি পাওয়া গেছে, ছবছ সেইরকম। হাতের তালুর ওপর জিনিসটা রেখে প্রখর বিদ্যুৎ বাতির নীচে ধরল হোমস।

আগন্তুক শুধু আপনার বসবার ঘরেই নয়, মি. সোমস, শোবার ঘরেও তার আগমনের চিহ্ন রেখে গেছে দেখছি।

কিন্তু এখানে তার কী দরকার?

আমার তো মনে হয় তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। অপ্রত্যাশিত পথে দুম করে ফিরে এলেন আপনি। কাজে কাজেই আপনি একেবারে দোরগোড়ায় না-এসে পৌঁছানো পর্যন্ত হুঁশিয়ার হওয়ার মতো কোনো নিশানাই পেল না সে। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তার? যে যে জিনিসগুলো তাকে ধরিয়ে দেবে, সেইগুলোই দু-হাতে তুলে নিয়ে তিরবেগে ঢুকে পড়ল সে আপনার শোবার ঘরে গা-ঢাকা দেওয়ার অভিপ্রায়ে।

হে ভগবান! মি. হোমস, আপনি কি তাহলে বলেন, যতক্ষণ ব্যানিস্টারের সঙ্গে ও-ঘরে আমি কথা বলছিলাম, ততক্ষণ আসল লোকটা ঘাপটি মেরে ছিল এ-ঘরে, আর আমি তার কিছুই

জানতে পারিনি?

তাই তো দেখছি।

নিশ্চয় আর একটা বিকল্প আছে, মি. হোমস? আমার শোবার ঘরের জানলাটা লক্ষ করেছেন কি?

জাফরিকাটা, কাচের শার্সিওলা, সিসের ফ্রেম, তিনটে আলাদা আলাদা জানলা, একটায় কবজা লাগানো এবং এত বড়ো যে অনায়াসেই একজন মানুষ ঢুকতে পারে।

এগজ্যাক্টলি। উঠোনের দিকে কোণ করে থাকায় জানলার খানিকটা প্রায় অদৃশ্য থাকে বললেই চলে। ওই দিক দিয়েই লোকটা ঢুকেছিল ভেতরে। শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে যায় ঘরের মধ্যে। সবশেষে, দরজাটা খোলা পেয়ে লম্বা দেয় সেই পথেই।

অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়তে লাগল হোমস।

বললে, এবার একটু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া যাক। আপনি তো বললেন না, তিনজন ছাত্রই এ-সিঁড়ি ব্যবহার করে বলে প্রায় তাদের যাতায়াত করতে হয় আপনাদের দরজার সামনে দিয়ে, তাই তো?

হ্যাঁ, তাই।

তিনজনেই পরীক্ষায় বসছে?

হ্যাঁ।

তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাউকে সন্দেহ করার কোনো কারণ আপনার আছে কি?

ইতস্তত করতে লাগল সোমস।

তারপর বললে, এ বড়ো জবর প্রশ্ন করলেন, মি. হোমস মহা পরে ফেললেন আমায়। প্রমাণাদির বালাই যেখানে নেই, সেখানে চট করে কেউ কি কাউকে সন্দেহ করতে চায়?

সন্দেহই শোনা যাক। প্রমাণ খোঁজার ভার আমার।

তাই যদি হয় তো সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় তিন ঘরের তিন বাসিন্দার চরিত্র বর্ণনা করেছি। নীচের তলায় থাকে গিলক্রাইস্ট, ছাত্র হিসাবে ভালো। খেলোয়াড় হিসাবেও সুনাম আছে। কলেজের রাগবি আর ক্রিকেট টিমে খেলে। হার্ডলস অর লং জাম্পে বু হয়েছে। চমৎকার ছেলে সে, সব দিক দিয়ে পুরুষের মতো। রেসকোর্সে যিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, সেই কুখ্যাত স্যার জাবেজ গিলক্রাইস্ট ওর বাবা। ছেলে কিন্তু খুবই গরিব। তাহলেও সে কঠোর পরিশ্রমী আর অধ্যবসায়ী। পরীক্ষায় ওর ফলাফল ভালোই হবে।

দোতলায় থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম। ছেলেটি শান্তশিষ্ট দুর্বোধ্য এবং আগাগোড়া রহস্যময়। সব ভারতীয়ই যা হয়, তাই আর কি। পড়াশুনায় সে ভালোই, যদিও সব সাবজেক্টের মধ্যে গ্রিকেই সে কাঁচা। অটল তার চরিত্র এবং কাজকর্মও বেশ পদ্ধতিমায়িক।

ওপরের তলাটা মাইলস ম্যাকলারেনের। কোনো কাজ যদি করবে বলে মনে করে তো ধীশক্তির দিক দিয়ে তার জুড়ি মেলা ভার। এই ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বলতম প্রতিভাদের অন্যতম সে। কিন্তু সে চঞ্চলচিত্ত, উচ্ছ্বল আর নীতিহীন। ফাস্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে তাস খেলা নিয়ে একটি কেলেক্সারি হওয়ায় কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এবারের পুরো পাঠক্রমটা সে ফাকি দিয়েছে। কাজেই নিশ্চয় এ-পরীক্ষা একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

তাহলে একেই আপনি সন্দেহ করেন বলুন?

অতদূর যাওয়ার সাহস আমার নেই! তবে তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কম সন্দেহ যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে সে হয়তো মাইলস ম্যাকলারেন নয়।

এগজ্যাক্টলি। মি. সোমস এবার আপনার পরিচারক ব্যানিস্টারকে একটু দেখতে চাই।

লোকটা আকারে ছোটোখাটো। সাদাটে, পরিষ্কার কামানো মুখ। ধোঁয়াটে রঙের কঁচাপাকা চুল। বছর পঞ্চাশ বয়স। রোজকার অচঞ্চল জীবনধারায় এই আকস্মিক উৎপাতের যন্ত্রণায় তখনও কষ্ট পাচ্ছিল সে। স্নায়বীয় দুর্বলতার জন্যে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার গোলগাল মুখ। হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত স্থির রাখতে পারছিল না বেচারি।

মি. সোমস বললেন, এই যাচ্ছেতাই ব্যাপারটার একটা বিহিত করা দরকার, তাই আমরা তদন্ত শুরু করেছি, ব্যানিস্টার।

ইয়েস, স্যার।

হোমস বললে, শুনলাম দরজায় চাবি ফেলে গেছিলে তুমি?

ইয়েস, স্যার।

যেদিন পেপারগুলো ঘরের মধ্যে এল, ঠিক সেইদিনই চাবি খুলে নিতে ভুলে গেলে তুমি যোগাযোগটা কি খুব অসাধারণ ঠেকছে না?

আমার কপাল মন্দ, স্যার । কিন্তু এর আগেও মাঝে মাঝে এমন ভুল আমার হয়েছে ।

ঘরে ঢুকেছিলে কখন?

সাড়ে চারটা নাগাদ । মি. সোমসের চা-পানের সময় তখন ।

কতক্ষণ ছিলে ঘরের ভেতর?

উনি ঘরে নেই দেখে তখুনি বেরিয়ে যাই আমি ।

টেবিলের ওপর রাখা পেপারগুলো লক্ষ করেছিলে?

না, স্যার, মোটেই করিনি ।

দরজা থেকে চাবি খুলে নিতে ভুলে গেলে কেমন করে?

আমার হাতে চাবির ট্রে ছিল । ভাবলাম, ফিরে এসে নিয়ে যাব চাবিটা । তারপর ভুলে গেছি ।

বাইরের দরজায় কি স্প্রিংয়ের তালা লাগানো আছে?

না, স্যার ।

তাহলে সর্বক্ষণই খোলা ছিল দরজাটা?

ইয়েস, স্যার ।

মি. সোমস ফিরে এসে তোমাকে যখন ডেকে পাঠান, তখন তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলে?

ইয়েস, স্যার । এত বছর এখানে আছি । কিন্তু এরকম ঘটনা তো কোনোদিন ঘটেনি । প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়েছিল আমার ।

তা তো বটেই । যখন বুঝলে শরীর খারাপ লাগছে, তখন কোনখানটায় ছিলে তুমি?

কোনখানে ছিলাম স্যার? কেন এইখানে দরজার পাশেই ।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! এতটা পথ গিয়ে দূরের কোণে ওই চেয়ারটায় বসেছিলে কিনা, তাই বললাম । মাঝের এ-চেয়ারে বসলে কেন শুনি?

জানি না স্যার । বসার জায়গা নিয়ে তখন আমি এত ভাবিনি ।

এ-ব্যাপারে ও যে বিশেষ কিছু জানে, তা আমার সত্যি সত্যিই মনে হয় না, মি. হোমস।
খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল ওকে-ছাইয়ের মতো একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল।

মি. সোমস চলে যাওয়ার পর এ-ঘরে ছিলে তুমি?

মিনিটখানেকের জন্যে ছিলাম। তারপর দরজায় তালা দিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই আমি।

কাকে সন্দেহ হয় তোমার?

কারো নাম করার আমার সাহস হয় না স্যার। এ ধরনের নোংরা কাজ করে লাভবান
হওয়ার মতো প্রবৃত্তি এ-ইউনিভার্সিটিতে কোনো ভদ্রলোকের আছে বলে মনে হয় না
আমার। না, স্যার, আমার তা বিশ্বাস হয় না।

ধন্যবাদ। ওতেই হবে। বললে হোমস। ওহো, আরও একটা কথা। এই যে তিনজন
ভদ্রলোকের দেখাশুনা কর তুমি, ওদের কাউকে বলনি তো এখান থেকে কিছু খোঁয়া
গেছে?

না, স্যার, একটা অক্ষরও বলিনি।

ওদের কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না, স্যার ।

বেশ, বেশ । এবার অনুমতি করেন তো চত্বরটা এক পাক ঘুরে আসা যাক ।

সন্ধ্যার বিষণ্ণ আঁধার গাঢ় হয়ে আসছিল । তারই মাঝে তিনটে হলুদ রঙের চৌকোনা আলো ঝকঝক করছিল আমাদের মাথার ওপরে ।

ওপরে তাকিয়ে হোমস বললে, আপনার তিনটে পাখিই দেখছি নিজের নিজের বাসায় রয়েছে । আরে! আরে! ও কী! ওদের একজন তো দারুণ অশান্তিতে ছটফট করছে মনে হচ্ছে?

পর্দার ওপর আচমকা ভেসে উঠল ভারতীয় ছাত্রের কুচকুচে কালো ছায়া । দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি জুড়েছিল সে ।

হোমস বললে, ওদের প্রত্যেকের ঘরে একবার ঝাঁকি দর্শন দিয়ে আসতে চাই! সম্ভব হবে কি?

সোমস জবাব দিলেন, কোনো অসুবিধে নেই । এ ঘর তিনটে কলেজের সবচেয়ে পুরানো ঘর বলে দর্শনেচ্ছুর আগমনটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় । আসুন, আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের ।

গিলক্রাইস্টের দরজায় টোকা মারার সঙ্গেসঙ্গে হোমস বলে উঠল, নাম বলবেন না, প্লিজ! ছিপছিপে চেহারার দীর্ঘতনু একটি যুবাপুরুষ দরজা খুলে দিলে। সোনালি রেশমের মতো একমাথা হালকা চুল। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে ভেতরে। মধ্যযুগীয় গার্হস্থ্য স্থাপত্যের কতকগুলি বিচিত্র নিদর্শন ছিল ঘরের মধ্যে। সত্যি সত্যি দেখবার মতো! একটা দেখে হোমস তো এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গেল যে তা আঁকতে শুরু করে দিলে নিজের নোটবইয়ের পাতায়। পেনসিলের শিস ভেঙে যাওয়ায় গিলক্রাইস্টের কাছ থেকে একটা পেনসিল ধার চেয়ে নিলে; সবশেষে, একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে শানিয়ে নিলে নিজের পেনসিলটা! এই আশ্চর্য দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ভারতীয়ের ঘরেও। ছেলেটি স্বল্পভাষী, খর্বকায়। হকের মতো বেঁকানো নাক। আড়চোখে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল সে। হোমসের স্থাপত্য সম্পর্কিত অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! বেশ বুঝলাম, আমাদের বিদায় দিয়ে খুশি হল সে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই হোমস যে তার অভীক্ষিত সূত্রের সন্ধান পায়নি, তা পবিষ্কার বুঝতে পারলাম ওর মুখ দেখে। তৃতীয়বার নিষ্ফল হল আমাদের অভিযান। টোকা মারা সত্ত্বেও দরজা খোলা দূরে থাকুক, ভেতর থেকে এমন এক পশলা কদর্য ভাষার বর্ষণ ভেসে এল যে কহতব্য নয়। তুমি যে-ই হও না কেন, পরোয়া করি না। গোল্লায় যাও! গর্জে ওঠে ত্রুদ্ধ কণ্ঠ। কাল আমার পরীক্ষা। আজকে কারো ক্ষমতা নেই আমায় বাইরে বার করে।

অত্যন্ত রুক্ষ ছোকরা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাগের চোটে লাল হয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন আমাদের পথপ্রদর্শক। ও অবশ্য জানত না যে আমিই টোকা মেরেছি

দরজায়। তাহলে ওর স্বভাবটাই ওইরকম অভব্য, অভদ্র আর এ-রকম অবস্থায় তো বাস্তবিকই সন্দেহজনক।

প্রত্যুত্তরে হোমস যা শুধাল, তা সত্যিই বিচিত্র।

ওর সঠিক উচ্চতাটা বলতে পারেন?

মি. হোমস, তা বলা মুশকিল। ভারতীয় ছাত্রের চেয়ে ও লম্বা বটে, তবে গিলক্রাইস্টের মতো অতটা নয়। আমার তো মনে হয় পাঁচ ফুট ছ-ইঞ্চির ধারেকাছে হবে।

দারুণ দরকারি পয়েন্ট, বললে হোমস। গুড নাইট, মি. সোমস।

বিস্ময়ে হতাশায় সজোরে চেষ্টা করে ওঠেন আমাদের পথপ্রদর্শক।

হায় ভগবান, মি. হোমস, এভাবে আমাকে অকূল পাথারে ফেলে সত্যি সত্যিই কি আপনি দুম করে চললেন? পরিস্থিতিটা এখনও উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। আগামীকাল পরীক্ষা। আজ রাতেই পাকাঁপাকি কিছু ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে তো পরীক্ষায় বসতে দিতে পারি না। যেভাবেই হোক এ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আমায়।

যেমন আছে, তেমনি চলুক। কিছু রদবদল করবেন না। কাল ভোরের দিকে এখানে আসছি। তখনই এ-প্রসঙ্গে কথা বলবখন। আমার তো মনে হয়, তখনই কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, সে-সম্পর্কে কিছু শলাপরামর্শ দিতে পারব। ইতিমধ্যে কোনো কিছুই পরিবর্তন করবেন না-সামান্য পরিবর্তনও নয়।

বেশ, তাই হবে, মি. হোমস।

আপনি নিরঙ্কুশ নিশ্চিত মনে থাকতে পারেন। এ উটকো উৎপাত থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা-না-একটা পথ নিশ্চয় আবিষ্কার করতে পারব আমরা। কালো কাদামাটির পিরামিড আর পেনসিলের কুচোগুলো নিয়ে চললাম। গুড বাই।

চত্বরে অন্ধকারে বেরিয়ে এসে আবার ওপরদিকে তাকালাম জানলাগুলোর পানে। ভারতীয় ছাত্রটি তখনও পায়চারি করছিল ঘরময়! বাকি দুজনে ছিল দৃষ্টির অন্তরালে।

বড়োরাস্তায় এসে পড়ার পর হোমস শুধোলে, কীহে ওয়াটসন, কী মনে হয় তোমার? এ যেন একটা ছোটোখাটো টেবিলে বসা খেলা-অনেকটা তিন তাসের হাত সাফাইয়ের মতো তাই নয় কি? তিনজন লোক রয়েছে এ-হেঁয়ালিতে। এদের মধ্যেই একজন করেছে এ-কাজ। তোমার পছন্দসই লোকটি কে শুনি?

ওপরের তলার আঁস্তাকুড়-মুখখা ছোকরাটা। ওরই রেকর্ড সব চাইতে খারাপ। ইন্ডিয়ান ছোকরাটাও কিন্তু ভারি ধড়িবাজ। সারাক্ষণ ঘরময় পায়চারি করার মানেটা কী শুনি?

তাতে কোনো দোষ নেই। প্রাণপণে কিছু মুখস্থ করার চেষ্টা করলে অনেকেই এ-রকম করে থাকে।

কীরকম অদ্ভুতভাবে বাঁকাচোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, তা দেখেছ তো?

তুমিও অমনিভাবে তাকাতে যদি পরীক্ষার আগের রাতের প্রস্তুতির মাঝে অনাহুত এক দঙ্গল লোক এসে ঢুকত তোমার ঘরে। না, না, ওতে কোনো গলতি দেখি না আমি। পেনসিল, ছুরি-সবই সন্তোষজনক। কিন্তু তবুও ওই লোকটাই যে গোলমাল করে দিচ্ছে সব।

কে?

কেন, ব্যানিস্টার, সোমসের পরিচারক? এ-ব্যাপারে তার ভূমিকাটা কী বলো তো?

রকমসকম দেখে তাকে বিলকুল খাঁটি মানুষ বলেই বিশ্বাস হয় আমার।

আমারও তাই বিশ্বাস। গোলমাল করে দিচ্ছে এই জায়গাটাই। কীসের জন্য একজন বিলকুল খাঁটি মানুষ বেশ, বেশ, এই তো দেখছি একটা বড়োসড়ো মনিহারি দোকান। এসো, আমাদের গবেষণা শুরু হোক এখান থেকেই।

মাত্র চারটে মনিহারি দোকান ছিল শহরে। বৃথাই সবকটায় ছুঁ মারলাম। প্রতিবারই পেনসিলের কুচোগুলো বার করে চড়া দাম দিতে চাইলে হোমস। কিন্তু সবাই একবাক্যে জানালে যে সাধারণ পেনসিল নয় বলে এ-জিনিস স্টকে রাখা হয় না বললেই চলে, তবে অর্ডার দিলে আনিয়ে দেওয়া যাবে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও বন্ধুবর খুব দমে গেছে বলে মনে হল না। কৌতুকছলে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিলে সে। তবে সে-কৌতুক পুরোপুরি নয়, আধাআধি।

লাভ নেই মাই ডিয়ার ওয়াটসন। সবচেয়ে জোরালো আর চূড়ান্ত সূত্র ছিল এইটাই-কিন্তু ফলাফল তো দেখছি ফক্স। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এ-সূত্র ছাড়াই যে কেসটা খাড়া করতে পারি আমি, সে-সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। সর্বনাশ! আরে ভায়া, ন-টা বাজতে চলল যে! আসবার সময়ে আধো-আধো গলায় ল্যান্ডলেডি বলে দিয়েছিল কড়াইগুটি তৈরি থাকবে সাড়ে সাতটায়। আরে ভাই ওয়াটসন, তোমার এই বারোমেসে তামাক আর অসময়ে খাওয়াদাওয়ার জন্যে আশা করছি শিগগিরই বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাবে। আর, তোমার অধঃপতনের অংশ আমাকেও নিতে হবে। কিন্তু নার্সিস শিক্ষক, অসাবধানী পরিচারক আর তিনজন সমুবাহী ছাত্রের রহস্যভেদ করার আগে তো তা করা যাবে না।

সেদিন আর এ-প্রসঙ্গ নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না হোমস। যদিও দেরি করে ডিনার খাওয়ার পর বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইল ও। সকাল আটটায় সবে প্রাতঃকৃত্য শেষ করেছি, এমন সময়ে আমার ঘরে ঢুকল ও।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

বলল, ওহে ওয়াটসন, সেন্ট লিউকস-এ যাওয়ার সময় হয়েছে। প্রাতরাশ না-সেরে আসতে পারবে?

নিশ্চয়।

আমরা গিয়ে নিশ্চিত কিছু না-বলা পর্যন্ত তো হাঁকপাঁক করে মরবেন সোমস। আর, ভয়ংকর সে ছটফটানি, নাকি বল?

ওঁকে নিশ্চিত কিছু বলার মতো উপাদান পেয়েছ?

মনে তো হয় পেয়েছি।

সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছ?

পেরেছি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। এ-রহস্যের সমাধান আমি করেছি।

কিন্তু টাটকা সাক্ষ্যপ্রমাণ তুমি পেলে কী করে শুনি? আর পেলেই-বা কী?

আহা! ভোর ছ-টার মতো অসময়ে তো আর স্নেফ হাওয়া খাওয়ার জন্যে শয্যা ত্যাগ করিনি আমি। ঝাড়া দুটো ঘণ্টা বেদম খাটতে হয়েছে আমাকে। আর কম করে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়েছে। তবেই না কিছু দেখাতে পারছি। এই দেখ।

হাত বাড়িয়ে ধরল ও। হাতের তালুতে দেখলাম কালো রঙের মণ্ডের মতো কাদামাটির তৈরি ছোটো ছোটো তিনটে পিরামিড।

আরে, হোমস, কাল তো মোটে দুটো পেয়েছিলে! আর একটা পেয়েছি আজ সকালে। খুব সাধাসিধে বিতর্কের ব্যাপার হে। তিন নম্বরটার আগমন যে-অঞ্চল থেকে, এক নম্বর আর দুই নম্বরের উৎপত্তিও সেইখানে। তাই, না, ওয়াটসন? বেশ, বেশ, চলে এসো চটপট। বন্ধুবর সোমসের যন্ত্রণা লাঘব করে আসা যাক এবার।

বাস্তবিকই রীতিমতো উত্তেজিত অবস্থায় দেখলাম দুর্ভাগা শিক্ষক বেচারিকে তার চেয়ারে পৌঁছানোর পর। সে-উত্তেজনা দেখলে সত্যিই বড় করুণা হয়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হবে পরীক্ষা। অথচ তখনও তার উভয় সংকটের যন্ত্রণা ঘোচেনি। তখনও ভাবছেন, এ-কাণ্ড সর্বসমক্ষে হাজির করবেন, না বদমাশ নচ্ছারটাকেও মূল্যবান স্কলারশিপের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে দেবেন! এমনই উদগ্র তার মানসিক উদবেগ যে চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলেন উনি। হোমসকে দেখেই দু-হাত সামনে প্রসারিত করে ব্যাকুলভাবে ছুটে গেলেন তার পানে।

জয় ভগবান, আপনি তাহলে এসেছেন! আমার ভয় হয়েছিল হয়তো নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনি। কী করি বলুন তো? পরীক্ষা শুরু করব?

হ্যাঁ। শুরু করুন-কোনো বাধা দেবেন না পরীক্ষায়।

কিন্তু বদমাশটা—

সে পরীক্ষা দেবে না।

তার নাম জানতে পেরেছেন?

মনে হয় পেরেছি। এব্যাপারে যদি পাঁচ-কান না করতে চান তো আমাদের নিজের নিজের কিছু ক্ষমতা লাভ করা দরকার। সামরিক বিচারালয়ের মতো ছোটোখাটো একটা কোর্ট মার্শালের আয়োজন করে আমরাই নিষ্পত্তি করে ফেলব এ-ব্যাপারের। সোমস, আপনি থাকুন ওইখানে—যদি কিছু মনে না করেন। ওয়াটসন, তুমি এখানে। আর্মচেয়ার নিয়ে মাঝখানে বসব আমি। অপরাধবোধে দুরু দুরু যার হৃৎপিণ্ড, তার বুকে আতঙ্কের শেল হানবার মতো পোজ আমরা নিতে পেরেছি বলেই তো মনে হয় আমার। দয়া করে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিন।

ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। বেশ বুঝলাম, আমাদের ধর্মাবতারসুলভ ভাবভঙ্গিমা আর ধর্মাধিকরণ দৃশ্য দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছে ওর বুক।

হোমস বললে, দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। ব্যানিস্টার, গতকালের ঘটনায় যে-সত্যটুকু লুকানো আছে, তা কি এবার বলবে?

লোকটার চুলের গোড়া পর্যন্ত বোধ হয় ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমি তো আপনাকে সবই বলেছি স্যার!

আর কিছু বলার নেই?

আর কিছুই নেই, স্যার।

বেশ, তাহলে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা শোনাই তোমায়। গতকাল চেয়ারটায় গিয়ে যখন বসেছিলে, তখন কি তুমি কোনো জিনিস গোপন করার অভিপ্রায় নিয়েই গেছিলে ওখানে? যে জিনিসটা দেখামাত্র বোঝা যেত যে ঘরের মধ্যে কারো আবির্ভাব ঘটেছিল?

পাণ্ডাশপানা বীভৎস হয়ে ওঠে ব্যানিস্টারের মুখ।

না, স্যার, নিশ্চয় না।

এটা কিন্তু একটা নিছক সম্ভাবনা, মোলায়েম মিষ্টি গলায় বললে হোমস। আমি অকপটে স্বীকার করছি, এ-সম্ভাবনা প্রমাণ করতে আমি অপারগ। তবে আর একটি জিনিস খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে আমার। মি. সোমস পিছু ফেরামাত্র সেই মুহূর্তে শোবার ঘরে যে-লোকটা লুকিয়ে ছিল তাকে তুমিই ছেড়ে দিয়েছিলে।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলে ব্যানিস্টার ।

ওখানে কেউ ছিল না, স্যার ।

আহা, সেইটাই তো পরিতাপের বিষয়, ব্যানিস্টার । এতক্ষণ পর্যন্ত সত্য বললেও বলে থাকতে পার । কিন্তু এবার তো আমি জানি যে ডাহা মিথ্যে বলছ তুমি ।

ওখানে কেউ ছিল না, স্যার ।

ধীরে, ব্যানিস্টার, ধীরে ।

না, স্যার, কেউ ছিল না ।

তাই যদি হয় তো আর কোনো খবরাখবর তুমি আমাদের দিতে পারবে না । দয়া করে এ-ঘরেই থাকবে কি তুমি? শোবার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াও । সোমস, একটা অনুরোধ আছে । অনুগ্রহ করে গিলক্রাইস্টের ঘরে গিয়ে তাকে একবার এখানে আসতে বলবেন কি?

ক্ষণেক পরেই গিলক্রাইস্টকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন সোমস । ভারি চমৎকার চেহারা ছেলেটির । ছিপছিপে লম্বা নমনীয় তনু । লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরার ধরন দেখলেই

বোঝা যায় কতখানি বিদ্যুৎশক্তি লুকিয়ে আছে তার প্রতি পদক্ষেপের মধ্যে। চটপটে ক্ষিপ্ততায় মজবুত দেহখানি। মুখশ্রী সুন্দর আর অকপট! উদবেগঘন নীল নীল দুই চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে সে আমাদের প্রত্যেকের ওপর। তারপর তা স্থির হয়ে গেল দূরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যানিস্টারের মুখের ওপর। এবার তার চোখের তারায় দেখলাম নিরাবয়ব নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি।

হোমস বললে, দরজাটা বন্ধ করে দিন। মি. গিলক্রাইস্ট, এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমাদের কথোপকথনের একটি অক্ষরও বাইরে কেউ কোনোদিনই জানতে পারবে না। কাজে কাজেই, অনায়াসেই মনের অর্গল খুলে দিয়ে অকপট কথা কইতে পারি আমরা। মি. গিলক্রাইস্ট, আমরা জানতে চাই আপনার মতো এ-রকম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ গতকালের এই গর্হিত কাজটা করলেন কী করে?

টলমলিয়ে উঠে পিছু হটে গেল দুর্ভাগা তরুণ গিলক্রাইস্ট। তারপরেই বড়ো বড়ো চোখে তাকালে ব্যানিস্টারের পানে। সে-চোখে পাশাপাশি ফুটে উঠল আতঙ্ক আর তিরস্কার।

না, না, মি. গিলক্রাইস্ট! একটা কথাও আমি বলিনি একটা কথাও না। আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ব্যানিস্টার!

হোমস বললে, না বলনি। কিন্তু এবার তা বললে। মি. গিলক্রাইস্ট, এবার বুঝতে পেরেছেন। তো ব্যানিস্টারের একটি কথার পর আর কোনো আশা নেই আপনার। এখন আপনার একমাত্র পথ হচ্ছে অকপটে সব কিছু স্বীকার করা।

মুহূর্তের জন্যে দু-হাত তুলে দারুণ আক্ষেপে থর থর করে কেঁপে ওঠা দেহটাকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেলে গিলক্রাইস্ট। পরের মুহূর্তেই সে জানু পেতে বসে পড়ল টেবিলের পাশে এবং দুই করতলে মুখ ঢেকে নিঃশেষে ভেঙে পড়ল আবেগঘন কান্নায়। ওঃ, সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

নরম গলায় হোমস বললে, আস্তে, আস্তে। মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। আর, তা ছাড়া আপনাকে দাগি ক্রিমিনাল হওয়ার অপবাদ তো কেউ দিচ্ছে না। আপনার বদলে যদি সমস্ত ঘটনাটা বলি মি. সসামসকে তাহলে হয়তো আমার ভুল-টুল হলে শুধরে দেওয়াটাই সহজতর হবে আপনার পক্ষে। তাই করব নাকি? বেশ, বেশ, কষ্ট করে আর উত্তর দিতে হবে না! শুধু শুনে যান। লক্ষ রাখুন যাতে আপনার ওপর কোনোরকম অবিচার না করে বসি।

মি. সোমস, যে-মুহূর্তে আপনি আমায় বললেন যে আর কেউ তো নয়ই, এমনকী ব্যানিস্টারের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না আপনার ঘরে পেপারগুলোর আবির্ভাব-তত্ত্ব, ঠিক তখন থেকেই কেসটা একটা স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করলে আমার মনের মধ্যে। অবশ্য ছাপাখানার লোকে জানত কিন্তু সে-সম্ভাবনা নাকচ করে দিলাম। কেননা, সে তো অফিসেই পরীক্ষা করতে পারত কাগজগুলো। ভারতীয় ছাত্রের সম্বন্ধেও কিছু ভাবিনি আমি। প্রুফগুলো পাকানো অবস্থায় থাকলে কাগজগুলো আসলে কীসের, তা তো আর তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং তাও বাদ দিলাম। ঘরে যে ঢুকেছিল সে জানত পেপারগুলো টেবিলের ওপর আছে। কিন্তু কী করে জানল সে?

আপনার ঘুরে আসার সময়ে জানলাটা পরীক্ষা করেছিলাম। তখন আপনার একটা একটা মজাদার ধারণা শুনে হাসি পেয়েছিল আমার। খটখটে দিনের আলোয় বিপরীত দিকের ঘরগুলোর বাসিন্দাদের চোখের ওপর দিয়ে আগন্তুক মহাপ্রভু ঠেলেঠেলে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে এমনি একটা সম্ভাবনা আমি নাকি চিন্তা করছিলাম। রীতিমতো উদ্ভট এই ধারণা। আসলে আমি মেপে দেখছিলাম, কতখানি লম্বা হলে তবে একজনের পক্ষে জানলার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মাঝখানের টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো দেখতে পাওয়া সম্ভব। আমি ছ-ফুট লম্বা। কিন্তু আপনাকেও কসরত করে তবে দেখতে হয়েছে মাঝখানের টেবিলটা। ওই উচ্চতার কমে কারো পক্ষেই এ-সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। আপনি তো জানেন, তিনজন ছাত্রের মধ্যে যে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা ত্রয়ীর মধ্যে তার ওপরেই নজর রাখলে লাভ হবে সবচেয়ে বেশি-এমন কথা ভাববার মতো যুক্তি এসে গেছিল আমার মাথার মধ্যে।

ঘরে ঢুকলাম। সাইড-টেবিল সম্পর্কিত খুঁটিনাটি আপনাকে জানালাম। গিলক্রাইস্ট যে লংজাম্প দক্ষ, এ-তথ্য আপনি আমায় না-বলা পর্যন্ত মাঝখানের টেবিল সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারিনি আমি। তখনই সমস্ত জিনিসটা চকিতের মধ্যে ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। বাকি রইল শুধু থিয়োরিকে বলবৎ করার জন্যে কয়েকটি প্রামাণ সংগ্রহের। এবং তা-ও আমি পেলাম অচিরেই।

যা ঘটেছিল, তা শুনুন। সারাবিকেলটা খেলার মাঠে লংজাম্প প্র্যাকটিস করে কাটিয়েছে এই তরুণটি। লাফাবার জুতো কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে আসে সে। জানেন তো, এ ধরনের

জুতার তলায় প্রচুর কাঁটা লাগানো থাকে। জানলার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে রেজায় লম্বা হওয়ার দরুন টেবিলের ওপর রাখা প্রফগুলো সে দেখতে পায়। সঙ্গেসঙ্গে বুঝে নেয় জিনিসগুলো কী। কোনো ক্ষতিই হত না যদি-না দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে আপনার অসাবধানী পরিচারকের ফেলে যাওয়া চাবিটা দেখতে পেত সে। আচম্বিতে একটা ঝোক চেপে বসে ওর মনে। ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে কাগজগুলো সত্যিই প্রফ কিনা। কাজটা দুঃসাহসের। কিন্তু বিপজ্জনক নয়। কেননা, ধরা পড়ে গেলেই সাফাই গেয়ে দিত সে যে নিছক একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যেই তার এহেন প্রবেশ।

কিন্তু যখনই দেখলে যে কাগজগুলো বাস্তবিকই প্রশ্নপত্রের প্রফ, তখন আর প্রলোভনের খপ্পর থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলে না সে। জুতো দুটো নামিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর। জানলার কাছে ওই চেয়ারটায় কী রেখেছিলেন বলুন তো?

দস্তানা। বললে তরুণ গিলক্রাইস্ট।

বিজয়গৌরবে ব্যানিস্টারের পানে তাকাল হোমস।

দস্তানাগুলো চেয়ারের ওপর রেখে প্রফগুলো তুলে নিলে সে। একসঙ্গে সবগুলো নয়। এক একটা করে নিলে নকল করার জন্যে। ও ভেবেছিল মাস্টারমশাই নিশ্চয় প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকবেন এবং জানলা থেকেই আপনাকে দেখতে পাবে সে। কিন্তু আমরা তো জানি, মাস্টারমশাই ফিরে এলেন পাশের ফটক দিয়ে। হঠাৎ তারা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল দরজার সামনেই। পালাবার সম্ভাব্য পথ আর নেই। দস্তানার কথা বেমালুম ভুলে

গিয়ে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে তিরবেগে সে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, টেবিলের ওপর ওই আঁচড়টা একদিকে খুব ক্ষীণ, কিন্তু শোবার ঘরের দরজার দিকে যতই গেছে দাগটা, ততই তা গভীরভাবে কেটে গিয়ে দু-ভাগ করে দিয়েছে চামড়া। শুধু এই দেখলেই তো বোঝা যায় জুতোগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওইদিকেই এবং আসামি আশ্রয় নিয়েছে ওই ঘরে। কাঁটার চারপাশে লেগে থাকা মাটি পড়ে রইল টেবিলের ওপর। দ্বিতীয় নমুনা আলাগা হয়ে পড়ল শোবার ঘরে। আরও বলি, আজ সকালেই হাঁটতে হাঁটতে খেলার মাঠে গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখতে পেলাম এই কালো রঙের আঠালো কাদামাটির উৎস। লাফাবার গর্তে এ ধরনের মাটির ব্যবহার দেখা যায়। তা ছাড়াও করাত চেরা কাঠের গুঁড়ো বা গাছের সূক্ষ্ম ছালচূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওপরে যাতে করে লাফাবার পর অ্যাথলিট পিছলে না যায়। গুঁড়ো সমেত কাদামাটির নমুনা খানিকটা নিয়ে এসেছি সাথে। যা বললাম, তা সত্য, মি. গিলক্রাইস্ট?

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তরুণ ছাত্র গিলক্রাইস্ট।

এখন বললে, হ্যাঁ, স্যার, সত্য।

হায় ভগবান, এ ছাড়া আর কিছুই কি তোমার বলার নেই? চেষ্টা করে ওঠেন হোমস।

আছে, স্যার। কিন্তু এই লজ্জাকর ব্যাপার প্রকাশ পাওয়ার আঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি আমি। সারারাত ছটফটিয়ে কাটানোর পর ভোরের দিকে এ-চিঠি লিখেছিলাম আপনার কাছে। আমার পাপকাজ যে আর ঢাকা নেই, এ-খবর জানার আগেই লিখেছিলাম

চিঠিটা। নিন, স্যার। চিঠিখানা খুললেই দেখবেন আমি লিখেছি, আমি মনস্থ করেছি এ-পরীক্ষা দেব না এবং এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রোডেশিয়ান পুলিশ একটি অফিসারের পদ অফার করেছে আমায় এবং আমি অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হচ্ছি।

সোমস বললেন, বাস্তবিকই খুব খুশি হলাম যে শেষ পর্যন্ত তুমি অসৎ পথে পাওয়া সুযোগ নিয়ে লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছ। কিন্তু মত পরিবর্তন করলে কেন শুন?

আঙুল তুলে ব্যানিস্টারকে দেখালে গিলক্রাইস্ট।

বলল, ওই সেই মানুষটি, যে আমায় ঠিক পথে চালনা করেছে।

হোমস বললে, এবার পথে এসো ব্যানিস্টার। আমি যা বললাম, তা থেকে নিশ্চয় একটু পরিস্কার বুঝেছ যে একমাত্র তুমিই এই তরুণ ছাত্রটিকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে পারতে। কেননা, ঘরে ছিলে তুমি এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে নিশ্চয় তালা দিয়ে গেছিলে দরজায়। জানলা দিয়ে পালানোর সম্ভাবনা একেবারেই অবিশ্বাস্য। আচ্ছা, এ-রহস্যের শেষ পয়েন্টটা খোলসা করে বলবে কি? তোমার এ-রকম আচরণের অর্থটা কী, তা তো বুঝলাম না?

আপনি যদি আগাগোড়া সব জানতেন, স্যার, তাহলে দেখতেন জলের মতোই পরিস্কার আমার আচরণের অর্থটুকু। কিন্তু আপনি যতই চতুর হন না কেন, শত চেষ্টা করলেও

এ-তথ্য জানা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক সময়ে আমি এই তরুণ ভদ্রলোকটির বাবা বুড়ো স্যার জ্যাবেজ গিলক্রাইস্টের বাটলার ছিলাম। উনি সর্বস্বান্ত হলে পরে এ-কলেজের পরিচারক হিসাবে এলাম এখানে। কিন্তু ভুলতে পারলাম না আমার পুরোনো মনিবকে ভুলতে পারলাম না দুনিয়ার চোখে তার এ পতনের জন্যে, তার দুর্দৈবের জন্যে। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে তার ছেলেকে যতখানি পারলাম চোখে চোখে রাখলাম আমি। গতকাল চৈচামেটি শুনে এ-ঘরে আসামাত্র প্রথমেই যে জিনিসগুলি দেখলাম, তা হল ওদিককার চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা মি. গিলক্রাইস্টের দস্তানা দুটি। এ-দস্তানা আমি ভালোভাবেই চিনি এবং তাই চকিতে বুঝলাম এখানে তাদের আগমনের রহস্যটুকু। মি. সোমসের চোখে পড়লেই ফাঁস হয়ে পড়বে সব কিছু। তাই ঝপ করে বসে পড়লাম চেয়ারটায়। আপনাকে ডেকে আনার জন্যে মি. সোমস ঘরের বাইরে না-যাওয়া পর্যন্ত আর চেয়ার ছেড়ে একচুলও নড়লাম না। তারপরেই আমার তরুণ মনিব, যাকে আমি হাঁটুতে গুইয়ে দোলনা দিয়েছি, বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে এবং তখুনি সব স্বীকার করলে আমার কাছে। স্যার, এরপর কি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করাটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়? স্বাভাবিক নয় কি তার বাবা যা করতেন ঠিক সেইভাবে ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যে এ-পথে তার কোনো লাভই হবে না? এজন্যে কি আমায় আপনি দোষ দেন, স্যার?

নিশ্চয় না। জ্যামুজ ধনুকের মতো টক করে দাঁড়িয়ে উঠে আন্তরিক সুরে বলল হোমস, সোমস, আপনার ছোট সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি বলেই তো মনে হচ্ছে। এদিকে বাড়িতে ঠান্ডা হচ্ছে আমাদের প্রাতরাশ। এসো হে, ওয়াটসন। মি. গিলক্রাইস্ট, আমার

বিশ্বাস, রোডেশিয়ায় আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। জীবনে শুধু একবার আপনি নীচে নামলেন। এবার দেখা যাক, ভবিষ্যতে কত উঁচুতে আপনি উঠতে পারেন।

টীকা

প্রশ্নপত্রের পলায়ন : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য থ্রি স্টুডেন্টস জুন ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ইংলন্ডে এবং কলিয়ার্স উইকলির ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে : ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শহর বলতে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজকেই বোঝানো হয়। হোমসের গল্প বা উপন্যাস থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য বা বক্তব্য সাপেক্ষে গবেষকরা মনে করেন হোমস অক্সফোর্ডেরই ছাত্র ছিলেন। এই গল্পের শহরটির সঙ্গে হোমসের পরিচয় দেখে তারা অনুমান করেন এখানেও অক্সফোর্ডের কথা বলা হয়েছে।

থিউসিডাইডিজ : আনুমানিক ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের গ্রিক ইতিহাসবিদ, থিউসিডাইডিজ ছিলেন এথেন্সের বাসিন্দা। পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধে অংশ নেন কিন্তু স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে আপিপালিস শহরকে রক্ষা করতে না-পারায় এথেন্স থেকে নির্বাসিত হন। এর পরবর্তী

কুড়ি বছরে তিনি এথেন্স এবং স্পার্টার রাজনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক গ্রন্থ হিস্ট্রি অব দ্য পলিপোনেসিয়ান ওয়ার রচনা করেন।

তিনটে স্লিপ কাগজে প্রফটা এসেছিল : অ্যান্ড্রু ল্যাং এবং অন্যান্য কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন, থিউসিডাইডিজের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদের প্রফের জন্যও তিনটি স্লিপ লাগতে পারে না।

JOHANNABER: জার্মানির নুরেমবার্গ শহরে কাসপার ফ্যাবার-এর প্রতিষ্ঠা করা পেনসিল তৈরির ব্যবসা তার প্রণতি জোহান লুথার ভন ফ্যাবার (১৮১৭-১৮৯৬) এবং জন এবারহার্ড ফ্যাবার (১৮২২-১৮৭৯) বড়ো করে ছড়িয়ে দেন প্রায় সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায়।

বু হয়েছে : অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের ছাত্রদের ক্রীড়ায় পারদর্শিতার শংসাপত্র হত বু হলে। লেখাপড়ায় লেটার পাওয়ার সমকক্ষ বু নামটির উদ্ভব অক্সফোর্ডে সফল ক্রীড়াবিদদের দেওয়া গাঢ় নীল এবং কেমব্রিজে হালকা নীল রঙের টুপির থেকে।

ছোটোখাটো একটা কোর্ট মার্শালের আয়োজন করে : দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য অ্যাবি গ্র্যাঞ্জ গল্লে ঠিক এই ধরনের একটি দৃশ্য দেখা যায়।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । ঔপাধ্যায় বৈষ্ণব ডায়েরী । শার্লক হোমস

রোডেশিয়ান : আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে রোডেশিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সিসিল রোডস-এর উদ্যোগে ১৮৮৯-এর সনদের ভিত্তিতে। রোডস পরে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলোনির প্রধানমন্ত্রী হন। রোডেশিয়ার বর্তমান পরিচিতি জিম্বাবুয়ে নামে।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোনার ডয়েল । শার্লক হোমস

ভিজিট দেওয়ার ভয়ংকর বগহিনি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন]

অভ্যাসমতো উদ্দেশ্যবিহীন সাক্ষ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম হোমস আর আমি। কুয়াশা-ঘন, হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যা। ছ-টা নাগাদ ঘরে ফিরে হোমস বাতিটা জ্বালতেই আলো গিয়ে পড়ল টেবিলের উপর রাখা একটা ভিজিটিং কার্ডের ওপর। একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে কার্ডটাকে সে পরম ঘৃণাভরে কণ্ঠে বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে ফেলে দিলে দূরে মেঝের ওপর। কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে :

চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন,
অ্যাপেলডোর টাওয়ারস,
হ্যাম্পস্টেড।

এজেন্ট।

লোকটা কে হে? জিজ্ঞেস করি আমি।

লন্ডনের জঘন্যতম লোক। আগুনের সামনে বসে পড়ে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিল হোমস। কার্ডের পেছনে কিছু লেখা আছে নাকি?

উলটে ধরে পড়লাম, সন্ধ্যা ছটায় আসছি-সি. এ. এম.।

হুম! আসার সময়ও হয়ে এল দেখছি। চিড়িয়াখানার সাপের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিলবিলে, হড়হড়ে, পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত প্রাণীগুলোর কালো মৃত্যুর মতো চকচকে চোখ আর কুটিল, চেপটা মুখের দিকে তাকালে তোমার গা শিরশির করে না? আপাদমস্তক রি-রি করে ওঠে না অপরিসীম ঘৃণায়? সারাজীবনে পঞ্চাশজন খুনির সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা লড়েছি আমি, কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বদ লোকটার নাম শুনলেও আমার এতটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ জাগে না, যতটা হয় এই লোকটার নাম শুনলে। ওর ছায়া মাড়বার প্রবৃত্তিও আমার নেই। তবুও ব্যাবসার খাতিরে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না-করে আমার উপায় নেই- কেননা, সত্যি বলতে কী, আমার আমন্ত্রণ রাখতেই আজকে সে আসছে এখানে।

কিন্তু লোকটা কে, তা তো বললে না?

বলছি ওয়াটসন বলছি। দুনিয়ার যত ব্ল্যাকমেলারের নাম শুনেছি, তাদের সম্রাট বলা যায় চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনকে। যে-পুরুষ এবং যে-নারীর গুঢ় খবর আর সামাজিক মানসম্মান মিলভারটনের হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, ভগবান তাদের রক্ষা করুন। ঠোঁটের কোণে অম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে অথচ মার্বেল পাথরের মতো কঠিন হৃদয় নিয়ে শোষণ শুরু হয়, যতক্ষণ-না শুধু ছিবড়েটুকু অবশিষ্ট থাকে। লোকটার প্রতিভা আছে এবং শোষণ-বিদ্যায় তার একটা পাণ্ডিত্য থাকার ফলে এ-জাতীয় অন্য যেকোনো ব্যাবসায় সে প্রথিতযশা হতে পারত। ওর পদ্ধতি এইরকম : সুকৌশলে সে সবাইকে জানিয়ে দেয়, বিত্ত বা খ্যাতির জীবনে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের জীবনের গুঢ় তথ্য লেখা কোনো চিঠি

অতি উচ্চ মূল্যে কিনতে সে প্রস্তুত। খাসকামরার বিশ্বাসঘাতক চাকর বা ঝিরাই শুধু এ ধরনের চিঠি তার কাছে পাঠায় না, স্নেহ-ভালোবাসার আস্থা অর্জন করে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এমন ভদ্রবদমাশরাও অর্থের লোভে ভরিয়ে তোলে মিলভারটনের চিঠির ঝাঁপি। এদিক দিয়ে মোটেই ব্যয়কুণ্ঠ নয় সে। আমি জানি, দুলাইনে লেখা একটা চিরকুটের জন্যে একজন পেয়াদাকে সে সাতশো পাউন্ড দাম দিয়েছিল, আর তার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছিল একটা সম্মান্ভ পরিবার। বাজারে হেন খবর নেই যা মিলভারটনের কাছে যায় না, তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবরও জমা পড়ে তার দপ্তরের খাতায়-তাই এ-শহরের শত শত লোক তার নাম শুনলেও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কবে কোথায় কীভাবে যে তার মরণ-টিপুনি শুরু হবে, তা কেউ জানে না। কেননা দিন এনে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা তার নয়, অর্থের যেমন তার অভাব নেই, তেমন অভাব নেই কূটবুদ্ধিরও ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে হাতের তাস হাতেই রেখে বছরের পর বছর শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে সে। তারপর যখন বোঝে চড়া বাজি জেতার সময় এসেছে, তখন ছাড়ে তার হাতের তাস। তোমাকে তো বললামই, লন্ডনের জঘন্যতম লোক হল এই মিলভারটন। সাধারণ দুর্বৃত্তের সঙ্গে এর তুলনা হয় না, কেন জানো? রক্ত গরম হয়ে গেলে মারপিট, খুন-জখম করা এক জিনিস, আর ধীরেসুস্থে হিসেবমতো অবসর সময়ে মানুষের দিবানিশার শান্তি কেড়ে নিয়ে তার স্নায়ুমণ্ডলে বিপর্যয় ডেকে এনে পরিপুষ্ট টাকার থলিকে আরও পুষ্ট করার প্রচেষ্টা আর এক জিনিস।

বন্ধুবরকে এ-রকম তীব্র আবেগ-থর-থর ভাষায় কথা বলতে আমি খুব অল্পই দেখেছি।

বললাম, কিন্তু আইনের আওতায় কি সে পড়ে না?

পড়ে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনো মূল্যই নেই। ধর, এক মহিলার সর্বনাশ আসন্ন। সে সময়ে মিলভারটনকে কয়েক মাসের জন্যে শ্রীঘরে পাঠিয়ে তার কোনো লাভ তো হচ্ছেই না, বরং মিলভারটন জেলে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তারও সর্বনাশ হচ্ছে সম্পূর্ণ। এইজন্যেই তার শিকাররা পালটা ঘা দিতে সাহস পায় না। নির্দোষ লোককে দোহন করার চেষ্টা করলে অবশ্য ফলাফল হত অন্যরকম। কিন্তু এদিক দিয়ে পাকা শয়তানের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি তার। না হে, না, ওর সঙ্গে লড়াইতে গেলে অন্য পন্থা ভাবতে হবে আমাদের।

এমন লোককে এখানে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

কারণ, এক স্বনামধন্য মহিলা মক্কেল তার কেস দিয়েছেন আমার হাতে। কেসটা শুনলে সত্যিই করুণা হয়, ওয়াটসন। গত মরসুমে প্রথম আবির্ভাবেই সেটা সুন্দরী হিসাবে যিনি নাম করেছেন, ইনিই সেই লেডি ইভা ব্র্যাকওয়েল। দিন পনেরোর মধ্যেই আর্ল অফ ডোভারকোর্টের সঙ্গে তার বিয়ে। ভদ্রমহিলার অবিবেচকের মতো লেখা কয়েকটি চিঠি এসে পড়েছে এই পিশাচটার খপ্পরে। অবিবেচক ছাড়া কী আর বলব, ওয়াটসন। চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের এক বিত্তহীন সম্ভ্রান্ত যুবককে। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পক্ষে চিঠিগুলো যথেষ্ট। মোটা টাকা না-পেলে মিলভারটন ওগুলো পাঠিয়ে দেবে আর্লের কাছে। আমার ওপর তার পড়েছে তার সঙ্গে দেখা করে যতদূর সম্ভব ভালো শর্তের ভিত্তিতে বিষয়টার ফয়সালা করার।

ঠিক সেই মুহূর্তে খটাখট শব্দের সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনলাম নীচে রাস্তার ওপর। তাকিয়ে দেখি, জমকালো একটা জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়ে নীচে। জোরালো বাতি দুটোর আলো ঠিকরে পড়ছিল ঘোড়া দুটোর অপূর্ব সুন্দর গাঢ় লালচে বাদামি রঙের পালিশকরা কাঁধের ওপর থেকে। একজন পেয়াদা দরজা খুলে ধরলে এবং খর্বকায় হুঁপুঁপুঁ এক পুরুষ নেমে এল নীচে। লোকটার গায়ে রাশিয়ান অ্যাসট্রাখান অঞ্চলের লোমশ চামড়ার ওভারকোট। এক মিনিট পরেই ঘরে ঢুকল সে।

চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনের বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। ধীমান পুরুষের মতো মস্তবড়ো সুগঠিত মাথা। গোলগাল, মাংসল, শ্মশ্রুবিহীন মুখ। ঠোঁটের কোণে যেন ফ্রেমে বাঁধানো অষ্টপ্রহরের হিমশীতল হাসি। আর চওড়া সোনার চশমার পেছনে একজোড়া তীক্ষ্ণ ধূসর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি। লোকটার হাবভাবে মি. পিকউইকসুলভ হিতৈষণার ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন ছদ্মবেশেও সামান্য ত্রুটি থেকে গেছে-ফ্রেমে-আঁটা নকল হাসি আর অশান্ত, অন্তর্ভেদী চোখের সুকঠিন ঝিকিমিকির জন্যে। কণ্ঠস্বর মুখের মতোই মসৃণ, পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঢুকেই হুঁপুঁপুঁ হাত বাড়িয়ে বিড়বিড় করে দুঃখ প্রকাশ এগিয়ে এল সে।

হাতটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গ্রানাইট কঠিন মুখে হোমস তাকালে তার দিকে। ছড়িয়ে পড়ল মিলভারটনের হাসি। হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিমায় দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওভারকোটটা খুলে ফেলে সে। তারপর পরম যত্নে ভাঁজ করে চেয়ারের পেছনে রেখে আসন গ্রহণ করে।

এ-ভদ্রলোকের সামনে কথাবার্তা বলা যাবে তো? আমার দিকে ইঙ্গিত করে বসে সে।

ডাক্তার ওয়াটসন আমার বন্ধু এবং পার্টনার ।

বেশ, বেশ, মিস্টার হোমস । আপনার মক্কেলের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখেই বললাম এ-কথা । একটা দুরূহ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা—

ডাক্তার ওয়াটসন এ-সম্বন্ধে আগেই সব শুনেছেন ।

তাহলে সরাসরি কাজের কথাই হোক । আপনি বলছেন, লেডি ইভার তরফে আলোচনা করবেন আপনি । আমার শর্ত মেনে নেওয়ার অধিকারও নিশ্চয় তিনি আপনাকে দিয়েছেন?

আপনার শর্ত কী, তাই বলুন ।

সাত হাজার পাউন্ড!

আর, যদি তা না-দেওয়া যায়?

মাই ডিয়ার স্যার, আমার পক্ষে সে-আলোচনা বড়োই বেদনাদায়ক । কিন্তু ১৪ তারিখে টাকা-দিলে ১৮ তারিখে যে বিয়ে হবে না এ-বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন । লোকটার অসহ্য হাসি আগের চাইতেও খুশিখুশি হয়ে ওঠে । ক্ষণকাল চিন্তা করে হোমস ।

তারপর বলে, এমন অসম্ভব শর্ত আরোপ করছেন আপনি যে, তা মেনে নেওয়া যায় না। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবশ্য আমিও ওয়াকিবহাল। আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেও দ্বিধা করবেন না লেডি ইভা। কাজেই আমি তাকে বলব ভবিষ্যৎ স্বামীর কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলে তার দাম্ভিক্যের ওপর নির্ভর করতে।

নিঃশব্দে হেসে উঠল মিলভারটন।

আপনি দেখছি, আর্লকে একেবারেই চেনেন না।

হোমসের মুখে পরাজয়ের চিহ্ন দেখে পরিষ্কার বুঝলাম, আর্লকে চিনতে তারও বাকি নেই।

শুধায় ও, চিঠিগুলোয় এমন কী ক্ষতিকর কথা আছে?

মিলভারটন জবাব দেয়, বেজায় চনমনে চিঠিগুলো প্রাণরসে ভরপুর। আপনি যদি মনে করেন, এ-পত্রগুচ্ছ আর্লের হাতে সমর্পণ করলেই আপনার মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা পাবে, তখন না হয়, তাই করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে এই সামান্য লিপিকা ক-টা ফিরিয়ে আনার জন্যে এতগুলো টাকা জলে দেওয়াও আপনাদের পক্ষে বোকামো। বলে দাঁড়িয়ে উঠে ভেড়ার চামড়ার লোমশ কোটে হাত দিল সে।

রাগে অপমানে ছাইয়ের মতো পাণ্ডাশ হয়ে ওঠে হোমসের মুখ।

সবুর। ধীরেসুস্থে কাজ করা দেখছি আপনার ধাতে নেই। এ-রকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কোনো-রকম কেলেক্সারি যাতে না-ছড়ায়, সে-বন্দোবস্ত যেভাবেই হোক আজ আমাদের করতে হবে।

আবার আসন গ্রহণ করে মিলভারটন। বলে, আমি জানতাম, এদিকটাও ভাববেন আপনি।

হোমস বলে চলে, লেডি ইভা খুব ধনবতী নন। দু-হাজার পাউন্ড দেওয়া মানেই তার স্বল্প বিত্তের প্রায় সবটুকুই দিয়ে দেওয়া আপনার দাবিতে সাত হাজার পাউন্ড দেওয়ার ক্ষমতা তো তার একেবারেই নেই। কাজেই আমার অনুরোধ, আপনি অত চড়া দাম না-হেঁকে ওই দু-হাজারেই চিঠিগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বিশ্বাস করুন, দু-হাজারের বেশি একটা কপর্দক দেওয়ার ক্ষমতাও লেডি ইভার নেই।

আর একটু ছড়িয়ে পড়ে মিলভারটনের হাসি-দুই চোখে ঝিকমিক করে ওঠে কৌতূহলের আলো।

লেডি ইভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যা বললেন, তা আমার অজানা নয়। তবে কী জানেন, একটা বিষয় আপনি স্বীকার করবেন যে, যেকোনো মহিলার জীবনে তার বিয়ের লগ্নটিই হল সর্বোত্তম ক্ষণ। এ সময়ে তার প্রতিটি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তার জন্যে কিছু-না-

কিছু করার আগ্রহ রাখে। মামুলি উপহার দেওয়াটা অনেকেরই মনঃপূত হয় না। তাই বলছিলাম, লন্ডনের সেরা শামাদান আর মাখন-ভরা ডিশ উপহার দিয়ে যতটা আনন্দ পাওয়া যাবে, তার চাইতেও বহুগুণ তৃপ্তি পাওয়া যাবে সামান্য এই পত্রগুচ্ছটি দিলে।

হোমস উত্তর দিলে, যা বললাম, তা সত্য। আপনার দাবিমতো অত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম, ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে আপনার যখন কোনো লাভই হবে না, তখন যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নেওয়া আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ভুল করলেন, মিস্টার হোমস, ভুল করলেন। হাতে হাঁড়ি ভেঙে দিলে, আমার লাভ বই লোকসান হবে না। এক্ষেত্রে লাভটা অবশ্য হবে পরোক্ষভাবে এবং তা নিতান্ত সামান্য নয়। বর্তমানে আট-দশটা এই ধরনের কেস হাতে রেখে পাকাচ্ছি-শুধু সুযোগ বুঝে কোপ মারার জন্যে! একগুঁয়েমির কী কঠোর শাস্তি লেডি ইভাকে আমি দিয়েছি, এ-খবর তাদের মধ্যে একবার ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। এ-নজির যে একবার শুনবে, বেয়াড়াপনা করার কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারবে না সে। আমার পয়েন্টটা বুঝেছেন তো? পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে দেখতে দেখতে বললে মিলভারটন।

বিদ্যুতের মতো চেয়ার থেকে ছিটকে গেল হোমস।

ওর পেছনে যাও, ওয়াটসন। বেরোতে দিয়ো না ঘর থেকে। ঠিক আছে। এবার, মশাই, দেখান তো আপনার ওই নোটবইতে আর কী কী আছে? ইঁদুরের মতো ক্ষিপ্ৰগতিতে ঘরের ধারে পিছলে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল মিলভারটন।

মিস্টার হোমস! মিস্টার হোমস! বলতে বলতে কোটের সামনের দিকটা আমাদের দিকে ফেরাতেই চোখে পড়ল ভেতরের পকেট থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা বড়ো রিভলভারের কুঁদো। আমিও আশা করেছিলাম, এইরকম ধরনের মৌলিক একটা কিছু না-করে ছাড়বেন না। এ-রকম কাণ্ড প্রায়ই হয় তো, কিন্তু করে কিছু লাভ হয় কি? আরে মশাই, আপনার বোঝা উচিত ছিল সশস্ত্র না-হয়ে কোথাও যাই না আমি। এবং দরকার হলে, গুলি চালাতেও মোটেই দ্বিধা করব না। আইনের সমর্থন যে আমি পাব, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তা ছাড়া চিঠিসমেত নোটবই এখানে আনব, এ-রকম ভ্রান্ত ধারণা আপনার কী করে হল বুঝছি না। এ-রকম নিরেট মূখের মতো কাজ আমি কখনো করি না। যাই হোক, এবার তো আমায় যেতে। হয়, জেন্টলমেন। আজ রাতেই আরও দু-একটা ছোটোখাটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। হ্যাম্পস্টেডে ফিরে যেতেও অনেকটা সময় লাগবে। এক-পা এগিয়ে এসে কোটটা তুলে নিল মিলভারটন। তারপর রিভলভারের ওপর হাত রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আমি একটা চেয়ার তুললাম, কিন্তু হোমস মাথা নাড়তে রেখে দিলাম যথাস্থানে। বাতাসে মাথা ঠুকে মৃদু হাসল মিলভারটন, দুই চোখ নেচে উঠল কৌতুকে। তারপরেই বিদায় হল সে। কয়েকমুহূর্তে পরেই দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম এবং পরক্ষণেই গড় গড় শব্দে দূর হতে দূরে উধাও হয়ে গেল তার জুড়ি।

ট্রাইজারের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে, বুকের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে, অপলক চোখে জ্বলন্ত অঙ্গারের পানে তাকিয়ে অনড় দেহে বসে রইল হোমস। পুরো আধঘণ্টা কেটে গেল। নীরব, নিশ্চল হয়ে ডুব দিয়ে রইল ও চিন্তার অতলে। তারপরেই, যেন উপায় স্থির হয়ে গেছে, এমনিভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেল শোয়ার ঘরে। একটু পরেই ছোকরা বয়েসের এক লম্পট মজুর হেলে-দুলে ফতোবাবুর মতো ঘরে ঢুকল। ছাগল-দাড়ি নেড়ে বাতির শিখায় মাটির পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। যাবার আগে বলে গেল, ওয়াটসন, আমার ফিরতে দেরি হবে। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার কৃশ মূর্তি। বুঝলাম, চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনের বিরুদ্ধে শুরু হল তার অভিযান। কিন্তু তখন আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি অভিযানের অন্তে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে আমাদের।

বেশ কয়েকদিন ধরে এই বেশেই আসা যাওয়া করল হোমস। সে হ্যাম্পস্টেডে যায় এবং সময়টা ভালোই কাটছে সেখানে-এ ছাড়া আর কোনো মন্তব্য শুনলাম না তার মুখে। কাজেই, কী যে করছে ও, তা জানতাম না। তারপর, একদিন এক দূরন্ত ঝড়ের রাতে বাড়িতে ফিরে এল হোমস। হাহাকার শব্দে দরজা-জানলায় মাথা খুঁড়ে ফিরে যাচ্ছিল দূরন্ত হাওয়া। এই তার শেষ অভিযান। ছদ্মবেশ খসিয়ে আগুনের ধারে পা ছড়িয়ে বসে, অভ্যাসমতো আপন মনে নিঃশব্দে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল বন্ধুবর।

ওয়াটসন, যদি বলি আমি বিয়ে করতে চলেছি, তাহলে নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবে না?

নিশ্চয় না।

শুনে চমকে যাবে ভায়া! আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে।

মাই ডিয়ার হোমস! অভিনন্দন...

মিলভারটনের বাড়ির ঝি-এর সঙ্গে।

সর্বনাশ! কী বলছ হোমস?

আরে ভাই, আমার খবরের দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু সেজন্যে তো অনেক দূর গড়িয়েছ দেখছি।

এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার নাম এসকট। জলের পাইপ, সিসটার্ন ইত্যাদি বসানো এবং মেরামত করাই আমার ব্যবসা এবং তা দিন-দিন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে আমি হাওয়া খেয়েছি আর কথা বলেছি এন্তার। কী মুশকিল, সেসব কথা তো বলাও যায় না। যাকগে, আমার যা যা দরকার, সবই পেয়ে গেছি। আমার হাতের তালুর সঙ্গে আমার যতখানি পরিচয়, ঠিক ততখানি জেনে গেছি মিলভারটনের বাড়ির খুঁটিনাটি।

কিন্তু হোমস, মেয়েটা?

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও বললে, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, অত ভাবতে গেলে কি চলে? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বাজি যেরকম থাকবে, হাতের তাসও ফেলবে সেইভাবে, তাই নয় কি? ভালো কথা, আরও একটা আনন্দের খবর আছে। অভিসার-পর্ব করতে গিয়ে আমার এক প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়ে ফেলেছি। পেছন থেকে আমায় পেলেই লোকটা নির্ঘাত গলা কেটে ছাড়বে। ওঃ, কী চমৎকার রাত্রি।

আজকের আবহাওয়া তোমার ভালো লাগছে?

আমার কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী আজকের আবহাওয়া। ওয়াটসন, আজ রাতেই মিলভারটনের বাড়িতে সিঁদ দিতে চাই আমি!

সান্ধ্য-পোশাক পরলাম হোমস আর আমি। দেখলে মনে হবে যেন থিয়েটার দর্শনান্তে গৃহে ফিরছেন দুই ভদ্রলোক। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে হ্যাম্পস্টেডের একটা ঠিকানায় এসে পৌঁছোলাম। গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিলাম এখানে। দারুণ ঠান্ডা পড়েছিল, কনকনে হাওয়ার ঝাঁপটায় মনে হচ্ছিল যেন বরফের ছুরি কেটে কেটে বসে যাচ্ছেমাংসের মধ্যে। ওভারকোটের বোতাম এঁটে নিলাম! তারপর ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম গন্তব্যস্থানের দিকে।

হোমস বললে, আজকের কাজটা একটু বিশেষ রকমের দুরূহ। হিসেবি বা হুঁশিয়ার না হলে সাফল্য অসম্ভব। মিলভারটনের পড়ার ঘরে একটা সিন্দুকের মধ্যে থাকে এই

দলিল-দস্তাবেজগুলো। পড়ার ঘরটা আবার তার শোবার ঘরের লাগোয়া একটা ঘর। কিন্তু আমাদের একটা সুবিধে আছে। নাদুসনুদুস খর্বকায় লোকেরা যখন টাকার কুমির হয়, তখন তাদের যে অসুস্থ অভ্যাসটি থাকে, মিলভারটনেরও তা আছে। অর্থাৎ বেজায় ঘুমকাতুরে লোকটা। আমার প্রেমিকা আগাথার কাছে শুনলাম, চাকর মহলে সবাই নাকি এ নিয়ে হাসাহাসি করে। একবার ঘুমোলে হল, সে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর ক্ষমতা আর কারো নেই। মিলভারটনের কাজকর্ম দেখবার জন্যে একান্ত অনুগত একজন সেক্রেটারি আছেন। সে ভদ্রলোকও সারাদিন পড়ার ঘর ছেড়ে এক পাও নড়েন না। আমাদের নৈশ অভিযান সেই কারণেই। এরপর লোকটার একটা বাঘা কুকুর আছে—সারারাত বাগানে টহল দেওয়া তার কাজ। গত দুরাতে আগাথার সঙ্গে দেখা করার সময়ে সে চাবি দিয়ে রেখেছিল কুকুরটাকে কাজেই নির্বিঘ্নে যেতে আসতে পারছি আমি। এই যে, এই বাড়িটা, বাগানওলা এই বড়ো বাড়িটা। ফটক দিয়ে ঢুকে পড়—এবার ডাইনে মোড় নিয়ে দাঁড়ানো যাক লরেল ঝোঁপের মধ্যে। মুখখাশগুলো এখানেই লাগিয়ে নেওয়া যাক, কি বল? লক্ষ করেছ, কোনো জানলা দিয়েই আলোর এতটুকু রশ্মি দেখা যাচ্ছে না। চমৎকার প্ল্যান, যেমনটি আশা করা গেছিল, ঠিক তেমনটিই হচ্ছে দেখছি।

কালো সিল্ক দিয়ে মুখ ঢাকার পর আমাদের দেখতে হল দু-দুটো অতি-ভয়ংকর নিশাচর প্রাণীর মত। মাজারের মতো নিঃশব্দ চরণে নিস্তব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন বিমিয়ে পড়া বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম দুজনে। একদিকে দেখলাম, টালির ছাউনি দেওয়া একটা বারান্দায় সারি সারি অনেকগুলো জানলা আর দুটো দরজা।

ফিসফিস করে ওঠে হোমস, ওইটাই ওর শোবার ঘর। দরজা খুলতেই পড়ার ঘর। সবচেয়ে ভালো হত এই দরজাটা খুলতে পারলে, কিন্তু দরজার ওদিকে শুধু ছিটকিনি নয়, তালাও লাগানো আছে। কাজেই এদিক দিয়ে ঢুকতে গেলে শব্দ-টব্দ একটু বেশিই হবে! এসো ঘুরে যাওয়া যাক। ওদিকে একটা কাচের তৈরি গাছপালা রাখার গ্রিনহাউস আছে। তার ভেতর দিয়ে বসার ঘরে যাওয়া যায়।

সেখানেও তালা লাগানো। কিন্তু কাচের একটা গোল চাকতি কেটে ফেলে হাত গলিয়ে ভেতর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দিলে হোমস। পরমুহূর্তে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে সে এবং ঠিক তখন থেকেই আইনের চোখে গুরু অপরাধ করা শুরু হল আমাদের। সংরক্ষণশালার ভারি উষ্ণ বাতাসে আর বিদেশ থেকে আনা রকমারি চারাগাছের দম-আটকানো সৌরভে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমাদের। অন্ধকারের মধ্যে আমার হাত চেপে ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল হোমস। গুল্মের কিনারা দিয়ে যাওয়ার সময় পাতাগুলো ঘষটে যেতে লাগল মুখের ওপর। বহুদিনের সযত্ন অভ্যাसे অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখবার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল হোমস। একহাতে আমার হাত আঁকড়ে, অপর হাতে একটা দরজা খুললে সে। মনে হল, যেন একটা মস্ত ঘরে ঢুকেছি; এবং একটু আগেই কেউ সেখানে সিগার খেয়ে গেছে। আসবাবপত্রের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গেল হোমস, আর একটা দরজা খুলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদিকে। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর আমি হাত বাড়তেই দেওয়াল থেকে ঝোলানো কতকগুলো কোটে হাত ঠেকল। বুঝলাম, যাতায়াতের পথে অর্থাৎ প্যাসেজে এসে পড়েছি। প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হোমস অতি সন্তর্পণে ডান দিকের একটা দরজা খুলে ধরলে। সঙ্গেসঙ্গে বিদ্যুৎবেগে একটা প্রাণী ধেয়ে এল আমাদের পানে, আর আমার হৃৎপিণ্ডটাও ডিগবাজি

খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝলাম, প্রাণীটা চতুষ্পদ এবং একটা নিরীহ বেড়াল, তখন ইচ্ছে হল জোরে হেসে উঠি। এ-ঘরে আগুন জ্বলছিল চুল্লিতে এবং এখানেও মস্তুর বাতাসে ভাসছিল তামাকের ঘন ধোঁয়া। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল হোমস। আমি ভেতরে এলে পরে, খুব আলতোভাবে বন্ধ করে দিলে দরজাটা। এইটাই মিলভারটনের পড়ার ঘর। অপর প্রান্তে একটা পর্দা ঝুলতে দেখে বুঝতে কষ্ট হল না যে শোবার ঘরের প্রবেশপথ সেটা।

জোরালো আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল সমস্ত ঘরটা। দরজার কাছে চক চক করছিল একটা বৈদ্যুতিক সুইচ। আগুনের আলো থাকায় সুইচ টেপার আর দরকার হল না। আগুনের চুল্লির একপাশে দেখলাম একটা ভারী পর্দা, বাড়ির ভেতরে ঢোকান আগে বাইরের দিকে ঠেলে বেরোনো যে-জানলাটা দেখেছিলাম, এ-পর্দা যে সেই জানলাকেই ঢেকে রেখেছে, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না আমার। চুল্লির আর একদিকে ছিল একটা দরজা। বাইরে থেকেই দেখেছি, এ-দরজা খুলেই বারান্দায় পা দিতে হয়। ঘরের ঠিক কেন্দ্রে একটা ডেস্ক আর চকচকে লাল চামড়া-মোড়া ঘুরন্ত চেয়ার। বিপরীত দিকে দেখলাম, মস্তবড়ো একটা বুককেস। ওপরে রয়েছে জ্ঞানের দেবী এনেথের মার্বেল পাথরের আবক্ষ প্রতিমূর্তি। কোণের দিকে বইয়ের আলমারি আর দেওয়ালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে একটা লম্বা, সবুজ রঙের সিন্দুক। আগুনের আলো ঠিকরে পড়ছিল তার পালিশ করা তামার হাতলের ওপর থেকে। গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে একবার দেখে নিলে হোমস। তারপর পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় কাত করে কান খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ। কোনোরকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। ইতিমধ্যে আমি ভাবলাম, বাইরের দিকে দরজা দিয়ে উধাও হওয়ার

ব্যবস্থাটাও আগে থেকে সম্পূর্ণ করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই দরজাটা পরীক্ষা করতে গেলাম আমি। গিয়ে তো অবাক। দরজায় তালাও নেই-বাইরে থেকে একটু ঠেলা মারলেই খুলে যায়! হোমসের বাহু স্পর্শ করতেই সে মুখোশপরা মুখ ফিরিয়ে তাকালে দরজার দিকে। তাকিয়ে চমকে উঠল, দেখলাম, আমার মতো আশ্চর্য হয়ে গেছে সে।

কানের গোড়ায় মুখ এনে ফিসফিস করে ওঠে হোমস, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার, চুলোয় যাক, নষ্ট করার মতো সময় আর নেই।

আমার কিছু করার আছে?

আছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তুমি। কাউকে আসতে শুনলেই ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিয়ে। তখন যে-পথে এসেছি, সেই পথেই সটকান দেব আমরা। যদি উলটো দিক থেকে কেউ আসে, তাহলে কাজ শেষ হয়ে গেলে বারান্দার দরজা দিয়ে সরে পড়ব, আর না হলে, এই পর্দাটার আড়ালে লুকোব। বুঝছ তো?

ঘাড় কাত করে জানালাম, বুঝেছি। তারপর দাঁড়ালাম দরজার সামনে। প্রথম প্রথম একটু ভয়-ভয় করছিল সত্যি, কিন্তু এখন সে-ভয় কেটে গেছিল। বরং সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত তীব্র উল্লাসে। যতদিন আইনের রক্ষক ছিলাম, কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারিনি, এ-জাতীয় আনন্দ-শিহরন, সেরাতে সেই প্রথম আইনের ভক্ষক হওয়ার পর আস্বাদ পেলাম তার। অভিযানের মহান উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের দ্রুত চরিত এবং এ-কাজে যে নিঃস্বার্থ আর রমণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে বিরচিত, এই টানটান

জ্ঞানের সঙ্গে এসে মিশেছিল অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় স্পোর্টসম্যানসুলভ তীব্র আগ্রহ। অপরাধ-সচেতন হওয়া দূরে থাকুক, বিপদের সম্ভাবনা যতই ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, ততই অসহ্য আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠেছিল আমার প্রতিটি লোমকূপ। যন্ত্রপাতির চামড়ার কেসটা খুলে ফেলল হোমস। তারপর দুরূহ অপারেশন করার আগে সার্জেন যেমন ধীর শান্ত, বিজ্ঞানীসুলভ নিপুণ হাতে একটার পর একটা যন্ত্র বেছে তুলে নেয়, ঠিক তেমনি অভ্যস্ত সতর্কতায় তৎপর হয়ে উঠল সে। সিন্দুক খোলা যে তার বিশেষ শখ, তা জানতাম। তাই এ-রকম একটা দানব-সিন্দুকের সামনাসামনি হয়ে সে যে আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্য কী; সিন্দুক তো নয়; যেন সোনালি আর সবুজ রঙের একটা ডাগন, যার জঠরে সঞ্চিত রয়েছে কত সুন্দরী মহিলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার উপাদান। কোটের হাতা গুটিয়ে নিয়েছিল হোমস ওভারকোটটাকে খুলে রেখেছিল চেয়ারের ওপর। পূর্ণোদ্যমে শুরু হল কাজ। দুটো ছাদা করার ড্রিল, একটা সিধকাঠি আর কয়েকটা খাঁজহীন চাবি বার করে রাখল সে। অতর্কিত বিপদের জন্যে তৈরি থেকে মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি তাকাতে লাগলাম, একবার এদিকে আর একবার ওদিকে। অবশ্য কেউ এসে পড়লে আমাদের করণীয় কী, সে-বিষয়ে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না। প্রায় আধঘণ্টা তন্ময় হয়ে রইল হোমস, নিবিড় উৎসাহ নিয়ে একটার পর একটা যন্ত্র তুলে নিয়ে ট্রেনিং পাওয়া কারিগরের মতো বেশ শক্ত আর নিপুণ হাতে কাজ করে চলল সে। অবশেষে শুনলাম, একটা ক্লিক শব্দ, চওড়া সবুজ দরজা ঘুরে গেল কবজার ওপর, ভেতরে দেখতে পেলাম অনেকগুলি কাগজের প্যাকেট। প্রত্যেকটা প্যাকেট সুতো দিয়ে বাঁধা, সিলমোহর করা এবং ওপরে নাম-ধাম সংখ্যা লেখা। একটা প্যাকেট হোমস তুলে নিলে, কিন্তু আগুনের চঞ্চল আলোয় ওপরের লেখা পড়া সম্ভব হল না। ইলেকট্রিক আলো জ্বালাও বিপজ্জনক, কেননা পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে মিলভারটন স্বয়ং। তাই,

চোরা-লণ্ঠনটা ঢেকে আনল সে। তারপরেই আচম্বিতে থমকে গেল। উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনল এবং পরমুহূর্তেই সিন্দুকের পাল্লা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়ে কেসটা তুলে নিলে। দ্রুতহাতে যন্ত্রপাতি কোটের পকেটে ঠেসে নিয়ে তিরবেগে লুকিয়ে পড়ল জানলার পর্দার পেছনে। যাবার সময়ে আমাকেও সরে আসতে বললে ইঙ্গিতে।

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পরেই শব্দ শুনতে পেলাম। তীব্র অনুভূতি দিয়ে অনেক আগেই এ-শব্দ শুনে হুঁশিয়ার হয়ে গেছিল হোমস। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল। অনেক দূরে যেন দড়াম করে বন্ধ হল একটা দরজা। তারপর শুনলাম অস্পষ্ট, চাপা গজগজানির পরেই থপ থপ-কে যেন অতি দ্রুত কিন্তু মেপে মেপে পা ফেলে এগিয়ে আসছে এদিকে। ঘরের বাইরের প্যাসেজে এসে গেল থপ থপ শব্দটা।... তারপর থমকে গেল দরজার সামনে। খুলে গেল দরজা। সুইচ টেপার খটাস শব্দ-দপ করে জ্বলে ওঠে ইলেকট্রিক আলো। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, কড়া সিগারেটের কটু গন্ধ ভেসে এল নাসারন্ধ্রে। তারপর আমরা, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার কয়েক গজের মধ্যেই পায়ের শব্দ ক্রমাগত আসা-যাওয়া করতে লাগল ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। এরপর থেমে গেল পদশব্দ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ শুনলাম চেয়ারে। তালাতে চাবি লাগানোর ক্লিক শব্দ এবং কাগজপত্র নাড়াচাড়া করার খস খস আওয়াজ। এতক্ষণে উঁকি মারার সাহস আমার হয়নি। এবার বুক ঠুকে পর্দাজোড়া সামান্য ফাঁক করে তাকলাম বাইরে। কাঁধের ওপর হোমসের কাঁধের চাপ পড়ায় বুঝলাম, হোমসও উঁকি মারার লোভ সামলাতে পারেনি। ঠিক সামনে আমাদের নাগালের মধ্যেই একটা চওড়া, গোলাকার পিঠ-আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে স্বয়ং মিলভারটন। বুঝলাম, আগাগোড়া তার গতিবিধির হিসেব করতে ভুল করেছি আমরা।

শোবার ঘরে একেবারেই আসেনি সে। ধূমপান করার বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে এতক্ষণ বসে ছিল, ঘরটা বাড়ির দূরপ্রান্তে হওয়ায় আলোকিত জানলাগুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। চোখের একেবারে সামনেই দেখছিলাম ওর চ্যাটালো, ধূসর মাথা আর চকচকে টাক। দু-পা টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে লাল-চামড়ামোড়া চেয়ারের পেছনে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল ও মুখ থেকে কোণ করে বেরিয়ে ছিল লম্বা কালো একটা সিগার। পরনে ধূমপান করার সময়ে পরার উপযুক্ত কারুকার্য করা আধা-সামরিক স্মোকিং-জ্যাকেট; জ্যাকেটের রং ফরাসি দেশের ক্ল্যারেট মদের মতো লাল, কিন্তু কলারটা কুচকুচে কালো। মখমলের। একহাতে আইন-সংক্রান্ত একটা দীর্ঘ দলিল নিয়ে অলসভাবে পড়ছিল সে, আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটার পর একটা ধোঁয়ার বলয় ছুঁড়ে দিচ্ছিল শূন্যে। আয়েশ করে জাঁকিয়ে বসার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল না, খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান করার ইচ্ছে আছে তার।

অন্ধকারের মাঝে অনুভব করলাম, আলতো করে আমার হাত ধরে মৃদু আঁকানি দিলে হোমস। পরিস্থিতি যে এখনও তার আয়ত্তের বাইরে যায়নি এবং এখনও নিরুবেগ তার অন্তর, সুতরাং আমারও উচিত সাহসে বুক বাঁধা—এই কথাগুলোই যেন হাত ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইল ও। কিন্তু আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম, তা নিশ্চয় সে দেখতে পায়নি। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে তা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করায়, সিন্দুকের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এবং যেকোনো মুহূর্তে তা মিলভারটনের চোখে পড়তে পারে। কাজেই মনে মনে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। যে-মুহূর্তে বুঝব মিলভারটন দেখতে পেয়েছে আধ বন্ধ দরজাটা এবং শক্ত হয়ে উঠেছে তার দেহ, সেই মুহূর্তেই গোপন স্থান থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে আমার

ওভারকোটটা ওর মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে জাপটে ধরে কাবু করে ফেলব তাকে, তারপর যা করার সে হোমসই করবে। কিন্তু একবারও চোখ তুলে তাকালে না মিলভারটন। অলস মস্তুর ভঙ্গিমায় পাতার পর পাতা উলটে চলল। বুঝলাম, নিবিড় আগ্রহে আইনবিদের যুক্তিস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ও। ভেবেছিলাম, দলিলটা পড়া শেষ এবং হাতের সিগার পুড়ে ছাই হলে শোয়ার আয়োজন করবে সে। কিন্তু এ দুটোর একটারও অন্তে পৌঁছোননা হল না। তার আগেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা এবং আমাদের চিন্তাধারাও আচমকা গতি পরিবর্তন করে ছুটল সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক খাতে!

বেশ কয়েকবার মিলভারটনকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেছিলাম আমি। একবার তো অধীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। রাতদুপুরে যে তার সঙ্গে কারো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে, এ-ধারণা একেবারেই মাথায় আসেনি আমার। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা মৃদু শব্দ ভেসে এল আমার কানে। কাগজপত্র ডেস্কের ওপর ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসল মিলভারটন। আবার শোনা গেল শব্দটা, তারপরেই দরজার ওপর আলতোভাবে টোকা মারার আওয়াজ। দাঁড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিলে মিলভারটন।

কেন, আমাদের তা দেখার দরকার নেই। নিয়তির দণ্ড নেমে এসেছে।

তারপর ত্বরিত স্বরে বললে, প্রায় আধঘণ্টার মতো দেরি হয়েছে তোমার।

অর্গল-মুক্ত দরজা আর মিলভারটনের রাত্রি জাগরণের অর্থও সুস্পষ্ট হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। স্ত্রীলোকের বেশভূষার মৃদু খসখস শব্দ শোনা গেল! মিলভারটন আমাদের দিকে ফিরতে পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। এবার সাহস করে আবার ফাঁক করে উঁকি মারলাম বাইরে।

আবার আসন গ্রহণ করেছিল মিলভারটন। আগের মতোই সিগারটাকে আলগোছে ধরে রেখেছিল ঠোঁটের কোণে-ডগাটা মুখ থেকে কোণ করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। তার ঠিক সামনে, বিদ্যুৎবাতির প্রখর আলোয়, দাঁড়িয়ে ছিল ছিপছিপে লম্বা চেহারার একটি কালোবরণ স্ত্রীলোক। অবগুষ্ঠনে ঢাকা তার মুখ, চিবুক থেকে ঝুলছিল বৈধব্য-সূচক আলখাল্লা। ঘন ঘন এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বইছিল তার এবং নমনীয় বরতনুর প্রতিটি ইঞ্চি কেঁপে কেঁপে উঠছিল প্রবল আবেগে।

মিলভারটন বললে, মাই ডিয়ার, রাতের বিশ্রাম তো আমার নষ্ট করে দিলে। যাই হোক, ঘুম-হওয়ার উপযুক্ত মূল্য আশা করি তুমি দিতে পারবে। অন্য কোনো সময়ে তোমার আসা সম্ভব হয় না বুঝি?

ঘাড় নাড়ল স্ত্রীলোকটি।

বেশ বেশ, না আসতে পারলে এসো না। কাউন্টসের শাসন যদি এতই কড়া বলে মনে কর তো তাকে শায়েস্তা করার এই হল সুযোগ। কী মুশকিল, আরে মেয়েটা, এত কাঁপছে কেন? ঠিক আছে, এই তো চাই। সামলে নাও নিজেকে! এবার এসো কাজের

কথা কিছু হোক। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা চিরকুট বার করল মিলভারটন, তুমি লিখেছ এমন পাঁচখানা চিঠি তোমার হাতে এসেছে যা কাউন্টেন্স দ্য আলবার্টকে সংকটে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। চিঠিগুলো। বিক্রি করতে চাও তুমি! আর আমি চাই কিনতে! এ পর্যন্ত কোনো ঝামেলা নেই। এখন শুধু দামটা করে নেওয়া। চিঠিগুলো আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। নমুনা যদি সত্যি সত্যিই ভালো হয়,—কী সর্বনাশ, আপনি?

একটি কথাও না-বলে অবগুণ্ঠন তুলে ফেলেছিল স্ত্রীলোকটি, চিবুকের ওপর থেকে আলখাল্লাও খসে পড়েছিল বুকের ওপর। মিলভারটনের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম যাঁকে, তাঁর বর্ণ মলিন হলেও তিনি সুশ্রী; সুগঠিত মুখে হকের মতো কোনো নাক, ঘন কালো ধারালো ভুরু-যুগল, ঝকঝক কিস্তি সুকঠিন একজোড়া চোখ, আর অবক্ষিম পাতলা অধরোষ্ঠে সর্বনাশা হাসি।

চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা, হ্যাঁ, আমি। যার জীবনে আপনি সর্বনাশের আগুন জ্বেলেছেন, আমিই সেই মেয়েটি।

বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন মহিলাটি পাতলা অধরোষ্ঠে খেলা করতে লাগল সেই ভয়ানক বিষাক্ত হাসি।

আমার জীবন যেভাবে ধ্বংস করেছেন, সেভাবে আর কোনো জীবনে আপনি সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে পারবেন না। আমার বুক যেভাবে ভেঙেছেন, সেভাবে আর কারো বুক আপনি আপনার শেল হানতে পারবেন না। পৃথিবীর বুক থেকে আমি মুছে দেব একটা

অতি বিষাক্ত বস্তুর অস্তিত্ব । এই নাও কুকুর কোথাকার, আর একটা! -আর একটা!-আর একটা!

বুকের মধ্যে থেকে একটা চকচকে খুদে রিভলভার বার করে মিলভারটনের দেহের ওপর একটার পর একটা ঘর খালি করে চললেন মহিলাটি-নলচেটা রইল মিলভারটনের শার্ট থেকে দু-ফুটের মধ্যেই। কুঁচকে সরে এল সে, উপুড় হয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, আর ভীষণভাবে কাশতে লাগল কাগজগুলো আঁকড়ে ধরে। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েই আর একটা গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। শেষ করে ফেলল আমায়! আতঁস্বরে চাঁচিয়ে উঠল সে-পরক্ষণেই নিষ্পন্দ হয়ে গেল তার দেহ। নিবিষ্ট চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলাটি, তারপর চিত হওয়া মুখের ওপর রগড়ালেন জুতোর হিল। আবার তাকালেন, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। জোরালো খস খস শব্দ শুনলাম, হুহু করে রাতের হাওয়া ঢুকে পড়ল উত্তপ্ত ঘরের মধ্যে, আর উধাও হয়ে গেলেন প্রতিহস্তা বাইরে অন্ধকারে।

আমরা চেষ্টা করলেও লোকটার অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাতে পারতাম না। কিন্তু যখন মহিলাটি গুলির পর গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছিলেন মিলভারটনের কুঁচকানো দেহের মধ্যে তখন আমি লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে গেছিলাম, কিন্তু হোমস হিমশীতল কঠিন হাতে আমার কবজি চেপে ধরে আটকে রাখলে। ওর ওই দৃঢ় মুঠির অর্থ বুঝলাম আমাকে সংযত রাখার পেছনে তার যুক্তিনির্ভর বিতর্ক। যে অবস্থাই হোক না কুচক্রী শয়তানের, আমাদের আসার উদ্দেশ্য অন্য এবং চোখের সামনে যাই হোক না কেন, কর্তব্য ভুললে চলবে না। মহিলাটি ঘর থেকে ঝড়ের মতো বেগে বেরোতে, হোমস দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদক্ষেপে

পৌঁছোল অন্য দরজায়। চাবি ঘুরিয়ে তালা এঁটে দিলে সে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে কণ্ঠস্বর আর ধাবমান পায়ের শব্দ শুনলাম। গুলি ছোড়ার আওয়াজে জেগে উঠেছে বাড়ির প্রত্যেকে। ধীর শান্ত অবিচল হাতে সিঁদুকটা খুলে ফেললে হোমস, দু-হাতে একবোঝা চিঠির তাড়া নিয়ে ফেলে দিলে আগুনে। আবার ফিরে এল সে। আবার নিলে একটা বোঝা ফেলে দিলে আগুনে। কয়েকবারের চেষ্টাতেই শূন্য হয়ে গেল সিঁদুকের উদর। বাইরে থেকে কে দরজার হাতল ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল। চকিত চোখে চারিদিকে দেখে নিলে হোমস। মিলভারটনের মৃত্যুদূত চিঠিটা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে ছিল টেবিলের উপর। সেটাও দাউ দাউ আগুনে ফেলে দিয়ে এল হোমস। তারপরেই বাইরের দরজা থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে আমার সাথে বেরিয়ে এসে, বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে তালা এঁটে দিলে। এদিকে গেলেই বাগানের দেওয়াল টপকাতে পারব।

এত তাড়াতাড়ি যে সমস্ত বাড়ি সজাগ হয়ে উঠবে, তা নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আলোয় আলোয় বলমল করছে এতবড়ো বাড়িটা। সামনের দরজা খোলা কয়েকজন লোক ছুটছিল বাগানের পথে। বহু লোকের হাঁকডাকে সাড়া পড়ে গেছিল বাগানে। আমরা যেই বারান্দা থেকে বেরিয়েছি, একজন তো পাকড়াও, পাকড়াও করে চেষ্টাতে চেষ্টাতে ছুটে এল পিছু পিছু। সমস্ত বাগানটা যেন হোমসের নখদর্পণে। একটা ছোটো চরাগাছের খেতের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে তিরবেগে এগিয়ে চলল সে, আমি আঠার মতো লেগে রইলাম তার পেছনে, আর পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে সমানে ছুটতে লাগল আমাদের অনুসন্ধানকারী। তারপরেই গতি রুদ্ধ হয়ে গেল ছ-ফুট উঁচু একটা পাঁচিলের সামনে। হোমস কিন্তু অবলীলাক্রমে লাফিয়ে উঠে পড়ল ওপরে এবং পরক্ষণেই নেমে পড়ল ওপাশে, আমিও লাফিয়ে উঠে

পড়লাম ওপরে এবং পরক্ষণেই নেমে পড়ল ওপাশে, আমিও লাফিয়ে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ছিনেজোঁকের মতো লোকটা সজোরে আঁকড়ে ধরলে আমার গোড়ালি। লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁকপাঁক করে কোনোরকমে উঠে পড়লাম ঘাসে-ঢাকা ওপরের অংশে, পরক্ষণেই মুখ খুবড়ে পড়লাম ওদিকে একটা ঝোঁপের মধ্যে। পলকের মধ্যে আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে হোমস এবং দুজনে টেনে দৌড়োলাম হ্যাম্পস্টেড হীথ-এর বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। প্রায় মাইল দুয়েক ছোট্টার পর হোমস দাঁড়িয়ে গিয়ে কানখানা খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ। নিখর নিস্তক্করতায় ঝিমিয়ে ছিল পেছনকার পথ। ছিনেজোঁকের মতো পিছু নেওয়া লোকটার চোখে শেষ পর্যন্ত ধুলো দেওয়া গেছে এবং আবার আমরা নিরাপদ।

এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভের পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সমাপনান্তে প্রভাতিক পাইপে ধূমপান করছি, এমন সময়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড খুব গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন মুখে আমাদের বসার ঘরে ঢুকল।

সুপ্রভাত, মিস্টার হোমস, সুপ্রভাত। খুব ব্যস্ত আছেন নাকি?

তোমার কথা শোনার মতো সময় আছে।

হাতে যদি বিশেষ কোনো কাজ না-থাকে, তাহলে একটা অত্যন্ত আশ্চর্য তদন্তে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন, এই আশায় এসেছিলাম। গত রাতে হ্যাম্পস্টেডে ঘটেছে এই ঘটনাটা।

সর্বনাশ! কী ব্যাপার শুনি? বলে হোমস।

খুন-অত্যন্ত নাটকীয় এবং আশ্চর্য রকমের খুন। আমি জানি এসব ব্যাপারে কতখানি উৎসুক আপনি। তাই বলছিলাম, দয়া করে যদি অ্যাপলডোর টাওয়ারে আপনার পায়ের ধুলো দিয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শের সুযোগ নিতে দিতেন আমাদের, তাহলে বাস্তবিকই অনুগৃহীত হতাম। খুনটা মোটেই সাধারণ নয়। এই মিলভারটন লোকটার ওপর বেশ কিছুদিন নজর রেখেছিলাম আমরা। আপনাকেই শুধু বলছি, লোকটা একটা আস্ত শয়তান। ব্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে অনেক কাগজপত্র নাকি ও রেখে দিত নিজের কাছে। এই ধরনের সব কাগজই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। মূল্যবান কোনো জিনিসই খোয়া যায়নি। সুতরাং আমাদের অনুমান, আততায়ীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ এবং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এ ধরনের সামাজিক কেলেক্সারি বন্ধ করা।

আততায়ীরা! চেষ্টা করে ওঠে হোমস, বহুবচন?

হ্যাঁ। দুজন এসেছিল। আর একটু হলেই হাতেনাতে ধরাও পড়ত। পায়ের ছাপ পেয়েছি, চেহারার বর্ণনা পেয়েছি এবং পিছু নিয়ে তাদের পাকড়াও করাও খুব অসম্ভব হবে না। প্রথম লোকটা একটু বেশি রকমের চটপটে। দ্বিতীয় লোকটার পায়ের গোড়ালি চেপে ধরেছিল বাগানের মালি-সামান্য ধস্তাধস্তি করেই পগার পার হয়ে যায় সে। মাঝারি আকারের, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা লোকটার চৌকো চোয়াল, পুরু ঘাড়, গোঁফ আছে এবং চোখ দুটো ঢাকা ছিল কালো মুখোশে।

শার্লক হোমস বলে ওঠে, খুবই অস্পষ্ট বর্ণনা। আরে, ওয়াটসনের চেহারাও তো ওইরকম!

বেশ কৌতুক অনুভব করে ইনস্পেকটর। বলে, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। বর্ণনার সঙ্গে ডক্টর ওয়াটসনের চেহারাই খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

হোমস বললে, লেসট্রেড এযাত্রা তোমাকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না আমার। ব্যাপার কি জান, মিলভারটন লোকটাকে আমিও জানতাম। লন্ডনের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকদের মধ্যেই তাকে স্থান দিয়েছিলাম আমি এবং আমি মনে করি, এমন কতকগুলো অপরাধ আছে সংসারে আইন যাদের স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই, প্রকারান্তরে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অনুমোদন করা যায় এসব ক্ষেত্রে। না, না তর্ক করে লাভ নেই। আমার মন স্থির হয়ে গেছে। নিহতের জন্যে নয়, হত্যাকারীদের জন্যে রইল আমার সহানুভূতি এবং এ-কैसे আমি নাক গলাব না।

যে শোচনীয় দৃশ্য চোখের সামনে দেখলাম, সে-সম্বন্ধে হোমস আমাকে একটা কথা বলেনি। কিন্তু সারাটা সকাল তাকে খুবই চিন্তামগ্ন দেখলাম। শূন্যগর্ভ দৃষ্টি আর নিবিড় তন্ময়তা দেখে মনে হল সে যেন একাগ্র মনে হারিয়ে যাওয়া কিছুকে স্মরণপথে আনবার চেষ্টা করছে। লাঞ্চ খেতে বসে অর্ধেক এগিয়েছি, এমন সময়ে আচমকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। তারপরই চিৎকার, সর্বনাশ! পেয়েছি! টুপি নাও! এসসা আমার সঙ্গে। লম্বা লম্বা পা ফেলে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ও বেকার স্ট্রিট পেরিয়ে এসে অক্সফোর্ড

বরাবর গিয়ে পড়ল রিজেন্ট সার্কাসে। এখানে বাঁ-দিকের একটা দোকানের জানলায় সাজানো ছিল ওই সময়কার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি আর সুন্দরীদের ফটোগ্রাফ। হোমসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একটা ছবির ওপর। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি দেখলাম রানির মতো গরবিনি এক মহিলার ফটোগ্রাফ। পরনে রাজসভার পরিচ্ছদ, সুগঠিত মাথায় মস্ত বড়ো হিরের টায়রা। অভিজাত্য যেন ঠিকরে পড়ছিল তার সর্ব অঙ্গে, হকের মতো সুচারু বক্ষিম নাকে, ধারালো ভুরুযুগলে, পাতলা অধরোষ্ঠে, আর ছোটো কিন্তু দৃঢ় থুতনিতে। তারপরেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল আমার। যুগ যুগ ধরে সম্মানিত সুপ্রাচীন উপাধিটা দেখেই বুঝলাম কার স্ত্রী ছিলেন ইনি। অভিজাতমহলে কুলে-মানে শ্রেষ্ঠ এই সম্রাণ্ড রাজনীতিবিদের নাম কে-না জানে। হোমসের চোখে চোখ রাখতেই ও ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে আমাকে নিয়ে সরে এল জানলার সামনে থেকে।

টীকা

১. ভাংচি দেওয়ার ভয়ঙ্কর কাহিনি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন ২৬ মার্চ ১৯০৪ সংখ্যার কলিয়ার্স ম্যাগাজিনে এবং এপ্রিল ১৯০৪ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১০-এ রচিত দ্য স্পেকলড ব্যান্ড নাটকে আর্থার কন্যান ডয়েল এই ব্ল্যাকমেলার চরিত্রটিকে রেখেছিলেন।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

হ্যাম্পস্টেড : বর্তমানে ক্যামডেনের অন্তর্গত বসবাসের এলাকা। এখানকার বিখ্যাত বাসিন্দাদের মধ্যে জন কিটস, কার্ল মার্কস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

চিড়িয়াখানা : বেকার স্ট্রিটের টিউব রেলস্টেশনের এক মাইলের কম দূরত্বে রিজেন্ট পার্কের একাংশে লন্ডনের চিড়িয়াখানা অবস্থিত। জিয়োলজিকাল সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৮ সালে এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মি. পিকউইক : চার্লস ডিকেন্স রচিত উপন্যাস, ১৮৩৭-এ প্রকাশিত, দ্য পিকউইক পেপার্স-এর প্রধান চরিত্র, সরল, সাদাসিধে, ধর্মভীরু মানুষ, মি. পিকউইক।

অনেক দূর গড়িয়েছ : কত দূর? একেবারে গভীরতম শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত? আশঙ্কা করেছেন ডেভিড গেলারস্টিন, রিচার্ড আশার, ডি. মার্টিন ডেকিন প্রমুখ গবেষক।

উধাও হয়ে গেলেন প্রতিহত্তা বাইরে অন্ধকারে : বাইরের ওই পথে পালাতে গিয়ে হোমস এবং ওয়াটসনকে পার হতে হয়েছিল ছয় ফুট পাঁচিল। ভিক্টোরীয় যুগের বেশবাসে ওই মহিলা নিশ্চয়ই সে-পথে যাননি। তাহলে কোন পথে পালালেন তিনি? প্রশ্ন তুলেছিলেন হোমস গবেষক ডি. মার্টিন ডেকিন।

মোর্যানের মারাত্মক হাতিয়ার

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এম্পটি হাউস]

১৮৯৪ সালের বসন্তকাল ।

অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডোয়ারের হত্যায় দুনিয়ার সমস্ত শৌখিন সমাজে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল, সাড়া পড়ে গেছিল লন্ডনের আপামর জনসাধারণের মধ্যে। যেরকম অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে তিনি খুন হয়েছিলেন, বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না।

দীর্ঘ দশ বছর বাদে আজ আমি অনুমতি পেয়েছি সারি সারি পরস্পরনির্ভর আশ্চর্য ঘটনাগুলোর হারিয়ে যাওয়া অংশগুলো লেখবার।

প্রথমেই সবাইকে জানিয়ে রাখি, দীর্ঘদিন ধরে এই চাঞ্চল্যকর কাহিনি চেপে রাখার জন্যে আমার কোনো দোষ নেই। অতীতে যে অতি আশ্চর্য পুরুষটির অনন্যসাধারণ চিন্তাধারা আর কার্যকলাপের একটু আধটু খবর জানিয়ে সবার চিত্তবিনোদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এ-কাহিনি না-লেখার সুকঠিন নির্দেশ পেয়েছিলাম তার নিজের মুখ থেকেই। আজ তা লিখতে বসেছি, কেননা গত মাসের তিন তারিখে সে নিজেই এ-নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে আমার লেখনীর ওপর থেকে।

অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ার আল অফ মেনুথের দ্বিতীয় পুত্র। আল অফ মেনুথ সে সময়ে অস্ট্রেলিয়ার একটা কলোনির গভর্নর ছিলেন। অ্যাডেয়ারের মা অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে এসেছিলেন চোখের ছানি অপারেশন করাতে। ৪২৭ নম্বর পার্ক লেনে ছেলে রোনাল্ড আর মেয়ে হিলডাকে নিয়ে থাকতেন তিনি। সমাজের সেরা মহলে ঘোরাফেরা করত রোনাল্ড। এবং যতদূর জানা যায়, তার কোনো বিশেষ বদঅভ্যাস ছিল না, কোনো শত্রুও ছিল না। কারসেটয়ার্সের মিস এডিথ উডলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে-সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় মাস কয়েক আগে উভয়পক্ষের সম্মতি নিয়ে। এবং এর ফলে রোনাল্ডের মনে যে কোনো দাগ পড়ছে তারও কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। সবাই জানত, রোনাল্ড খুব সীমিত এবং সনাতন পরিধির মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে ভালোবাসেন-কেননা আবেগের কোনো বালাই ছিল না তার প্রকৃতিতে। স্বভাবটিও ছিল বেশ শান্ত। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত এমন শান্তশিষ্ট তরুণ অভিজাতের শিরে নেমে এল মৃত্যুর পরোয়ানা এল অত্যন্ত আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ১৮৯৪ সালের তিরিশে মার্চ রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটায় মধ্যে।

তাস খেলতে ভালোবাসতেন রোনাল্ড অ্যাডেয়ার। একটানা খেলে যেতেন, কিন্তু চোট খাওয়ার মতো ঝুঁকি কখনো নিতেন না। বন্ডউইন, ক্যাভেন্ডিস আর বাগাটেলী ক্লাবের সভ্য ছিলেন তিনি। জানা গেছে, মৃত্যুর দিন বাগাটেলী কার্ড ক্লাবের ডিনারের পর রাবার অফ হুইস্ট খেলেছিলেন রোনাল্ড। বিকেলেও তাঁকে খেলতে দেখা গেছে সেখানে। খেলার সাথি ছিলেন মি. মারে, স্যার জন হার্ডি এবং কর্নেল মোর্যান। এঁদের কথা থেকেই জানা যায় যে হুইস্ট খেলেছিলেন রোনাল্ড এবং খেলাতে মোটামুটি সমানভাবে পড়েছিল সবার তাস। অ্যাডেয়ার খুব জোর পাঁচ পাউন্ড হেরে থাকতে পারেন তার বেশি নয়। তার

আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল এবং এ সামান্য ক্ষতিতে মুষড়ে যাবার মতো মানুষ তিনি নন। প্রায় প্রতিদিনই একটা-না-একটা ক্লাবে তাস খেলতেন রোনাল্ড। কিন্তু এমনই সাবধানী খেলোয়াড় তিনি যে বড়ো-একটা হারতেন না-পকেট ভারী করে তবে টেবিল ছাড়তেন। আরও জানা গেল যে, হপ্তাখানেক আগে কর্নেল মমর্যানকে পার্টনার নিয়ে এক হাত থেকেই গডফ্রে মিলনার এবং লর্ড ব্যালোরের কাছ থেকে প্রায় চারশো কুড়ি পাউন্ড জিতেছিলেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলতে তদন্তের ফলে এই সবই জানা গেছিল তার সম্বন্ধে।

খুনের রাতে ক্লাব থেকে ঠিক দশটায় বাড়ি ফিরে আসেন অ্যাডেয়ার। মা আর বোন বেরিয়েছেন কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে। তিনতলায় সামনের ঘরটা সাধারণত তার বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়-পরিচারিকা এই ঘরেই ঢোকবার শব্দ শুনেছে। আগেই ঘরে চুল্লি জ্বেলে দিয়েছিল সে, ধোঁয়া হচ্ছিল বলে জানলাটাও খুলে এসেছিল। রাত এগারোটা কুড়ি মিনিটে লেডি মেনুথ আর তাঁর মেয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনো শব্দ শোনা গেল না ঘর থেকে। শুভরাত্রি জানাবার জন্যে লেডি মেনুথ ছেলের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়া। চেষ্টা করে, ধাক্কা দিয়ে কোনো সাড়াশব্দ যখন পাওয়া গেল না, তখন লোকজন ডেকে জোর করে খোলা হল দরজা। টেবিলের কাছে পড়ে ছিলেন হতভাগ্য রোনাল্ড। রিভলভারের বুলেটে বীভৎসভাবে বিকৃত হয়ে গেছিল তার মাথার খুলি। ঘরের মধ্যে কিন্তু ও-জাতীয় কোনো হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেবিলের ওপর দশ পাউন্ডের দুটো নোট পড়ে ছিল-আর ছিল ছোটো ছোটো থাকে সাজানো সোনা রুপোয় মিশানো সতেরো পাউন্ড দশ শিলিং। একটা কাগজে কতকগুলো সংখ্যা বসানো ছিল-পাশে পাশে লেখা কয়েকজন ক্লাবের

বন্ধুর নাম। কাজেই ধরে নেওয়া হল, মৃত্যুর আগে তাসের জুয়োর হারজিতের একটা মোটামুটি খসড়া করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

মিনিটখানেক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল কেসটা। প্রথমত ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব এ-কাজ খুনির। খুনের পর খোলা জানলা দিয়ে উধাও হয়েছে সে দরজায় চাবি যেমন ছিল তেমনি রেখে। মাটি থেকে কম করে বিশ ফুট উঁচুতে জানলাটা। অবশ্য জানলার ঠিক নীচেই ফুলে ফুলে ঢাকা ক্রোকাসের একটি ঝোপ ছিল। বিশ ফুট উঁচু থেকে সেখানে কেউ লাফিয়ে পড়লে ফুল-টুল ছিঁড়ে ঝোপ তো লম্বভল্ব হতই, মাটিতেও গভীর পায়ের ছাপ পাওয়া যেত। কিন্তু সে-রকম কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। ঝোপের মধ্যে দিয়ে ইদানীং কেউ হেঁটেছে বলেও মনে হল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, অ্যাডেয়ার নিজেই দরজায় চাবি দিয়েছিলেন ভেতর থেকে। তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যু এল কোন পথে? কোনো-রকম চিহ্ন না-রেখে কারো পক্ষেই কিছু বেয়ে জানলায় উঠে আসা সম্ভব নয়। ধরা যাক জানলা দিয়ে কেউ গুলি চালিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে তার খুলি। তাহলে তো হত্যাকারীর হাতের টিপ অসাধারণ বলতে হবে। কেননা, রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ে এ-রকম মরণ ঘা দেওয়া বড়ো সোজা কথা নয়। বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে জনবহুল পার্ক লেনে কেউ-না-কেউ গুলির আওয়াজ নিশ্চয় শুনতে পেত। বাড়ি থেকে শ-খানেক গজের মধ্যে ভাড়াটে গাড়ির একটা আচ্ছা আছে। সেখান থেকেও ফায়ারিং-এর কোনো শব্দ শোনা যায়নি। সব ঠিক। কিন্তু তবুও রিভলভারের বুলেটেই মারা গেছেন অ্যাডেয়ার। মারা গেছেন নিতান্ত আচম্বিতে খুদে কালান্তকের চকিত চুম্বন পলকের মধ্যেই অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের দেহ থেকে মুছে নিয়ে গেছে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন।

এই হল পার্ক লেন রহস্য। খুনের পেছনে কোনো মোটিভ পাওয়া যায়নি, কেননা আমি আগেই বলেছি রোনাল্ডের কোনো শত্রু ছিল না। তা ছাড়া তাঁর ঘরের টাকাপয়সা সরানোরও কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। কাজেই, মোটিভের কোনো নামগন্ধ না-থাকায় আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এই আশ্চর্য রহস্য।

সারাদিন ধরে শুধু এই সবই ভাবলাম বার বার। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, যে-পরিমাণে মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোকে কষ্ট দিলাম, সে-অনুপাতে সমস্যার সুরাহা বলতে গেলে কিছুই হল না।

সন্দের দিকে বেড়াতে বেড়াতে পার্কের দিকে এসেছিলাম। ছ-টা নাগাদ এসে পৌঁছোলাম পার্ক সেন আর অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মোড়ে। ফুটপাথের ওপর এক দঙ্গল উষ্ণ প্রকৃতির লোককে দেখলাম ভিড় করে একদৃষ্টে ওপরতলার বিশেষ একটা জানলার পানে তাকিয়ে থাকতে। বুঝলাম যে-বাড়ির সন্ধান আসা এ সেই বাড়ি। পিছু হটতে গিয়ে ধাক্কা লেগে গেল আধবুড়ো এক কুঁজোর সঙ্গে। আমার ঠিক পেছনেই একগাদা বই হাতে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ধাক্কা লেগে কয়েকটা বই ছত্রাকার হয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর। লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে দেখলাম আমার কাছে বইগুলোর যে-দামই থাকুক না কেন এবং তাদের সঙ্গে আমি যত খারাপ ব্যবহারই করি না কেন, আধবুড়ো গ্রন্থকীট ভদ্রলোকের কাছে তাদের দাম অপরিসীম। কেননা, আমার কথা শুরু হতে-না-হতেই দাঁত খিচিয়ে দারুণ ঘৃণায় এক হুংকার ছেড়ে পেছন ফিরে পা চালালেন ভদ্রলোক ভিড়ের

দিকে । পেছন থেকে ভিড়ের মধ্যে আমি শুধু দেখতে পেলাম তার সাদাকালো কোঁকড়ানো জুলপি জোড়া ।

পার্ক লেনের ৪২৭ নম্বর বাড়ি দেখে আমার আসল সমস্যার কোনো সুরাহাই হল না । রাস্তা আর বাড়ির মাঝে রেলিং লাগানো একটা নীচু পাঁচিল দেখলাম । তাও সব মিলিয়ে পাঁচ ফুটের উঁচু নয় । কাজেই রেলিং টপকে যে কেউ অনায়াসেই ঢুকতে পারে বাগানে, কিন্তু জানলার নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব । কেননা, জলের পাইপ কি ওই জাতীয় কিছুই দেখতে পেলাম না ধারেকাছে । আগের চেয়ে আরও বেশি হতভম্ব হয়ে ফিরে এলাম কেনসিংটনে । পাঁচ মিনিটও হয়নি আমার স্টাডিতে বসেছি আমি, এমন সময়ে পরিচারিকা এসে খবর দিলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আমার সঙ্গে ।

ঘরে ঢুকলেন যিনি তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম । পার্ক লেনের সেই অদ্ভুত প্রকৃতির আধবুড়ো গ্রন্থকীট । লম্বা লম্বা পাকা চুলের মাঝে ধারালো কঠিন মুখ । ডান বগলে ডজনখানেক তার সেই মহামূল্যবান কেতাব ।

কীরকম যেন অদ্ভুত ককর্শ স্বরে শুধোলেন, আমাকে দেখে বেজায় অবাক হয়ে গেলেন দেখছি?

স্বীকার করলাম যে কিছুটা হয়েছি বই কী ।

কিছু মনে করবেন না স্যার, বিবেকের কামড় সহিতে না-পেরে আসতে হল আমায়। আপনার পিছু পিছু আসছিলাম আমি। আপনাকে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়তে দেখে ভাবলাম বলে যাই আমার রক্ষ ব্যবহারে যেন কিছু মনে না-করেন। আপনার ওপর মোটেই রাগ করিনি আমি, বরং বইগুলো তুলে দেওয়ার জন্যে অশেষ কৃতজ্ঞ।

আমি আপনার প্রতিবেশী। চার্চ স্ট্রিটের মোড়ে আমার বইয়ের দোকানটা হয়তো দেখে থাকবেন আপনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই খুব খুশি হলাম, স্যার। আপনারও হয়তো বই কেনার বাতিক থাকতে পারে। এই দেখুন ব্রিটিশ বার্ড, ক্যাটাল্লাস, আর হোলি ওয়ার প্রতিখানা বাড়িতে রাখার মতো। পাঁচখানা বই দিয়ে আপনার দ্বিতীয় সেলফের ওই ফাঁকটা ভরাট করে ফেলতে পারেন। বড়ো নোংরা লাগছে, কি বলেন স্যার?

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের ক্যাবিনেটটা দেখে আবার যখন সামনে তাকালাম দেখলাম আমার পানে হাসিমুখে তাকিয়ে স্টাডি-টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শার্লক হোমস।

দাঁড়িয়ে উঠে সেকেন্ড কয়েক রীতিমতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। তারপরেই বোধ হয় জীবনে সেই প্রথম এবং শেষবারের মতো অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি। ধোঁয়াটে রঙের খানিকটা কুয়াশা ঘুরপাক খেয়ে উঠল চোখের সামনে! কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখলাম আমার কলারের বোতাম খোলা এবং ঠোঁটের ওপর ব্র্যান্ডির চনচনে স্বাদ। ফ্লাস্ক হাতে ঝুঁকে পড়ে আমার চেয়ারে বসে ছিল হোমস।

শুনলাম সেই পরিচিত স্বর যা কোনোদিনই ভোলা যায় না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আমার ঘাট হয়েছে, ক্ষমা করো আমায়। তুমি যে এ-রকম শক পাবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

সজোরে আঁকড়ে ধরলাম তার হাত।

হোমস! সত্যিই তুমি তো? বাস্তবিকই কি তুমি বেঁচে আছ? শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর খাদ বেয়ে উঠে আসতে পেরেছিলে তুমি?

সবুর! সবুর! এসব কথা আলোচনা করার মতো অবস্থায় আছ তো? আবির্ভাবটা এতটা নাটকীয় করার কোনো দরকার ছিল না। বড়ো জোরালো শক দিয়ে ফেলেছি তোমায়।

কিছু হয়নি আমার। কিন্তু, হোমস, আমি যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না ভাই। গুড হেভেনস আমি ভাবতেও পারিনি কোনোদিন যে তুমি... তুমি আবার এসে দাঁড়াবে আমার স্টাডিতে, সজোরে আবার তার বাহু আঁকড়ে ধরে শিরাবহুল সরু পাকানো হাতে হাত বুলিয়ে বললাম, না, তুমি আর যাই হও, প্রেত নয়। বলো কীভাবে সেই ভয়াবহ খাদের ভেতর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলে।

আমার উলটোদিকে বসে হোমস তার পুরোনো কায়দায় যেন কিছুই হয়নি এমনি উদাসীন ভাবে একটা সিগারেট ধরালে। পরনে তার বইয়ের দোকানির জীর্ণ ফ্রক কোট। বাকিটুকু, অর্থাৎ চুলের রাশি আর পুরোনো বইয়ের গাদা, পড়ে ছিল টেবিলের ওপর।

হোমসকে আগের চাইতেও রোগা এবং সজাগ মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নাক, ধারালো চিবুক আর শুকনো মুখে মৃতের মুখের মতো পাণ্ডাশপানা রক্তহীনতা লক্ষ করে বুঝলাম ইদানীং খুব স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

সিগারেট ধরিয়ে বলল হোমস, গা এলিয়ে বসে বাঁচলাম, ওয়াটসন। লম্বা মানুষের পক্ষে পুরো এক ফুট ছেটে ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনয় করে যাওয়া বড়ো সোজা কথা নয়। যাক, ভাই, তোমার সাহায্য আমার এখন দরকার। আজ রাতেই অত্যন্ত কঠিন আর বিপজ্জনক অভিযানে তোমাকে পাশে না-পেলে আমার চলবে না। কাজটা শেষ হলে, সমস্ত কিছু খুলে বলাই ভালো, কি বল?

কৌতূহলের চাপে ফেটে মরে যাব আমি। যা বলবার এখনই বলো।

আজ রাতে আমার সঙ্গে আসছ তো?

এক-শোবার। যখনই বলবে, যেখানেই বলবে-আমার অমত নেই।

বাস্তবিকই পুরোনো দিনগুলো যেন আবার ফিরে এল। যাবার আগে চটপট হাত চালিয়ে ডিনারটাও খেয়ে যেতে হবে। বেশ, তাহলে শুরু হোক খাদ-প্রসঙ্গ। খাদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে আমায় খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি ওয়াটসন। কারণ জলের মতো সরল। খাদের ভেতর আমি কোনোদিনই পড়িনি।

খাদের মধ্যে পড়ইনি?

না, ওয়াটসন, কোনোদিনই না। তোমাকে যে-চিরকুটা লিখে গেছিলাম, তাতেও কোনো মিথ্যা ছিল না। যে সরু পথটা বেয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোনো যায়, ঠিক তার মুখটাতে যখন পরলোকগত প্রফেসর মরিয়াটির শয়তান মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তখন অবশ্য আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে আমার লীলাখেলা শেষ হয়ে এসেছে। লোকটার গ্রানাইট কঠিন ধূসর চোখে দেখলাম চাপা ফন্দির ঝিলিক। দু-চারটে কথা বলার পর প্রফেসরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছোট চিরকুটটা লিখে ফেললাম-এই চিরকুটটাই তোমার হাতে পৌঁছেছিল। সিগারেটের বাক্স আর বেড়াবার ছড়িসমেত চিরকুটটা রেখে সরু পথ বরাবর এগিয়ে গেলাম-পিছু পিছু এলেন মরিয়াটি। পথের শেষে একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালাম হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে। কোনো হাতিয়ার না-নিয়ে সিধে আমার দিকে দৌড়ে এসে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে আমায় জাপটে ধরলেন তিনি। তার খেল যে খতম হয়েছে, তা মরিয়াটি ভালোভাবেই জানতেন, তাই যেনতেনপ্রকারেণ প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। পড়ো পড়ো হয়ে সেই সরু কিনারায় দাঁড়িয়ে কোনোরকমে তাঁর ধাক্কা সামলে নিলাম। তুমি তো জানই আমি একটু-আধটু বারিৎসু জানি। জাপানি পদ্ধতিতে কুস্তির এই বিশেষ কায়দা বহুবার আমি কাজে লাগিয়েছি অনেক সঙ্গিন পরিস্থিতিতে। আমাকে জাপটে ধরার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই পড়ো পড়ো হয়েও চট করে পিছলে বেরিয়ে গেলাম তার আলিঙ্গন থেকে। বিকট চিৎকার করে প্রফেসর কয়েক সেকেন্ড পাগলের মতো হাত ছুড়লেন, দু-হাতের আঙুল বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরলেন বাতাসকে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও দেহের সমতা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না তিনি, তলিয়ে গেলেন নীচে! কিনারা থেকে মুখ বাড়িয়ে

বহুদূর পর্যন্ত তাকে পড়তে দেখলাম। তারপর একটা পাথরে লেগে ঠিকরে গিয়ে ঝপাস করে তলিয়ে গেলেন জলের তলায়।

বড়ো বড়ো চোখ করে হতবাক হয়ে শুনছিলাম হোমসের যমালয় থেকে জীবন্ত ফিরে আসার কাহিনি। সিগারেট টানার ফাঁকে রসিয়ে রসিয়ে বলে চলেছিল সে।

থামতেই আমি চেষ্টা করে উঠলাম, কিন্তু পায়ের ছাপ! আমি নিজের চোখে দেখেছি দু-জোড়া পায়ের ছাপ কিনারা পর্যন্ত গেছে-কোনোটাই কিন্তু ফেরেনি।

ফিরেছিল অন্য পথে। প্রফেসর অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মতোই বুঝলাম দৈবের কৃপায় কী অসাধারণ সুযোগ এসে গেছে আমার হাতের মুঠোয়। আমাকে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখানোর শপথ যে মরিয়াদি একা করেননি, তা আমি জানতাম। নেতার মৃত্যুতে অন্ততপক্ষে তিনজনের প্রতিশোধ-স্পৃহা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে! তিনজনের প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির মানুষ। এদের মধ্যে একজন-না-একজন আমাকে শেষ করবেই আর যদি উলটো দিক থেকে ভাবা যায়, অর্থাৎ দুনিয়ার সবাই যদি জানতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে, আমিও পরলোকের পথে রওনা হয়েছি, তাহলে এই লোকগুলোও আরও বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করবে। ফলে, একদিন-না-একদিন আমি তাদের সাবাড় করবই। এবং তিনজনকে খতম করতে পারলেই দুনিয়াকে আবার জানিয়ে দেওয়া যাবে যে, আমি মরিনি, এই সুন্দর ভুবনেই দিব্যি বেঁচে আছি আর পাঁচজনের মতো। মস্তিষ্কের কাজ যে কত দ্রুত হতে পারে তা বুঝলাম সেদিন, কেননা

আমার বিশ্বাস প্রফেসর মরিয়ান রাইখেনবা ফল-এর তলা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই এতগুলো জিনিস ভাবা আমার শেষ হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে উঠে পেছনের পাথুরে দেওয়াল পরীক্ষা করে দেখলাম। মাস কয়েক পরে এই দুর্ঘটনার ছবির মতো বিবরণ তোমার রচনায় পড়ে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। তুমি লিখেছিলে যে, পাথুরে দেওয়ালটা খাড়া উঠে গেছে। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়। কেননা পা রাখবার ছোটো ছোটো জায়গা তো ছিলই, তাকের মতো খানিকটা পাথরও বেরিয়ে এসেছিল। পাহাড়টা এমনই খাড়াই যে, আগাগোড়া বেয়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব, ঠিক তেমনই অসম্ভব ভিজে পথে পায়ের ছাপ-রেখে বেরিয়ে পড়া। এ-রকম ক্ষেত্রে এর আগে আমি যে-চালাকি করেছি, তা করতে পারতাম। অর্থাৎ স্রেফ পিছু হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু একইদিকে তিনজোড়া পায়ের ছাপ এগিয়ে যাওয়া দেখলেই চালাকি ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কাজেই সব দিক ভেবে, দেখলাম পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠাই সবচেয়ে ভালো। ভাই ওয়াটসন, কাজটা খুব মজার নয়। নীচ থেকে জলপ্রপাতের গর্জন এসে আছড়ে পড়ছিল কানের পর্দায়। বাজে কল্পনা আমার মাথায় কোনোদিন আসে না কিন্তু বিশ্বাস কর, সেদিন যেন শুনলাম খাদের গহ্বর থেকে আতর্নাদ করে আমায় ডাকছে মরিয়ানটির কণ্ঠ। একটু সামান্য ভুল মানেই মৃত্যু। একাধিকবার ঘাসের চাপড়া উপড়ে এসেছে হাতের মুঠোয় অথবা পাহাড়ের ভিজে খাঁজে হড়কে গেছে বুটের ডগা প্রতিবারই ভেবেছি এই বুঝি সব শেষ। কিন্তু কিছুতেই না-দমে অতিকষ্টে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওপরে উঠে শেষকালে পৌঁছোলাম সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা কয়েক ফুট গভীর একটা পাথরের তাকে। দিব্যি আরামে সবার চোখের আড়ালে থেকে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম এইখানে। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এইখানেই শুয়ে শুয়ে

দেখলাম কী গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অথচ কী বিশ্রী আনাড়িভাবে আমার মৃত্যুর তদন্ত শেষ করলে তুমি।

অনেকক্ষণ পরে শেষকালে তোমার অকাট্য কিন্তু আগাগোড়া ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হলে। একলা শুয়ে শুয়ে তোমায় যেতে দেখলাম বিষণ্ণ মুখে। ভেবেছিলাম আমার অ্যাডভেঞ্চারের ইতি বোধ হয় এইখানেই। কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে বুঝলাম বিস্ময়ের এখনও অনেক বাকি। ওপর থেকে বিরাট একটা পাথরের চাই গড় গড় করে গড়িয়ে এসে সাঁৎ করে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দমাস করে পড়ল নীচের পথে এবং পর মুহূর্তেই ছিটকে গিয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। মুহূর্তের জন্য ভাবলাম বুঝি নিছক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওপরে তাকিয়ে দেখলাম কালো হয়ে আসা আকাশের পটে একজন পুরুষের মাথা, সঙ্গেসঙ্গে গড়িয়ে এল আর একটা পাথর, এসে পড়ল যে-তাকটায় শুয়ে ছিলাম। ঠিক তার ওপরেই মাথার এক ফুট দূরে। চকিতে বুঝলাম সব। মরিয়াটি একা আসেননি। তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল তারই একজন স্যাণ্ডাত একনজরেই চিনেছিলাম লোকটাকে। কী ভীষণ প্রকৃতির লোক সে, তা ওই একবার দেখেই বুঝেছিলাম। আমার চোখের আড়ালে থেকে দূর থেকে সে দেখেছে তার বন্ধুর মৃত্যু এবং আমার পলায়ন। হট করে কিছু না-করে অপেক্ষা করেছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। তারপর খাড়াই পাহাড়ের একেবারে ওপরে উঠে কমরেডের অসমাপ্ত কাজটাই সম্পূর্ণ করতে শুরু করেছে।

ওয়াটসন, এসব কথা ভাবতে আমার বেশি সময় যায়নি। পাহাড়ের চূড়ায় ভয়ংকর মুখটাকে আবার দেখতে পেলাম বুঝলাম আর একটা পাথর নেমে আসতে আর দেরি

নেই। হাঁপাঁক করে খামচে নামতে লাগলাম নীচের পথের ওপর। ঠান্ডা মাথায় এ-কাজ করতে পারতাম না

আমি। ওপরে ওঠার চেয়ে এক-শো গুণ বেশি কঠিন নীচে নামা। কিন্তু বিপদের কথা ভাববার আর সময় নেই তখন। পাথরের তাক ধরে ঝুলে পড়তেই আর একটা পাথর পাশ দিয়ে গুম করে নেমে গেল নীচে। মাঝামাঝি আসতেই পিছলে গেলাম আমি হড়হড় করে নেমে এলাম নীচে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কাটাছেড়া রক্তাক্ত দেহে এসে পড়লাম রাস্তার ওপরেই খাদের মধ্যে নয়। নেমেই টেনে দৌড়। অন্ধকারে গা ঢেকে পাহাড়ের সারির মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে গেলাম দশ মাইল। এক হণ্টা পরে পৌঁছেলাম ফ্লোরেন্সে। এক বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। দুনিয়ার কেউই জানেনি আমি কোথায় আছি এবং কীভাবে আছি।

আমার অজ্ঞাতবাসের খবর জানত শুধু একজনই-আমার ভাই মাইক্রফট। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, জানি না এজন্যে আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারবে কি না। কিন্তু ভাই, এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেকেই জানুক এবং বিশ্বাস করুক যে, আমি মারা গেছি। এবং এও ঠিক যে আমি মৃত এ-কথা তুমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস না-করলে কি আমার অক্সলাভের অমন রোমাঞ্চকর বিবরণ লিখতে পারতে? ও-লেখা যে একবার পড়েছে, তারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি আর নেই। গত তিন বছরে বারকয়েক কলম নিয়ে বসেছিলাম তোমাকে দু-এক লাইন লিখতে, কিন্তু প্রতিবারেই নিজেকে সামলে নিয়েছি আমার প্রতি তোমার গভীর অনুরাগের কথা ভেবে। কেননা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে এমন কিছু অশোভন কাণ্ড করে বসতে যে, আমার গোপন রহস্য

আর গোপন থাকত না। ঠিক এই কারণেই আজ সন্ধ্যাবেলাতেও যখন আমার বইগুলো রাস্তায় ফেলে দিলে তুমি, আমাকে সরে পড়তে হয়েছে। সে সময়ে খুবই বিপদের মধ্যে ছিলাম আমি। অবাক হয়ে যদি তাকিয়ে থাকতে তুমি অথবা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠতে, তাহলেই ছদ্মবেশ ফুঁড়ে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত সন্ধানীদের চোখে। পরিণাম হত অত্যন্ত শোচনীয় এবং এবার যা হারাতে তা আর ফিরে পেতে না। মাইক্রফোনের কাছে আমার গুপ্ত কথা ফাঁস করতে হয়েছে শুধু প্রয়োজনমতো টাকা পাওয়ার জন্যে।

ইতিমধ্যে শুরু হল মরিয়ান্ট মামলা। শেষও হল। কিন্তু ফলাফল খুব সুখের হল না। আশা করছিলাম অনেক কিছুই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দলের দুজন সবচেয়ে ভীষণ প্রকৃতির লোকই রইল জেলের বাইরে। আমার ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে এই দুজনেই মরণপণ করেছিল। দুজনেই আমার পরম শত্রু।

কাজেই, দু-বছর ঘুরে বেড়িলাম তিব্বতে লামা দেখে এবং প্রধান লামার কাছে থেকে বেশ কিছুদিন মজায় কাটিয়ে দিলাম। এরপর গেলাম পারস্যে, মক্কা দেখলাম এবং খারটুমে খলিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সে ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সব কথা আমি যথাসময়ে ফরেন অফিসে জানিয়ে দিয়েছি। ফ্রান্সে ফিরে এসে আলকাতরা থেকে পাওয়া যৌগিক পদার্থ নিয়ে কয়েক মাস গবেষণা করলাম দক্ষিণ ফ্রান্সের সঁপেলিয়ারের একটা ল্যাবরেটরিতে^{১২}। ফলাফল হল খুবই সন্তোষজনক। ইতিমধ্যে জানলাম আমার দুজন শত্রুর মধ্যে বাকি রয়েছে শুধু একজন। কাজেই লন্ডনে ফিরে আসার আয়োজন করছি, এমন সময়ে শুনলাম পার্ক লেনের রহস্যের চাঞ্চল্যকর খবর। শুনেই আর দেরি করলাম না। কেসটার বিশেষ কয়েকটি পয়েন্ট সম্পর্কে আমার আগ্রহ তো জেগেছিলই, কিন্তু শুধু

এই কারণেই অত তাড়াতাড়ি ফিরিনি। খবরটা পড়েই বুঝেছিলাম আবার দৈব আমার সহায়। অদ্ভুত কতকগুলো ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধে হাতের মুঠোয় এসে পড়বে এই সময়ে যদি ফিরে আসতে পারি লন্ডনে। লন্ডনে পৌঁছেই হাজির হলাম বেকার স্ট্রিটে। মিসেস হাডসন তো আমাকে দেখেই আঁতকে উঠে ঘন ঘন মূছা যেতে লাগলেন।

একটু থেমে আবার বললে হোমস, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, দুঃখের সবচেয়ে বড়ো দাওয়াই হল কাজ। আজ রাতের কাজটাও যদি দুজনে মিলে শেষ করতে পারি এবং সফল হতে পারি-তাহলে জানব এ-গ্রহে অন্তত একটা পুরুষের বেঁচে থাকার যথেষ্ট অধিকার আছে।

বৃথাই আমি হাতজোড় করলাম, কাকুতিমিনতি করলাম আরও কিছু বলার জন্যে। কিন্তু অটল, অনড়ভাবে সে শুধু বললে, সকাল হওয়ার আগেই অনেক কিছু দেখতে শুনতে পাবে তুমি। অতীতের পুরো তিনটে বছর নিয়ে এখনও বকবক করা বাকি আছে। সাড়ে নটা পর্যন্ত তাই চলুক, বেশি নয়। ঠিক সাড়ে নটার সময় বেরিয়ে পড়ব আমরা, তারপর শুরু হবে খালি বাড়িতে আমাদের মনে রাখবার মতো অ্যাডভেঞ্চার।

ভাড়াটে গাড়িতে পকেটে রিভলভার নিয়ে ঠিক তার পাশটিতে বসে মনে পড়ে গেল পুরোনো দিনের কথা। ওস্তাদ শিকারির ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম, বেশ গুরুতর রকমের অ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়িয়েছি আমরা। মাঝে মাঝে তার তাপসিক গাম্ভীর্য ভেদ করে ফুটে উঠছিল ব্যঙ্গবঙ্কিম মৃদু হাসি-তাতে আমার কৌতূহল কমা দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল।

ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রিটে চলেছে, কিন্তু ক্যাভেন্ডিস স্কোয়ারের কোণে গাড়ি দাঁড় করাল হোমস। লক্ষ করলাম, গাড়ি থেকে নামার সময়ে ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে তন্নতন্ন করে সে দেখে নিল। অনেকক্ষণ পরে পৌঁছোলাম ব্ল্যান্ড ফোর্ড স্ট্রিটে। পৌঁছেই বোঁ করে একটা সরু গলিতে ঢুকে গেল হোমস! ওদিককার কাঠের ফটক পেরিয়ে পৌঁছাল একটা পরিত্যক্ত চত্বরে। পকেট থেকে চাবি বার করে একটা বাড়ির পেছনের দরজা খুলে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল ভেতরে। ভালোমন্দ কিছু ভাববার সময় ছিল না। হোমসের পিছু পিছু আমিও ঢোকামাত্র তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিল সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেতরে। বেশ বুঝলাম বাড়িটা একদম খালি। হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে বিরাট চারকোনা একটা খালি ঘরে ঢুকল সে। ঘরের কোণগুলো ঘন আঁধারে ঢাকা, রাস্তার আলোয় মাঝখানের অন্ধকার একটু পাতলা হয়ে এসেছিল। কাছাকাছি কোনো বাতি দেখতে পেলাম না, জানলার কাছে প্রচুর ধুলো জমে থাকায় শুধু দুজন দুজনকে দেখতে পাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকেই চোখ চলল না। কাঁধে হাত রেখে কানের গোড়ায় মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল হোমস, কোথায় এসেছি জান?

ধুলোজমা জানলার ভেতর দিকে তাকিয়ে বললাম, বেকার স্ট্রিটে, তাই না?

শাবাশ। আমাদের পুরোনো আস্তানার ঠিক উলটো দিকের বাড়ি এটা-নাম, ক্যামডেন হাউস।

কিন্তু এখানে মরতে এলাম কেন তাই তো বুঝছি না।

এলাম এই কারণে যে এখান থেকে চমৎকার দেখা যায় ওই ছবির মতো জিনিসটাকে। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, খুব সাবধানে জানলার আরও কাছে এগিয়ে যাও, খুব সাবধানে, কেউ যেন বাইরে থেকে দেখতে না-পায়। এগিয়ে গিয়ে যে-ঘর থেকে আমাদের ছোটোবড়ো সবরকম অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত, সেই পুরোনো ঘরটার মধ্যেই একবার ভালো করে উঁকি মেরে দেখ! দেখা যাক, তিন বছর তোমার কাছ ছাড়া হয়েও তোমাকে চমকে দেবার মতো ক্ষমতা এখনও আমার আছে কি না।

পা টিপে টিপে এগিয়ে তাকালাম পরিচিত জানলাটার পানে। তাকিয়েই এমন চমকে উঠলাম যে মুখ দিয়ে অজান্তে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল।

জানলার পর্দা নামানো ছিল, আর খুব জোরালো একটা আলো জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। জোর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল জানলার পর্দা, আর ঠিক মাঝখানে ফুটে উঠেছিল একটা স্পষ্ট, কালো ছায়ামূর্তি। মূর্তিটি একটি পুরুষের। চেয়ারে বসে ছিল লোকটি, তার মাথা হেলানোর কায়দা, চৌকো কাঁধ আর ধারালো মুখের আদল আমার চেনা অনেক দিনের চেনা। মুখটা অর্ধেক ঘুরিয়ে বসে ছিল সে-এ-রকম কালো কুচকুচে সিলুয়েট মূর্তি আমাদের বাপঠাকুরদার চোখে পড়লে হয়তো সঙ্গেসঙ্গে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন।

ছায়ামূর্তিটি হোমসের অথবা অবিকল হোমসের মতো কোনো পুরুষের। এমনই আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম যে হাত বাড়িয়ে হোমসের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিলাম সত্যিই সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কি না।

অবরুদ্ধ হাসিতে হাসছিল হোমস। বলল, কী হল?

গুড হেভেনস! করেছ কী?

অবিকল আমার মতোই দেখতে হয়েছে, তাই না ওয়াটসন?

আমি তো দিব্যি করে বলতে রাজি আছি যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

কৃতিত্বটুকু গ্রিনোবল-এর মসিয়ে অস্কার মনিয়ারের প্রাপ্য। ছাঁচটা তৈরি করতে বেশ কিছুদিন গেছে ভদ্রলোকের। মোমের তৈরি শার্লক হোমসের আবক্ষ মূর্তি^{১৪}। বাকি যা দেখছ সেটুকু আজ বিকেলে বেকার স্ট্রিটে গিয়ে আমায় করে আসতে হয়েছে।

কিন্তু কেন?

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, কারণ শুধু একটি। আমি যখন বাড়িতে নেই, তখন কয়েকজন লোক বিশ্বাস করুক যে আমি বাড়িতেই আছি! এবং এই অদ্ভুত বিশ্বাস তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমিও বিশ্বাস করি।

অর্থাৎ, তোমার বিশ্বাস ঘরের ওপর চোখ রেখে কেউ বসে ছিল বা এখনও আছে।

ছিল এবং আমি তা জানি।

কারা?

আমার পুরোনো শত্রুরা ওয়াটসন। যে কুখ্যাত সমাজের নেতা এখনও রাইখেনবা ফল-এ শুয়ে-তারা। তুমি তো জানই আমি যে বেঁচে আছি, তা একমাত্র তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং বিশ্বাস করে যে, একদিন-না-একদিন, দু-দিন আগে হোক, আর পরে হোক, আমার ঘরে আমি ফিরে আসবই। সমানে এই তিন বছর তারা পাহারা দিয়ে এসেছে, আজ সকালে সার্থক হয়েছে তাদের প্রতীক্ষা-স্বচক্ষে তারা দেখেছে আমায় ফিরে আসতে।

তুমি জানলে কী করে?

খুব সহজে। জানলা দিয়ে তাকাতেই ওদের চৌকিদারকে আমি চিনেছি। লোকটার নাম-পার্কার, স্বভাবটি খুব নিরীহ, পেশা হল ফাঁস দিয়ে খুন করে রাহাজানি করা, ইহুদিদের হার্প-৫ বাজানোয় জুড়ি মেলা ভার। পার্কারকে আমি ডরাই না, ডরাই তার পেছনে যে আরও ভয়ংকর লোকটা আছে তাকে। যে ছিল মরিয়ার্টির হরিহর-আত্মা বন্ধু; যে রাইখেনবা ফল-এর পাহাড়ের চুড়ো থেকে পাথর গড়িয়ে আমাকেও মরিয়ার্টির পাশে

পাঠাতে চেয়েছিল, যে লন্ডনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, ধুরন্ধর আর পয়লা নম্বরের বদমাশ-এ হচ্ছে সেই-ই! ওয়াটসন, আজ রাতে আমার পিছু নিয়েছে সে নিজেই, কিন্তু ঘুণাঙ্করেও জানতে পারেনি তার পিছু নিয়েছি আমরা।

ধীরে ধীরে বন্ধুবরের মতলব স্বচ্ছ হয়ে এল আমার কাছে। এ-বাড়িতে আমরা এসেছি হোমসের ডামি দেখতে নয়, ডামিকে যারা চোখে চোখে রেখেছে তাদের দেখতে, লুকোনো জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে। জানলার পর্দায় ডামির কালো ছায়াটা টোপ আর আমরা হলাম শিকারি। অন্ধকারের মাঝে, উঁচ পড়লে শোনা যায় এমনি স্তব্ধতার মধ্যে আমরা দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম রাস্তা দিয়ে হনহন করে যাওয়া মূর্তিগুলোকে। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে রাত যখন আরও গভীর হল, ফাঁকা হয়ে এল রাস্তা উত্তেজনা আর সে চেপে রাখতে পারলে না। অস্থিরভাবে ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত শুরু হল অশান্ত অবিরাম পায়চারি। ভাবলাম, এই সময় আমার কিছু বলা দরকার। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে চোখ তুলে আলোকিত জানলার পানে তাকাতেই আবার আগের মতো বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সজোরে হোমসের হাত আঁকড়ে ধরে আঙুল তুলে চিৎকার করে উঠলাম—

হোমস দেখেছ? ছায়াটা সরে গেছে!

প্রথমবারে দেখেছিলাম পাশ ফিরে বসা অবস্থায় ডামির ছায়া। এবার দেখলাম পিছন ফিরে বসা অবস্থায়। তিন বছরেরও যে হোমসের রুক্ষ মেজাজ মোলায়েম হয়নি তার প্রমাণ পেলাম তখনই। তার মতো বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এ-রকম তিরিক্ষে মেজাজ

এবং এত অল্পতেই এভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা মোটেই মানায় না। আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই খ্যাক করে উঠল সে, নড়েছে তত হয়েছে কী? তুমি কি আমাকে এমনই নিরেট গাধা ভেবেছ যে একটা নিছক ডামি খাড়া করে ইউরোপের সবচেয়ে জাঁহাজ সবচেয়ে ধড়িবাজ কয়েকজনের চোখে ধুলো দিতে পারব? তুমি আমায় ভাব কী ওয়াটসন? ঘণ্টা দুয়েক হল এ-ঘরে এসেছি আমরা। এই দু-ঘণ্টার মধ্যে মিসেস হাডসন ডামিটাকে নড়িয়ে-চড়িয়ে বসিয়েছেন সবসুদ্ধ আটবার অর্থাৎ প্রতি পনেরো মিনিটে একবার। সামনের দিকে থাকার ফলে তার ছায়া কোননামতেই জানলার পর্দায় পড়ছে না। চুপ!হঠাৎ দারুণ উত্তেজনায় যেন দম আটকে গেল হোমসের। ফিকে আলোয় দেখলাম-সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গে সজাগ প্রতীক্ষা ফুটিয়ে তুলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে। চারিদিক নিস্তব্ধ এবং ঘন আঁধারের মাঝে দেখলাম শুধু জ্বলজ্বলে ঝলমলে হলুদ পর্দার ওপর ফুটে রয়েছে কালো কুচকুচে ছায়াছবির দেহ-রেখা। থমথমে স্তব্ধতার মাঝে আবার শুনলাম জিব আর তালুর মধ্যকার অতি-পরিচিত মৃদু সতর্কধ্বনি-বুঝলাম কী নিদারুণ চাপা উত্তেজনায় আচম্বিতে টানটান হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতিটি অংশ। মুহূর্তকাল পরেই এক হ্যাচকা টানে আমাকে ঘরের কালির মতো কালো অন্ধকারে ঢাকা একটা কোণে টেনে নিয়ে গেল হোমস-অনুভব করলাম আমার উৎসুক ঠোঁটের ওপর তার সাবধানী আঙুলের স্পর্শ। বুঝলাম তার অর্থ হুশিয়ার! যে-আঙুল দিয়ে হোমস আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, স্পষ্ট অনুভব করলাম থরথর করে তা কাঁপছে। কোনোদিন বন্ধুবরকে এতখানি বিচলিত হতে দেখিনি। আমি কিন্তু যতদূর পারলাম চোখ চালিয়ে নিখর নিস্তব্ধ রাস্তায় ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আচমকা আমিও সজাগ হয়ে উঠলাম। তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে আমার আগেই হোমস যার সাড়া পেয়েছে এবার আমার স্কুল অনুভূতিতেও সে সাড়া জাগালে। খুব মৃদু চাপা একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। শব্দটা এল বেকার স্ট্রিটের দিক থেকে নয়, যে-বাড়িতে আমরা ঘাপটি মেরে বসে, তারই পেছন দিক থেকে। একটা দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ। পরমুহূর্তেই প্যাসেজে শুনলাম পায়ের শব্দ-কে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। অতি কষ্টে চেষ্টা করছে সে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে, কিন্তু খাঁ খাঁ বাড়ির মধ্যে ওইটুকু শব্দই হাহাকার শব্দে ককর্শ প্রতিধ্বনি তুলে আসন্ন বিপদের ডমরুধ্বনি বাজিয়ে চলেছে। দেওয়ালের সঙ্গে সাপটে রইল হোমস। আমিও রিভলভারের ওপর হাত রেখে যতটা পারলাম দেওয়ালের সঙ্গে মিশে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম খোলা দরজার দিকে অন্ধকারের পটভূমিকায় মিশমিশে কালো একটা ছায়ামূর্তির আবছা দেহরেখা। এক মুহূর্ত দাঁড়াল ছায়ামূর্তি-তারপরেই আবার হিংস্র নিশাচর শ্বাপদের মতো গুড়ি মেরে এগিয়ে এল ঘরের মাঝে। ঠিক তিন গজ দূরে যখন তার ত্রুর মূর্তি এসে পৌঁছোল, আমি দেহের প্রতিটি পেশি টান টান করে তৈরি হলাম লাফাবার জন্যে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম সে জানেই না যে আমরা হাজির আছি ঘরের মধ্যে। গা ঘেষে এগিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। জানলার ধারে পৌঁছে খুব আলতোভাবে কিন্তু নিঃশব্দে আধ ফুট তুলে ধরলেন জানলার শার্সি। খোলা জানলার ঠিক পাশটিতে সে গুড়ি মেরে বসে পড়তেই রাস্তার আলো সোজাসুজি এসে পড়ল তার মুখের ওপর। আলোর প্রতিফলনে আকাশের বুকে চিকমিকে তারার মতোই জ্বলছিল তার চোখ দুটো। উত্তেজনায় থির থির করে কেঁপে উঠছিল তার মুখের মাংসপেশি। বয়স হয়েছে তার, নাকটা সরু, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। কপালটা উঁচু, সামনের দিকে টাক পড়ে যাওয়ায় অনেকটা চওড়া। ধোঁয়াটে রঙের মস্ত একজোড়া গোঁফ, মাথার পেছনের দিকে বসানো

ছিল অপেরা হ্যাট, খোলা ওভারকোটের মধ্যে দিয়ে চকচক করছিল ইভনিং ড্রেস-শার্টটা। ভারী কিন্তু মলিন মুখ অসংখ্য রুম্ফগভীর রেখায় কলঙ্কিত। একহাতে একটা লাঠির মত জিনিস দেখলাম, কিন্তু মেঝের ওপর রাখতেই কঠিন ধাতব শব্দ হওয়ায় বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক নয়। ওভারকোটের পকেট থেকে বড় আকারের একটা জিনিস বার করে তৎপর হয়ে উঠল সে, কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম জোরালো তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ। যেন ক্লিক শব্দে ঘাঁটিতে আটকে গেল স্প্রিং বা ওই জাতীয় কিছু। তখনও শেষ হয়নি তার তৎপরতা। হাঁটু গেড়ে বসে এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেহের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে চাপ দিতে লাগল বোধ হয় কোনো লিভারের ওপর ফলে অনেকক্ষণ ধরে জাঁতা ঘোরার পর ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ শুনলাম শেষ হল আবার একটা জোরালো ক্লিক শব্দে। এবার সে সিধে হতেই তার হাতে দেখলাম বন্দুকের মতো একটা জিনিস বাঁটটা কিন্তু বিদঘুটে রকমের। ব্রিচের দিকটা খুলে ফেলে কী-একটা ঢুকিয়ে খটাস করে বন্ধ করে দিল ব্রিচলুক ১৬। তারপর গুঁড়ি মেরে বসে নলচের প্রান্তটা রাখল জানলার কিনারায়, লম্বা গোঁফ ঝুলে পড়ল কুঁদোর ওপর মাছি বরাবর জ্বলজ্বলে চোখ রেখে টিপ ঠিক করতে লাগল সে তন্ময় হয়ে। তারপর শুনলাম স্বস্তির ছোট শ্বাস ফেলার শব্দ- বন্দুকের কিছুতকিমাকার বাঁটটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে তৈরি হল সে লক্ষ্যভেদের জন্য। মাছি বরাবর দৃষ্টিরেখার অপর প্রান্তে জ্বলজ্বলে হলদে পটভূমিকায় কালো ছায়ামূর্তি তার নিশানা চোখ তুলে একবার দেখে নিলাম এই আজব টার্গেটকে। তারপর চোখ নামিয়ে আনতে দেখলাম মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে নিখর হয়ে গেল সে। পরমুহূর্তেই ঘোড়ার ওপর শক্ত হয়ে বসল তার আঙুল। অদ্ভুত শন শন শব্দ শুনলাম। বাতাস কেটে কী যেন উড়ে গেল তিরবেগে, সঙ্গেসঙ্গে জানলার কাচভাঙার মিষ্টি জলতরঙ্গের মতো আওয়াজ। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘের মতো লাফিয়ে উঠল হোমস-এক লাফেই

বন্দুকবাজের পিঠে পড়ে চিত করে আছড়ে ফেলল মেঝের ওপর। পরমুহূর্তেই ছিটকে গেল লোকটা এবং পলক ফেলার আগেই সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরলে হোমসের টুটি। এবার আমি তৎপর হলাম, রিভলভারের বাঁট দিয়ে মাথায় এক ঘা মারতেই শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চেপে ধরতেই হোমস তীব্র শব্দে হুইসল বাজিয়ে দিল। ফুটপাথে শুনলাম ধাবমান পায়ের খটাখট শব্দ, পরক্ষণেই ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল আর সাদা পোশাক পরা একজন ডিটেকটিভ তিরবেগে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

লেসট্রেড তো? শুধোল হোমস।

ইয়েস, মি. হোমস। আমি নিজেই এলাম। আপনাকে আবার লন্ডনে দেখে খুবই খুশি হলাম, স্যার।

দু-দিক থেকে জোয়ান কনস্টেবল দুজন লোকটাকে চেপে ধরায় আমরা দুজন উঠে দাঁড়ালাম। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছিল সে। হোমস এগিয়ে গিয়ে শার্সিটা টেনে নামিয়ে পর্দা ফেলে দিলে। লেসট্রেড দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলল। কনস্টেবল দুজনও তাদের চোরা লণ্ঠনের ঢাকনা খুলে ফেলতে লোকটার দিকে ভালো করে তাকালাম।

মুখখানা তার পুরুষের মতোই বটে। চোখে-মুখে অফুরন্ত তেজের দীপ্তি, ধারালো বুদ্ধির প্রখরতা, অথচ কেমন জানি নিষ্ঠুর, নির্মম, শয়তানি মাখানো। দার্শনিকের মতো চওড়া উন্নত কপাল, কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগী পুরুষের মতো চোয়াল! জীবনের শুরু হয়েছিল

তার অসীম কর্মক্ষমতা নিয়ে কিন্তু কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়ে তা ভাবেনি। তার ত্রুর নীল চোখের দিকে তাকানো যায় না; ঝুলে-পড়া দুই পাতায় ফুটে উঠেছে সমস্ত মানুষজাতির প্রতি অসীম ঘৃণা। তাকানো যায় না তার ভয়ংকর রকমের বেপরোয়া নাক এবং শিহরন জাগানো গভীর বলি-আঁকা কপালের পানে সেখানে অনায়াসেই পড়া যায় প্রকৃতির সহজতম ভাষায় লেখা বিপদের সংকেত। আমাদের কোনোরকম আমল দিলে না সে, অপলকে তাকিয়ে রইল হোমসের পানে-সে-দৃষ্টিতে পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল ঘৃণা আর বিস্ময়।

দুমড়ে-যাওয়া কলারটা ঠিক করতে করতে হোমস বললে, কর্নেল, পুরোনো একটা নাটকে পড়েছিলাম, সব যাত্রার শেষ হয় প্রেমিকদের মিলনে। রাইখেনবা ফল-এ পাথরের তাকটায় শুয়ে থাকার সময়ে আপনার সুনজরে পড়ে অসীম দয়ার যে একটু নমুনা পেয়েছিলাম, তা মনে করেই আবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা খুব সুখময় হবে বলে মনে করিনি।

সম্মোহিতের মতো কর্নেল কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন হোমসের পানে। উত্তরে দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বললেন, ফিচেল শয়তান কোথাকার।

হোমস বলল, ভালো কথা, এখনও আলাপ করানো হয়নি। জেন্টলমেন, ইনিই হলেন কর্নেল সিভাসটিয়ান মোর্যান। হার ম্যাজেস্টিস-এর ইন্ডিয়ান আর্মিতে এঁর সুনাম আছে এবং আজ পর্যন্ত আমাদের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যে দূরপাল্লার বন্দুকবাজ যত আছেন,

তাদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ইনি । কর্নেল, আপনার বাঘের ঝুলির জুড়ি আজও পাওয়া যায়নি... তাই না?

কোনো উত্তর এল না ভীষণ চেহারার বুড়ো কর্নেলের দিক থেকে । জ্বলন্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তিনি বন্ধুর হোমসের পানে । জ্বলন্ত ক্ষুধিত চোখে ভয়ংকর চাহনি আর ঝাঁটার মতো বড়ো বড়ো গোঁফ-সব মিলিয়ে তাঁকে খাঁচায় বন্দি বাঘের মতোই মনে হচ্ছিল ।

হোমস বললে, আমার এই অতি সরল ধোঁকাবাজিতে আপনার মতো এমন একজন বুড়ো শিকারি যে এত সহজে বোকা বনে যাবেন, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে ।

নিদারুণ রাগে চাপা গর্জন করে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়লেন কর্নেল, কিন্তু কনস্টেবল দুজনের হ্যাচকা টানে আবার যথাস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন । তার চোখ-মুখের তখনকার

সে-জিঘাংসা বেশিক্ষণ দেখলেও শিউরে উঠতে হয় ।

হোমস বললে, আমি স্বীকার করছি আমাকেও আপনি একটু অবাক করে দিয়েছিলেন । আপনি নিজেই যে খালি বাড়ির এমন পছন্দসই জানলার সামনে বসে তাগ করবেন, তা আমি ভাবিনি । আমি ভেবেছিলাম রাস্তা থেকেই হুকুম দেবেন আপনি তাই লেসট্রেড

সাপ্তোপাঙ্গ নিয়ে আপনার প্রতীক্ষাই করছিল বাইরে। শুধু এইটুকু ছাড়া সবটুকু আমার হিসেবমতোই হয়েছে।

লেসট্রেডের পানে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল মোর্যান।

বললেন, আমাকে খেপ্তার করার কোনো কারণ থাকুক আর না-থাকুক, এই লোকটাকে দিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করানোর অধিকার কি আপনার আছে? আইনের হাতেই যদি আমি এসে থাকি, সব কিছু আইনসম্মতভাবেই হওয়া উচিত।

লেসট্রেড বলল, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। মি. হোমস, আর কিছু বলবেন কি?

মেঝে থেকে শক্তিশালী এয়ারগানটা তুলে নিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে করতে বললে হোমস, তুলনা হয় না এমন অস্ত্রের, শব্দহীন কিন্তু অসাধারণ এর ক্ষমতা বাস্তবিকই তারিফ করতে হয় এমন হাতিয়ারের। প্রফেসর মরিয়ার্টির অর্ডার অনুযায়ী অন্ধ জার্মান মেকানিক ভন হার্ডার তৈরি করেছিল এটা। ভন হার্ডারকে আমি চিনি। বেশ কয়েক বছর ধরে জানতাম এই অস্ত্রের কথা, কিন্তু কোনোদিন নাড়াচাড়া করার সৌভাগ্য হয়নি। লেসট্রেড, মন দিয়ে জিনিসটা দেখে রাখ এবং যে-বুলেট এর মধ্যে আঁটে-সেগুলোকে ভুলো না-এ আমার বিশেষ অনুরোধ।

দরজার দিকে সবাইকে নিয়ে এগোতে এগোতে লেসট্রেড বললে, আপনি নিশ্চিত থাকুন মি. হোমস। আর কিছু বলবেন নাকি?

শুধু একটি প্রশ্ন । কী চার্জ আনছ কর্নেলের বিরুদ্ধে?

কেন, মি. শার্লক হোমসকে খুন করার চেষ্টা?

না, না, লেসট্রেড । যাকে সমস্ত পুলিশবাহিনী বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, ইনিই সেই কর্নেল সিভাসটিয়ান মোর্যান-যিনি গত মাসের তিরিশ তারিখে ৪২৭ নং পার্ক লেনের উলটোদিকের বাড়ির দোতলার ১৭ খোলা জানলা দিয়ে এয়ারগান থেকে বুলেট ছুঁড়ে অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে খুন করেছিলেন । লেসট্রেড, এই হল তোমার চার্জ । ওয়াটসন, ভাঙা জানলার ঠান্ডা বাতাস যদি কিছুক্ষণ সহ্য করতে পার, তাহলে সিগার টেনে আধঘণ্টা সময় আমার স্টাডিতে কাটিয়ে যাও, সময়টা যে বাজে খরচ হবে না, সে-গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি ।

মাইক্রফট হোমসের তত্ত্বাবধানে আর মিসেস হাডসনের নিয়মিত যত্নে আমাদের পুরোনো ঘরগুলিতে দেখলাম কোনো পরিবর্তনই আসেনি । চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অবশ্য একটু অস্বস্তি লাগছিল, তবে যে-জিনিসটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দেখলাম আছে । কেমিক্যাল কর্নারে আগের মতোই অ্যাসিডের দাগ লাগা দেবদারু কাঠের টেবিলটাকে দেখলাম । সেলফের ওপর সারি সারি সাজানো স্ক্র্যাপবুক আর রেফারেন্স বুক । বইগুলোর বিকট চেহারা দেখে অবশ্য আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে অনেকেই সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলেই পরম খুশি হত । রেখাচিত্র, বেহালার বাক্স, পাইপের র্যাক-এমনকী তামাক ভরতি পারস্যের চটিটাও চোখে পড়ল চারদিক তাকাতে গিয়ে । ঘরের মধ্যে

হাজির ছিল দুজন। প্রথম জন মিসেস হাডসন, আমরা ঘরে ঢুকতেই চোখে-মুখে উপচে-পড়া খুশি নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। দ্বিতীয় জন হোমসের অদ্ভুত ডামিটা-আজ রাতের অ্যাডভেঞ্চারের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু অভিনয়ের ফলে সর্বাপেক্ষা সাফল্য এনে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয়। মডেলটা মোমের, দেহের মিল তো বটেই, রংসুদ্ধ এমনই নিখুঁত যে দেখলে পরে হোমস বলেই মনে হয়। ফুলের টব রাখার সরু লম্বামতে একটা টেবিলের ওপর বসানো ছিল মূর্তিটা, গায়ে এমন কায়দায় হোমসের একটা পুরোনো ড্রেসিং গাউন জড়ানো যে রাস্তা থেকে দেখলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

হোমস বলল, মিসেস হাডসন, যেরকম বলেছিলাম, ঠিক সেইরকম করেছিলেন তো?

প্রতিবারই হাঁটু দিয়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়েছে আমায়।

চমৎকার। বাস্তবিকই আপনার সাহায্য না-পেলে এত নিখুঁতভাবে ধোঁকা দেওয়া যেত না। ওদের। বুলেটটা কোথায় লেগেছে তা দেখেছেন তো?

হ্যাঁ। আপনার অমন চমৎকার মূর্তিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। বুলেটটা মাথার ভেতর দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে চেপটা হয়ে পড়ে ছিল মেঝেতে। এই দেখুন!

আমার হাতে বুলেটটা তুলে দিয়ে বলল হোমস, বুঝতেই পারছ ওয়াটসন। রিভলভারের নরম বুলেট না হলে এ-অবস্থা হয় না। একেই বলে প্রতিভা-কেননা এ-জিনিস যে

এয়ারগান থেকে ফায়ার করা হয়েছে-তা কারোর মাথাতেও আসবে না। ঠিক আছে, মিসেস হাডসন, সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

জরাজীর্ণ ফ্রককোটটা খুলে ফেলেছিল সে, এবার ডামির ওপর থেকে হুঁদুর রঙের ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতেই ফিরে এল পুরোনো হোমস-মাকাননে যে সুদীর্ঘ তিনটে বছরের ব্যবধান আছে, তা আর মনেই রইল না।

মূর্তিটার কপাল চুরমার হয়ে গেছিল বুলেটের ঘায়ে। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হাসিমুখে বলল হোমস, বুড়ো শিকারির স্নায়ু দেখছি এখনও আগের মতোই ঠিক তেমনই ধীরস্থির। চোখের ধারও দেখছি এতটুকু কমেনি। বুলেটটা মাথার পেছনে ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে ঢুকে ব্রেনটা লন্ডলন্ড করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে সামনে দিয়ে। অব্যর্থ বন্দুক চালানোয় এঁর জুড়িদার ইন্ডিয়াতে ছিল না। আমার তো মনে হয়, লন্ডনে এঁকে টেক্কা দেওয়ার মতো বন্দুকবাজ অল্প কয়েকজনই

আছে। ভদ্রলোকের নাম কি এর আগে শুনেছিলে?

না।

বটে, বটে, নামযশের কী করুণ পরিণতি! অবশ্য প্রফেসর জেমস মরিয়ান্টের নামও তুমি কোনোদিন জানতে না, অথচ তাঁকে শতাব্দীর সূর্য বললে বোধ হয় অত্যাক্তি হয় না,

আগামী শতাব্দীতেও এ-রকম প্রতিভা আর দেখা যাবে বলে মনে হয় না। সেলফ থেকে জীবনচরিতের স্ক্র্যাপ বইখানা নামাও, একটু চোখ বুলাননা যাক।

সিগার থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অলসভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল হোমস। তারপর বইটা আমার হাতে তুলে দিল। মোর্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দেখলাম বেশ গুছিয়ে লিখে রেখেছে।

মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরে হোমসের হাতে লেখা : লন্ডনের দ্বিতীয় সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি।

হোমসের হাতে বইটা তুলে দিয়ে বললাম, আশ্চর্য, সৈনিক জীবনে লোকটা দেখছি প্রচুর সম্মান পেয়েছেন।

সত্যিই তাই ওয়াটসন। সৈনিক জীবনের অনেকদূর পর্যন্ত তার সুনামের অন্ত ছিল না। হঠাৎ বিগড়ে গেলেন কর্নেল মোর্যান, শুরু হল তাঁর বিপথে কুপথে যাওয়া। প্রকাশ্য কলেঙ্কারি অবশ্য কোনোদিনই হয়নি, কিন্তু পাঁচ কান হওয়াও বাকি থাকেনি, তবে তাঁর পক্ষে ইন্ডিয়ায় বেশিদিন থাকা সম্ভব হল না। অবসর নিলেন কর্নেল, এলেন লন্ডনে, আসতে-না-আসতেই আবার শুরু হল তার দুর্নাম কুড়ানোর পালা। এই সময়ে প্রফেসর মরিয়ার্টির সুনজরে পড়লেন তিনি মরিয়ার্টি কিছুদিনের জন্যে তার সাজোপাজদের পাণ্ডা করে দিয়েছিলেন কর্নেলকে। যাই হোক, কর্নেলকে এস্তার টাকা দিতে লাগলেন মরিয়ার্টি। যেসব উঁচু ধরনের কাজ সাধারণ অপরাধী সমাজ কোনোদিন ভাবতেও সাহস

করত না, এইরকম দু-একটা কাজেও লাগালেন কর্নেলকে। ১৮৮৭ সালে লন্ডারে মিসেস স্টুয়ার্টের মৃত্যুকাহিনি মনে পড়ছে তোমার? পড়ছে না? মোর্যান যে এর মূলে ছিলেন, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রমাণ করা যায়নি কিছুই। কর্নেলকে এমনই চালাকি করে আড়ালে রাখা হয়েছিল যে মরিয়ার্টির দল ভেঙে যাওয়ার পরেও কোনোমতেই মোর্যানকে জালে জড়ানো যায়নি। মনে পড়ে তোমার, তোমাকে তোমার বাড়িতে ডাকতে গিয়ে এয়ারগানের ভয়ে কীভাবে জানলার খড়খড়ি টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলাম? তখনও তুমি ভেবেছিলে কল্পনার মাত্রা আমার ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানতাম আমার এত সাবধান হওয়া অকারণ নয়, কেননা এই অসাধারণ এয়ারগানের অস্তিত্ব আমি তখনই জানতাম এবং এও জানতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বন্দুকবাজের একজনের হাতেই থাকতে পারে হাতিয়ারটা। সুইজারল্যান্ডে মরিয়ার্টির সাথে ইনিই আমার পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। রাইখেনবাকের পাথরের তাকে শুয়ে থাকার সময়ে সেই ভয়ংকর পাঁচটা মিনিটের জন্যও দায়ী ইনিই।

ফ্রান্সে অজ্ঞাতবাসের সময় মন দিয়ে কাগজ পড়তাম কবে আবার তাকে আমার পাছু নেওয়াতে পারব ওই সুযোগের প্রতীক্ষায়। তাই অপরাধ-সংক্রান্ত খবর নিয়মিত শুধু দেখে যেতাম। জানতাম একদিন-না-একদিন তাকে আমি বাগে পাবই। তার পরেই মৃত্যু হল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারের। যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে হাপিত্যে করে বসে থাকা, শেষ পর্যন্ত পেলাম সেই সুযোগ! এ-কাজ যে কর্নেল মোর্যানের সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। রোনাল্ডের সাথে তাস খেলার পর ক্লাব থেকে পিছু নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপর গুলি চালিয়েছিলেন খোলা জানলা দিয়ে। সঙ্গেসঙ্গে ফিরে এলাম লন্ডনে। পাহারাদার আমায় নজরে রেখেছেন দেখলাম এবং বুঝলাম তার মনিবের

কাছে যথাসময়ে পৌঁছে যাবে আমার ধূমকেতুর মতো উদয় হওয়ার খবর। রোনাল্ডকে খুন করার সঙ্গেসঙ্গে আমার ফিরে আসার উদ্দেশ্য যে কী, তাও আবিষ্কার করা কঠিন হবে না তার পক্ষে। তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার হয়ে গিয়ে আমাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে তৎপর হয়ে উঠবেন কর্নেল। সঙ্গে আনবেন তার বহু অপরাধের সঙ্গী রক্তখেকো হাতিয়ারকে। তাঁর সুবিধার জন্যে জানলায় চমৎকার ছায়াবাজি দেখিয়ে পুলিশকে সাবধান করে দিলাম, হয়তো তাদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার। যাই হোক, আমি যেখানে ঘাপটি মেরে কর্নেলের ওপর নজর রাখব ভেবেছিলাম, কর্নেল যে শেষ পর্যন্ত সেইখান থেকেই আক্রমণ শুরু করবেন, তা ভাবিনি। তাহলে মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আর কিছু বুঝতে বাকি রইল কি?

আছে বই কী। অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে খুন করার পেছনে কর্নেলের কী মোটিভ থাকতে পারে, সে-বিষয়ে কিছুই বলনি তুমি।

আমার তো মনে হয় সব জটিলতাই সরল হয়ে আসবে আমার অনুমান দিয়ে। সওয়ালের সময়ে জানা যায় যে মোর্যান আর অ্যাডেয়ার দুজনে মিলে প্রচুর টাকা জিতেছিলেন। মোর্যান যে শেষ পর্যন্ত ল্যাঙ্গে খেলতে শুরু করে তা মোর্যান-চরিত্র যে জানে সে-ই বুঝতে পারবে। আমার বিশ্বাস খুনের দিনই অ্যাডেয়ার জানতে পারেন যে মোর্যান তাকে ঠকাচ্ছেন। তখনই হয়তো আড়ালে ডেকে কর্নেলকে তিনি ভয় দেখিয়েছিলেন যে ক্লাবের সভ্যতালিকা থেকে নিজে থেকে নাম না-কাটিয়ে নিলে এবং চিরকালের মতো তাস খেলা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না-দিলে তিনি সব কিছু ফাঁস করে দিতে বাধ্য হবেন। কর্নেলকে শুধু ভয় দেখিয়েই কাজ সারতে চেয়েছিলেন রোনাল্ড। ক্লাব থেকে বিতাড়িত হওয়া

মানেই মোর্যানের নিকেশ হওয়া, কেননা তাস খেলে অসাধু উপায়ে টাকা নিয়েই ইদানীং তার দিন কেটেছে। কাজেই বিনা দ্বিধায় রোনাল্ডকে খুন করলেন তিনি। খুন হওয়ার সময়ে হিসেব করতে বসেছিলেন রোনাল্ড। অসৎ পার্টনারের সঙ্গে খেলে যে-টাকা জিতেছিলেন, তা হজম করার প্রবৃত্তি তার ছিল না। তাই হিসেব করতে বসেছিলেন কাদেরকে কত টাকা ফেরত দিতে হবে। দরজা বন্ধ করেছিলেন তিনিই। কেননা মা আর বোন এসে একসাথে অত নাম আর খুচরো টাকাপয়সা দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেই ফ্যাসাদে পড়তে হত-তাই ওই সাবধানতা। কেমন, ঠিক আছে তো?

নিঃসন্দেহে। বিলকুল সত্যকেই অনুমান করে বসেছ তুমি।

মামলা চলার সময় বোঝা যাবে সত্যি কি মিথ্যে। আপাতত আমি স্বাধীন। কর্নেল মোর্যান আর আসবেন না আমার দিবানিশার শান্তি কেড়ে নিতে, ভন হার্ডারের বিখ্যাত এয়ারগানও শান্তি পাবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ামে, আর আবার শুরু হবে শার্লক হোমসের পুরোনো জীবন, শুরু হবে লন্ডনের জটিল জীবনের বিস্তার সমস্যার সমাধানে তার সর্বশক্তির বিনিয়োগ।

টাকা

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

মোরানের মারাত্মক হাতিয়ার : দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এমটি হাউস কলিয়ার্স উইকলি পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় এবং স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের অক্টোবর ১৯০৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। পাঠকদের কাছে শার্লক হোমসের সমস্ত কাহিনির মধ্যে, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল শার্লক হোমস ফিরে আসবার কারণে।

৪২৭ নম্বর পার্ক লেনে : হাইড পার্কের পূর্ব প্রান্তের লাগোয়া পার্ক লেন অভিজাত উচ্চবিত্ত মানুষদের বসবাসের এলাকা।

ক্যাভেন্ডিস আর বাগাটেলী ক্লাব : ১৮৯১ সাল নাগাদ লন্ডন শহরের ওয়েস্ট এন্ড অঞ্চলে জুয়া খেলার বেশ কয়েকটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড ব্যালমোরাল : দ্য নোবল ব্যাচেলর এবং দ্য সিলভার ব্লেজ গল্পে লর্ড ব্যালমোরালের উল্লেখ পাওয়া গেছে। ব্যালমোরাল ক্যাসল রানি ভিক্টোরিয়া লিজ নিয়েছিলেন। পরে প্রিন্স আলবার্ট রানির জন্য এটি কিনে নেন। জানা যায়, রানি ভিক্টোরিয়া গোপনীয়তার কারণে অনেক সময় নিজেকে ডাচেস অব ব্যালমোরাল ছদ্ম-উপাধিতে পরিচয় দিতেন।

এই সবই ভাবলাম বার বার : হোমস-গবেষক ক্রিস্টোফার মর্লে প্রশ্ন তুলেছেন, নিজের ডাক্তারির পেশা ছেড়ে ওয়াটসন গোয়েন্দাগিরি করতেন কেন? এবং কখন?

বারিৎসু : একপ্রকার জাপানি কায়দায় কুস্তি । বারিৎসু ইউরোপে জনপ্রিয় হয় ১৮৯৯-এ পিয়ার্সনস ম্যাগাজিনে এই বিষয়ে ই. ডবলু বার্টন রাইটের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ।

তিব্বত : ওই বিশেষ সময়ে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামার শাসনকাল চললেও, তিব্বত ছিল চিনের কিঙ বা মাঞ্চু বংশীয় রাজাদের ছত্রছায়ায় শাসিত ।

প্রধান লামা : ১৮৯৩-এ ত্রয়োদশ দালাই লামা যুবতেন গিয়োটসোর বয়স ছিল পনেরো বছর; এবং নবম পাঞ্চেন লামা চোকেই নিমার বয়স ছিল নয় বছর । শার্লক হোমস মজায় কাটিয়েছিলেন কার সঙ্গে?

মক্কা দেখলাম : স্যার রিচার্ড বার্টন ছদ্মবেশে মক্কা দর্শন করেন ১৮৫৩-তে । হোমস মুসলমান না হয়ে কোন ছদ্মবেশে মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম করলেন?

খারটুম : আফ্রিকার দেশ সুদানের রাজধানী খারটুম ১৮৮৫ সালে অল মাহেদীর নেতৃত্বে তার অনুগামীরা দখল করে নেয় এবং তারা খারটুমকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে অমরখানে নতুন রাজধানী পত্তন করে । ১৮৯৮-এ ইংরেজরা খারটুম পুনর্দখল করলে গভর্নর জেনারেল লর্ড কীচেনার-এর পরিচালনায় এই শহর পুনর্নির্মিত হয় । ১৮৯১-এ হোমস কোন খারটুম চেয়েছিলেন?

খলিফ : ওই সময়ে খলিফা ছিলেন আবদুল্লাহি (১৮৪৬-১৮৯৯) । ইনি আবদআল্লা নামেও পরিচিত ছিলেন ।

মঁপেলিয়ারের একটা ল্যাবরেটরিতে : ১২২০-তে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব সঁপেলিয়ারের কোনো ল্যাবরেটরি হওয়া সম্ভব।

পকেট থেকে চাবি বার করে : হোমস ওই বাড়ির চাবি কোথা থেকে পেলেন, সেই রহস্য কিন্তু পরিষ্কার হয়নি।

মোমের তৈরি...আবক্ষ মূর্তি : বেকার স্ট্রিটের অদূরে, মেরিলিবোন রোডে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মাদাম ত্যুসো-র মোমের মূর্তির সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন মেরি গ্রেজহোট ব্যুসো (১৭৬০-১৮৫০)। অচিরে বিশ্বখ্যাত সেই মিউজিয়ামের কোনো কারিগর হোমসের এই মূর্তি বানাতে সাহায্য করে থাকতে পারেন বলে অনুমান করেন বহু হোমস-গবেষক।

হার্প : ধাতু বা কাঠের ফ্রেমে বাঁধা তারের বাদ্যযন্ত্র। এশিয়া এবং ইউরোপে এই বাজনা বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত।

ব্রিচব্লক : বন্দুকের গুলির খোপ বন্ধ করবার ধাতব অংশ।

পার্ক লেনের উলটোদিকের বাড়ির : পার্ক লেনের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে একদিকে বাড়ির সারি, অপরদিকে হাইড পার্ক। অর্থাৎ এই রাস্তায় কোনো বাড়ির উলটোদিকের বাড়ি বলে কিছু থাকতে পারে না।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার কনান ডয়েল । শার্লক হোমস

জেমস মরিয়ান : প্রফেসরের প্রথম নাম এই প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। দ্য ফাইনাল প্রবলেম গল্পে জানা যায় প্রফেসরের ভাইয়ের নামও জেমস।

সুন্দরীর শক্তির জ্বালা!

[দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট]

তীক্ষ্ণ চোখে মিস ভায়োলেট স্মিথের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হোমস বললে, এটুকু বুঝছি স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আপনার নেই এবং সে-রকম কোনো কারণ নিয়ে আপনার আগমন নয়। এ-রকম উৎসাহী বাইসাইক্লিস্টের তো অফুরন্ত এনার্জি থাকাই স্বাভাবিক, না, কী বলেন আপনি?

আশ্চর্য হয়ে নিজের পায়ের দিকে মিস স্মিথ তাকাতে আমারও চোখ পড়ল পেডালের ঘষা লেগে পাশের দিকে সামান্য ক্ষয়ে যাওয়া জুততার সোল দুটো।

আপনি ধরেছেন ঠিকই, মি. হোমস। সাইকেল চালানোয় আমার উৎসাহ একটু বেশি এবং আজকে আপনার কাছে এসেছি বলতে গেলে এই কারণেই।

হোমস মিস স্মিথের দস্তানাহীন অনাবৃত হাতটা তুলে নিয়ে এমন নির্বিকারভাবে অনন্যমনা হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে দিল যেন কোনো নমুনা পরীক্ষা করতে বসেছে আত্মভোলা বিজ্ঞানী।

কিছু মনে করবেন না, এই আমার ব্যাবসা, হাতটা নামিয়ে রেখে বললে বন্ধুবর। আর একটু হলেই ভুল করে ফেলেছিলাম আর কি। আপনাকে টাইপিস্ট মনে করেছিলাম।

কিন্তু এখন আর কোনো ভুল নেই-পেশাটা গান-বাজনার। সামনের দিকে চেপটা বর্ষার ফলার মতো আঙুলগুলো লক্ষ করেছ ওয়াটসন? টাইপিস্ট আর বাজনাদারদের আঙুলই এ-রকম হয়ে থাকে। কিন্তু মুখেতে দেখছি পরমার্থ-নিষ্ঠার হালকা প্রতিচ্ছবি, বলে আলতোভাবে আলোর দিকে মিস স্মিথের মুখটি ঘুরিয়ে দিয়ে সে বললে, টাইপিস্টের চোখে-মুখে এ-রকম অমূর্ততার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইনি মিউজিশিয়ান!

হ্যাঁ মি. হোমস, আমি গানের মাস্টারি করি।

গ্রামাঞ্চলে, আপনার গায়ের রং দেখে তাই মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ফার্নহ্যামের কাছে, সারের সীমানায়।

বড় সুন্দর পরিবেশ। এখন বলুন দিকি, সারের সীমানায় ফার্নহ্যামের কাছে কী ঝামেলায় পড়েছেন আপনি?

মি. হোমস, বেশ কিছুদিন হল, আমার বাবা আমাদের মায়া কাটিয়েছেন। বাবার নাম জেমস স্মিথ। ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন। বাবা মারা গেলে একেবারে জলে পড়লাম বললেই চলে। সংসারে আত্মীয় বলতে ছিল এক কাকা, রালফ স্মিথ। পঁচিশ বছর আগে আফ্রিকায় অ্যাডভেঞ্চার করতে গেছিলেন কাকা এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার কাছ থেকে আর সাড়াশব্দ পাইনি। বাবার মৃত্যুর পরে অভাব-অনটনের সংসার নিয়ে যখন জ্বলে-পুড়ে মরছি আমি আর মা, ঠিক এই সময়ে শুনলাম

আমরা কোথায় আছি তা জানার জন্যে দ্য টাইমস-এ কারা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। খবরটা কানে আসার পর আমাদের আনন্দ-উত্তেজনা খানিকটা অনুমান করতে পারেন আপনি। ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত বুঝি বরাত খুলল, কারো সম্পত্তি-টম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে বসেছি আমরা দুই হতভাগিনী। কাগজে আইনজ্ঞের নাম ছিল-কাজেই সিধে হাজির হলাম তার অফিসে। সেখানে গিয়ে আলাপ হল মি. ক্যারুথার্স আর মি. উডলি নামে দুই ভদ্রলোকের সাথে। সাউথ আফ্রিকা দেশ থেকে বেড়াতে এসেছিলেন ওঁরা। শুনলাম কাকা এঁদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কয়েকমাস আগে জোহানেসবার্গে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মারা গেছেন উনি। মৃত্যুশয্যায় এঁদেরকে মিনতি করে যান যেন দেশে ফিরে তার আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বার করে তাদের যাতে কোনো অভাব না-থাকে তার ব্যবস্থা তারা করেন। শুনে ভারি আশ্চর্য লেগেছিল এই কারণে যে, যে-কাকা জীবিতকালে আমরা বেঁচে আছি কি মরে আছি সে খোঁজটুকুও নেওয়া দরকার মনে করেননি, মৃত্যুর পর যাতে আমাদের গায়ে আঁচড়টি না-লাগে সে-ব্যবস্থা করার জন্যে এত মাথাব্যথা হয়েছিল তার মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে। কিন্তু মি. ক্যারুথার্স সব বুঝিয়ে বললেন। বললেন, বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই নাকি খুব মুষড়ে পড়েছেন কাকা। আমাদের এ দুর্গতির জন্যে নিজেকে দায়ী করেন এবং উঠে-পড়ে লাগলেন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে।

মাপ করবেন, বাধা দিয়ে বলল হোমস, এসব কথাবার্তা কবে হয়েছিল?

গত ডিসেম্বরে-মাস চারেক আগে।

তারপর?

মি. উডলি লোকটা অতি যাচ্ছেতাই। যখন-তখন আমার পানে তাকিয়ে তার চোখ টেপার বহরটা যদি দেখতেন তো আপনারও আপাদমস্তক জ্বলে যেত। চেহারাটা রুক্ষ, ফুলো ফুলো মুখ, লাল গোঁফ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল কপালের দু-পাশে লেপটানো। ছোকরা বয়স। কিন্তু অতি কদর্য প্রকৃতির লোক এবং রীতিমতো ন্যাকারজনক। এ-রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে শুনলেও খুশি হবে না সিরিল।

ওহো, তার নাম বুঝি সিরিল! হাসিমুখে বলল হোমস।

একটু লাল হয়ে ওঠে মিস ভায়োলেট স্মিথ, তারপরেই ফিক করে হেসে ফেলে বললে, হ্যাঁ মি. হোমস, সিরিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গ্রীষ্মের শেষাশেষি বিয়ে করার ইচ্ছে আমাদের। কী মুশকিল, ওর কথা আবার শুরু করলাম কখন? আমি যা বলতে চাইছিলাম তা এই মি. উডলি লোকটা ন্যাকারজনক হলেও মি. ক্যারুথার্স কিন্তু অতটা নয়। ভদ্রলোকের বয়সও বেশি, গায়ের রং ময়লা পাঙাশ-পানা, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো, কথাবার্তা খুব অল্প বলেন। স্বল্পভাষী হলেও ভদ্রলোকের ব্যবহার খুব মার্জিত এবং ভদ্র, হাসিটাও মিষ্টি। মোটের ওপর মি. ক্যারুথার্সকে অনায়াসেই বরদাস্ত করা চলে। একান্ত শুভানুধ্যায়ীর মতো আমাদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন ভদ্রলোক। আমরা বড়ো গরিব শুনে উনি প্রস্তাব করলেন তার বাড়িতে থেকে তাঁর দশ বছরের মেয়েকে গান শেখানোর। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে রাজি নই। শুনে উনি বললেন প্রত্যেক শনিবার আমি না হয় মার কাছে আসব। বছরে এক-শো পাউন্ড দিতে রাজি হলেন উনি। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটা খুব খারাপ নয়, বিশেষ করে তখন আমাদের যা অবস্থা-এ যেন

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। আমতা আমতা না-করে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর একদিন তল্লিতল্লা নিয়ে আস্তানা গাড়লাম ফার্নহ্যাম থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে শিলটার্ন গ্রাঞ্জ-এ। মি. ক্যারুথার্স বিপত্নীক। তাই ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্যে মিসেস ডিক্সন নামে একজন বর্ষীয়সী লেডি-হাউসকিপারকে এনেছিলেন সংসারে। মিসেস ডিক্সনকে দেখলেই বোঝা যায়, বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরে তার জন্ম। আমার ছাত্রীটিও বড়ো ভালো। মোটের ওপর সব দেখে শুনে খারাপ লাগল না এবং রাতারাতি নসিব খুলে যাওয়ার জন্যে অবাক হলাম খুবই। মি. ক্যারুথার্সের চমৎকার ব্যবহারের কথা আর কী বলব। এ ছাড়া গান-বাজনার ওপর তার অনুরাগও বড়ো কম ছিল না। প্রতিটি সন্ধে তাই ফুরফুরে প্রজাপতির মতো হাসিখুশি ডানা মেলে উড়ে যেতে লাগল আমার মনকে আনন্দের আভায় উজ্জ্বল করে দিয়ে। প্রত্যেক শনিবার শহরে আসতাম মাকে দেখবার জন্যে।

আমার এ সুখের জীবনে প্রথম অশান্তির সূত্রপাত হল লাল-গুফো মি. উডলির ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবে। লোকটা এসেছিল মাত্র মাসখানেক থাকার জন্যে। কিন্তু আমার কাছে এই একটি মাসই তিনমাসের মতো লম্বা মনে হয়েছে। শুধু পয়লা নম্বরের বজ্জাত বললে অল্প বলা হয়, অতি ভয়ংকর চরিত্রের লোক এই মি. উডলি। ইতরের মতো প্রত্যেকের সাথেই ব্যবহার কিন্তু, আমার কাছে সে ইতরের চাইতেও অধম। তার গা-ঘিনঘিনে প্রেম নিবেদন, টাকাপয়সার দস্ত এবং তাকে বিয়ে করলে লন্ডনের সবচেয়ে সেরা হিরের উপহারের লোভনীয় প্রস্তাবেও যখন কাজ হল না, তখন একদিন ডিনারের পর আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে দিব্যি করে সে বললে তাকে চুমু না-খাওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই আমার। কী আসুরিক শক্তি লোকটার গায়ে, ঠিক এই সময় মি. ক্যারুথার্স এসে না-

পড়লে শেষ পর্যন্ত কী যে হত ভগবান জনেন। উনি এসেই আগে আমায় মুক্ত করলেন লোকটার ক্লোডাক্ত সাপের মতো বাহুপাশ থেকে, তারপর এক ঘুসিতে তাকে শুইয়ে দিলেন মেঝের ওপর। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। কিন্তু এই আসাই লোকটার যে শেষ আসা, তা নিশ্চয় বুঝেছেন। পরের দিন মাপ চাইলেন মি. ক্যারুথার্স। আর কোনোদিন যে এভাবে আমাকে লাঞ্চিত হতে হবে না, সে-আশ্বাসও দিলেন। সেইদিন থেকে আর মি. উডলির শ্রীমুখ দেখিনি আমি।

মি. হোমস, এবার আসা যাক আসল ব্যাপারে। অর্থাৎ যে-কারণে আপনার কাছে আসা পরামর্শের জন্যে। প্রথমেই বলি, প্রতি শনিবার দুপুর বারোটোর আগেই সাইকেলে করে আমায় ফার্নহ্যাম স্টেশন আসতে হয়, বারোটা বাইশের ট্রেন ধরে আসার জন্যে। শিলটার্ন এ্যাঞ্জ থেকে স্টেশনে আসার পথটা বড়ো নির্জন। বিশেষ করে এক জায়গায় তো বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই খাঁ খাঁ রাস্তাটা। শার্লিংটন হলের চারিদিক ঘিরে একটা জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলের কিনারা থেকে শার্লিংটন হিথ পর্যন্ত মাঝের মাইলখানেক রাস্তায় দিনদুপুরেও জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যায় না-এত নির্জন। কসবেরি হিল-এর কাছে হাইরোডে না-পৌঁছানো পর্যন্ত দু-একটা গাড়িঘোড়া কি চাষি-মজুরের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়-এ-রকম ফাঁকা রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না। হুগা দুয়েক আগে এই জায়গাটা দিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ পেছনে তাকাতে দেখলাম প্রায় দু-শো গজ দূরে একটি লোককে তারও বাহন একটা দু-চাকার সাইকেল। লোকটার গালে কুচকুচে কালো ছোটো দাড়ি। বয়সের দিক দিয়ে না বুড়ো না জোয়ান বলেই মনে হল। ফার্নহ্যাম পৌঁছানোর আগে আর একবার পেছনে তাকিয়ে তাকে আর দেখতে পেলাম না, কাজেই এ-সম্বন্ধে আর কিছু ভাবিনি! কিন্তু মি. হোমস, আশ্চর্য হলাম তখনই যখন সোমবার ফেরার পথে একই

লোককে দেখলাম একই রাস্তায় একই দ্বি-চক্রানে। বিস্ময় আরও বাড়ল যখন একই ব্যাপারটা ঠিক আগের মতোই ঘটল পরের শনিবারে আর সোমবারে। তার আর আমার মধ্যকার ব্যবধানটা রেখে দিলে লোকটা। আমার উপর নির্যাতনেরও কোনো চেষ্টা করলে না, তবুও জানি কীরকম বেয়াড়া লাগল সমস্ত ঘটনাটা। মি. ক্যারুথার্সকে বললাম সব। আদ্যোপান্ত শুনে ভদ্রলোকের খুব আগ্রহ জেগেছে মনে হল। আমায় বললেন আমার কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। কেননা, এ-রাস্তা দিয়ে যাতে আমাকে আর সঙ্গীহীন অবস্থায় না যেতে হয়, এজন্যে তিনি ইতিমধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ির অর্ডার দিয়েছেন।

এই হপ্তাতেই ঘোড়ার গাড়ি এসে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু কী কারণে জানি না, তা এল। কাজেই, আবার সাইকেলে করে রওনা দিতে হল স্টেশনের দিকে। আমি কিন্তু আজ সকালের কথাই বলছি। শার্লিংটন হিথের কাছে এসে পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম। তাকাতেই চোখে পড়ল সেই লোকটাকে গত দুটো হপ্তায় যেভাবে তাকে দেখেছি, ঠিক সেইভাবে শ-দুয়েক গজের ব্যবধানে সাইকেল চালিয়ে পিছু নিয়েছে সে। দূরত্বটা সমান রেখেছিল যাতে ভালো করে তার মুখ না দেখতে পাই। কিন্তু লোকটা যে আমার চেনাজানা নয়, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। পরনে গাঢ় রঙের সুট, মাথায় কাপড়ের টুপি। কুচকুচে কালো দাড়িটা ছাড়া মুখের আর কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। আজকে আর তেমন ভয় পাইনি, উলটে কৌতূহল হল খুবই। ঠিক করলাম, লোকটা কে এবং কী তার অভিপ্রায়, তা আমায় জানতেই হবে যেনতেনপ্রকারে। গতি কমিয়ে আনলাম সাইকেলে, দেখলাম তার গতিও কমে এসেছে। থেমে গেলাম, সে-ও পেডাল ঘোরানো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার ওপর। ফাঁদটা পাতলাম তখনই। রাস্তাটা এক জায়গায় আচমকা মোড় নিয়েছে জানতাম। তিরবেগে সাইকেল চালিয়ে মোড়টা ঘুরেই থেমে

গেলাম-প্রতীক্ষায় রইলাম দাড়িওয়ালা লোকটার। জানতাম, সে-ও তিরবেগে মোড় ঘুরেই আমাকে পেরিয়ে যাবে, থামবার অবসর পাবে না। কিন্তু আর টিকি দেখতে পেলাম না লোকটার। আবার ফিরে এলাম মোড় ঘুরে, মাইলখানেকের মতো রাস্তার মধ্যে লোকটার ছায়াও দেখতে পেলাম না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন, আমি যে-জায়গাটার কথা বলছি, সেখানে রাস্তাটা দু-পাশে কোনো শাখাপ্রশাখা না-রেখে লম্বালম্বি এসে মোড় নিয়েছে। কাজেই, তার ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাওয়া দেখে আমার তখনকার অবস্থাটা আপনি খানিকটা অনুমান করতে পারবেন মি. হোমস।

নিঃশব্দে একচোট হেসে নিয়ে দু-হাত ঘষতে ঘষতে বলল হোমস, কেসটায় বেশ কিছু ভাবনার খোরাক আছে দেখছি। প্রথমবার মোড় ঘোরার পর থেকে, লোকটা উধাও হয়ে গেছে। দেখার আগে পর্যন্ত ব্যবধানটা কত মিনিটের বলুন তো?

মিনিট দু-তিন তো বটেই।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে তো লোকটার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া সড়কটার দু-পাশে অন্য কোনো রাস্তাও নেই, তাই না?

না।

তাহলে যেকোনো একদিকের পায়ে-চলা রাস্তায় নেমে পড়াই স্বাভাবিক।

না তা সম্ভব নয়। শার্লিংটন হিথ-এর পাশে সে যেখানেই ঘাপটি মেরে থাকুক না কেন, আমার চোখ এড়াত না।

তাহলে, বাদসাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত রইল শুধু একটাই এবং তা হচ্ছে এই শার্লিংটন হল যদি রাস্তার আর এক প্রান্তে হয়, তাহলে সেদিকেই সটকেছে লোকটা। আর কিছু বলবেন নাকি?

না, মি. হোমস। দিনদুপুরে ওই কাণ্ড দেখে আমি এমনই ঘাবড়ে গেলাম যে মনে হল সিধে আপনার কাছে এসে আপনার পরামর্শ না-নেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাব না মনে। তাই—।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল হোমস।

তারপর শুধাল, যে-ভদ্রলোকের সাথে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাঁপাকি হয়ে রয়েছে, তিনি থাকেন কোথায়?

কভেনট্রিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে কাজ করে ও।

আচমকা দেখা দিয়ে আপনাকে চমকে দেওয়ার মতলব নেই তো তার?

মি. হোমস, আপনি তাঁকে চেনেন না!

আপনার আর কোনো স্তাবক আছে নাকি?

সিরিলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে কয়েকজন ছিল।

তারপর?

তারপর ধরুন, এই উডলি নামধারী বিকট লোকটা অবশ্য ওকে স্তাবক শ্রেণিতে ফেলবে কি না, সে-বিচার আপনার।

আর কেউ?

আমতা আমতা করতে থাকে মিস স্মিথ।

কে সে? শুধাল হোমস।

আমার মনের ভুল হতে পারে মি. হোমস, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন জানি মনে হয়েছে মি. ক্যারুথার্স আমার সম্বন্ধে একটু বেশি রকমের সচেতন। একই বাড়িতে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বাজনা-টাজনাগুলো আমিই বাজাই। মুখ ফুটে কোনোদিনই কিছু বলেননি। সেদিক দিয়ে উনি নিখুঁত ভদ্রলোক। কিন্তু মেয়েদের মন তো, ধুলো দেওয়া বড়ো কঠিন।

হ্যাঁ! গম্ভীর হয়ে উঠল হোমস । ভদ্রলোকের কাজ কারবার কী?

খুব বড়োলোক বলেই জানি । গাড়িঘোড়া তো নেই?

না-থাকলেও খুব সচ্ছল অবস্থা । হুগুয়ে দু-দিন উনি শহরে যান । দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার শেয়ার নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন বললেই চলে ।

মিস স্মিথ, নতুন কিছু ঘটলেই আমাকে জানানো । আপাতত আমি খুবই ব্যস্ত, তবুও কথা দিচ্ছি আপনার কেসটা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় আমার হবে । ইতিমধ্যে আমাকে-জানিয়ে হট করে কিছু করে বসবেন না যেন । গুড বাই, সুখবর শোনার আশায় রইলাম ।

মিস স্মিথের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলোনের আগেই হারিয়ে যাওয়া চিন্তার খেঁই ধরতেই যেন পাইপটার দিকে হাত বাড়িয়ে হোমস বললে, কেসটার কতকগুলো পয়েন্ট আর ইঙ্গিত লক্ষ্য করার মতো ।

একটা পয়েন্ট আমিও লক্ষ্য করেছি । একই জায়গায় বার বার রোডসাইড রোমিয়ে দেখা দিচ্ছে কেন, এই তো?

এগজ্যাক্টলি। যাক, প্রথমেই আমাদের জানা দরকার, শার্লিংটন হল-এর বাসিন্দারা কারা, তারপর মি. ক্যারুথার্স আর উডলির আচারব্যবহার দেখে বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দুজনে। তাই যদি হয় তাহলে ওদের মধ্যকার আসল সম্পর্কটাই-বা কী, আর রালফ স্মিথের আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়ার বেলায় ওদের দুজনেরই-বা এত আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কেন? আর একটা পয়েন্ট। দ্বিগুণ বেতন দিয়ে যিনি গভর্নেস নিয়ে আসেন বাড়িতে, বাড়ি থেকে দু-মাইল দূরের স্টেশনে যাতায়াত করার জন্যে তিনি গাড়িঘোড়া রাখেন না এ কেমনতরো ব্যবস্থা, ওয়াটসন? সত্যিই, কীরকম খাপছাড়া লাগছে, তাই না?

তুমি যাবে নাকি?

না হে না, গেলে তোমাকেই যেতে হবে। এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি আমার মূল্যবান গবেষণার ব্যাঘাত করতে চাই না। সোমবার সকাল সকাল ফার্নহ্যামে পৌঁছে শার্লিংটন হিথ-এর কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

সোমবার সকালে ফার্নহ্যাম স্টেশনে নেমে শার্লিংটন হিথ খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। মিস স্মিথের শনি-সোমবারের অ্যাডভেঞ্চারের সিনটি দেখলে ভুল হওয়া অসম্ভব।

এমন জায়গায় দাঁড়িলাম, যাতে হলের দু-দিকের তোরণ ছাড়াও দু-পাশে প্রসারিত রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এতক্ষণ জনপ্রাণীর সাড়া ছিল না রাস্তায়। আমি

ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই যেন দিগে এসেছি, তার উলটো দিকের রাস্তায় দেখলাম একটা চলন্ত সাইকেল। সাইকেলটা আসছে আমার দিকেই। চালকের পরনে কুচকুচে কালো সুট, একগাল কালো দাড়িও চোখে পড়ল। শার্লিংটন জমির শেষাশেষি এসে লাফিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কৃষ্ণবেশ সাইক্লিস্ট। সাইকেলটাকে টেনে নিয়ে ঝোঁপের একটা ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মিনিট পনেরো চুপচাপ। তারপরেই দেখা গেল আর একটা সাইকেল। স্টেশনের দিক থেকে আসছে মিস স্মিথ।

এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে শার্লিংটন ঝোপ-এর কাছাকাছি আসতেই লুকোনো জায়গা থেকে কৃষ্ণবেশ লোকটা চট করে বাইরে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে উঠল সাইকেলের ওপর এবং শুরু হল মিস স্মিথের পিছু নেওয়া। ধু-ধু মাঠের মধ্যে ফিতের মতো রাস্তার ওপর চোখে পড়ল শুধু এই দৃশ্যই। ধাবমান দুটি মূর্তি। রানির মতো মাথা তুলে সিটের ওপর সিধে হয়ে বসে মিস স্মিথ, আর তার পেছনে হ্যান্ডেলবারের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে কালো সুট পরা রহস্যময় লোকটা-হাবভাব তার বিচিত্র, ঠিক যেন চোরের মতো। পেছন ফিরে একবার তাকাল মিস স্মিথ, তাকিয়ে স্পিড কমিয়ে দিল। সঙ্গেসঙ্গে পেছনের সাইকেলেরও স্পিড কমল। দাঁড়িয়ে গেল মিস স্মিথ। কালোদাড়িও ব্রেক কষে দাঁড়াল মাঝখানে রইল অন্ততপক্ষে শ-দুই গজের ব্যবধান। এরপরেই মিস স্মিথ যা করল তা যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই চমকপ্রদ। সাহসের বলিহারি যাই মেয়েটার। আচমকা সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে তিরবেগে লোকটার দিকে ছুটে এল সে। কালোদাড়িও কম চটপটে নয়। চোখের পলক ফেলার আগেই সে-ও সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে ঝোঁ ঝোঁ করে

ছুটল যেদিক থেকে আসছিল সেইদিকে। পড়ি কি মরি করে সে পালাবার দৃশ্য দেখার মতোই বটে। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য আবার ফিরে এল মিস স্মিথ। এবার পেছনকার নীরব সঙ্গীকে উপেক্ষা করে সিধে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। তার সিধে হয়ে সামনের দিকে তাকানোর ভঙ্গিমা দেখে মনে হল, দস্ত ওই মেয়েকেই মানায় বটে। লোকটাও ছিনেজোঁকের মতো আবার পিছু পিছু আসছিল—মাঝখানের ব্যবধান সেই দু-শো গজ! তারপর পথের বাঁকে দুজনেই হারিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে না পড়ে তখনও ঘাপটি মেরে রইলাম আমার লুকোনো জায়গায়। থেকে ভালোই করেছিলাম। কেননা, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম আস্তে আস্তে ফিরে আসছে লোকটা। হল-এর তোরণের দিকে মোড় নিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে। গাছপালার ফাঁকে তাকে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দু-হাত তুলে বোধ হয় নেকটাই ঠিক করছিল। তারপর আবার সাইকেল চালিয়ে হলের দিকে চলে গেল সে। আমি গাছগাছড়া গুল্মের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম সেদিকে। অনেক দূরে দেখতে পেলাম ধোঁয়া ধোঁয়া রঙের অনেক পুরোনো বাড়ি, অনেক উঁচু পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল টিউডর চিমনিগুলো; কিন্তু রাস্তাটা এমন একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে যে গেছে লোকটার টিকিও আর দেখতে পেলাম না।

না পেলাম, কিন্তু বলতে নেই কাজটা আমার বৃথা যায়নি। কাজ হয়েছে যথেষ্ট, সুতরাং বেশ খুশি খুশি মনে হাঁটা দিলাম ফার্নহ্যামের দিকে। লোক্যাল হাউস-এজেন্ট শার্লিংটন হল সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ খবর দিতে পারল না আমায়, তবে পল-মলের একটা নাম করা ফার্মের রেফারেন্স দিলে। বাড়ি আসার পথে সেখানে দু মেরে এলাম। রিপ্রেজেন্টেটিভের

কাছে শুনলাম, এ-গরমে আর শার্লিংটন হল পাওয়া সম্ভব নয়। বড়ো দেরি হয়ে গেছে। মাসখানেক আগে মি. উইলিয়ামসন নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন বাড়িটা। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে এবং চেহারা দেখলে হেঁজিপেজি বলেও মনে হয় না। এজেন্ট-ভদ্রলোকের বিনয় মাটি স্পর্শ করে বটে, কিন্তু এর বেশি আর কিছু সে বলতে রাজি হল না। কেননা, মি. উইলিয়ামসনের সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা তার শোভা পায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার সুদীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করলাম মি. শার্লক হোমসের কাছে। কান খাড়া করে সব শুনল হোমস। আশা করেছিলাম, ছোটোখাটো দু-একটা শাবাশ কি বাহবা, অথবা ব্র্যভো, মাই ডিয়ার ওয়াটসন-এ-রকম জাতীয় কিছু কিছু প্রশংসা শুনতে পাব ওর মুখ থেকে। কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেল না হোমস। উলটে ওর রসকষহীন মুখ আরও বেশি কঠোর হয়ে উঠতে লাগল আমার বর্ণনার তালে তালে এবং আমি যা করেছি আর যা করিনি, তার ওপর এমন চোখা চোখা মন্তব্য ছাড়তে শুরু করলে যে কহতব্য নয়।

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, তোমার লুকোনো জায়গা নির্বাচনই ভুল হয়েছে। বোঁপের পেছনে থাকা উচিত ছিল না তোমার; তাতে লোকটাকে কাছ থেকে ভালো করে দেখতে পেতে। বেশ কয়েকশো গজ দূর থেকে যা দেখছ, মিস স্মিথ দেখেছে তার থেকেও অনেক বেশি-সুতরাং তোমার রিপোর্টে বেশি তথ্যের আশা করা অন্যায়। মিস স্মিথের ধারণা লোকটাকে সে চেনে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে চেনে। তা না হলে লোকটা অমন মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করবে কেন? পাছে, মেয়েটা তার কাছাকাছি এসে তাকে চিনে ফেলে, ভয় সেটাই, তাই না? লোকটা হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল বললে।

তাহলেই দেখ, এখানেও নিজের মুখ আড়াল করবার প্রচেষ্টা। বাস্তবিকই ওয়াটসন, যাচ্ছেতাই রকমের বাজে কাজ করে এসেছ তুমি। লোকটা বাড়ির দিকে ফিরে যেতেই তোমার খেয়াল হল লোকটার পরিচয় জানার। আর, তাই তুমি এলে লন্ডন হাউস-এজেন্টের কাছে!

একটু গরম হয়ে উঠি আমি, তা ছাড়া আমার কী করার ছিল শুন?

কাছাকাছি কোনো পাবলিক-হাউসে যাওয়া। গাঁ অঞ্চলে সবরকম মুখরোচক আলোচনার কেন্দ্র হল পাবলিক হাউস।

পরের দিন সকালে মিস স্মিথের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। আমি যা যা দেখেছি তারই সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভুল বর্ণনা ছিল চিঠিতে! কিন্তু রিপোর্টের সারাংশ তাতে নেই, ছিল তলাকার ছোট পুনশ্চতে :

মি, হোমস, অকপটে সব কথা আপনাকে খুলে লিখছি এবং আমার বিশ্বাস এদিক দিয়ে আপনার ওপর আমার অগাধ আস্থা কোনোদিনই ক্ষুণ্ণ হবে না। এখানে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। মি. ক্যারুথার্স বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। আমার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা যে সত্যই নিখাদ সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি যে বাগদত্তা। আমার প্রত্যাখ্যান খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছেন মি. ক্যারুথার্স, কিন্তু কোনোরকম উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা দেখাননি। খুব ভদ্রভাবে শুনেছেন আমার বক্তব্য। বুঝতেই পারছেন, এরপর থেকে পরিস্থিতি বড়ো জটিল হয়ে উঠেছে।

চিঠি পড়া শেষ হলে চিন্তাঘন চোখে হোমস বললে, আমাদের ইয়ং ফ্রেন্ড দেখছি ক্রমশই গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে। না হে, আমার একটু গাঁয়ে যাওয়া দরকার। আজই বিকেলে রওনা হয়ে ছায়াঢাকা পাখিডাকা সুনিবিড় শান্তির নীড় গাঁয়ের হাওয়া খাওয়ার সাথে সাথে আগে থেকেই ভেবে রাখা দু-একটা থিয়োরিও পরখ করে দেখতে হবে।

ছায়াঢাকা পাখিডাকা সুনিবিড় শান্তির নীড়ে হোমসের অভিযান যে শান্তিময় হয়নি, তা ওকে দেখামাত্র বুঝলাম। রাত করে বাড়ি ফিরল ও। এক ঠোঁট কাটা, কপালের ওপর একটা বিরাট টিপি। তা ছাড়া, চেহারাময় এমন একটা উজ্জ্বল ভাব যে ওকে দেখামাত্র স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড উল্লসিত হয়ে উঠত একটা তদন্তের সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে। হোমস কিন্তু এই আজব অ্যাডভেঞ্চারে বিলম্বিত পুলকিত। সব কথা বলতে বলতে কতবার যে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল তার আর ইয়ত্তা নেই।

তোমাকে আগেই বলেছিলাম, পাড়া-গাঁ অঞ্চলে পাঁচজনে বসে আড্ডা মারে এমন জায়গা খুঁজে বার করতে। ফার্নহ্যামে নেমে এ-রকম জায়গা বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। মদের আড্ডায় গিয়ে বসতে যে-লোকটার সঙ্গে আলাপ হল তার আবার কিছু নিজস্ব জায়গাজমি বাড়ি ঘরদোর আছে। একটু বেশি বকা স্বভাব লোকটার। কাজেই যা চাইছিলাম, সবই শুনলাম তার কাছে। উইলিয়ামসন লোকটার সাদারঙের একগাল দাড়ি আছে, সামান্য কয়েকটা চাকরবাকর নিয়ে শার্লিংটন হল-এ একলাই থাকেন ভদ্রলোক। গুজব, ভদ্রলোক এককালে পাদরি ছিলেন অথবা এখনও আছেন। কিন্তু হল-এ থাকতে থাকতে তাঁর কীর্তিকলাপের দু-একটা নমুনা যা শুনলাম, তা জপতপ ধর্মকর্ম যাঁর কাজ,

তাঁর পক্ষে শোভা পায় না। ক্লারিক্যাল এজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম এরকম একটা নাম তাদের অর্ডারেও এককালে ছিল। কিন্তু লোকটার কাজকর্মের রেকর্ড অতি জঘন্য, শোনার মতো নয়। বাচাল লোকটার পেট থেকে আরও কথা বার করে নিলাম। প্রতি হপ্তায় শনি রোববার নাগাদ অনেকের আগমন ঘটে শার্লিংটন হল-এ। বিশেষ করে একজনের কথাই বললেন ভদ্রলোক। লোকটার নাম মি. উডলি, লাল লাল গোঁফ অনেকদিন পর্যন্ত তাকে, একনাগাড়ে হল-এ থাকতে দেখা গেছে। ঠিক এই সময়ে হল বিপত্তি। যার সম্বন্ধে এত কথা, সেই মি. উডলি যে স্বয়ং পাশের ঘরে পিপে থেকে গড়িয়ে বিয়ার খাচ্ছিল, তা কি আর আমি জানি ছাই। শুধু মদ্যপানই করেনি, আড়ি পেতে আমাদের সব কথাই শুনেছে। কথার মাঝেই গট গট করে ঢুকেই শুরু হল অশ্রাব্য গালিগালাজের সঙ্গে অজস্র প্রশ্নবাণ! কে আমি? কী আমার অভিপ্রায়? এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মানে কী? কথাবার্তা বেশ বলে লোকটা। সে কী বচনের তোড়! বিশেষণগুলোও বড়ো চোখাচোখা। বৃষ্টির মতো গালিবর্ষণ শেষ হল মোক্ষম একটা ঘুসি ঝেড়ে। পেছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে তার মারখানা দেখার মতো। বরাত মন্দ, ঘুসিটা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। তার পরের মিনিট ক-টা কিন্তু অতি উপাদেয়। বাঁ-হাতের সিধে মার, ওই একবারই। পাকা বদমাশ হলে কী হবে, মি. উডলিকে বাড়ি। যেতে হল গাড়িতে! আর আমার অবস্থাটা তো দেখছই! গায়ের অভিযান শেষ হল বটে, তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সময়টা ভালো কাটালেও লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। সারে বর্ডার থেকে তুমি যা জেনেছ, তার থেকে এমন কিছু বেশি জানিনি আমি।

বেস্পতিবার আর একটা চিঠি পেলাম মিস স্মিথের কাছ থেকে।

মি. হোমস, শুনে নিশ্চয় খুব বেশি অবাক হবেন না-আমি মি. ক্যারুথার্সের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। মুঠো মুঠো টাকা মাইনে দিলেও এ-রকম অস্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার মধ্যে এত আড়ষ্টভাবে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। শনিবার শহরে আসছি এবং আর ফেরার ইচ্ছে নেই। মি. ক্যারুথার্স গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই ফাঁকা রাস্তায় বিপদের আশঙ্কা আর নেই। সত্যিকারের বিপদ-আপদ কোনোকালে ছিল কি না তা অবিশ্যি আমার জানা নেই।

শুধু মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে মন কষাকষি হওয়ার জন্যেই চাকরি আমি ছাড়ছি না, আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। মি. উডলি নামে ন্যাকারজনক লোকটা আবার দেখছি এসে জুটেছে। জন্ম থেকেই লোকটাকে দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়ংকর। কিন্তু ইদানীং দেখছি ওর এই বীভৎস রূপ আরও খোলতাই হয়েছে। নিশ্চয় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল লোকটার, মুখের আদলটাই পালটে গেছে মনে হল, চেনা মুশকিল। জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম মি. ক্যারুথার্সের সঙ্গে খুবই উত্তেজিতভাবে হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে সে। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল দুজনের, শেষকালে যেন মি. ক্যারুথার্সও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন মনে হল।

গম্ভীরভাবে হোমস বলল, ওয়াটসন, যা ভয় করেছিলাম তাই। মেয়েটাকে ঘিরে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য এখন শেষবারের মতো স্টেশন আসার সময়ে বেচারির ওপর কেউ যেন উৎপাত না-করে তা দেখা। ভায়া, আগামী শনিবার সকালে আমরা দুজনেই রওনা হচ্ছি। এ-রকম একটা আশ্চর্য অথচ অসম্পূর্ণ

তদন্তের পরিশেষটা আর যাই হোক, অবাস্তিত যাতে না হয়, তা তো আমাদের দেখা দরকার ।

বালি ঢাকা চওড়া রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি আর হোমস বুক ভরে সকালের তাজা বাতাস নিয়ে পাখি পাখালির মিষ্টি গান শুনতে শুনতে বসন্তের ছোঁয়া অনুভব করলাম দেহের অণু-পরমাণুতে । কসবেরি হিল-এর কাছে রাস্তাটা একটু ওপরদিকে উঠে গেছিল, এইখান থেকে চোখে পড়ল লম্বা লম্বা পুরোনো ওকগাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে কালো কুটিল চেহারার শার্লিংটন হল । ওক গাছগুলো তো পুরোনো বটেই, কিন্তু তাদের থেকেও আরও বেশি স্থবির মনে হচ্ছিল হলটাকে, যার প্রতিটি ইটে প্রতিটি পাথরে অগুনতি বছরের অনেক ইতিহাস লেখা! সবুজ গাছপালা আর বাদামি রঙের ঝোপঝাড়ের মাঝখানকার লালচে হলদে ফিতের মতো সুদীর্ঘ পথটা আঙুল দিয়ে দেখাল হোমস । অনেক দূরে দেখলাম ছোট্ট একটা কালো ফুটকি একটা গাড়ি । আসছে আমাদের দিকেই । দেখেই অসহিষ্ণুভাবে এই যা বলে চিৎকার করে উঠল হোমস ।

আধঘণ্টার মতো সময় হাতে রেখেছিলাম । কিন্তু ও-গাড়ি যদি মিস স্মিথের হয়, তাহলে তো দেখছি অনেক সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছে সে আগের ট্রেনটা ধরার আশায় । ওয়াটসন, শার্লিংটনে ওর সঙ্গে দেখা হবে বলে মনে হয় না আমার-আমরা পৌঁছোনের আগেই শার্লিংটন পেরিয়ে যাবে ওর গাড়ি ।

চড়াইটা পেরিয়ে আসার পর থেকেই গাড়িটা আর দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু গতিবেগ আমাদের এমনই বেড়ে গেল যে আমার মতো কুঁড়ে মানুষের, চব্বিশ ঘণ্টাই

যার হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকা কাজ, আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। বলাবাহুল্য, পিছিয়ে পড়লাম। আমি। হোমসের কথা আলাদা। প্রথমত এ-রকম দৌড়ঝাঁপ করার ঝামেলা তো তাকে বলতে গেলে বারোমাসই পোহাতে হয়, তা ছাড়া ওর ওই অফুরন্ত নার্ভাস এনার্জির ভাঙার ভাঙিয়ে যেভাবে খুশি যতক্ষণ খুশি নিজের উদ্যমশক্তিকে জিইয়ে রাখতে পারে ও। কাজেই তার ক্যাণ্ডারুর মতো লাফিয়ে চলার এতটুকু মন্দগতি দেখা গেল না। আমাদের মধ্যকার ব্যবধান তখন প্রায় শ-খানেক গজ, আচমকা স্তব্ধ হল ওর ক্যাণ্ডারু লাফ। মুহূর্তেই দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে এমন ভাব করলে যেন নিরাশায় দুঃখে নিঃশেষ হয়ে গেল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে পথের বাঁকে দেখা গেল দু-চাকার একটা ঘোড়ার গাড়ি। কদম চালে মোড় ঘুরেই গড় গড় বন বন শব্দে তির বেগে গাড়িটা ধেয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

দৌড়োতে দৌড়োতে চিৎকার করে উঠল হোমস, ইস, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে, ওয়াটসন, দারুণ দেরি করে ফেলেছি আমরা। আমিও ততক্ষণে হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়োচ্ছি ওর পাশে পাশে। গাধা, বোকা গাধা আমি, আগের ট্রেনের জন্যে তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল আমার। মেয়েটাকে ওরা গুম করল, ওয়াটসন-গুম করল! খুনও করতে পারে! ভগবান জানেন কী ওদের মর্জি! রাস্তা জুড়ে দাঁড়াও! থামিয়ে দাও ঘোড়াটাকে। ঠিক আছে, উঠে পড়ো, চটপট! দেখা যাক এবার আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কি না।

লাফ মেরে গাড়িটায় দুজনে উঠে পড়ার পর হোমস লাগাম ধরে মুখ ঘুরিয়ে দিলে ঘোড়ার তারপরেই শন করে বাতাস কেটে চাবুকের এক ঘা। যেন উড়ে চললাম আমরা।

বাঁকটা ফেরার সঙ্গেসঙ্গে শার্লিংটন হল আর বোঁপের মধ্যকার সুদীর্ঘ রাস্তাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে ।

সজোরে হোমসের হাত আঁকড়ে ফিসফিসিয়ে উঠলাম, হোমস, এই সেই লোক ।

থামুন! সাইকেলটা টেনে এনে আমাদের রাস্তা বন্ধ করে চিৎকার করে উঠল লোকটা ।

আমার কোলে লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল হোমস ।

আপনাকেই খুঁজছিলাম । মিস ভায়োলেট স্মিথ কোথায়? দ্রুত অথচ পরিস্কার গলায় বলে গেল হোমস ।

আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি আপনাকে । তারই গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন আর জানেন না সে কোথায়?

এদিকে আসতে আসতে রাস্তায় চোখে পড়ল গাড়িটা ফাঁকা, কাউকে ভেতরে দেখিনি । মিস স্মিথ বিপদে পড়েছেন ভেবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এলাম এদিকে ।

হে ভগবান! হে ভগবান, এ কী হল, কী করি আমি এখন? হতাশায় একেবারে যেন খুঁড়িয়ে ভেঙে গেল দাড়িওলা আগন্তুক । শেষ পর্যন্ত ওই কুত্তা উডলি আর পাজির পাঝাড়া গাঁইয়া পাদরিটার খপ্পরেই পড়ল মেয়েটা । আসুন, আসুন, সত্যিই যদি ওর বন্ধু হয়ে

থাকেন আপনারা তাহলে চলে আসুন আমার পেছনে পেছনে। আমার পাশটিতে শুধু থাকুন, যেভাবেই হোক, বাঁচাব ওকে। তাতে যদি শার্লিংটন-এর বনে লাশও পড়ে থাকে, এ-শর্মা পেছোবে না।

উদ্ধান্তের মতো এক হাতে পিস্তল নিয়ে ঝোঁপের মাঝে একটা ফাঁকের দিকে দৌড়াল লোকটা। হোমস তার পিছু নিল, আমিও ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিয়ে লেগে রইলাম তার পেছনে। কাদা-চটচটে রাস্তার ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে হোমস বললে, এই তো, এই পথেই ওরা এসেছে দেখছি। আরে আরে এ কী! দাঁড়ান, দাঁড়ান, এক মিনিট দাঁড়িয়ে যান। ঝোঁপের মধ্যে এ কে? বছর সতেরো বয়সের একটা ছোকরা রক্তাক্ত মুখে পড়েছিল ঝোঁপের মাঝে।

আগন্তুক উত্তেজিতভাবে বললেন, এ যে দেখছি পিটার! এই ছোকরাই তো মিস স্মিথের গাড়ি চালিয়ে আনল এইমাত্র। জানোয়ারগুলো ওকে শুধু টেনেই নামায়নি, ডান্ডার ঘায়ে সাংঘাতিক জখমও করেছে দেখছি। বেচারি, কিন্তু ওকে এখন এইভাবেই ফেলে রেখে যেতে হবে। আমরা ওর পাশে থেকেও তো এখন কিছু করতে পারছি না। মেয়েটাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে, নারীজীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে যেভাবেই হোক তাকে রক্ষা করতে হবে।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে ক্ষিপ্তের মতো দৌড়াতে লাগলাম আমরা। চারদিক ঘেরা বাগানের কাছাকাছি গিয়ে হোমস দাঁড়িয়ে গেল।

বাড়ির দিকে ওরা যায়নি। এই তো বাঁ-দিকে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে এই যে এদিকে, লরেল ঝোঁপের পাশে। ওই শোন, ওই শোন, যা ভয় করেছিলাম! আচম্বিতে আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে গেল এক আতীক্ষ আর্ত চিৎকারে, নিঃসীম বিভীষিকায় যেন রিনঝিন করে উঠল সে-চিৎকার। শব্দটা এল আমাদের সামনেই ফুলে ফুলে ঢাকা ঘন সবুজ ঝোঁপের ভেতর থেকে। কেঁপে কেঁপে উঠছিল চিৎকারটা। তারপরেই আচমকা সব চুপ হয়ে গেল, শুধু শুনলাম গলার মধ্যকার চাপা ঘড় ঘড় শব্দ, যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার।

এদিকে! এদিকে! খেলার মাঠে আছে ওরা! চেষ্টাতে চেষ্টাতে ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে পাগলা হাতির মতো ছুটে গেল আগন্তুক। কাপুরুষ কুকুর কোথাকার! পেছনে আসুন, আপনারা আমার পেছনেই থাকুন! ওঃ, বড়ো দেরি হয়ে গেছে, বড়ো দেরি হয়ে গেছে! হায়, এ কী হল!

আচম্বিতে শেষ হয়ে গেল ঝোপঝাড়ের বাধা, এসে পড়লাম ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছানো একটুকরো খোলা জমির ওপর। সবুজ আয়নার মতো টুকরো জমিটার চারপাশে বড়ো বড়ো বহু পুরোনো ওক গাছের সারি। জমির ওদিকের প্রান্তে দৈত্যের মতো বিরাট একটা ওকগাছের ছায়ায় তিনজন লোকের ছোট্ট একটি দল দাঁড়িয়ে। তিনজনের মধ্যে একটা মেয়ে মিস স্মিথ, সামনের দিকে মাথা ঝুলে পড়েছিল তার এবং মনে হল জ্ঞান নেই। রুমাল দিয়ে মুখটাও বাঁধা দেখলাম। উলটোদিকে দাঁড়িয়ে পাশবিক চেহারার হোঁতকামুখখা লাল-গুফো একজন জোয়ান। বোম লাগানো চামড়ার গেইটার পরা, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সে, এক হাত কোমরে, আর এক

হাতে দুলছে একটা ঘোড়ার চাবুক। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তার দেহের প্রতিটি অংশে ভাবে ভঙ্গিমায় নিষ্ঠুর বিজয়োল্লাস, অপরিসীম ঔদ্ধত্য যেন লিকলিকে চাবুকের মতোই হিল হিল করে উঠছিল। ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে আর একজন পুরুষ। লোকটার বয়স হয়েছে। ধোঁয়াটে রঙের একগাল দাড়ি, হালকা টুইড সুটের ওপর ধবধবে সাদা খাটো আলখাল্লা। মাঠের কিনারায় আমরা দেখা দিতেই প্রার্থনার বইটা এমনভাবে সে পকেটে পুরল যেন এইমাত্র বরকনের বিয়ে সাঙ্গ হল। তারপর মহাফুর্তিতে ত্রু-প্রকৃতি বরবাবাজির পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাতেও ভুল করল না।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি, বিয়ে হয়ে গেল ওদের!

আমাদের গাইড শুধু বললে, চলে আসুন! চলে আসুন!

বলতে বলতে সবুজ ঘাসজমির ওপর দিয়ে উল্কা বেগে সে ধেয়ে গেল সামনের দিকে। পেছনে আঠার মতো লেগে রইলাম হোমস আর আমি। ছুটতে ছুটতে দেখলাম মিস স্মিথ টলমলিয়ে উঠে গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। ততক্ষণে আর আমার বুঝতে বাকি নেই যে সাদা আলখাল্লা পরা ধোঁয়াটে দাড়ি আধবুড়ো লোকটাই উইলিয়ামসন-এককালে কিছু সময়ের জন্যে পাদরিগিরিও সে করেছে। আমাদের দেখেই শ্লেষভরে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাল সে বাতাসে মাথা ঠুকে বো করে। ইতর চেহারার উডলি লোকটাও মাঠবন কাঁপিয়ে অউহাস্য করে উঠল জানোয়ারের মতো। এ-হাসি শুধু বিদ্রূপের নয়, বিজয়োল্লাসের। হাসতে হাসতে চাবুক দোলাতে দোলাতে সে এগিয়ে এল আমাদের পানে।

বলল, ওহে বব, তোমার দাড়িটা এবার সরিয়ে নাও। তোমাকে যখন আমি হাড়েহাড়েই চিনি, তখন ও-জিনিসটা রেখে আর হাসিয়ো না আমাকে। যাই হোক, সাজোপাজ নিয়ে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। এসো, মিসেস উডলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমাদের। এ-কথার উত্তর আমাদের গাইড যেভাবে দিলে তাতে তাক লেগে গেল আমার। পলক ফেলার আগেই ছদ্মবেশ খসিয়ে ফেলল সে। এক হ্যাচকা টানে কয়লা কালো কুচকুচে দাড়ির বোঝা সরিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়ল পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো পাগুশপানা লম্বাটে ধরনের একটি মুখ। দাড়িটা মাঠের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভার তুলে এবার লক্ষ করলে গোয়ার জাহবাজকে-কেউটে সাপের মতো হাতের ঘোড়ার চাবুকটা দোলাতে দোলাতে বিপজ্জনকভাবে যে তখনও এগিয়ে আসছিল আমাদের পানে।

আমাদের দোস্তু বলল, হ্যাঁ, আমিই বব ক্যারুথার্স। আর মেয়েটিকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করব আমি। সেজন্যে এমন কিছুই নেই এ-দুনিয়ায় যা আমি করতে প্রস্তুত নই। আমি তোমায় আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম-ওর গায়ে হাত দিলে কিন্তু ভগবানের দিব্যি, আমার কথার নড়চড় হবে না জেনে রেখো!

উঁহু, বড়ো দেরি করে ফেলেছ তুমি, ভায়োলেট এখন আমার বউ।

না, তোমার বিধবা।

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । ঔষধার বৈশিষ্ট্য ডায়াল । শার্লক হোমস

চকিতে খানিকটা আগুন বলসে উঠল তার রিভলভারের নলটাতে। ফায়ারিংয়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই উডলির ওয়েস্টকোটের সামনেটা ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্তে দেখতে দেখতে ভিজে গেল। আতঁ চিৎকার করে এক পাক ঘুরে গেল সে, তারপরেই চিৎপাত হয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাঠের ওপর কদর্য মুখের রক্তাভা চকিতে মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল বিচিত্র ফ্যাকাশে ভয়াবহতা। আধবুড়ো লোকটা তখনও তার সাদা ধড়াচুড়ো নামায়নি। নিমেষের মধ্যে এ-কাণ্ড হয়ে যেতে এমন অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে দিলে যা শোনার দুর্ভাগ্য সারাজীবনে আমার হয়নি। পরক্ষণেই টেনে বার করলে নিজের রিভলভার, কিন্তু তা তুলে ধরার আগেই তার চোখ পড়ল হোমসের উদ্যত রিভলভারের ব্যারেলের ওপর।

কঠিন স্বরে বললে হোমস, যথেষ্ট হয়েছে। পিস্তল ফেলুন। ওয়াটসন, তুলে নাও! ওরই মাথা লক্ষ করে দাঁড়াও! ধন্যবাদ। ক্যারুথার্স, আপনার রিভলভারটাও দিন আমাকে। মারপিটের আর দরকার নেই। এগিয়ে আসুন, দিয়ে যান রিভলভার।

কে আপনি?

আমার নাম শার্লক হোমস।

গুড লর্ড!

আমার নাম শুনেছেন দেখছি। পুলিশ না-আসা পর্যন্ত তাদের কর্তব্যই করতে হবে আমায়। এই, এদিকে এসো! ঝোপঝাড় ঠেলে ফাঁকা মাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল ভয়ার্ত গাড়োয়ানটা। তাকেই চিৎকার করে ডাকল হোমস। এদিকে এসো। যত তাড়াতাড়ি পার এই চিরকুটটা নিয়ে যাও ফার্নহ্যামে। নোটবুকের পাতা ছিঁড়ে খস খস করে কয়েক লাইন লিখল হোমস। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সুপারিনটেন্ডেন্টকে দেবে চিঠিটা। উনি এসে না-পৌঁছানো পর্যন্ত আপনাদের প্রত্যেককেই আমার হেফাজতে থাকতে হবে।

অত্যন্ত কড়া আর প্রভুত্বময় ব্যক্তিত্ব হোমসের। স্বল্প কথার খবরদারিতে চকিতের মধ্যে অমন একটি খুনখারাপির দৃশ্যও এসে গেল তার হাতের মুঠোয়। আমরা প্রত্যেকেই যেন তার হাতের পুতুল হয়ে গেলাম। উইলিয়ামসন আর ক্যারুথার্স আহত উডলিকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে। আমি নিয়ে এলাম মিস স্মিথকে-বেচারি দারুণ ঘাবড়ে গেছিল কাণ্ডকারখানা দেখে। আহত উডলিকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। হোমসের অনুরোধে তাকে পরীক্ষা করে রিপোর্টটা দিতে এলাম। মাস্কাতা আমলের পর্দা ঝোলানো ডাইনিং রুমে দুই বন্দিকে সামনে বসিয়ে সিধে হয়ে বসে ছিল হোমস।

বললাম, বেঁচে যাবে লোকটা।

কী!তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল ক্যারুথার্স। ওপরে গিয়ে ওকে শেষ করি আগে-তারপর অন্য কথা। আপনি কি বলতে চান ডানাকাটা পরির মতো

অমন সুন্দরী মেয়েটির সারাজীবন ওই জানোয়ার রোরিং জ্যাক উডলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে?

হোমস বললে, এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো দরকার নেই। মস্ত দুটো কারণে কোনোমতেই উডলির বউ হওয়া সম্ভব নয় মিস স্মিথের পক্ষে। প্রথমেই আমরা অনায়াসেই মি. উইলিয়ামসনকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে আদপে বিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা তার আছে কি না।

চিলের মতো চাঁচিয়ে উঠল বুড়ো রাসকেল উইলিয়ামসন, আলবত আছে।

ছিল এবং পরে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

একবার যে পুরুত হয়, চিরকাল সে পুরুতই থাকে।

আমার তা মনে হয় না। লাইসেন্স আছে?

বিয়ের জন্যে একটা লাইসেন্স আনিয়েছি। আমার পকেটেই আছে।

তাহলে তা চালাকি করেই আনানো হয়েছে বলব। সে যাই হোক, জোর করে দেওয়া বিয়েকে বিয়ে তো বলেই না, উলটে এ মহাপাতকের কাজ যারা করতে যায়, তাদের অপরাধের গুরুত্ব যে কতখানি, তা টের পাবেন শিগগিরিই। এ-ব্যাপার নিয়ে ভাববার

জন্যে কম করে বছর দশেক সময় তো পাবেনই, অন্তত আমার তো তাই বিশ্বাস। মি. ক্যারুথার্স, পিস্তলটা পকেটে রেখে দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতেন আপনি।

এখন তা বুঝেছি, মি. হোমস। জীবনে আমি একবারই ভালোবেসেছি এবং আমার এ ভালোবাসা, বুঝতেই পারছেন, মিস স্মিথকে ঘিরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে এতদিন ধরে। তাই সবরকমভাবে তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছি। সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় বিপদের ধাক্কা থেকে। কিন্তু এত করেও যখন দেখলাম যার সংস্পর্শে এসে ভালোবাসা কাকে বলে জেনেছি, সে পড়েছে এমন একজনের খপ্পরে, যার নামে কিমবারলি থেকে জোহানেসবার্গ পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা শিউরে ওঠে, সারা আফ্রিকায় যার জুড়িদার হওয়ার মতোও মানুষ-পশু আর খুনে গুন্ডা আর দুটি নেই, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, চিন্তাবুদ্ধিবোধে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল উন্মাদ রাগে। মি. হোমস, বেশি কথা কী, আমার চাকরিতে মিস স্মিথকে বহাল করার পর থেকে একটি দিনের জন্যেও ওঁকে আমি বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে বেরোতে দিইনি-কেননা, এই রাসকেলগুলো যে অষ্টপ্রহর ওত পেতে রয়েছে তার জন্যে, তা আর কেউ না-জানলেও আমি তো জানি। এমনকী বাড়ি ছেড়ে যেখানেই সে একলা রওনা হয়েছে, আমিও সাইকেলে তার পাছু নিয়েছি, পাছে কেউ তার ওপর হামলা করে বসে এই ভয়ে। অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? বেশ কিছুটা তফাতে থেকে সাইকেল চালিয়েছি এবং পাছে চিনে ফেলে তাই নকল দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশও ধারণ করতে হয়েছে। হয়তো এসবের দরকার হত না যদি আর পাঁচটা মেয়ের মতো হত মিস স্মিথ। কিন্তু তার মতো তেজি মেয়ে বড়ো একটা দেখা যায় না, কাজেই রাস্তাঘাটে বেরোলেই আমি তার পাছু নিই জানলে আর এক মুহূর্তও আমার চাকরিতে সে থাকত না।

টেলিগ্রামটা আসার পরেই বুঝলাম আর সবুর করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে, এসপার কি ওসপার, যা হয় একটা কিছু ওরা এবার করবেই।

কীসের টেলিগ্রাম?

পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করল ক্যারুথার্স।

এই দেখুন!

খুবই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম।

বুড়ো অক্সা পেয়েছে।

হোমস বললে, হুম। বুঝছি, এবার জলের মতোই সব বুঝছি। এবং এ-টেলিগ্রাম পাওয়ার পর কেন তারা উঠে পড়ে লেগেছে, তাও আর অস্পষ্ট নেই আমার কাছে। দয়া করে উৎকর্ষ হয়ে শুনুন তারপর বলুন আর কিছু গোপন রইল কি না। প্রথমেই বলি, আপনারা তিনজনেই-মানে, আপনি উইলিয়ামসন, আপনি ক্যারুথার্স আর উডলি-এসেছেন সাউথ আফ্রিকা থেকে।

পয়লা নম্বরের কাঁচা মিথ্যে বুড়ো ঘুঘু বলে উঠল সঙ্গেসঙ্গে, মাসকয়েক হল এদের আমি দেখেছি, তার আগে এদের চন্দ্রবদন দেখার সৌভাগ্য আমার কোনোদিনই হয়নি। তা ছাড়া আফ্রিকায় আমি জীবনে যাইনি। কাজেই, মি. ব্যস্তবাগীশ হোমস, আপনার মূল্যবান তদন্তফল পাইপে ভরে কিছুক্ষণ ধূমপান করলে বিলক্ষণ খুশি হব।

ক্যারুথার্স বললে, মিথ্যে বলেনি উইলিয়ামসন।

বেশ, বেশ, না হয় আপনারা দুজনেই এসেছেন আফ্রিকা থেকে। প্রভুপাদকে তাহলে আমাদের স্বদেশি মালই বলব। সাউথ আফ্রিকায় রালফ স্মিথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আপনাদের। আপনারা জানতেন বেশিদিন বাঁচবে না সে। আর জানতেন, বুড়ো অক্লি পোলে তার সব সম্পত্তিই পাবে তার ভাইঝি! কীরকম-ঠিক হচ্ছে তো?

ক্যারুথার্স মাথা হেলিয়ে সায় দিলে আর শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে আর এক পশলা গালিগালাজ সৃষ্টি করলে বুড়ো উইলিয়ামসন।

এইভাইঝিই তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আরও একটা জিনিস আপনারা জানতেন-বুড়ো কোনো উইলই করবে না।

ক্যারুথার্স বললে, লিখতে পড়তেই জানত না।

কাজে কাজেই আপনারা দুজনে কষ্ট করে সাগর লঙ্ঘন করে এলেন এদেশে, উদ্দেশ্য মেয়েটাকে খুঁজে বার করা। আপনার মতলব ছিল অভিনব। একজন বিয়ে করতেন মেয়েকে আর একজন বখরা নিতেন লুটের সম্পত্তির। যেকোনো কারণেই হোক, উডলিকে স্বামী নির্বাচন করা হয়। কেমন, ঠিক হচ্ছে তো?

জাহাজে আসার সময়ে বাজি ফেলে তাস খেলেছিলাম-উডলিই জিতে নিলে মিস স্মিথকে।

বটে। এখানে এসে কায়দা করে চাকরিতে বহাল করলেন মিস স্মিথকে, ঠিক হল এই সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করা শুরু করবে উডলি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনাদের, মাতাল উডলিকে চিনতে বেশি দেরি হল না মিস স্মিথের এবং এ-রকম একটা গোঁয়ার জানোয়ারের সঙ্গে প্রেম তো দূরের কথা, কথা বলাও যে সম্ভব নয় তার পক্ষে, তাও বোঝা গেল শিগগিরই। ইতিমধ্যে আপনার সব বন্দোবস্তই ভঙুল হয়ে গেল একটি কারণে আপনি নিজেই মিস স্মিথের প্রেমে পড়ে গেলেন। কাজেই একটা ইতর লোক আপনার ওপর টেক্সা মেরে তাকে জিতে নিয়ে যাবে, এ-চিন্তাও আপনার কাছে বিছের কামড়ের মতো যন্ত্রণাময় হয়ে উঠল।

না, না, কিছুতেই হতে পারে না!

তাই একদিন ঝগড়াটা হল দুজনের মধ্যে। আপনার ওপর গনগনে রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে এবং শুরু হল আপনাকে বাদ দিয়েই ভায়োলেট হরণের আয়োজন।

শুকনো হেসে ক্যারুথার্স বলল, উইলিয়ামসন, এ-ভদ্রলোকের কাছে আর কিছু চেপে রেখে লাভ আছে কি? হ্যাঁ, দারুণ ঝগড়া হয়ে গেছিল আমাদের মধ্যে। আমাকে ঘুসি মেরে পেড়ে ফেললে উডলি। এদিক দিয়ে আমিও কম যাই না। কাজেই শোধ নিলাম তখনই। তারপর থেকে যেন উবে গেল উডলি। এই পাদরি হতভাগার সঙ্গে তখনই যোগসাজশ হয় ওর। লক্ষ করলাম, মিস স্মিথ যে-পথ দিয়ে স্টেশনে যায়, তারই ধারে দুজনে ঘাঁটি পেতেছে একসাথে। তখন থেকেই মিস স্মিথের ওপর নজর রাখা শুরু করলাম আমি, কেননা হাওয়া সুবিধের মনে হল না। ওদেরকেও চোখে চোখে রাখলাম, কেননা ওদের আসল ফন্দিটা যে কী, তা ঠিক বুঝে উঠছিলাম না। দিনদুয়েক আগে বাড়ি বয়ে এসে এই টেলিগ্রামটা দেখাল উডলি। বুড়োর মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার পরেই ও জিজ্ঞেস করলে, এর পরেও চুক্তি অনুসারে আমি কাজ করব কি না। আমি সোজা না বলে দিলাম। ও আবার জিজ্ঞেস করলে, মেয়েটাকে আমি বিয়ে করে তাকে টাকার বখরা দেব কি না। আমি বললাম, বিয়ে করতে পারলে তো খুশিই হতাম, কিন্তু সে রাজি হবে না। ও বললে, আগে ওর বিয়েটা লাগিয়ে দাও তো, তারপর হুগাখানেক কি দুয়েক পরে দাওয়াই দিলে সব সিধে হয়ে যাবে। আমি বলে দিলাম, ওসব জোর জবরদস্তির কথা শুনতে আমি রাজি নই। রাগে আগুন হয়ে কদর্য গালিগালাজ করতে করতে চলে গেল উডলি। ওর মতো ছোটোলোক ইতরের মুখে অবশ্য ও ধরনের গালাগালি বেমানান নয় মোটেই। যাবার সময়ে শাসিয়ে গেল যে ছলে বলে কৌশলে মেয়েটাকে সে নিজের

কোটরে পুরবেই। এই হুগার শেষের দিকেই তার এ-চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। স্টেশন পর্যন্ত একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করেছিলাম আমি। কিন্তু মন মানল না, তাই নিজেই সাইকেলে পাছু নিয়েছিলাম তার। সবে রওনা হয়েছিল সে। আমিও নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখে পাছু নেওয়া শুরু করেছি, কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। যখনই দেখলাম দুজন ভদ্রলোক তার গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসছে, বুঝতে আর কিছুই বাকি রইল না আমার।

উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের টুকরোটা আগুনের চুল্লিতে ঢোকা মেরে ফেলে দিয়ে হোমস বললে, ইদানীং মাথাটা আমার বড়োই মোটা হয়ে গেছে, ওয়াটসন! যখনই তোমার রিপোর্ট পেশ করার সময়ে বললে দাড়িওলা সাইক্লিস্ট তোমার দিকে পিছন করে বাগানের ঝোঁপের মধ্যে দুহাত তুলে বোধ হয় নেকটাই ঠিক করছিল, তখনই আমার সব বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

কেসটার পাণ্ডুলিপির তলায় দেখছি অনেকদিন পরে নিজেই আরও দু-একটি কথা লিখে রেখেছিলাম। মিস ভায়োলেট স্মিথ বিপুল সম্পত্তি পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে এবং এখন সে ওয়েস্টমিনস্টারের নামকরা ফার্ম মর্টন অ্যান্ড কেনেডির পার্টনার সিরিল মর্টনের বধূ।

অপহরণ আর লাঞ্ছনার অভিযোগে উইলিয়ামসন আর উডলি দুজনেই শাস্তি পেয়েছে ধর্মাধিকরণ থেকে। উইলিয়ামসন সাত বছরের আর উডলি দশ বছরের।

টীকা

সুন্দরীর শতক জ্বালা : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট আমেরিকায় কলিয়াস উইকলির ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় এবং ইংলন্ডে জানুয়ারি ১৯০৪ সংখ্যায় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইম্পিরিয়াল থিয়েটার : ওয়েস্টমিনস্টারের রয়্যাল অ্যাকোয়ারিয়ামের অংশ, ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের হল-এ গান-বাজনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত। ১৮৯৯-এ এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অভিনেত্রী লিলি ল্যাংট্রি এটি আবার খোলবার ব্যবস্থা করেন ১৯০১-এ। এখানে অভিনীত মঞ্চ-সফল প্রযোজনাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল আর্থার কন্যান ডয়ালের লেখা ব্রিগেডিয়ার জেরাদ (১৯০৬)।

জোহানেসবার্গ : দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটার্সবার্গ অঞ্চলের স্বর্ণখনি এলাকার প্রশাসন-কেন্দ্র হিসেবে জোহানেসবার্গ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ সালে। বর্তমানে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার এক গুরুত্বপূর্ণ শহর।

কভেনট্রিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানিতে : কভেনট্রিতে মিডল্যান্ড ইলেকট্রিকাল ফ্যাকটরিস লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

দ্বিগুণ বেতন দিয়ে : ১৮৯৫-এ গভর্নমেন্টের চলতি বেতন পঞ্চাশ পাউন্ড, আজকের বাজারে ৩২০০ পাউন্ডেরও বেশি। তা ছাড়া থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকত এর সঙ্গে। জানিয়েছেন হোমস-গবেষক লেসলি ক্লিংগার।

সিটের ওপর সিঁধে হয়ে বসে : ভিক্টোরীয় যুগের ইংলন্ডে মেয়েদের সাইকেল চালাতে হত গোড়ালি পর্যন্ত স্কুলের স্কার্ট, পেটিকোট, উর্ধ্বাঙ্গে জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি পরে। মনে হয় না যে তারা খুব সাবলীল থাকতে পারতেন।

পিছিয়ে পড়লাম : দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস উপন্যাসে ওয়াটসনকে একবার বেশ জোরেই দৌড়াতে দেখা গিয়েছিল, স্যার হেনরির সঙ্গে। অনেক সমালোচকের মতে ওয়াটসনের পায়ে আফগানিস্তানের লাগা আঘাতের ব্যথা চাগাড় দেওয়াতেই তিনি দৌড়াতে পারেননি এইবার।

একবার যে পুরুত হয়, চিরকাল সে পুরুত থাকে: বুড়ো বজ্জাত উইলিয়ামসন কিন্তু এই কথাটা ঠিকই বলেছে। চার্চ অব ইংলন্ডের নিয়মে এমন পুরুত শাস্তির যোগ্য, কিন্তু তাতে বিয়ে ভাঙে না। অবশ্য, এক্ষেত্রে মিস স্মিথ-এর এ-বিয়েতে মত না থাকায় বিয়ে ভাঙতে বাধ্য।

কিমবারলি : ১৮৭০-এ এক বিশাল হিরের খনি আবিষ্কার হলে ১৮৭১-এ কিমবার্লি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার খনি অঞ্চলে। কিমবার্লির হিরের খনি কৃষিজীবী দেশ

দু রিটার্ন অব শার্লক হোমস । আর্থার বোশান ডয়েল । শার্লক হোমস

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে একে একটি খনিপ্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করে ।